



বাংলা সংবাদ

সংবাদক — শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

১৯৪৬

জগতে স্বাস্থ্য কে না চায় ?

“রাইচরন মার্কি খাঁতি সন্নিবার তৈল”

বাবহাবে মানুষকে সজীব করে ও হাবান স্বাস্থ্যকে পুনরুজ্জীবিত করে।

এই তৈল ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক—আচায়া প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয় কর্তৃক প্রস্তুত।

ইহাতে সর্দিয়া ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার ভেজান নাই, ভেজান প্রমাণে টাঙ্গা প্রমাণ।

প্রাপ্তিস্থান } ৩৩ নং নিউ ক্যানেল রোড—(বেলগেছিয়া)  
 } ৩৫৫ নং ওয়েস্ট ক্যানেল বোড—(উল্টাডাঙ্গা) কলিকাতা।

(ফোন নম্বর ৩৪৪০ বড়বাজার)

ইঙ্গিত কার্যালয়—মেহেরপুর—গোপসেনা পোঃ, যশোহর।

প্রবন্ধাদি পাঠাইবাব ঠিকানা—১৪৬ডি, মাণিকতলা রোড, কলিকাতা।

## সূচী

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

১। পত্রাবলী—(এক)—শ্রীশ্রীজ্ঞানী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়	২২৯	১৩। বঙ্কিত ( কবিতা )—শ্রীকুমার সবকার	২৫২
২। „ ( দুই )—শ্রীশ্রীবৎসল ঘোষ	২৩১	১৪। পাথের ( গল্প )—শ্রীফণীন্দ্র পাল	২৫৩
৩। ববষে ববষে ( কবিতা )—শ্রীদিলীপকুমার বায়	২৩২	১৫। অনির্কচনীয় ( কবিতা )—শ্রীসখা'নাথ দাশ	২৫৯
৪। মিলন পথে (গল্প)—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	২৩৩	১৬। প্রবোধকুমারের ছোট গল্প— শ্রীহেবেল বন্দোপাধ্যায়	২৬০
৫। বিশ্বামিত্র ( কবিতা )—শ্রীনন্দগোপাল সেন গুপ্ত	২৩৮	১৭। বাঙ্গালার কাব্য সম্পদ—শ্রীউপেন্দ্রকিশোর সামন্তবাহু সাহিত্য সরস্বতী	২৬৩
৬। কুটীর শিল্প—শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন শাস্ত্রী	২৪০	১৮। স্ববাহার ( কবিতা )—শ্রীপ্রণব বায়	২৬৫
৭। প্রার্থনা ( কবিতা )—শ্রীহেমেন্দ্রলাল বায়	২৪২	১৯। বাগান	২৬৬
৮। গল্প, গল্প নয়—শ্রীহেমেন্দ্র মল্লিক	২৪৩	২০। পুস্তক পাঠ	২৬৮
৯। জ্ঞানযোগ—বেদপত্নী	২৪৬	২১। ইঙ্গিতেব অভিনব প্রস্তাবের ছেব	২৬৯
১০। ড'ফোঁটা অগ্নিজল (কবিতা)—শ্রী মণিলাল নিয়োগী	২৪৬		
১১। উদয়তারা—শ্রীস্বনৈজকুমার বসু	২৫৭		
১২। আমার পৃথিবী—শ্রীপাচুগোপাল মুখোপাধ্যায়	২৫০		

## ইঙ্গিতেব নিয়মাবলী.

- ১। কার্তিক হইতে ইঙ্গিতেব বর্ষ আবম্ভ ।
- ২। বৎসবেব যে কোন মাস হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া বায় । যিনি যে মাসে গ্রাহক হইবেন তাঁহাকে সেই মাসেব পূর্কমাস পণ্যম্ভ কাগজ দেওয়া হইবে ।
- ৩। ইঙ্গিত প্রতিমাসেব ২য় সপ্তাহে বাহির হইবে । মাসেব ২০ তারিখেব ২য় কাগজ না পাইলে স্থানীয় পোষ্ট-মাষ্টাবেব সার্টিফিকেট সহ লিখনে অপাঙ্গ সংখ্যা পাঠাইয়া দেওয়া হয় । দুই আনার ডাকটিকিট পাঠাইলে যে কোন এক সংখ্যা নমুনা পাঠান হয় ।
- ৪। প্রবন্ধাদি সম্পাদকেব নামে ইঙ্গিত কাব্য'নেবে প্বেবিতব্য ।
- ৫। অমনোনীত প্রবন্ধাদি ডাক টিকিট দেওয়া না থাকিলে স্পষ্টে পাঠান হয় না । উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত প্রবন্ধাদি গৃহীত হয় না ।
- ৬। প্রবন্ধেব মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন ।
- ৭। লেখক লেখিকাণা অমুগ্রহ পূর্কক প্রবন্ধের নকল বাগিয়া পাঠাইবেন ; নতুবা অমনোনীত প্রবন্ধ ফেবত লইতে কিম্বা সম্পাদকেব নিকট হইতে কিছু জানিতে হইলে প্রবন্ধেব সহিত ডাকটিকিট পাঠাইতে হইবে । নূতন লেখক লেখিকাদেব সাহিত্যাশুশীলনেব স্রযোগ দেওয়া ইঙ্গিতেব অন্যতম উদ্দেশ্য ।

ইঙ্গিত-কার্যালয়—মেহেবপুৰ, গোপসেনা পোঃ. ( যশোহর )

১৪৬ ডি, মাণিকতলা রোড, কলিকাতা ।

## ❀ সূচী ❀

	পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
১। যোগাসনে অরবিন্দ—		১১। শ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধে ফ্রান্সের মহামনীষী	
শ্রীবীরীন্দ্রকুমার ঘোষ	৩৮৫	রোমঁ। রোলঁ। লিখিয়াছেন	৪০০
২। কালী—শ্রীদিলীপকুমার রায়	৩৮৬	১২। রসবোধ—শ্রীনিবারণ চৌধুরী	৪০১
৩। অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার—		১৩। তাঁতিরাম—আশালতা দেবী	৪০৪
রবীন্দ্রনাথ	৩৮৭	১৪। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্ররায়—	
৪। সুভাষিত—সম্পাদক	৩৮৮	শ্রীউপেন্দ্রকিশোর সামন্ত রায়	
৫। শুভদৃষ্টি—শ্রীদিলীপকুমার রায়	৩৮৯	সাহিত্য সরস্বতী	৪০৭
৬। শ্রীঅরবিন্দের বাণী	৩৯০	১৫। শ্রাবণ ( কবিতা )—	
৭। আমন্ত্রণ ( কবিতা )—		শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ	৪১০
শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ	৩৯২	১৬। উদয়তারা—শ্রীমুনীলকুমার ধর	৪১১
৮। অশেষের কথা—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু	৩৯৩	১৭। গান	৪১৮
৯। শ্রীঅরবিন্দ—শ্রীঅবনীনাথ রায়	৩৯৬	১৮। বাতায়ন—	৪১৯
১০। শ্রীঅরবিন্দের সেবায়—		১৯। পুস্তক পবিচয়—শ্রীশচীন্দ্রলাল ঘোষ	৪২০
শ্রীরতিকান্ত পালিত	৩৯৭	২০। জীবন বীমা	৪২২

## ❀ ইঙ্গিতের বিজ্ঞাপনের মাসিক হার ❀ ✓

১। পূর্ণ পৃষ্ঠা ১০৮ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ৫৮ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৩৮ টাকা, সূচীর নীচের অর্ধ পৃষ্ঠা ৬৮ টাকা ; অথ্য বিশেষ পৃষ্ঠার হার পত্রে জ্ঞাতব্য। বেশীদিনের চুক্তিতে বিজ্ঞাপন দিলে সুবিধা দরে বন্দোবস্ত করা হয়।

২। সাধারণ পৃষ্ঠার যে কোন জায়গায় প্রতি বর্গ ইঞ্চি ৮০ আনা হিসাবে।

৩। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়। নূতন বিজ্ঞাপন ২০শে তারিখের মধ্যে দেয়। অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। বিজ্ঞাপনের ভুলের জন্য আমরা দায়ী নহি এবং বিজ্ঞাপন যখন বন্ধ করিবেন, ব্লক থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরত লইবেন।

—ইঙ্গিতের স্বত্বাধিকারী

১৪৬ ডি, মাণিকতলা রোড,  
কলিকাতা।

# WORKS OF SRI AUROBINDO.

Rs. As. P.

## ✽ অরবিন্দের পত্র ✽

### Essays on the Gita

Ist. Series	5	0	0
2nd. Series	7	8	0
Isha Upanishad ...	1	8	0
Ideal & Progress. ...	1	0	0
War & Self Determination	2	8	0
System of National Education	1	0	0
Thoughts & Glimpses ...	0	8	0
Evolution ...	0	8	0
Superman ...	0	6	0
Baji Prabhou ...	0	10	0
Yogic Sadhan ...	0	10	0
Yoga & its Objects ...	0	12	0
Renaissance in India ...	1	12	0
Ideal of the Karmayogin	1	12	0
The Mother ...	1	0	0
Kalidasa ...	1	0	0
National Value of Art ...	0	8	0
Rishi Bunkim Chandra	0	6	0
Brain of India ...	0	6	0
Uttarpara Speech ...	0	4	0
Songs of Myrtilla ...	1	4	0

Speeches—New Ed. will Shortly come out.

দাম ছয় আনা

হিন্দুনারীর আদর্শ কি, স্বামীর অনুবর্তিনী হইয়া  
কোন্ কৰ্মপন্থার অনুসরণ করিলে এই জরামৃত্যু-  
দুঃখময় সংসারে থাকিয়াও অন্তরে অনন্ত রহন্তলোকে  
শান্তির নীড় রচনা করা যায় তাহারই আভাষ  
অরবিন্দ তাঁহার পত্রের ছন্দে ছন্দে দিয়াছেন।

## ✽ পণ্ডিতারীর পত্র ✽

দাম দুই আনা

দিব্য জীবনের ইঙ্গিত এই পত্রে আছে।

গীতার ভূমিকা	...	...	১।০
কারাকাহিনী	...	...	১।০
কৰ্মযোগী	...	...	২।০
অরবিন্দের গীতা ১ম	...	...	১।০
ঐ ২য়	...	...	২।০
ঐ ৩য়	...	...	১।০

**ARYA PUBLISHING HOUSE**

**COLLEGE STREET MARKET, CALCUTTA.**

**TO LET.**



## ❀ সূচী ❀

	পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
১। শেষপ্রশ্নের জের—		৬। বৈকালী ভোগ ( কবিতা )—	
শ্রীআশালতা দেবী	৪২৫	শ্রীকালিদাস রায়	৪৪৫
২। মায়া—শ্রীঅরবিন্দ দত্ত	৪৩৩	৭। তাঁতিরাম—শ্রীআশালতা দেবী	৪৪৬
৩। জন্মান্তর ( কবিতা )—শ্রীমনোহর মৈত্র	৪৪০	৮। ‘আমির’ ঋগ্বাণী ( কবিতা )—	
৪। মনো-মর্শ্বর—শ্রীহিমাদ্রিনারায়ণ বসু	৪৪১	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু	৪৪৭
৫। অপ্রত্যাশিত—শ্রীহাসিরাম দেবী	৪৪৩	৯। বাতায়ন	৪৪৮

## স্বর্ণ-সমনস্যার সমাধান

এই সোনার দুম্মুল্যের বাজারে ও ভীষণ অর্থ সঙ্কটের দিনে আসল সোনার গহনা গড়াইয়া স্ত্রী পরিজনকে পরিতে দেওয়া কোন মতেই নিরাপদ নহে। সেক্ষেত্রে স্বল্পবায়ু অর্থাৎ আসল সোনার গহনা গড়াইতে যে মজুরি ব্যয় হইত, মাত্র সেই খরচে অবিকল গিনির মত রং হাই পলিস বিশিষ্ট (9kt) গোল্ডের (৯২ দরের সোনা) গহনা ব্যবহার করিয়া সামাজিকতা ও মানসম্মত রক্ষা করুন। ১ সেট নিরেট সোনার (9kt. গোল্ডের) আধুনিক প্যাটার্নের ফ্যান্সি ভাটিয়া চুড়ি ৮ গাছা, ছোট ও বড় ৩০২ টাকা হইতে ৫০২ টাকা; ঐ 9kt. গোল্ডের ফ্যান্সি মবচেন ১ ছড়া ৩০ ইঞ্চি—৪৫ ইঞ্চি—৬০ ইঞ্চি লম্বা ২০২ টাকা হইতে ৩০২ টাকা ও ৪৫২ টাকা; ঐ ছোট ছেলেমেয়েদের নেকচেন ১টী লকেট সহ 9kt. Gold এর ১২২ টাকা। প্লেন ব্যাঙ্গেল ছোট ও বড় 9kt. Gold এর ৮২ টাকা হইতে ১২২ টাকা। 9kt. Gold এর জিনিষ ব্যবহারান্তে বিক্রয় করিলে অধিক মূল্য আদায় পাইবেন।

বিস্তারিত জানিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র দিলেই ক্যাটালগ পাইবেন।

**আবিষ্কারক---বি, মুখার্জি**

“নিউ রোল্ডগোল্ড ওয়ার্কস,”

১৭৫ নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

## ইঙ্গিতের অযথা বিনম্রের কৈফিয়ৎ

নূতন মাসিকের ক্ষেত্রে নাগিয়া, বিশেষতঃ তাহাতে আবার যদি থাকে আনাড়িপনা, তাহা হইলে তাহার পরিচালকমণ্ডলীকে, সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহক অনুগ্রাহকবর্গকেও যে কতরকম অসুবিধা, অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়া যাইতে হয়—তাহা ভুক্তভোগীর অবদিত নাই। অধিকন্তু যদি থাকে অর্থভাব, তাহা হইলে “মধুরেণ সমাপয়েৎ !!” আমাদের এ সকল ক্রটির সবগুলিই নৃত্যাদিক বর্তমান। পাঠকবর্গও প্রতিমাসে তাহার নিদর্শন পাইতেছেন।

কিন্তু এরূপ অত্যাচার তাঁহারা আর কতদিন সহ্য করিবেন! শুধু তাঁহাদেরই নিকট হইতে চিরদিন ত্যাগ, সহানুভূতি ও উদারতা চাহিয়াই দিন কাটাইলে আমাদের চলিবার নয়—আমাদেরও হইতে হইবে সেগুলি পাওয়ার উপযুক্ত।

তাই পুরাতন বৎসরের অনিয়মের জের টানিয়া আমরা নূতন বৎসরের প্রথম মাসটিকে (কার্তিক) আর গ্লানিগ্রস্ত করিতে চাহিতেছি না। পুরাতন বৎসরের ভাদ্র সংখ্যাটিকে আশ্বিন সংখ্যায় পরিবর্তিত ও পরিসমাপ্ত করিয়া আমরা পুরাতন বৎসরকে অতীতের ক্রটি ও গ্লানিভার হইতে মুক্তি দিতে চাই। অতঃপর ইঙ্গিতের নূতন বৎসরের প্রথম মাস, অর্থাৎ কার্তিক মাস হইতে প্রতি মাসেই কাগজ যাহাতে নিয়মিত ভাবে প্রথম সপ্তাহে এবং পরিবর্তিত আকারে পান তাহার সমিশেষ বন্দোবস্ত করা হইল।

ছাপাখানার বিঘ্ন বিলাটই ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যা অযথা বিনম্র ও একসঙ্গে প্রকাশিত হইবার প্রধানতম কারণ।

### ইঙ্গিতের গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণের প্রতি নিবেদন

এইমাসে ইঙ্গিতের বৎসর পূর্ণ হইল। দীর্ঘ একবৎসর ধরিয়া ইঙ্গিত তাহার পাতায় পাতায় কি সাহিত্য পরিবেষণ করিল তাহা ইঙ্গিতের গ্রাহক অনুগ্রাহকবর্গের অবদিত নাই। তাঁহারা ইঙ্গিতের সাহিত্য-সম্পদ, কিম্বা বর্ণপটের ভাবাভাবের মানদণ্ডে যে ইঙ্গিতকে গ্রহণ করিয়া আছেন—তাহা মনে করিবার আমাদের কোনই কারণ নাই। তাঁহারা ইঙ্গিতকে গ্রহণ করিয়াছেন উদার সহানুভূতির দৃষ্টিতে; ইঙ্গিতের সাহিত্যিক মণ্ডলী যাহাতে বাণীর সেবা করিতে সুযোগ পায়, সেই ভবুই তাঁহাদের এই অপার ত্যাগ ও মহানুভবতা। আমরা এবৎসরও পুনরায় তাঁহাদের গ্রাহক থাকিয়া আমাদের এই সাহিত্যিক সার্থকতাকে সম্বদ্ধতর করিবার জগ্ন অন্বেষণ জানাইতেছি। নূতন বৎসরে ইঙ্গিতের আকার পরিবর্তিত হইল—প্রচ্ছদপট ও নানারূপ চিত্রের সম্ভারে পত্রিকাখানি পরিপুষ্ট করা হইল। দাম পূর্ববৎ রহিল। গতবৎসরের চাঁদাটা তাঁহারা আজও দেন নাই, তাঁহাদের আশ্বিনের মধ্যেই আমাদের অফিসের ঠিকানায় চাঁদাটি পাঠাইবার জন্ত অনুরোধ করি।

একান্তই যদি কেহ আমাদের প্রতি বিমুগ্ধ হইয়েন, কিম্বা নূতন বৎসরে গ্রাহক থাকিতে নিতান্তই অসুবিধা বোধ করেন—তাহা হইলে কার্তিকের পূর্বে একখানি কার্ডযোগে আমাদের জানাইবেন। এ বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া কেহ যেন এ গরীব প্রচেষ্টাটিকে কতিগ্রস্থ না করেন। ইতি—

বিনীত

কার্য্যাপ্যক্ষ

# সূচী

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

১। রবীন্দ্রনাথ—“নিরুদ্দেশ যাত্রায়”	১	৯। চাষার ছেলে—	৩৭
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু	১	শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৩৭
২। বনাম—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মল্লিক	৬	১০। ভূপর্যটক ( কবিতা )—শ্রীলতাদেবী	৪২
৩। বিংশ শতাব্দী ও প্রেমেন্দ্র মিত্র—	১১	১১। শক্তিয়োগী পীলসুডস্কী—	৪৩
শ্রী প্রণব রায়	১১	শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্তী	৪৩
৪। কত দূরে ?—শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ	১৩	১২। ‘গতি মোর পূর্ণতার পানে’ (কবিতা)—	৪৬
৫। বার্তাবাহী—	১৭	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মিত্র	৪৬
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর বি, এ	১৭	১৩। নারীসাহিত্যের মর্যাদা—	৪৭
৬। বেকার সমস্যা—	২৩	শ্রীকালিদাস রায়	৪৭
শ্রীআশুতোষ সাহা	২৩	১৪। ন্যায়দর্শন—	৪৮
৭। “তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী	৩০	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিজ্ঞারত্ন এম, এ	৪৮
অথির বিজুরিক পাতিয়া” ( কবিতা )—	৩০	১৫। সঙ্কলন—	৫১
শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য বি, এ	৩০	১৬। বাতায়ন—	৫৪
৮। উদয়তারা—শ্রীসুনীলকুমার ধর	৩১	১৭। প্রাপ্তিস্বীকার—	৫৬

## ❀ ইঙ্গিতের বিজ্ঞাপনের মাসিক হার ❀

১। পূর্ণ পৃষ্ঠা ১০ টাকা, অর্ধ পৃষ্ঠা ৫ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৩ টাকা, সূচীর নীচের অর্ধ পৃষ্ঠা ৬ টাকা ; অথ বিশেষ পৃষ্ঠার হার পত্রে জ্ঞাতব্য। বেশীদিনের চুক্তিতে বিজ্ঞাপন দিলে সুবিধা দরে বন্দোবস্ত করা হয়।

২। সাধারণ পৃষ্ঠার যে কোন জায়গায় প্রতি বর্গ ইঞ্চি ১০ আনা হিসাবে।

৩। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়। নূতন বিজ্ঞাপন ২০শে তারিখের মধ্যে দেয়। অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। বিজ্ঞাপনের ভুলের জন্য আমরা দায়ী নহি এবং বিজ্ঞাপন যখন বন্ধ করিবেন, বন্ধ থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে ফেরত লইবেন।

## —ইঙ্গিতের কার্য্যধ্যক্ষ

১৪৬ ডি, মাণিকতলা রোড,

কলিকাতা।

## শ্রীঅরবিন্দের পুস্তকাবলী

**ভারতের রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভা**—শ্রীঅরবিন্দের A Defence of Indian Culture ইহতে অনূদিত  
এই পুস্তকখানি বাংলা ভাষায় রাজনীতি সম্বন্ধে অপূর্ব গ্রন্থ। ভারত কেন পরাধীন তাহার গুঢ় রহস্যের সন্ধান  
এখানে পাইবেন। মুক্তির পথ দেখিতে পাইবেন। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র।

**শ্রীঅরবিন্দের গীতা**—মানবজাতির বর্তমান সমস্যাসমূহের সমাধানে গীতার উপযোগিতা কি যদি বুঝিতে  
চান, শ্রীঅরবিন্দের এই দিব্য ব্যাখ্যা পাঠ করুন। জীবনের পথে নূতন আলোক দেখিতে পাইবেন।

মূল্য ১ম খণ্ড—১।০, ২য় খণ্ড—২।০, ৩য় খণ্ড—১।০

শ্রীঅরবিন্দের ইংরাজী ও বাংলা পুস্তকাবলীর বর্ণনাসহ বিস্তৃত ক্যাটালগ, পত্র  
লিখিলেই পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

গীতাপ্রচার কার্যালয়

১৬ নং নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য লেন, পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা।

## দিলীপকুমারের

দুধারা ( উপগ্রাস )—১।০ দেড় টাকা।

নারী একসঙ্গে দুজনকে ভালবাসে, না—না ?

শরৎচন্দ্র :—“বইখানি সকলকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়তে বলি।”

মনের পরশ ( উপগ্রাস )—৩২ তিন টাকা।

শরৎচন্দ্র :—“বুকের দরদ দিয়ে যে সংসারটাকে দেখতে শিখেছে তার লেখার মধ্যে যে কত ব্যথা  
আনন্দ জমে ওঠে এ বইটি পড়লে তা বোঝা যায়।.....শেষের দিকটা  
এতো ভালো লেগেছে যে বলতে পারি না।”

ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকাবলী ( সঙ্গীত শিল্প )—২২ দুই টাকা।

বীরবল :—“বাংলা ভাষায় একটি অপূর্ব গ্রন্থ”—ভূমিকায়। ভারতের শ্রেষ্ঠ  
গায়ক গায়িকা ও বর্তমান সঙ্গীতের সম্পর্কে।

✓ গীতিমঞ্জরী ( স্বরলিপি )—২।০ আড়াই টাকা।

দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল, পণ্ডিত ভাতখণ্ডের লক্ষাগীত,  
নিরুপমা দেবী, কবীর, মীরা—প্রভৃতির গান।

অনামী ( কবিতা—যন্ত্রস্থ )

শ্রীঅরবিন্দ, রোলাঁ, রামেন, রবীন্দ্রনাথ, এ-ই, শরৎচন্দ্র, নলিনীকান্ত, বুদ্ধদেব, সুরাবর্দ্ধি, আশালতা,  
কিতীশ সেন প্রভৃতির বহু পত্র শতাধিক পৃষ্ঠা সহিত। তিন ভাগ এক খণ্ডে। ৪০০ পৃষ্ঠারও অধিক।

প্রাপ্তব্য :—গুরুদাস লাইব্রেরী—২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা।

# ইঙ্গিত

সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য নামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং হাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥

১ম বর্ষ	বৈশাখ	১৩৩৯
৭ম সংখ্যা		সাল

## পত্রাবলী \*

এক

### শ্রীমুক্তি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রবি বাবু সেদিন আমার এক বন্ধুকে বলেছেন, “আমাদের দেশের লোকেরা আমার কাছে দাবী করতে জানে না। এখানে দাবী মানে সভাপতি হ’তে কিংবা ছেলে মেয়ের নাম রাখতে অনুরোধ করাই বোঝে। যুরোপে কিন্তু এমন চাইতে জানে যে আমি না দিয়ে থাকতেই পারি না। এ দেশে দিলীপ শুধু খুঁচিয়ে কথা বাহির করতে জানে।” ছোট মুখে যদি বড় কথা শোনবার দুরাশা পোষণ করেন তাহ’লে বলি আমার বন্ধুদের মধ্যে কেবলমাত্র আপনিই শুধু provoke কোরতে জানেন, সেই জন্ত আপনার চিঠি পড়তে আমার ভাল লাগে। চিঠির উত্তর দিতে আমার আরো ভাল লাগত, যদি আমার স্বাস্থ্য আরো ভাল হ’ত। কাছে থাকার এই গুণ, মুখে তর্ক চল্ল, কাগজ কলমের বালাই নেই, সময় খুঁজে নেবার অজুহাত নেই, শক্তি অপচয়ের আশঙ্কা নেই। আজ চিঠি লিখতে ভাল লাগছে— তাই লম্বা চিঠি লিখছি।

মানুষ সন্তানের কাছে ঠিক কি চায় বলা শক্ত, কিন্তু মাত্র দুই দিন দেখে সন্তানের কাছে ‘স্বত’ হ’তে চায় এ কথা আমি জোর করে বলতে পারি না। গরে সেই বয়সে হয়ত চাইব, যে বয়সে গ্রে সাহেব Elegy লিখেছিলেন। উক্ত কবিতাটি আপনি উল্লেখ কোরেছেন তাই বলছি। কবিতাটির মর্ম্ম হয়ত আপনি যা লিখেছেন তাই, কিন্তু সৌন্দর্য্য হচ্ছে অল্প ধরণের। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ শুধু পরকালের কথা ভাবে এই দেশে, ও-দেশে পূর্বকালের কথাই মনকে বিষাদে ডুবিয়ে দেয়। এ বিষাদ গোমতী নদীর কিনারায় শীতকালের সন্ধ্যায় কুয়াসার মতন, অম্পট, অনির্দিষ্ট, অথচ আবেশময় এবং সুন্দর। এই অনির্দিষ্ট আবহাওয়া হচ্ছে ভূত ভগ্নের স্থতির আবেষ্টনী, ভবিষ্যতের নয়। আমি অন্ততঃ এই বুঝছি। সে যাই হোক, মার ভালবাসাতে স্বত হ’বার লোভ ও আকাঙ্ক্ষা নেই। অতএব বর্তমান মুহূর্ত্তে সন্তানের প্রতি স্নেহ পিতা ও মাতার কাছে স্থতির স্মরণ ধবে চলে না।

\* পত্র দুইখানি শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায়ের নিকট লিখিত



আমার বিশ্বাস আপনার বিশ্লেষণের গোড়ায় একটা মন্ত ভুল আছে। জীবজগতে হয়ত Continuation of species নিয়তির মতন কাজ কবে—তাও কবে না। কিন্তু মনোময় জগতে এই Continuity-কে মনের ভাবায় তর্জমা করলে ব্যক্তির নিজের গড়া মনের স্বাক্ষরে অবমাননা করা হয়। Behaviouristরা এই ভুল করেছেন। আমার বক্তব্য এই যে মন, দেহের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েও নিজের স্বাধীন গর্ভিত, সেই জন্ত জীবজগতের নিয়মগুণকে হুহু মনোময় জগতে পাটন যায় না। এই ধরন জড়ের প্রকৃতি আকর্ষণ ও প্রত্যাকর্ষণ, কিন্তু তাই বলে প্রেমের সংজ্ঞা কি নর নারীর আকর্ষণ হবে? প্রেম হচ্ছে একটি সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ জড়, জীব, মন, আত্মা সবই মিলে সৃজন করে। আমাদের কি অধিকার আছে সৃজন শক্তির একই অখণ্ড ও সম্পূর্ণতাকে বিশ্লেষণ করে তার একটি মাত্র ধারার দ্বারা শক্তির সমস্ত বিকাশকে বোঝা? অনেক কথা মনে আসছে—লিখতে পারছি না।

“পতিতার পত্র” সত্য ঘটনা হ’তে পারে। accomplished fact-কে অস্বীকার করি না—কিন্তু fact এর সাহিত্যিক মূল্য নেই। তার রূপই মূল্যবান—কিন্তু নাম ও রূপ আলাদা। নাম ঠিক করার মানে সমস্তার প্রকৃতি নিরূপণ করা অর্থাৎ সমস্তা নির্ধারণ করা। আপনি লিখেছেন প্রথমে, পত্রটি problem নয়, তার পরেই লিখেছেন, ‘সফাইটা সত্য কিনা, অর্থাৎ যে রকম ঘটনার মধ্যে পড়েছিলেন তাতে তাঁর ঘরে থাকাই সাহসিকতা হ’ত, কি চলে যাওয়াই উচিত হ’ত এই বিচার্য—এইটাই crucial point—পরে লিখেছেন controversial point. Controversy তার আমার কথিত problem এ তফাৎ কোথায়? আমার বিশ্বাস লেখক রূপ দিতে গিয়ে সমস্তার নাম নিয়ে ব্যস্ত হয়েছেন যেটা আমার কাজ ছিল—রূপস্ফটর ছিল না। নারী হৃদয়ের অজানা বেদনা, একটা অকথিত বিদ্রোহ, পুরুষ-সমাজের উপর একটা স্ত্রীত্ব অভি-শাপ—বক্তৃতার বিষয় হ’ত পারে, তাও Bethune College-এর মাঠে। কিন্তু ওরূপ abstract argument, কিন্তু

abstract emotion সাহিত্যের বস্তু নয়। ব্যক্তি থেকে চ্যুত, বিচ্ছিন্ন করেছেন কি সব মাটি। “পতিতার পত্র” একটি সমাজতত্ত্বের বক্তৃতা মাত্র। যদি fact হয় তা হ’লে গল্পাংশ লোপ পেত না।

আমি কতটা বিবাহ-বিদ্রোহী বৈশাখের “কল্লোলে” পাবেন। লেখাটির বাইরে থেকে মনে হবে জ্ঞ সাগরের ঝিপকো। তাই দেখে যেন ভাববেন না যে আমি “পতিতার পত্রের” মর্মগ্রহণে অক্ষম। সেখানে বাগ্যাকান্ত বাবুর গল্প এক জায়গায় লিখেছি। “পতিতার পত্র” বা বঙ্গবার কথা আমারও তাই অর্থাৎ বিবাহের সার্থকতা নেই, তবে হরিসাদন বাবু লিখেছেন নারী সমাজের তরফ থেকে, আর আমি লিখেছি মাত্র একটি ব্যক্তির (সে ব্যক্তিটি পুরুষ) তরফ থেকে—tragedy একই। আমার রূপ দেওয়া আশা করি সাহিত্যিক হয়েছে। হরিসাদন বাবুর লেখার সঙ্গে আমার লেখার তুলনা করছি দেখে মনে মনে ক্ষুব্ধ হবেন না, কেননা আমি বাক্য রূপ বুঝি তারই প্রমাণ মাত্র দিচ্ছি, তুলনা করছি না। আর মনে মনে চটে না গিয়ে আমার লেখাটিকে নিরপেক্ষ ভাবেই দেখবেন।

আপনার বন্ধুর ভাষা একটু ফেনিল, কিন্তু ভালই। সত্য কথা এই যে আপনার চিঠির ভাষা ওর চেয়েও ভাল। আমার concrete লেখা ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। ভাব-প্রবণ লেখা তত পছন্দ আর হয় না, বোধ হয় বয়সের দোষে।

হরিশোহন আমাকে চিঠি দেয় নি, সেই জন্ত উত্তর দিতে পারি নি। সে সভাপতি হয়েছে শুনে সুখী হলাম—তার depth আছে, enthusiasm আছে যদি ইতিমধ্যে অধ্যাপনা করে উচ্ছন্ন না গিয়ে থাকে। আমি তাকে প্রোৎসাহিত করি—আপনারও বোধ হয় ভাল লাগবে। সে আজকাল গান গায় কি?

দেবী হয়ে গেল, হাত ভেঁরে আসছে। “সবুজপত্রের” জন্ত আজ একটা লেখা পাঠাচ্ছি।

আমার ভালবাসা নেবেন—এখানে বড় গরম। ইতি

তোমার ২০শে তারিখের পত্র পাইয়াছি। এ কয়দিন এত ব্যস্ত ছিলাম যে ইচ্ছা থাকিলেও তোমায় পত্র লিখিতে পারি নাই। তোমার পত্র পাইয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। মনে হইতেছে আমি বুঝি সেই দৌলতপুরের অধ্যাপক আছি। পুরাতন জীবন একরকম ভুলিয়া গিয়াছি তুমি এবং তোমার পত্র আমাকে অতীতের কোলে টানিয়া আনিয়া আমার বর্তমান ভুলিয়া দিতেছে। বাস্তবিক দৌলতপুরের স্মৃতি ভুলিবার নহে। যতদূর যে অবস্থায় থাকি না কেন সে জীবন আর ফিরাইয়া পাইব না। আজও দৌলতপুরের কাহাকেও পাইলে আমার সব কাজ ভুলিয়া সেখানকার কথা জিজ্ঞাসা করি। তাহার কারণ কি জন—সেখানে আমরা আদর্শের সন্ধানে আদর্শ জীবন পাইবার জন্য গিয়াছিলাম। মানুষ যতটা তাহার আদর্শের নিকট থাকিতে পারে এবং সেটাকে বাস্তব মনে করে এবং মনে করিয়া তাহার প্রতি নিজেকে চলিত করে ততটাই সে সুখী ইহাই আমার মত। দৌলতপুরে পার্থিব সুখ ও আরাম কিছুই ছিল না এবং সেগুলি স্বেচ্ছায় বিদায় দিয়া সুখী ছিলাম তাহার কারণ এই যে সেখানে জীবনের সামনে একটা জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া তাহাকে পূজা করিতাম। আজ সব আছে—সুখ বলিতে সাধারণ মানুষের যাহা বুঝায় সব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান—কিন্তু শান্তি নাই; যেন কিসের অভাব প্রতিক্ষণ অনুভব করি। যাহা হউক দর্শনের চর্চায় প্রয়োজন নাই, অল্পকথা বলি।

সত্য সত্যই তোমার স্মৃতিপ্রসঙ্গ পড়িলে মন বেদনায় তরিয়া উঠে। জীজ্ঞানি চিরদিনই আমার আদর্শ ছিল। সেই আদর্শ রাখিতে পারিব না ইহা আমার বিবাহ না করিবার অন্যতম কারণ ছিল। শাস্ত্রকার হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজবেত্তারা জীলোকদের জন্য সংখ্যাতীত অনুশাসনের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন কিন্তু পুরুষের জন্য কিছু

নাই বলিলে চলে। আজও “গৃহিণীর কর্তব্য” “বিবাহিতা নারীর কর্তব্য” প্রভৃতি নীতিগর্ভ পুস্তক ও পুস্তিকা বাহির হইতেছে কিন্তু পুরুষের সম্বন্ধে কি কিছু বলিবার নাই? এই যে—স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করিয়া ইহজগতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল তাহার মৃত্যুর অন্তরালে কি গভীর দুঃখ, হতাশা, বেদনা হয়ত নির্মমতা লুকান আছে সমাজ কি তাহা দেখে? পুরুষ কি কখন আত্মবিশ্লেষণ করে? হয়ত ঐ হতভাগিনীর স্বামী বংশের কারণে না ফারিতে আর একটা কৃতদাসী আনিয়া সাংসারিক সুখভোগের উপায় করিয়াছে বা করিবে। কিন্তু তা’ বলিয়া কি স্বেচ্ছামৃত্যু বরণকারিণীর মর্ম্মকথা বিগণিতার নিকট পৌছিতে না এবং সমাজ কিছু করুক আর না করুক তাহার অমোঘ শাস্তি অলক্ষ্যে সমাজকে ভোগ করিতে হইবে না? প্রকৃত বলিতে কি আমি যখন আমাদের নির্মমতা ও নির্ভরতার কথা ভাবি তখন আমাদের মানুষ বলিতে ঘৃণা হয়। আমি আমাদের জীজ্ঞানিকে কোন দোষ দেই না। কারণ শিক্ষা দীক্ষা না দিয়া দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে যাহাকে এক সংসার হইতে অন্য সংসারে আনিয়া সমাজ, ধর্ম্ম, সাংসারিক ও ব্যক্তিগত রীতিনীতির মধ্যে ফেলিয়া সর্বপ্রকারে পেষণ করি তাহার নিকট হইতে আমরা কি আশা করিতে পারি? আমাদের হউক বা অন্য জাতির হউক যে সমাজের রীতিনীতি আইন কাহন মানবধর্ম্মকে ক্ষুদ্র করে, মানুষের হৃদয় দেখে না—সংস্কার ও আচার লইয়া ব্যস্ত থাকে, সে সমাজ চাই না—ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাউক। আমি যত দিন বাঁচিব এই সমাজ ধ্বংস করিতে সাহায্য করিব।

তুমি ধান ভানিতে শিবের গীত মনে করিও না। সমাজ সম্বন্ধে আমার মতামত তোমায় জানাইলাম।

দৌলতপুরের “দেবায়তন” উঠিয়া যাইবার কারণ লেখকের অভাব নহে, উৎসাহের অভাব। হয়ত এখনো যদি আমি



সেখানে বাই, অলখর প্রভৃতি নূতন কবির সৃষ্টি করিতে পারি।  
আর অন্য কেহ গিয়া কবি এবং কাব্য বধ করিতে পারে।  
তাই বলি সেখানে আজ প্রাণ নাই—উৎসাহ নাই—সুতরাং  
চেষ্টা নাই—গতানুগতিক ভাবে সব কাজ চলিতেছে—তাই  
“দেবায়তন” উঠিয়া গেল।

তোমার পত্র পড়িয়া আমার পুরাতন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া  
উঠে। যে সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণের পদতলে বসিয়া  
জীবনের খাণ্ড আহরণ করিয়াছিলাম—তাহাদের আশার  
কিঞ্চিৎ পূর্ণ করিতে পারিলে আমি অনেক বড় হইতাম—  
পার্থিব হিসাবে নহে, মনুষ্য হিসাবে। কিন্তু তাহারা  
শিব গড়িতে চাহিয়াছিলেন—আমি বাদর হইয়াছি। যৌব-  
নের প্রারম্ভে যখন দৌলতপুর যাই তখন বিশ্বপ্রেমিক হইব  
এই দুরাশা ছিল—তাই সকলকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়া-  
ছিলাম। জগতে মানুষ যাহা চায় বিধাতা আমার পূর্ণ-

ভাবে দিয়াছিলেন। পিতামাতা ও ভ্রাতা বন্ধুদের অকৃত্রিম  
ভালবাসা, তোমাদের স্নেহ প্রণোদিত ভালবাসা ও পূজা  
আমি অজ্ঞপ্ত পাইয়াছি। সে আকাঙ্ক্ষা নাই। আজ মুক্তকণ্ঠে  
স্বীকার করিতেছি—তোমাদের প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতাম।  
যৌবনের যে ভালবাসা মানুষ স্ত্রী পুত্রদিগকে ও নিজ  
সংসারকে দেয়, আমি উহা তোমাদের দিয়াছিলাম। তাই  
পরিপূর্ণ যৌবনে বিবাহ করিয়া ক্ষুদ্র সংসারে তাহা  
দিতে পারিলাম না। ইহা আমার দুর্বলতা কিন্তু ইহা সত্য।

আমি ভাল আছি। আমাদের বাড়ীর ঠিকানা ৩১ রাম-  
রতন বস্তুর লেন, শ্রামবাজার, কলিকাতা। তোমার  
স্ত্রী কবে আসিবেন জানিতে পারিলে আমি মটর পাঠাইতে  
পারি। শীঘ্র আমার অশীদার অগরবাবু দিল্লী বাইবেন।  
তোমার সন্তিত সাক্ষাৎ করিতে বলিব।

আমার ভালবাসা জানিবে। পত্রের উত্তর দিও।

## বরষে বরষে

শ্রীদিলীপ কুমার রায়

বরষে...বরষে...আজি...অভ্রান্ত ঝঝরে তপ্ত অশ্রু বরষায়,  
দীর্ঘ মর্ম্মতলে হয়, শোণিতে উথলে লোর...বরষে বিধুর,  
উর্দ্ধলোক হ'তে ওই নামে...আজি নামে...হিম করুণা নিষ্ঠুর !  
সীমাহারা তার সেই শূন্য ব্যাপ্তি মাঝে হৃদি আপনা হারায়।

অন্নের পরিধি-ঘেরা প্রিয় দুঃখ স্থখ মোর ! মেহুর মধুর—  
চির পরিচিত ওগো হারানো দিনের স্মৃতি ! আজিকে বিদায়।  
আজি মোর যেতে হবে উদার দুর্ভিসারে...বেদন যাত্রায়...  
বেলা হারা ঘর ছাড়া...উত্তাল তরঙ্গ চূর্ণ দলিয়া...সুদূর।

গহান্ জীবন ! তব মহানন্দ সৃজ' প্রাণ বৈরাগী আমার.  
বারেক চাহিব তবু ফিরে মোর মুহূর্ত্তান্ মর প্রেম 'পরে,  
যারে বিসর্জিতে হবে চূর্ণিব বারেক সেই বিদায়-অধরে,  
পরে একা—হবে স্রু উদ্দেশে মোর—চির অভিসার।

বরষে...বরষে...আজি...নিখিল ভুবন শুধু তপ্ত আঁধিধারা  
দেবতা কিরায় মুখ...যাহে হয়, মর্ত্য হৃদি হয় আত্মহারা।

শ্রীনলিনী কান্ত গুপ্তের ফরাসী সনেট হইতে অনূদিত।

## Il plent.....Il plent.....

Nalini Kanta Gupta.

Il plent...il plent...il plent sans fin des  
pleurs amors  
Il plent du sang an fond demon an fendue  
La grace sans merci du Haut est descendue ..  
Et dans son infini, je me perds ! je me perds !

Petits plaisirs chers ! O les gentils mouillages  
Demes jours envotes, il me fant vous quitter,  
After an large exfin chercher les apretes  
Des embruns vagabonds sur les mars sans vivages !

Bonheur de vie en grand ! j'en ai lesin toujours  
Mais un dernier regard, Amours en agonie !  
Un sent baiser d'adioux anx levres que je nic,—  
Et je pars a jamais et vers toi sent jaccours !

Il plent...il plent...le monde enfier nist que  
des larmes

O les dieux si jaloux des aises qui nous  
charment !

## মিলন-পথে

( পূর্বানুস্মৃতি )

শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়

সে দিন বেড়াতে যাওয়া আর তার হ'ল না। কত কি চিন্তা আসিয়া তাহাকে চারি দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিতে লাগিল। সেই তার বহু আশা আকাঙ্ক্ষার পাঠ্য জীবনের কাল অবধি—জীবনের অসীম ব্যর্থতা—দুঃখ দৈন্যের শত শত নগ্নমূর্তি—ক্ষুদ্র উপজীবিকা—পিতামাতার অকালমৃত্যু, সব মিশে যেন একটা বড় তাল পাকাইয়া তাহার মাথার মধ্যে ভেঁা ভেঁা করিয়া ঘুরিতে লাগিল। আজ চিন্তার তার অবধি নাই। তবুও সেই বিশৃঙ্খল চিন্তার স্রোতের ঘূর্ণিপাক এড়াইয়া একটা অনন্তভূত ভাব তার ক্লান্ত মনকে স্পর্শ করিতে লাগিল। সে রাত্রে ভাল করিয়া তাহার ঘুম হইল না।

পর দিন সকালে উঠিয়া হাত মুগ ধুইয়া ছেলে পড়াইতে যাইবে এমন সময় দু'জন ভদ্র লোক আসিয়া উপস্থিত। দু'জনই তার পরিচিত। একজন হরপ্রসাদ রায়ের সদর নায়েব কৃষ্ণ কমল বাড়ুজ্জে ও অপর ব্যক্তি তার পাশের বাড়ীর এক জ্ঞাতি খুড়া প্রসাদ মুখুজ্জে। বিজয় উভয়কেই সমাদরে ঘরের ভিতর লইয়া আসিল এবং খাতের উপরের বিশৃঙ্খল বিছানার স্তূপ একটু বিছাইয়া দিয়া বসিতে অনুরোধ করিল। কুশল জিজ্ঞাসার পালা শেষ হইলে, কৃষ্ণ কমল বাবু ধীরে ধীরে আসল কথা পাড়িলেন। বিজয় অনেক ভাবিল, অনেক আপত্তি তুলিল—তার সাংসারিক ও আর্থিক অবস্থা দেখাইয়া; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই টিকিল না। কৃষ্ণ বাবু সেই মেসে বসিয়াই ছেলে আশীর্বাদের কার্য্য সারিয়া আবার দশটার টে'ণেই দেবীপুরে ফিরিলেন।

( ৫ )

আজ বিজয়ের বিয়ে। পাড়ার বধূরা সব মাতুলিক ক্রিয়ামগ্ন রত। বিজয়কে মান করাইয়া, কপালে তার চন্দন

এঁকে বর সাড়াইয়া দিল। আর বৌদিদিকে করিতে হইল বিজয়ের মায়ের সব কাজ। বিজয় বৌদিদিকে প্রণাম করিয়া বিয়ে করিতে দসিন।

খুব ঘটী করিয়া বিবাহ হইল। বর দেখিয়া কেহ স্থগাতি বই নিন্দা করিল না। তবে গরীব বলেই যা সবার একটু আফশোষ রয়ে গেল। প্রবীণা প্রতিবেশিনীদের মধ্যে কেহ কেহ অনাদৃতভাবে জমিদার গৃহিনীকে এ সাম্বনা দিতে তুলিল না যে—“জন্ম মৃত্যু বিষে, তিন বিধেতা নিয়ে। কপাল ছাড়া আর পথ নেই। তবে মেয়ের ভাগ্যে যদি সুখ থাকে তবে এই ছেলের হাতেই হবে। তা বলে আর দুঃখ কর না মা।”

বর কনের হাত ধরিয়া বাসরে যাইতেছে এমন সময় বাহিরের জনতার মাঝে একটা মৃদু কোলাহল উদ্ভিত হইল—“ঐ ভবেশ এসেছে”, ঐ ভবেশ এসেছে”।

শত বিস্মিত চক্ষুর মধ্য দিয়া ভবেশ হন্ হন্ করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল, এবং নিকটে দণ্ডায়মানা বিস্মিতা ভবতারিণী দেবীকে প্রণাম করিয়া বলিল—“জ্যাঠাই মা, আজ দশটায় জামিনে খালাস পেয়েছি। বেরিয়েই এখানে চলে এসেছি—আমার অমিয়ার বিয়ের উৎসবে যোগ দেবার জন্তে”। সে যেন আরও কিছু বলিতে যাইতে ছিল, কিন্তু গলা ভারী হইয়া উঠিল।

নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সেই ঝুল বারান্দার সম্মুখস্থ রেলিং ধরিয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অদূরে সানাইয়ের বেহাগ রাগিণী যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার অন্তরের সহিত সমতা রক্ষা করিতেছিল। শ্রামাপ্রসাদ ধীরে ধীরে পাশে আসিয়া তাহার হাত ধরিল।

( ৬ )

বিজয় বিবাহ করিয়া বাড়ী আসিল। এয়ো দলের

হলুধনি ও ঢোল সানাইয়ের বাজনায ছোট বাড়ীটী আজ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। বৌদিদি বধু বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। বুকে তাঁর আনন্দ ধরে না, কেবল চোখ দুটিই তাঁর মাঝে মাঝে ভিজিয়া উঠিতেছে। আজ সোনার সংসার, কিন্তু সংসার ধারা করিলেন তাঁরা সব আজ কোথায়! বৌ দেখিয়া সবাই বলিতে লাগিল—“এমন রূপ দশ গ্রামের মধ্যে আসে নাই।” বউ দিদি আরও দেখিলেন বউ যত না রূপ অলঙ্কার আনিয়াছে—গুণ আনিয়াছে তার শত গুণ। অত বড় জমিদারের একমাত্র আদরের মেয়ে; কিন্তু অহঙ্কারের লেশটুকু নাই তার অন্তরে। দু’দিন না যেতেই সে বৌদিদির হাতের কাজ কাড়িয়া করিতে যাইত—তাঁর শত বাধা নিষেধ সত্ত্বেও। অবশেষে বৌদিদির একটা কৃত্রিম ধমক না থাইয়া আর নিরস্ত হইত না। আনন্দে বৌদিদির চোখে জল আসিত। তিনি বলিতেন “আমার চাঁদে চাঁদে” মিলিয়াছে। আজ বিজয়ের ফুল শয্যা! বর বধুর প্রথম মিলন রাত্রি। ফুলের মালা বরণ ডালা লইয়া পাড়ার মেয়েরা আসিয়া বর বধুকে মনের মত করিয়া সাজাইল। বৌদিদিদের মধ্যে কেহ কেহ গান বাজনা করিলেন। হাসি ঠাট্টার অবিচ্ছিন্ন বজা বহিল। শেষে কোলের ছেলে মেয়ে ঘুমাইয়া পড়িতেছে দেখিয়া সবাই মিষ্টি মুখ করিয়া নিজ নিজ ঘরে ফিরিলেন।

বিজয় এখন মহা সমস্তা গণিল। কি বলিয়া বউয়ের সঙ্গে আলাপ করিবে—কে প্রথমে কথা কহিবে—কি জিজ্ঞাসা করিবে—কি ভাবে তাদের নব জীবন বাপন পদ্ধতির একটা মোটামুটি খসড়া তৈরি করিয়া লইবে, এইরূপ কত অসংলগ্ন চিন্তারাশি তাহার অন্তরকে তোল পাড় করিয়া তুলিল।

বিজয় নীরবে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল, নিতান্তই যখন অপর পক্ষ হইতে কোন সাড়া আসিল না, তখন তাহাকেই প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করিতে হইল। অমিয়ার বাম হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বিজয় আশ্বে আশ্বে ডাকিল—“আমার অমিয়া”—“ও অমিয়া”—“ও গো” কথা কওনা কেন?” কোন সাড়া নাই। তখন বিজয় নিতান্ত হতাশের সুরেই বলিল “বুঝেছি, এ বিয়েতে তুমি

সন্তুষ্ট হতে পারনি।” এতক্ষণে উত্তর আসিল “যদি বুঝে থাক তবে তাই”।

“যদি সন্তুষ্টই না হতে পেরে থাক তবে এ বিয়েতে তুমি মত দিলে কেন?” “অত কথা আমি জানিনে। আমার শরীর বড় খারাপ বোধ হচ্ছে, আমায় ঘুমাতো দাও।” বিজয়ের বুকে কে যেন একগানা পাথর চাপাইয়া দিল। তাহার শিথিল বন্ধন হইতে অমিয়ার হাত থানা আশ্বে খসিয়া পড়িল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে সে পাশ ফিরিয়া গেল। এইরূপে ব্যর্থ নিশীথিনি চুপে চুপে আসে চুপে চুপে যায়, সাহস হয় না—তার সুগভীর নীরবতা ভঙ্গ কারতে।

সকালে শুকনো মুখে বিজয় বিছানা হতে উঠে। বন্ধু বান্ধবের দল জিজ্ঞাসা করে—“কেমন বিজু, বৌয়ের সঙ্গে কেমন ভাব হচ্ছে?” বিজয় স্নান চৌটে হাসির রেখা ফুটিয়ে বলে “বেশ”! বৌদিদি জিজ্ঞাসা করে “ওকি! বিজু, অমন সব সময় মুখ ভার করে থাকিস কেন?” বিজয় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে “কই কিছু না।”  
.....বৌ পছন্দ হয়েছে ত?.....বিজয় মাথা নীচু করে বলে “হঁ।”

বাড়ীতে আর মন টিকিল না। বিজয় সে দিন সকাল বেলা হঠাৎ বৌদিদিকে তার কলিকাতায় যাওয়ার আয়োজন ঠিক করিয়া দিতে বলিল। বৌদিদি বেশ একটু বিস্মিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন “আজই কলিকাতায় যাবি কেন? ছুটি ফুরবার ত এখনও অনেক দেরী আছে। অন্ততঃ বৌ যে কদিন এখানে আছে, সে কটা দিন থেকে যা”। বিজয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল “না, আমার বিশেষ জরুরী কাজ আছে—আজ না গেলেই নয়।” বুকের ব্যথা বুকে চাপিয়া বিজয় সেই দিনই কলিকাতায় চলিল।

বিজয়ের আকস্মিক কলিকাতা গমনে বৌদিদির মনে কেমন একটা খটকা রহিয়া গেল।

( ৭ )

অমিয়া খুত্তর বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিল। তাহাকে কাছে পাইয়া বৃদ্ধা ঠাকুরমার ত আর আনন্দ ধরে না।

তাড়াতাড়ি খাবার খাওয়াইয়া কাছে বসাইয়া শত প্রাণে গাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। শশুর বাড়ীর সকলের কেমন ব্যবহার, কেমন আদর যত্ন পাউল, কি কি গহনা পাইল ইত্যাদি.....।

অমিয়া শত মুখে বৌদিদির প্রশংসা করিতে লাগিল। বলিল—“ঠাকমা, অমন লোক দেখা যায় না। যেমন মিষ্টি চহারা, তেমনই মধুর ব্যবহার। একাধারে সবই মিলিয়াছে—শাস্তি স্থির সতর্ক ভালবাসা—আনন্দের সরল পরিহাস ও সমবয়সীর সাহচর্য। অমুর যে শশুর বাড়ীর আদর যত্নের কোন অভাব হয় নাই শুনিয়া তিনি অনেক আশ্বস্ত হইলেন। অমুকে আরও কাছে টানিয়া লইয়া গালটা তাহার একটু টিপিয়া দিয়া বলিলেন “কেমন বর পছন্দ হয়েছে ত?” আসার সময় কি বলে দিলে সে?” “যাও অত আমি জানিনে। বলিয়া সে সেখান হইতে উঠিয়া গেল। বৃদ্ধার মুখখানি মুহূর্তে উজ্জল হইয়া উঠিল।

শশুর বাড়ী হইতে আসিবার পর অবধি অমিয়ার জীবনে একটা মস্ত পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। এই কয় দিনেই সে যেন কেমন একটু ভারিকি হইয়া উঠিয়াছে। তার সেই সকৌতুক চঞ্চল দৃষ্টি ও কারণে অকারণে হালকা হাসি আর নাই। একটা মস্ত গান্ধীবা যেন তাহার আপাদ মস্তক জুড়িয়া বসিয়াছে। সমবয়সীরা সব ঠাট্টা করিয়া বলিল “এত বড়লোক হ’লি ক’বে?” শুনিয়া সে শুধু মুখ টিপিয়া হাসিত।

সে দিন সকাল বেলায় এক ভিখারিণী আসিয়া গিন্নিয়ার নিকট একখানা কাপড়ের প্রার্থনা জানাইল। জমিদার গৃহিণী তখন নীচের ঘরে বসিয়া তরকারি কুটিতেছিলেন, বাটির উপর হইতে মুখ না তুলিয়াই তিনি উত্তর দিলেন “দেওয়ার মত কাপড় ত এখন নাই বাছা।”

অমিয়া নিকটেই বসিয়া ছিল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে ছুটিয়া উপরে গেল এবং মুহূর্তের মধ্যেই একখানি লাল পেড়ে সাড়ী আনিয়া ভিখারিণীর হাতে দিল। সে অজস্র আশীর্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

আজকাল অমিয়ার দয়া দাক্ষিণ্য বড় বাড়িয়া উঠিয়াছে। পরোপকারই যেন তার জীবনের সব চেয়ে প্রিয় ব্রত হইয়া

দাঁড়াইয়াছে। পাড়ার গরীব প্রতিবেশীদের মধ্যে কাহারও অসুখের কথা শুনিলে, সে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া সেখানে যায়; দিন রাত সেখানে পড়িয়া থাকে ও সেবা শুশ্রূষা করে। গোপনে আঁচলের খুঁটে বাধিয়া লইয়া যায়—ঔষধ পথ্যের অভাব দেখিলেই চুপে চুপে নিয়া আনে।

জ্যৈষ্ঠ মাস। জামাই বয়ী। বিজয় নিমজ্জিত হইয়া দেবীপুরে আসিয়াছে। নূতন জামাই আসিয়াছে। মহা ধুমধাম পড়িয়া গেল। আদর যত্নের সীমা নাই। আমোদ প্রমোদ, খেলা ধূলা ও গান বাজনার মধ্যেই সারাদিন কাটিল, রাত্রিতে আহারের পর বিজয় শুইতে গেল, কিন্তু অমিয়ার সন্ধান নাই। ও পাড়ার টুনে শাঁখারির ছেলের জর-বিকার তাই অমিয়া সারা রাত সেখানেই পড়িয়া আছে।

বৃদ্ধ টুনে শাঁখারি তাহার টিপটিপে লণ্ঠনটা হাতে লইয়া যখন অমিয়াকে পৌছে দিয়ে গেল, তখন রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অমিয়া তার ঠাকুরমাকে আসিয়া চুপে চুপে ডাকিল, দরজা খুলিয়া দিতে। দরজা খুলিতেই তিনি বিকৃত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন আর এখন এলে কেন? আসার আর কি দরকার ছিল?” অমিয়া কোন কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে ঠাকুরমার বিছানার এক পাশে শুইয়া পড়িল। জমিদার গৃহিণীও অনেক বকাবকি করিতে লাগিলেন। তাহার সেই অগ্নিশর্মা মূর্তি দেখিয়া বেচারী টুনে ত ভয়ে একেবারে চট হইয়া গিয়াছিল। এতক্ষণে আস্তে আস্তে বলিল “গিন্নিমা, উনাকে আমার কিছু বল না। উনি ত মানুষ নয়। সগ্গের কোন দেবতা শাপ ভেট্টা হয়ে এই মন্তে এসেছে—আমাদের মত গরীব দুঃখীকে ভ্রাণ করতে।” গৃহিণী রাগে গর গর করিতে করিতে দরজা আঁটয়া দিলেন।

বিজয় দু’দিন থাকিয়া চলিয়া গেল। অমিয়ার সাক্ষাৎ মিলিল না। মা গালি পাড়িতে লাগিলেন। অমিয়া সহজ ভাবেই জবাব দিল “একটা জীবনের চেয়ে আমার আমোদ প্রমোদ বড় নয়।”

সে বার বড়দিনের সময় বাড়ী আসিয়া বিজয় অরাক্রান্ত হইয়া পড়ে। তিন চার দিন পর্যন্ত জর বিচ্ছেদ না হওয়ায় বৌ দিদি অমিয়াকে আনিতে দেবীপুরে লোক পাঠাইলেন,



কিন্তু আসিনে কে ? তখন দেবীপুরের বাগদীপাড়ায় ভীষণ কলেরা দেখা দিয়াছে । অমিয়ার স্নান আহারের সময় নাই । কোন দিন বা একবার বাড়ী আসিতে পারিত—কোন দিন বা আসিতও না । তাহাকে ডাকাইয়া মা বিজয়ের অস্থখের কথা সব বলিলেন । সে এককথায় উত্তর দিল “সেখানে দিদিমণি থাকিতে তাঁহার শুশ্রূষার কোন ক্রটিই হবে না । এখানে শত শত মুমূর্ষুকে ফেলিয়া আমি যাইতে পারিব না ।” মা ক্রুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন—“আমার বাড়ীতে আর তুগি ঢুকতে পাবে না ।” “না হয় নাই ঢুকিব” — বলিয়া দরজার মাথায় তাকের উপর হইতে কি একটা পুঁটুলী লইয়া আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে অমিয়া খিড়কির দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল । দেবীপুর হইতে লোক ফিরিয়া আসিয়া সকল কথাই বলিল । বৌদিদি সব শুনিলেন, কিন্তু কোন কথাই বলিলেন না ।

বিবাহের পর দীর্ঘ তিন বৎসর অতীত হইতে চলিল । ইহার মধ্যে অমিয়া অনেক বারই মুক্তগামে আসিয়াছে কিন্তু বিজয়ের সহিত আর সাক্ষাৎ হয় নাই । বিজয়ের ছুটিতে বাড়ী ফিরিবার পূর্বেই অমিয়া মাকে চিঠি লিখিয়া কৌশলে দেবীপুরে চলিয়া যাইত । বিজয়ও ছুটির সময় যে বার অমিয়া বাড়ীতে থাকিত, সেবার বায়ু পরিবর্তনের নাম করিয়া অন্যত্র রওনা হইত । উভয়ের মধ্যে এই যে চলনার অভিনয় চলিতেছিল, তাহা অন্য কেহ না জানিলেও বুদ্ধিমতী বৌদিদির বুঝিতে বাকী রহিত না । ব্যথায় তাঁহার বুক ভরিয়া উঠিত ।

( ৮ )

সেদিন অমিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া সোজা সাজি নটিক বাগদীর বাড়ী আসিয়া উঠিল । নটিকের স্ত্রী মাতু দরজায় হাত দিয়া তাহারই অপেক্ষায় পথপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল । অমিয়া আসিয়া দাওয়ায় উঠিতেই মাতু ব্যাকুলকণ্ঠে কাদিতে কাদিতে তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—“মা, তোমার ছেলে অমন করছে কেন ?” অমিয়ারও চোখে জল আসিল । মাতুর আকুল কণ্ঠের মধ্যে যে ব্যথা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইল—তাহাই আজ তাহাকে সব চেয়ে

বেশী আঘাত দিয়া গেল । “ভয় কি ? এমনি সেরে যাবে ।”—বলিতে বলিতে একটু অন্যমনস্ক ভাবেই সে ঘরে ঢুকিয়া ফটকের শিয়রে বসিতেই মনে পড়িল—তাহার স্বামীও ত একদিন এমনি রোগে পড়িয়া তাহাকে লইতে লোক পাঠাইয়া ছিলেন । আর সেদিন সে উপেক্ষায় সেখানে যাইতে অস্বীকার করিয়াছিল । সেই কঠোর অবজ্ঞা কত ভীষণ ভাবেই না তাঁহার—পীড়িত বুকে বাজিয়াছিল । সেও ত তাঁর বিবাহিতা পত্নী । স্বামীর প্রতি কি তাহার কোন কর্তব্যই নাই । হঠাৎ ফটক অশ্রুটস্বরে বলিয়া উঠিল—“উঃ—ঃ মা একটু জল ।” অমিয়ার চমক ভাঙিল । সে ভাড়াতাড়ি পাশের গ্লাসটা উঠু করিয়া তাহার মুখে ধরিল ।

রাত্রি প্রায় দশটায় অমিয়া উদাস প্রাণে বাড়ী ফিরিল এবং কাহারও সহিত আলাপ না করিয়াই বিছানায় শুইয়া পড়িল । তাহার পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া অন্য কাহারও তাহার সঙ্গে কথা বলিবার সাহস হইল না । মা ভাত খাইতে ডাকিলেন । সে উঠরে জানাইল—তাহার শরীর বড় অস্থস্থ হয়েছে । ভাত খাবে না ।

আজ বুকে তার শত চিন্তার ঝড় বহিতেছে । তার ব্যর্থ প্রেমের এতটুকু সান্ত্বনা খুঁজিতে সে আজ কোন পথে চলিয়াছে—নিমেষের স্থখ স্বপ্নের একটা ক্ষীণ স্মৃতি বুকে লইয়া আজ সে কি করিতে বসিয়াছে—সে কি সেই ক্ষণিক ভুলের একটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লইতে পারিবে না ? তারই ভ্রম কি আর একটা জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সুখ-স্বচ্ছন্দ্য চির ব্যর্থতায় ডুবিতে বসে নাই ? ব্যথা ও অশ্রুশোচনায় তার অন্তর কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিল । আজ তার মনে হইতে লাগিল—যদি একটি বার তাঁর দেখা পাই—পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া লইব । তিনি ত দেবতার মত মানুষ—অবশ্যই ক্ষমা করিবেন ।

( ৯ )

দিন তিনেক হইল বিজয় প্রবল জ্বর ও বুকে পিঠে বেদনা লইয়া বাড়ী আসিয়াছে । ডাক্তার দু'বেলা দেখিতেছেন ও ঔষধ দিতেছেন, কিন্তু রোগ

দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। পূর্বে বৃকের এক পাশে ব্যথা ছিল, এখন দুই পাশেই চাপিয়া ধরিয়াছে। বৌদিদি প্রাণপাত করিয়া রাত্রি দিন শুশ্রূষা করিতেছেন—আর তিন বেলা নারায়ণের মন্দিরে মাথা কুটিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না।

আজ দুপুর হইতেই বিকারের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। ডাক্তারেরা তাহার জীবন সম্বন্ধে শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন, বৌদিদি বিজয়ের অবস্থা আত্মপূর্বক লিখিয়া অমিয়ার মায়ের নিকট এক পত্র পাঠাইলেন।

মা পত্র পড়িতেছেন। অমিয়া কাছেই বসিয়া আছে। সে সব শুনি। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিল। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল “মা, এফুনি বেহারা ডেকে আমার পাকী ঠিক করে দাও। আমি যুক্তগ্রামে যাব।” তিনি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন “এখন সন্ধ্যা বেলায় কোথায় যাবি? কাল সকালে তখন সব ব্যবস্থা করা যাবে।” অমিয়া কিছুতেই শুনিল না। জিদ ধরিয়া বসিল—“আমাকে এফুনি যেতে হবে,—তাই পৌছাতে যত রাত হয়।” জমিদারগৃহিণী বাড়ীর চাকরকে বেহারা ডাকিতে হুকুম দিলেন। অমিয়া নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত সেখানেই বসিয়া রহিল।

বেহারা আসিলে অমিয়া পরণের কাপড়খানা পর্যান্ত ছাড়িল না, তাড়াতাড়ি মায়ের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া পাকীর ভিতরে গিয়া বসিল। অমিয়া চলিয়া গেল। মা অবাক হইয়া পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যুক্তগ্রামে যখন পাকী হইতে বাহির হইয়া অমিয়া সোজা-স্বজি বিজয়ের ঘরে আসিয়া ঢুকিল বিজয় তখন একটু স্থির হইয়া শুইয়াছিল। ধীরে ধীরে পাশে বসিয়া বিজয়ের মুমূর্ষু মুখ খানির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একবার দেখিতেই, সে ভয়ে আঁৎকিয়া উঠিল। মৃত্যুর একটা কাল ছায়া তাহার সমস্ত চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অন্তরের উচ্ছ্বসিত আবেগ আর অমিয়া চাপিয়া রাখিতে পারিল না। বিজয়ের বরফের মত হিম পা দু’খানার উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাদিতে লাগিল—“প্রভো! স্বামিন্! আজ দাসী তার ইহকাল পরকালের সর্বস্ব উজাড় করিয়া তোমার পায়ের

দিতে ছুটে এসেছে। একবার ক্ষমা কর, প্রভু।” বিজয় একবার তাকাইয়া দেখিল। তার পর অতি ক্ষীণকণ্ঠে কহিতে লাগিল “অমিয়া আজ আর আমার থাকার জো নাই। আমার ডাক এসেছে। তুমি পরে এস। আমি পরপারে তোমার জন্ত অপেক্ষা করব।” আর কিছু বলিতে পারিল না। দু’কোঁটা তপ্ত অশ্রু তার চোখের কোণ দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, বিজয়ের অবস্থাও তত খারাপ হইতে লাগিল। দু’জন ডাক্তার সারা রাত্রি পাশে বসিয়া জাগিলেন, বৌদিদি আকুল কণ্ঠে ঠাকুরের কাছে কত আরাধনা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হইয়া গেল।

বিজয়ের মৃত্যুর পর প্রায় এক বৎসর কাটিয়াছে। অমিয়া আর দেবীপুরে যায় নাই। এখন তার জীবনের সম্বল হইয়াছে, ঐ দেওয়ালে ঝুলানো বিজয়ের ছোট ফটোখানা। সব সময় সেইখানাই কাছে লইয়া বসিয়া থাকে। চোখের জলে তার পা ধোয়াইয়া জাঁচল দিয়া মুছাইয়া দেয়, তিন বেলা পূজা করে, রাত্রিতে শিয়রে রাখিয়া ঘুমায়। এক কথায় ওই ধ্যান লইয়াই আছে। এক বৎসর পূর্বে যে অমিয়াকে দেখিয়াছে আজ সে তাহাকে দেখিলে চমকাইয়া উঠিবে। মৃত্যুর একটা স্পষ্ট আভাস যেন তার শীর্ণ মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। উৎকট মানসিক চিন্তায় অন্তরের আগুনে অহরহ পুড়িয়া পুড়িয়া সে ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হইয়াছে।

আজ ক’দিন হতে অমিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বৌদিদি ডাক্তার ডাকিবার প্রস্তাব করিতেই সে ত্যক্ত হইয়া পড়ে। বৌদিদি নীরবে অশ্রুমোচন করেন।

সে দিন দুপুরে অমিয়ার অবস্থা বড় খারাপ হইয়া পড়িল। প্রবল জ্বর, মাঝে মাঝে দুই একটা ভুল বকিতেছে। বৌদিদি শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতেছেন। তাহার মরণোন্মুখ মুখের পানে এক এক বার চাহিতেছেন, আবার অগ্নি দিকে মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতেছেন।

অমিয়া বৌদিদির পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল। ইঙ্গিতে বিজয়ের ফটোখানা তাহার মাথায় একবার স্পর্শ করাইতে বলিল। তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে কহিতে লাগিল—“দিদিমণি, আজ আমার বড় আনন্দের দিন। আমি আজ মিলন পথে। ঐ দেখ, আজ তিনি আমার কত ব্যাকুল হইয়া ডাকিতেছেন। আনন্দের একটা ক্ষীণ জ্যোতি তাহার সমস্ত চোখে মুখে ভাসিয়া উঠিল। আকস্মিক মানসিক উত্তেজনার ফলে একবার রক্ত বসি হইল। পর-ক্ষণেই বৌদিদি চীৎকার করিয়া কাদিয়া উঠিলেন।

## বিশ্বামিত্র

শ্রীনন্দগোপাল সেন গুপ্ত

দিবা অবসান প্রায়—পক্ষ প্রসারিয়া  
আধার-বিহঙ্গী ওড়ে আকাশের বুকে,  
পশ্চিম দিগন্ত প্রান্তে শেষ আলোটুকু  
ঝিলিমিলি করে শুধু অক্ষুট ব্যথায় !  
কানে বাজে অরণ্যের চকিত মর্ম্মরে  
কার দীর্ঘশ্বাস মাথা বিষণ্ণ সঙ্গীত ।  
কর্ম্মহীন, লক্ষ্যহীন, উদাস নয়নে  
চেয়ে আছি দূরপানে যেন মনে পড়ে  
একদিন এ জীবনে ছিল বহুকাজ—  
ছিল শৌর্য্য, দস্ত দৃপ্ত কঠোর প্রয়াস,  
যার বলে উল্লজিয়া নিজ জন্ম-লিপি  
গড়েছি নব বিশ্ব, নব জন্ম-ধারা—  
বিধাতা দিয়েছে বাধা, দিয়েছে সমাজ,  
শৃঙ্খলা হেসেছে হাসি—দেখিনি চাহিয়া ।  
এই নিত্য সুখ-দুঃখ জন্ম-মৃত্যু ভরা  
কষ্টের সংসার হ'তে আরো পূর্ণতর,  
আরো সুষ্ঠু, আরো উচ্চ, হবে মোর ধরা  
এই ছিল অভিলাষ । সে দিনের সেই  
আত্মবলে বলীয়ান বিদ্রোহী ব্রাহ্মণ,  
সেই উগ্র তপস্কার উত্তর সাধক,  
এই আমি ? কোথা গেল সে দুর্দম স্পৃহা ?  
সে বিরাট কর্ম্ম শক্তি ? আজ চেয়ে থাকা  
শুধু দূরে ব্যর্থ ক্ষোভে, রুথা অভিমানে,  
নিঃসাড় পক্ষুর মতো—অগ্ন্যুৎপাৎ শেষে,  
যেমন তুহিনারত পাষাণের স্তূপ ।  
নিষ্ফল জীবন মম—তাই মনে পড়ে—  
মনে পড়ে ফাক্তনের প্রথম প্রত্যাষ,

ছায়াচ্ছন্ন বিক্ষ্যবনে, নর্ম্মদার তটে,  
ব'সেছি যোগাসনে । বসন্ত আগমে  
রোমাঞ্চিত বনাঞ্চল—বিহঙ্গ-কাকলী,  
নির্ম্মল শিশির-স্নাত নূতন আলোক,—  
নর্ম্মদার নিরলস মর্ম্মরিত ধ্বনি,  
প্রক্ষুটিত কুসুমের শুভ্র সমুজ্জ্বল  
নিষ্কলুষ স্নিগ্ধ হাসি, মধুপ গুঞ্জন—  
মৃদুমন্দ গন্ধবহ, চঞ্চল পুলক  
জলে-স্থলে—গিরিদরী উপত্যকা তলে,  
প্রকৃতির উচ্ছৃঙ্খল জাগরণ রেখা ;  
তারি সাথে আধো-আলো, আধো-অন্ধকারে,  
মূর্ত্তিময়ী উষা যেন দিল দরশন—  
নিদ্রাতুর নিশীথের যবনিকা ভেদি !  
বিলোল অলকদাম, কুসুম মঞ্জীরে  
শৃঙ্খলিত পদদ্বয়, অপাঙ্গের কোণে  
ঈষৎ সলজ্জ হাসি, বিবশ-চঞ্চল  
বাসন্তী শাটিকা সঙ্গে ; সুগৌর বরণ,  
পীনোরত উরস্থল, সারঙ্গী-চপল—  
ত্রস্ত পদে, ত্রস্ত বেশে, দাঁড়াল' আসিয়া  
কেকারব মুখরিত নীপ তরুতলে ;—  
শিখিনী ভুলিল নৃত্য, হরিণ-হরিণী  
উর্দ্ধে তুলি গ্রীবাদেশ, নবতৃণদল  
সমাচ্ছন্ন বনভূমি হ'তে, অপলকে  
রহিল চাহিয়া সেই মোহিনীর পানে ।  
তুমি কি বাসন্তী-সখি, আসিলে ভূতলে,  
পরিপূর্ণ বসন্তের মাধুর্য্য লীলায়  
উদ্বেলিত বনাস্তুর শোভা সন্দর্শনে,



অথবা জীবন্ত কোন স্বপনের ছবি  
সহসা উঠিলে ফুটি প্রভাত আলোকে,  
তপোবন ললামন্তুতা উষাকীর মতো— ?  
কিংবা কোন দূরগত বিস্মৃত গীতের  
সত্যজাত সচঞ্চল মূচ্ছনার মতো,  
ধীরে ধীরে নেমে এলে হৃদি-উপকূলে  
অন্ধকার অনন্তের ছায়া-লোক হ'তে ?  
শিহরিল বন-ভূমি অশোকে কিংশুকে,  
মুকুলিত আম্রবনে বহিল সহসা  
যৌবনের দীর্ঘশ্বাস ; ধ্যান ভঙ্গ হ'লো—  
দেখিলাম বক্ষ হ'তে গিয়াছে খসিয়া  
চীনাংশুক, সুপীবর বাম উরুদেশ  
বায়ু-বেগ-হিল্লোলিত অঞ্চলের ফাঁকে  
ঈষৎ পড়িল চোখে—যেন একখানি  
কালো মেঘ আবরিয়া মেথলা প্রদেশ  
লুটায় প'ড়েছে পায়ে। হায় রে সেরূপ  
বৈশাখের দীপ্তিমান রবি-রশ্মি সম  
ঝলসিল আঁখি মম, বন্ধলের তলে  
বক্ষ-রক্ত তালে তালে উঠিল নাচিয়া  
মন্ত্রমুগ্ধ, গীতাসক্ত, ভুজঙ্গের মতো !  
লক্ষকোটি বৎসরের বার্কিক্য বিদারি,  
অন্তরের গূঢ়তম অন্তর প্রদেশে,  
অবলুপ্ত যে যৌবন, হ'লো জাগরিত  
সহসা সে জীর্ণতার প্রাসাদ-শিখরে।

\* \* \*

তারপর কেন হায় হ'লো না মরণ ?  
না, এ রূথা অনুতাপ ! আমার কি দোষ ?

আমি কি ক'রেছি ক্রটি কোন দিন তরে,  
রোধিয়া ইন্দ্রিয়-রুত্তি সংযম সাধিতে ?  
যোগ-যাগ-ব্রহ্মচর্য্য নানা কৃচ্ছ্রত  
ক'রেছি আজীবন, লোকালয় ্যজ্ঞি  
এসেছি নির্জন বনে ; তবু যদি কোন  
অসতর্ক বসন্তের উন্মাদ বাতাসে  
সহসা ভাঙিয়া যায় সংযমের বাঁধ,  
কারে তবে দিবে শাপ ? কার মূঢ়তার  
ক্রটি ল'য়ে বাধাইবে মিথ্যা হানাহানি ?  
অন্তরের অন্তস্তলে শুধু একবার  
দেখ' চেয়ে আপনার, দেখ কি ভীষণ  
লোলুপ অতৃপ্ত ল'য়ে পিপাসা রাক্ষসী  
ব'সে আছে নিশি দিন, ত্যাগের শৃঙ্খলে  
যতই বাঁধনা তারে, যদি একবার  
কোনরূপে মুক্ত পায় পায়ণ-পিঞ্জর  
কদর্য্য নগ্নতা লয়ে হইবে বাহির  
বীভৎস স্বরূপ তার। যত ঘৃণা কর'  
যত তারে দাও গালি সকলই নিষ্ফল !  
অন্তরে লুকায়ে রাখি ভোগের বাসনা,  
শুষ্ক বৈরাগ্যের বেশে কারে দিবে ফাঁকি ?  
আমি ত মানব বটে, মানবের মতো  
গহন অরণ্য হ'তে কুহুম তুলিতে,  
যদি বিঁধে থাকে কাঁটা, তারি গ্লানি ব'য়ে  
কাটা'ব' কি এ জীবন ? নিমেঘের ভুল,  
চিরন্তন হ'য়ে রবে, আর মানবের  
অন্তরের চিরন্তনী অতৃপ্ত পিপাসা  
দিবে আত্ম বলিদান বৈরাগ্যের পায়ে ?

# কুটির শিল্প

শ্রীউপেন্দ্র নাথ সেন শাস্ত্রী

কুটিরে বসিয়া যে নানাবিধ দ্রব্য অনায়াসে ও সহজ প্রণালীতে প্রস্তুত হয়, কেবল তাহাই কুটির শিল্প বলিয়া ধরা হয় না, বরং সাধারণ গৃহস্থগণ, বিশেষতঃ রমণীরা তাহাদের গৃহস্থালীর নানা কর্মের অবসরে যে প্রয়োজনীয় ও মনোরম দ্রব্যাদি প্রস্তুত করেন কুটিরে বসিয়াই হউক আর অট্টালিকায় বসিয়াই হউক, তাহাকেই কুটিরশিল্প বলা যাইতে পারে। কুটির শিল্প বলিতে আমরা উল্লিখিত প্রকারের দ্রব্য উৎপাদন পদ্ধতি বুঝি বলিয়া দরিদ্রের কুটির হইতে ধনীর অট্টালিকা পর্যন্ত সকল স্থান হইতেই আমরা তাহার আশা করিতে পারি।

আমাদের দেশে এককালে কুটির শিল্পের যথেষ্ট সমাদর ছিল। এমন কি, শুক্রনীতিকার ইহাও বলিয়াছেন যে পূর্ণাঙ্গ যুবকদিগকে বাদ দিয়া বিকলাঙ্গ, হীনান্ন অন্ধ আতুর দিগের দ্বারাও তখন অনেক শিল্পানুশীলনের সুব্যবস্থা করা হইত। প্রাচীনকালের ত কথাই নাই মধ্যযুগেও কুটির শিল্পের আদরের অবধি ছিল না। প্রাচীন ও মধ্যযুগে কুটির শিল্প অট্টালিকাবিহারিণীদের অবসর বিনোদন, মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের কথঞ্চিৎ অর্থসঞ্চয়ের উপায় ও দরিদ্রের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম প্রধান অবলম্বন ছিল, এবং কার্যতঃ প্রাসাদ হইতে কুটির পর্যন্ত ইহার অবাধ স্বচ্ছন্দ প্রসার দেখা যাইত। বর্তমান কালে স্বাধীনজাতি সমূহের মধ্যে কুটির শিল্পের যথেষ্ট প্রচলন ও প্রভূত সমাদর থাকিলেও আমাদের দেশে তাহা প্রায় লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। কুটির শিল্প ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম সহায়, কারণ ইহাতে অধিকার থাকিলে অন্যের অধীনতা স্বীকার না করিয়াও গৃহে বসিয়াই লোকের জীবিকানির্বাহের উপায় হয়। যাহার জীবিকা নির্বাহের কোন প্রকার উপায় আছে ইহাতে ক্ষমতা থাকিলে সামান্য অর্থের জন্য তাহাকে পর-স্থাপেক্ষী হইতে হয় না।

প্রাচীনকালে নানাবিধ শিল্পে অধিকার না থাকিলে কেহই প্রকৃত শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইতে পারিত না। শিল্পে অধিকার থাকা তখন বিশালরাজ্যের অধিপতিদেরও গৌরবের পরিচয় ছিল, এই জনাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন ভারতের রাজন্যবৃন্দও কোনও না কোনও শিল্পে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে নিপুণ শিল্পী বলিয়াও পরিচিত ছিলেন তাঁহাদের অর্থের বা অন্য কোনও প্রকার দ্রব্যের অভাব ছিল না। তথাপি তাঁহারা স্বীয় কার্য নির্বাহের উপযোগী বিদ্যার অতিরিক্তও কিছু শিখিয়া রাখিতেন; এমন কি সেই কাব্য তাহাদের পদ ও প্রহিষ্ঠার উপযোগী না হইলেও হত্যাদর হইত না। সেই জনাই দেখিতে পাই মহারাজা নল পাচকের ও অশ্ব চালকের কার্য, অর্জুন নৃত্যগীত, ভীম পাচকের কার্য, যুধিষ্ঠির অক্ষকৌশল, নকুল ও সহদেব গো চিকিৎসা ও অশ্ব চিকিৎসা এবং বৎসরাজ উদয়ন বীণাবাদন ও তিলক রচনা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং অদৃষ্টের বিপর্যয়ে তাঁহারা যখন বিপদাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের প্রত্যেকের উক্ত বিদ্যাসকল কাজে লাগিয়া ছিল। যদি নল যুধিষ্ঠির প্রভৃতিরও শিল্পকার্যে নৈপুণ্য অগৌরবের পরিচয় না হয় তবে সামান্য মানবের শিল্পশিক্ষায় অপমান বোধ না হওয়াই উচিত। ইংরাজীতে যাহাকে Liberal Education বা উদার শিক্ষা বলে তাহারও প্রকৃত অর্থ এই যে, শিক্ষনীয় যে কোনও বিষয় অবজ্ঞা না করিয়া শিক্ষা করা। দুর্ভাগ্যক্রমে আজকাল আমাদের দেশে তথা কথিত অনেক শিক্ষিত নর ও নারী শিল্পশিক্ষাকে গৌরবজনক বলিয়া মনে করেন না। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে ইহা একপ্রকার দাসোচিত মনোবৃত্তির পরিচয়; কারণ মানব স্বাধীনতা হীন হইয়া দাস হইয়া পড়িলে তাহার কতকগুলি অলীক অভিমান আসিয়া উপস্থিত হয় এবং শিল্পকার্যে

অনায়া সেই অলৌক অভিমানেরই কাজ। এই অলৌক অভি-  
মান আমাদের অনেক দুঃখ ও দুর্দশার কারণ, আর এ  
কথাও সত্য যাহারা অবসর কালে কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিয়া  
ব্যক্তিগত স্বখ ও স্বাধীনতা লাভে উদাসীন জাতিগত স্বাধী-  
নতা ও সৌভাগ্যের অধিকারীও তাহারা কখনই হইতে পারে  
না।

বাৎসর্য্যন ঋষি প্রভৃতি প্রণীত প্রাচীন শাস্ত্রে চতুষষ্টি  
কলার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কাহার কাহারও মতে  
কলা বা শিল্পের সংখ্যা চারিশত আশি। প্রাচীন কালে জন  
সমাজে শিক্ষিত বালিয়া পরিচয় দিতে হইলে সকলকেই এই  
সকল কলায় নৈপুণ্য লাভ করিতে হইত। পূর্বে নল প্রভৃতির  
যে সকল কলা নৈপুণ্যের কথা বলা হইয়াছে তাহাও এই  
সকল কলার অন্তর্গত। চতুষষ্টি কলা অতিবিস্তীর্ণ, নিম্নে  
তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকটি কলার বিবরণ প্রদত্ত  
হইতেছে। বলা বাহুল্য বর্তমানে কুটার শিল্প বলিতে যাহা  
বুঝায় ইহারা তাহার অন্তর্গত।

(১) আলেখ্য বা চিত্রশিল্প—চিত্রশিল্প যে কত মনো-  
রম তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহাতে যেমনই চিত্র-  
বিনোদন হয়, তেমনই আবার নৈপুণ্যলাভ করিতে পারিলে  
খ্যাতি ও অর্থলাভ উভয়েরই সম্ভাবনা আছে, যে দেশে এক  
একখানা উত্তম চিত্র একরূপ অধিক মূল্যে বিক্রীত হয় যে  
তাহাকে কুবেরের ভাণ্ডার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না,  
আমাদের দেশে তত অধিক মূল্য দিবার লোক না থাকিলেও  
চিত্র উৎকৃষ্ট হইলে যথেষ্ট অর্থলাভ হইতে পারে।

(২) রঞ্জন শিল্প—অথবা বস্ত্রাদি রঞ্জন করিবার  
বিদ্যা। বস্ত্রাদি রঞ্জন করিতেও অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যের  
প্রয়োজন। সূত্র, রেশম এবং পশম নির্মিত বস্ত্রাদির রঞ্জন  
বিভিন্ন উপাদানের সাহায্যে ও বিভিন্ন প্রণালীতে করিতে হয়।  
বস্ত্রাদির উপরে ফুল, লতাপাতা প্রভৃতির ছাপ দেওয়াও  
এই বিদ্যার অন্তর্গত। বর্তমানে ব্রহ্মদেশ, মালদ্বাজ প্রভৃতি  
দেশে রঞ্জিত বস্ত্রের যথেষ্ট ব্যবহার আছে, ইয়োরোপীয়েরাও  
রঞ্জিত বস্ত্রের আদর করিয়া থাকে। রঞ্জনশিল্পেও প্রচুর  
অর্থাগম হইয়া থাকে।

(৩) ভূষণ-যোজন অর্থাৎ মুক্তা, পুঁতি প্রভৃতি

যোগে বিচিত্র ভূষণ রচনা। বস্ত্রাদির উপর শলমা ও  
চুমকির কাজ করাও ভূষণ যোজনের অন্তর্গত, অনেকে এই  
কার্যের দ্বারা জীবিকার্জন করিয়া থাকেন।

(৪) গন্ধযুক্তি—সুগন্ধ তৈল, সুগন্ধি সাবান, চুলের  
কম্প, জুতারকালি প্রভৃতি প্রস্তুত করা ইহার অন্তর্গত।

(৫) ভক্ষ্যবিকার—নানাবিধ চাটনী, মোরতা, জাম,  
জেলী প্রভৃতি প্রস্তুত করা।

(৬) কর্ণপত্র ভঙ্গ—অথবা হস্তিদন্ত, শঙ্খ, প্রবাল, ঝিলুক  
প্রভৃতিদ্বারা নানাবিধ অলঙ্কার ও অন্যান্য বস্তু প্রস্তুত করা।

(৭) সূচীবান কর্ম—এই শিল্প তিন ভাগে বিভক্ত যথা  
(ক) সীবন অথবা জামা প্রভৃতি প্রস্তুত (খ) উতন বা রিপু  
কর্ম এবং (গ) বিরচণ অথবা শাল ইত্যাদির উপর সূক্ষ্ম  
সূচীকায়া কিংবা বুটি তুলিবার কায়া।

(৮) পটিকাবেত্রবান—অর্থাৎ বাঁশ, বেত, নারিকেল  
পত্রের কাটি প্রভৃতির সাহায্যে টেবিল, চেয়ার, আলনা  
ফুলের সাজি, ধামা, ডালা, কুলা প্রভৃতি প্রস্তুত করাও এই  
বিভাগের অন্তর্গত। ব্রহ্মদেশ ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে  
এই সকল কার্যে যথেষ্ট আয় হইয়া থাকে। ইহা করিতে  
পারিলেও বিলক্ষণ অর্থাগম হয়।

(৯) পাতুবাদ—স্বর্ণ রৌপ্য প্রস্তর ও মণিমুক্তাদির  
যোজনা, মৌনার কাজও এই বিভাগের অন্তর্গত।

(১০) তকু' কর্ম—অথবা কুঁদের সাহায্যে কাষ্ঠ ও ধাতু  
ময় দ্রব্যাদির মসৃণতা ও উজ্জলতা সাধন।

(১১) পুষ্প শকটিকা—অথবা কাগজ, টিন, কাষ্ঠ-  
প্রভৃতির দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শকট ও অন্যান্য ক্রীড়নক  
প্রস্তুত।

এইরূপ আরও অনেক শিল্পের উল্লেখ করা হইয়াছে।  
বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহার মধ্যেই আরও বহুশিল্প  
অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ 'আলেখ্য' বলিলে মাত্র  
পটের উপর চিত্রাঙ্কন নহে, কাষ্ঠ বা মৃত্তিকা নির্মিত দ্রব্যের  
উপর গালার সাহায্যে ফুল ফল প্রভৃতির চিত্র অঙ্কন, ভিত্তি-  
গত্রে চিত্র অঙ্কন প্রভৃতিও এক আলেখ্য বলিতে বুঝিতে  
হইবে। কাঁথা সেলাই প্রভৃতি সূচীবান কর্মের অন্তর্গত।  
বলা বাহুল্য কস্মা বা কাঁথা একটি উত্তম শিল্প। এ যুগেও

শিল্পের জন্য একপানা কাঁথা পকাশ কি ষাট টাকা মূল্যেও বিক্রীত হইতে দেখা গিয়াছে। মৎস্যশঙ্ক বা মাছের আঁসছারা নানাবিধ দ্রব্যপ্রস্তুত কর্ণপত্রভঙ্গের মধ্যে পাড়িয়াছে। তকুর্কশের মধ্যে কাষ্ঠদ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুতলিকা ক্রীড়নক নির্মাণ পুষ্পশকটিকার অন্তর্গত। ধাতুর উপর নাম খোদাই করা, রক্ত নির্মাণ ও স্বর্ণকার দিগের নিমিত্ত ছাঁচ প্রস্তুত করাও ধাতুবাদের অন্তর্গত।

একটু চেষ্টা করিলে অনেক পুরুষ ও রমণী বহু কুটির শিল্পে নৈপুণ্য লাভ করিতে পারেন, যে সকল দেশ ব্যবসায় বা বাণিজ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে সেই সকল দেশেই কুটিরশিল্পের যথেষ্ট প্রচলন আছে। জাপান আমেরিকা ও জার্মানীর আমদানী যে সকল বালকদের ক্রীড়নক, অথবা গৃহসজ্জার উপকরণ আমরা ক্রয় করিয়া থাকি তাহার অধিকাংশই তদ্দেশবাসিনীগণের কুটির শিল্প ব্যতীত আর কিছু নহে। ব্রহ্মদেশ যে চুরুটের জন্য বিখ্যাত তাহাও ব্রহ্ম-মহিলাদের হস্তে প্রস্তুত। কলিকাতার সহরে অনেক ভদ্র মহিলা সলমা, চুম্বকী ও জরীর কার্য্য করিয়া বিলক্ষণ আয় করিয়া থাকেন। ঐরূপ শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে অনেক ভদ্র মহিলা বস্ত্রের উপরে রেশমের বা সূতার ফুল তুলিয়া বিলক্ষণ উপার্জন করিয়া থাকেন। ইয়োরোপের অতি উচ্চ শ্রেণীর ভদ্রমহিলারাও মোজা, গলাবন্ধ ও লেশ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন। তবে যে সকল দেশে কুটির শিল্প প্রচলিত আছে সে সকল স্থানে তাহাতে উৎসাহ দান করিবারও বহু ব্যক্তি আছেন। সে স্থানের বড় বড় ব্যবসায়ীরা এই সকল কার্য্যে সাধারণকে উৎসাহ দান করেন ও তাহাদের প্রস্তুত দ্রব্য ক্রয় করিয়া পৃথিবীময় বিক্রয় করেন

আর আমরা আমাদের দাসোচিত মনোবৃত্তির ফলে বিদেশের কুটির শিল্প জানিয়া ও না জানিয়া ক্রয় করি কিন্তু স্বদেশজাত দ্রব্যের জন্য মৌখিক উৎসাহ পদন্ত প্রদর্শন করিতে কার্পণ্য করি। কুটির শিল্প প্রদর্শনের জন্য আমাদের দেশে মধ্যে মধ্যে প্রদর্শনী হয়, কিন্তু বিদেশীয় ব্যবসায়ীরাই তাহাতে লাভবান হয় বলিয়া মনে করি। প্রদর্শনী ক্ষেত্রে আমরা যাইয়া মাত্র দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখিয়া চলিয়া আসি, পক্ষান্তরে বিদেশীয়েরা সে স্থানে আগমন করিয়া তাহাদের নক্সা লইয়া যায় ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী অবগত হইতে চেষ্টা করে এবং পরে তাহাদের দেশ হইতে ঐরূপ জিনিষ কুটিরে কুটিরে প্রস্তুত হইয়া আমাদের দেশে আগমন করে ও অর্থব্যয় করিয়া আমরা তাহা ক্রয় করি। ফলে এক একটা প্রদর্শনীতে আর কিছু লাভ হউক বা না হউক আমাদের দেশে এক একটি শিল্প যেন লোপই পাইতে থাকে।

শিল্প প্রদর্শনীর অমূল্যত্ব হইলেও আমরা যদি তাহার অন্তর্নিহিত সদভিপ্রায় বুঝিতে না পারি, তাহা হইলে ঐরূপ প্রদর্শনীর কোনও সার্থকতা থাকে না। যেদিন আমরা কুটির শিল্পের উপযোগিতা বুঝিতে পারিয়া সর্বাস্তঃকরণে তাহাদের বহুল প্রচারে সাহায্য করিব সেদিন দেশের প্রভূত উন্নতি হইবে। স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতিসাধনে যদি কেহ আগ্রহবান হন তবে তিনি যে স্বদেশীয় কুটির শিল্পের উন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগ করিবেন ইহাতে অসুমা ত্র সন্দেহ নাই। বস্ত্র করি বথার্থ ই বলিয়াছেন :—

\* \* \*

যে দেশের কৃষীবল শিল্পে দিবে মন,  
পুঞ্জিবে বাণীর বীণা যাব সেই দেশে।”

## প্রার্থনা

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় .

বর্ণ বাঁহার কুন্দকুসুম

তুমার এবং চন্দ্র রে,

শুভ্র শুচি ভূষণ বাঁহার অঙ্গে

হাস্ত বাঁহার পায় শোভা এ

বীণার বরদণ্ড রে,

শ্বেত শতদল আসন গড়ে রঙ্গে।

বিষ্ণু বিধি মহেশ্বর

বাঁরে করেন বন্দনা

দেবতার বাঁর ধ্যানে মগন নিত্য,

নিঃশেষেতে নষ্ট করেন

সব জড়তার লাঞ্ছনা,

সেই বাণী মোর শুদ্ধ করুন চিত্ত।



## গল্প, গল্প নয়

শ্রীহেমেন্দ্র মল্লিক

আজ পর্যন্ত ব্যাপারটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারলুম না—তখনও না—এখনও না—যে কি করে শৈলেন সেদিন অত বড় ভুলটা করে ফেলল! কেননা মেডিকেল কলেজের সে একজন মেধাবী ছাত্র বলেই সকলে মানতো—অবশ্য মৃত পিসিমার লক্ষণিক টাকা পাবার আগে।

সে দিন দু'জনে এক ভদ্রলোকের বাড়ী নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েছিলাম। ফেরবার পরে কাপড় বদলিয়ে সে এলো আমার কক্ষে—শোবার আগে একটু গল্প করতে। আমি পাশের ঘরেই “নব্বিনের সঙ্গে একটা কথা বলতে কয়েক মিনিটের জন্ত গেছি এমন সময় সে বলে উঠল—

“মণি, আমার মনে হচ্ছে জর আসবে—তোর কুইনিনের শিশিটা কোথায় বলত,—চার গ্রেণ খেয়ে ফেলি—” আমি পাশের ঘর থেকে চেষ্টিয়ে বল্লুম—“বাঁদিকের তাকের উপর আছে—এক একটা পিল্ চার গ্রেণ করে—।”

গল্প শুদ্ধব চলছিলো কি একটা বিষয় নিয়ে। মিনিট কতক যেতেই শৈলেন কথা বলতে বলতে হঠাৎ তার চেয়ারে ঢলে পড়লো। আমি চমকে উঠে এসে দেখি—সে প্রায় অজ্ঞান হ'য়ে গ্যাছে।

কি রকম? এই কথা বলছিলো আর হঠাৎ? একটু ভেবে দেখি—ঠিক ঠিক, এবার হয়েছে।

সোজা তাকের কাছে গিয়ে দেখি—মহা মুক্তি।

তাকের উপর কুইনিনের শিশি কোথাও নাই। মর্ফিয়ার শিশিটা সামনেই খোলা পড়ে আছে। উপরের তলায় আর একজন এম্-বি ছিলো, তাকে পাঠিয়ে দিলুম বৃদ্ধ ডাক্তার কৃষ্ণরতন সরকার মশায়কে আনতে। দুটো মোড়ের পরেই তাঁর বাড়ী। টাকার বিষয় চিন্তার দরকার ছিলো না—কারণ শৈলেন অগাধ টাকার মালিক।

\* \* \* \*

সরকার মশাই এলেন; খরচ সম্বন্ধে কোন দ্বিধা না ক'রে আমরা নবাবী চালে তার চিকিৎসা শুরু করতে বসলাম।

সীটরেট অব্ ক্যামোইন্ ঘন ঘন ডোজ্ হিসাবে এবং পেয়ালার পর পেয়লা কড়া কফি খাওয়ানো চলতে লাগল শৈলেনকে দাঁড় করিয়ে দু'জনে দু'দিকে ধ'রে ঘরের এফোণ থেকে ওকোণ পর্যন্ত দোড়াদোড়ি করান হ'ল। বৃদ্ধ সরকার মশায় কল্পনানৈবে অদূরবর্তী মোটা রকমের লাভের আশায় শৈলেনকে চিম্টি কাটা থেকে শুরু ক'রে গোটাকতক চড় পর্যন্ত বসিয়ে দিলেন নিশ্চিত চিন্তে! Hand তমার এম—ডি মনের সাথে বেশ গুছিয়ে ভাগ্ করে মিলিটারী মেজাজে বসিয়ে দিলে এক লাগি। এবং আমাদের বুঝিয়ে দিলে—“কি করব ভাই, জীবনে লক্ষপতিকে লাগি মারবার অযোগ্য কি আর পাওয়া যাবে কখনও?”

ঘণ্টা দুই ধরে কুতূর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করার মতো অবিরত প্রশাস-প্রণালী চলবার পর শৈলেন একটু চোখ খুলতে সরকার বললেন,—“আর ভয় নেই। কিন্তু অন্ততঃ আরও ঘণ্টা দুই একে জাগিয়ে রাখতে হ'বে। কথাবার্তা, হাসি-তামাসা আর মাঝে মাঝে দু একটা ধাক্কা দিতে পারলেই ওটা হ'বে’ক্ষণ। যখন দেখবে—এর পল্ন্স আর রেস্পিরেশন্ বেশ নরম্যাল তখন ঘুমুতে দিও। আমি চল্লুম।”

\* \* \* \*

আমি ভেগে বসে আছি—।

শৈলেন বাবা শিব ঠাকুরের মতো আধ-পোলা আঁখিতে চুলছে দেখে আমি আবার কাজ শুরু কর্লুম।

“খুব ঘমের বেড়া ডিঙ্গিয়েছ বাবা—যে কাণ্ড ক'রে বসেছিলে—। যাই হোক, এ যাত্রা নমঃ নমঃ ক'রে উঠে বস দিকিনি গোপাল—, আচ্ছা শৈলি—প্রফেসর মৈত্র কি একবারও বলেনি যে এম—ও—আর—পি—এইচ—আই—এ” এর উচ্চারণ কুইনিন নয়? ধন্য জন্মগ্রহণ করেছিলে বাবা। যাই হোক সে সব কথা কাল হ'বে—কিন্তু তোমার নাপু হওয়া উচিত ছিলো তাই—”

শৈলেন একটা জাব্বা ক্যাবলার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে হাসতে লাগলো—“ম—মি, আমার মন—নে, হচ্ছে—মোম—মাছি হ’য়ে গুনুন গুনুন—ন’ ক’রে—বি-বি বিরক্ত করিসনে, ঘুমগে—”

ব্যাস্—। দু’পলকের মধ্যেই শৈলেন একেবারে জ্ঞাত। ওর ঘাড় ধরে আচ্ছা করে নাড়া দিয়ে বললুম—“ওই মর্ক-টের বাপ কর্কট কোথাকার—ওসব চলবে না বলে দিচ্ছি—”

শৈলেনের ওজন হচ্ছে দু’মণ তেরো সের। একলা ওকে উঠিয়ে বান্দর তাড়ানো খেলা করাবার আশাটা আমার পক্ষে বুনো হাতীর পায়ে কাছ সাঙলা গোছের, কাজেই চিন্তা করতে লাগলুম—“কি করে ওকে জাগিয়ে রাখা যায়……।

…ঠিক ঠিক। রাগিয়ে দেওয়ার চেয়ে বড়ো ব্যবস্থা আর নেই। কিন্তু কি ক’রে? ওর ত’ কোনো খুঁত নেই। একেবারে আদর্শসূচক চরিত্র—“ঘোড়ামার্কী” চুণের মতো সাদা। বিনয়-নম্রতায় কন্ঠাদায়গ্রস্ত পিতা। নারী সম্বন্ধেও একেবারে শঙ্করাচার্য্য! তবু মনে মনে একটা মতলব ভাঁজলুম। প্ল্যান্টা বেশ গুছিয়ে নিয়ে দেখি—একেবারে ওয়ারটালু যুদ্ধজয়ের নক্সা!!

\* \* \* \*

মুখে চোখে দারুণ ঘৃণার ভাব ফুটিয়ে শৈলেনের ঘাড় ধরে খুঁটা-তোলা-গোছ নাড়া দিতে লাগলুম। আলমুস্তিমিত নেত্র মেলে সে তাকাল। আমাদের গাঁয়ের কালাপিসির মতো কাংসবিনিমিত সুরে আমি বললুম—“শোনো শৈলেন, তোমাতে আমাতে খুবই বন্ধুত্ব আছে মনি, কিন্তু যে দুর্গাম তোমার গুনলাগ, এর পরে আমার দোর তোমার কাছে চিরকালের মতো বন্ধ হ’ল আজ থেকে। নীচ-মনা, হীন, বিশ্বাসঘাতক কোথাকার।”

এবার যেন শৈলেনের চেতনা আসছে ব’লে বোপ হ’ল। —“মণ—ই ভ্যাপার কি ভলতো? গায়ে চামছিকে ভসেছে নাগি? নাগ্যের ভেতর মশা?”

ভোঁ—বুবু—!

—“হয়েছে হয়েছে থাক। পিসির অগাধ সম্পত্তি পেয়ে

দুর্কুদ্বির পাঁচ আলগা হয়ে গ্যাছে—না?—শয়তান, ডাষ্ট বিন্ কোথাকার। টাকা পাওয়ার আগে মার হৃদয়ে গিয়ে খেলা করেছে—সে এখন গরীব—পাড়াগেয়ে—না? ভীক বন-হরিণীর মতো সরলা যেই পল্লীবালিকার সঙ্গে গিয়েছিলে ফ্লট করতে? লজ্জা করে না তোমার সে অভাগী কি ভাবছে বলোতো—? সমস্ত ধনীদেব উপর তার কেমন ঘৃণা হচ্ছে বলতো?”

হতভাগ্য শৈলেন। কিন্তু—“কি করা যাবে—? নিক-পায়। ওর ওঠবার চেষ্টা দেপে বুঝতে পারলুম—চটেছে। আর এ অমূলক অপবাদে চটাই স্বাভাবিক; কারণ নারী সম্বন্ধে ও নির্জলা-চরিত্র বলে সমস্ত জানি, প্রেম করা দূরে থাক, তার বানানই বোধ করি ও জানে না! একে বলিষ্ঠ গুণাকৃতি, তায় নাগপুরে বাড়ী;—উত্তেজনাও ওর চোখ বেন জলছিলো। কাঁপতে কাঁপতে সে বললে—“মাথা ঘড়োঁ করে দেব জানিস্—?” উঠতে চেষ্টা করল সঙ্গে সঙ্গেই অতবড় জোয়ান হলেও এখন একেবারে ভিজে রটিং এর মতোই দুর্বল। আমি এক হাতেই ধাক্কা মেরে ওকে বসিয়ে দিলুম।

আমি উঠে একটা চুরুট ধরালুম। আমার যে এমন অপূর্ণ অভিনয় শক্তি আছে, আগে তা জানতুম না। মনে মনে অত্যন্ত খুসী হয়ে উঠলুম।

একটু পরেই শৈলেনের নাসিকা ঘনি কানে আসতেই ফিরে দেখি স্যাকরার হাপরের মত ওর উদরটি নামা ওঠা কচ্ছে; কাছে গিয়ে টেনে মেরে দিলুম ঘাড়ের ওপর মেছো বাজার মার্কী এক রদ্দা! কিন্তু কোথায় গেল তার রাগ! সে আমার দিকে হাসিমুখে নির্লিপ্ত নির্দিকার ভাবে ক্ষুণ্ণ-বাক্স ছোকরার মতো চেয়ে রইল। শৈলেন—তুমি যতো শিগ্গির পারো আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আমি নিশ্চিন্ত হব। আমি ত বলেই দিয়েছি—তোমায় আমি এখন কি চোখে দেখি; এখনও যদি তোমার মধ্যে আত্মসম্মানের এক কণাও থাকে তবে আর কখনও ভদ্র সমাজে ঐ মুখ দেখাবার আগে বারকতক চিন্তা করো।

সেই সরলা বালিকা—যাকে অনেক স্থখের স্বপ্ন দেখিয়ে ভুলিয়েছ, সে এখন তোমার কাছে কলসী কাঁখে ময়লা

শাড়ী পরা নিতান্তই গেঁয়ো মেয়ে—কেমন? সে আর এখন বিডনষ্ট্রীট দিয়ে তোমার পাশে হাটবার উপযুক্ত নয়?

নাগরা, হাত কাটা ব্লাউজ, হেয়ার ক্লিপ এসব পরতে জানে না বলে—না? এতোই টাকার গরম হয়েছে তোমার নিলজ্জ, নীচ মনা, নষ্টচরিত্র কোথাকার! অসহায় অভাগিনী বালিকা সে—তুমি কি বলে তার কচি বুকখানা ভেঙ্গে দিচ্ছে। এরকম অবহেলা দেখিয়ে? দূর হও, তোমার সঙ্গ ছাড়তে পারলে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচবো!”

অনর্গল ব'কে ব'কে একটু দম নেবার জন্য থামতে হল। পেছন ফিরে আরসীতে দেখি শৈলেন নড়চে—চকিতে ঘুরে দাঁড়ালুম—কেননা, ঘাড়ের উপর ছমন তের সের ওজনের কোন বস্তুকেই আচমিতে পড়তে দিতে রাজী নই।

এবারে আগের চেয়ে একটু স্পষ্ট করে বলতে লাগল “আমি তোকে ও রকম করে বলতে পারতুম না মণি, হাজার অপরাধ করলেও না—

“আচ্ছা ঘাবড়াস নে—আমি উঠতে পারলে হয় একবার। জানলা গলিয়ে তোকে যদি ট্রামের ছাদে না ফেলে দিই তখন বলিস্।”

আর বাস্তবিক পক্ষে আমারও বড় অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল একটা নিষ্কলঙ্ক নির্দোষীকে এরকম কল্লিত অপবাদ দিতে।

যাই হোক—কাল এ কথা নিয়ে একচোট হাসা যাবে মনে করে নিজেকে বোঝালুম।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই শৈলেন আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ওর পাল্‌স আর রেস্‌পিরেশন দিচ্ছে বেশ নরম্যাল মনে

হওয়াতে আমিও ক্লান্ত দেহে পাশের রুমে গিয়ে শয্যাশ্রয় গ্রহণ করলুম।

\* \* \*

সারা রাত জাগরণের পর উঠতে একটু বেল হয়ে গেছিল শৈলেনের ঘরে ঢুকে দেখি ও আগেই জেগেছে। চেয়ারে বসে আশ্বে আশ্বে চুকট টানছে; প্রকৃতিস্থ মূর্তি দেখে আশ্চর্য হনুম বটে, কিন্তু শব্দ জাগল ওর চিন্তারেখাকুটিল ললাট আর শুক গম্ভীর মুখ দেখে! ভাবলুম, কাল রাতের কথা ও বোধ করি ভুলতে পারে নি। আমার অপবাদ আর অপমানের কথা স্মরণ করে ওর অভিমানী গন নিশ্চয়ই আহত হয়েছে।

অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা চাইব ব'লে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলুম। আমাকে দেখেই সে নিতান্ত অপ্রতিভভাবে ব'লে উঠল, “এই যে মণি, এসো। তার পর খানিক নীরব থেকে কুণ্ঠিত লজ্জিত স্বরে বলতে লাগল “ভাই মণি, কালকে রাতের অপমানের জন্যে তোরা কাছে আমি কৃতজ্ঞ! তুই আমাকে আশ্রুচেতনা ফিরিয়ে দিয়েচিস। ভাই স্বীকার করছি যে রেণুর ওপর আমি ইদানীং অবিচার করে ফেলেছি কিন্তু ভালো তাকে সত্যিই বেসেছিলুম,—নৈলে আজও তাকে ভুলতে পারি নি কেন? যাই হোক ভাই, আমি স্থির করেছি রেণুকে আমি সত্যিই বিয়ে করব—হোক না সে গাঁয়ের মেয়ে, গরীব অল্পশিক্ষিতা—”

হতভম্বের মতো শৈলেনের দিকে আমি চেয়ে রইলুম। তবে কি এই বিংশ শতাব্দীর শঙ্করাচার্য্যটি সত্যিই—?



# জ্ঞান-যোগ

বেদপন্থী

“শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ জ্ঞানাক্ষ্যানং বিশিষ্যতে  
ধ্যানাৎ কৰ্মফলত্যাগস্তাগাচ্ছান্তিরনন্তরং।” (গী: ১২।১২)

বন্ধন মোচন হয়, মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয়, মস্তিষ্কে উদ্ভাবনীশক্তি  
জাগে—এ সেই সাধনা।

শাস্ত্র বলিতেছেন অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান বড়। পড়াটা  
মুখস্থ করা অপেক্ষা get by heart করাটা নিশ্চয়ই বড়।  
যে সকল ক্রিয়াকৰ্ম আমরা প্রায় চোখ বুজিয়া সারি, জ্ঞান  
পাইলে সে গুলি আলোকিত হয় এবং অন্তরের অন্ধকার  
দূর হয়। তাতে আত্মশুদ্ধি ঘটে এবং সেই শুদ্ধচিত্তে  
সত্যের আবির্ভাব স্পষ্ট হয়। আবার সমস্ত জ্ঞানকে  
নিজের করিয়া নেবার জন্য ধ্যান দরকার জ্ঞান ও ধ্যান  
জীবনলাভের দুটি পরম বন্ধু।

পরবর্তী যুগে জ্ঞানের কথাগুলি গাঁটবন্ধ করা কাপড়ের  
মত মাড়োয়ারী, ভাটিয়ারূপী ধর্মবণিকদের হাতে পড়িয়া সর্ক-  
নাশের সূচনা করে, আজ বৈজ্ঞানিক যুগ তার ব্যবসা  
সভ্য সমাজে প্রায় মারিয়া গিয়াছে ইহাতে ধর্মের  
ব্যবসাদারিটা কমিয়াছে কিন্তু অশ্লথপ্রকারের মূঢ়তা আসিয়া  
আশ্রয় করিয়াছে। ধর্ম যে জীবনের ভূমিকা—ইহা  
বন্ধা ও শ্রোতা জানেন কি, যদিও জানেন মানেন  
কতটুকু?

আগে জ্ঞানের সাধনা মহৎ বলিয়া বিঘোষিত ছিল,  
এখন যেমন বৈজ্ঞানিক সাধনা। আদর্শ ছিল সমগ্র  
জীবনকে একটি পরিণতি দান করা। ব্রহ্মচর্যা, গাহস্থ্য ও  
বানপ্রস্থ এগুলি সেই সাধনারই অঙ্গ, যে সাধনায় আত্মার

উপনিষদের কথাটি সত্য—ততো ভূয় ইব তে তমো য উ  
বিদ্যায়াং রতাঃ। অজ্ঞানের অন্ধকার অপেক্ষা চেতনার  
অন্ধকার গাঢ়তর। কারণ তাহা জ্ঞানের অর্থাৎ অতি-  
জ্ঞানের অন্ধকার!

## দু'ফোঁটা আঁখিজল

শ্রীঅখিল নিয়োগী

লিপিকার সাথে পাঠালে যে প্রিয়া দুই ফোঁটা আঁখিজল  
একি শুধু সখি তোলাতে আমায়, একি শুধু তব ছল!  
দুই ফোঁটা আঁখিজল।

না গো তা' সত্য নহে—

দুই ফোঁটা বারি অভিমানিনীর কত কথা কানে কহে—  
এ দুই ফোঁটার ইতিহাস প্রাণে বয়ে আনে পরিমল।

লিপি যদি তব শুভ্র থাকিত, থাকি ত না কোনো রেখা—  
দুই ফোঁটা জল শুনাইত মোরে তোমার প্রাণের লেখা!

তোমারই আমি প্রাণ—

এই কথা লিখে আঁখিজলে তব করিয়াছে অপমান।

শুধু দুই ফোঁটা জল—

তোমার মনের সকল কথাই করে তাতে টলমল।

**শ্রীমুনীকুমার ধর**

নিজের আত্মীয় পরিচিতদের গভীর বাহিরে পরের জন্তে  
ভাবিতে শেখা মমতার সেই প্রথম। মমতা যেন এগার  
বছরের উজান ঠেলিয়া যৌবনের প্রথম জোয়ারের তীরে  
গিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে ভুলিয়া গেল তাহার একটু দূরেই  
অপর খাটে নরেন শুইয়া আছে এবং এখনও হস্ত ঘুমায়ে  
নাই। কিন্তু এমনি আশ্চর্য্য অনেক চেষ্টা করিয়াও  
মমতা ছেলেটির নাম কিছুতেই মনে করিতে পারিল  
না, কেবল একখানা সুন্দর মুখের অম্পট ছায়া  
তাহার চোখের সামনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।  
তাহার জীবনের পরের অধ্যায়ে দেখা গেল পলাশকে।  
মমতার মনের স্বপ্নময়ী রাজকন্যা যখন এমনি করিয়া  
হারানো রাজপুত্রের সন্ধানে স্বস্তির মণিকোঠায় ঘুরিয়া  
ফিরিতেছে বাহিরের আকাশে তখন ঝড় উঠিল। ভয়াব্র  
শীতের রাজ্যের সে কি করুণ আর্ন্তনাদ! ঝড়ের ঝাপ্টায়  
আলোর শেড়টি ছলিতেছে, আলনা হইতে কয়েকটি জামা-

কাপড় উড়িয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, মমতার বিছানার চাদর খানিকটা উল্টাইয়া গেছে। তন্দ্রা ভাঙিয়া চমকাইয়া উঠিয়া মুখের আবরণ খুলিতেই ঠাণ্ডা হাওয়ার প্রচণ্ড একটা ঢেউ তাহার মুখের উপর দিয়া বহিয়া গেল। মমতা তাড়া-তাড়ি উঠিয়া শাসি বন্ধ করিয়া দিতে গেলে বাধা দিয়া নরেন বলিল, থাক মমতা—

দুই মুহূর্তের জন্যে থমকাই দাঁড়াইয়া মমতা ধীরে ধীরে জানালার নিকটে গিয়া চূপ করিয়া দাঁড়াইল। দুর্বোলের ছরস্পন্দন বাড়িয়াই চলিয়াছে, অসহায় পৃথিবীর করুণ বিলাপ কানে আসিতেছে—জানালার ধারে কিছুক্ষণ শুকভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মমতা ফিরিয়া আসিয়া নিজের খাটের উপর বসিল। বৃষ্টির ঝাপটায় তাহার পরনের কাপড়ের অনেকখানি ভিজিয়া গেছে।

নরেন বলিল—সত্যি সত্যিই জানালাটা বন্ধ কোরে দিলে না?

খাটের ধারে বসিয়া পা দুলাইতে দুলাইতে মমতা বলিল—না।

—বৃষ্টির ছাটে সব ভিজে গেল যে—

—থাক-গে

কোন কথা না বলিয়া নরেন নিজে উঠিয়া একটি একটি করিয়া চারিটি জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া স্নইচ্ টিপিয়া আলো জালিয়া দিল।

চোখে আলো লাগিতেই দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মমতা বলিল—আঃ, আবার আলো জ্বাললে কেন, নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ো না—

ধীরে ধীরে মমতার দিকে আগাইয়া আসিয়া নরেন বলিল—আমি এখনি চলে যাচ্ছি, মমতা—

মমতা একথা শুনিয়া মনে করিল নরেন বুঝি তাহার সঙ্গে এই ছুতায় একটা আপোষ করিতে চায়, তাই মুখ না ফিরাইয়াই অকারণ অহঙ্কারের সঙ্গে বলিল—বেশ—

নরেন গিনিটখানেক মমতার পাশে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, একবার কি যেন বলিতেও গেল কিন্তু মমতাকে অমনি ভাবে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে ওদিকে গিয়া নিজের স্ন্যটকেসটা

গুছাইতে লাগিল! সে হয়ত বলিত—আমাকে বাধ্য হয়েই যেতে হচ্ছে মমতা—কিন্তু তোমাকে যে আমি ভুলব না শুধু এই কথাটা বোলে যেতে চাই।

কিন্তু নরেন যখন সত্য সত্যি বাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া মমতার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল নরেনের এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আচরণে মমতা ভয়ে ও বিস্ময়ে শুক হইয়া গেছে! তাহাকে এখানে একাকী রাখিয়া নরেন চলিয়া যাইতেছে! সম্বন্ধের বন্ধন না থাকিলেও চক্ষুজ্ঞাও কি নাই! আর মমতা ত তাহাকে যাচিয়া মুক্তি দিয়াছে তবে নরেনের এত ভয়ই বা কেন!

এই একটু পূর্বে মমতার মুখের উপর অহঙ্কারের যে ছায়া পড়িয়াছিল তাহা অপসারিত হইয়া বেদনায় কালো হইয়া উঠিয়াছে। দুটি চোখে যেন অশ্রুর জোয়ার! অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—তোমাকে বাধা দিতে চাই নে কিন্তু আমাকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে গেলে কি কাজের এতই ক্ষতি হোত—

—আমার একটু অন্তায় হ'য়েছে, মমতা—কিন্তু কি জানি কেন আমার যাওয়ার কথা কিছুতেই আগে বোলতে পারি নি। তা ছাড়া যাওয়ার আগে আমাদের মধ্যে একটা মীমাংসা হওয়ার দরকার ছিল।

—মীমাংসা যখন হয়েই গেছে তখন ত আর কোন দ্বন্দ্বই নেই।

—মীমাংসার ধারা ঠিক সোজা পথে আসে নি বলেই ত যত দ্বন্দ্ব, তা নইলে একটু আগেও তোমার সঙ্গে কলকাতায় না যাওয়ার কথা ভাবতে পারিনি—

—তোমার অনুকম্পা প্রত্যাখ্যান কোরে যদি কোন অপরাধ কোরে থাকি, ক্ষমা চাচ্ছি এবং এই অনুকম্পার দোহাই দিয়ে বলচি আমাকে এত বড় শাস্তি দিও না, অন্ততঃ—

বাধা দিয়া নরেন বলিল—কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছে। মমতা যার জন্তে আমি নিজেকে পর্যন্ত বিপন্ন কোরতে যাচ্ছিলাম সে একটু আগে আমার নাগালের বহু দূরে সরে গেছে। লোহা আর আগুন নিয়ে যাদের কারবার ছায়ায় অনুসরণ করা তাদের পোষায় না—

অপরূপ ভঙ্গীতে নরেনের মুখের দিকে তাকাইয়া মমতা বলিল—সে কি সত্যি কেবল ছায়া—

এর উত্তরে নরেন যদি কোন কথা না বলিত তা হইলে এই পরিচ্ছেদের যবনিকা এইখানেই বেশ নির্দিষ্টভাবে টানিয়া দেওয়া যাইত এবং বলা চলিত পুরুষের সব চেয়ে বড় কর্তব্য নির্ধারণ চেয়েও নারীর একটুকরা হাসি, ছোট একটা কথার দাম অনেক বেশী। কিংবা এও বলা চলিত নরেন মুখে যাই বলুক না কেন মমতার মোহ আজও সে কাটাইতে পারে নাই। নরেনকে নীরব দেখিয়া মমতাও মনে করিল তাহার এতদিনের স্বপ্ন ও আশা বুঝি একেবারে মিথ্যা নয় এবং নরেন তাহার কথার উত্তরে পুনরায় কোন ওজড় আপত্তি করিলে সে কি বলিবে তাহাও সে ইতিমধ্যে ভাবিয়া ফেলিল। আর নরেন যদি সত্যিই একটি কথাও না বলিয়া নীরবে চলিয়া যাইত তাতে মমতা দুঃখিত হইত বটে কিন্তু ছোট একটু আশার আশায় অকারণ পুলকে যে দুর্বলতা সে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে তাহার জন্য এমন লজ্জায় পড়িতে হইত না।

নরেন মৃদু হাসিয়া বলিল—এ যেন আমাদের ধরে বেঁধে ওষুধ গেলনর মত হয়েছে, মমতা। তবে আমাদের এ ভাল-বাসার অভিনয় ও ওষুধে এই তফাৎ যে, ওষুধ ঠিক হ'লে রোগের উপশম হয় আর আমাদের হয়েছে এক কূল যখন ভাঙলই তখন অপরের কাঁধে চড়ে কোন রকমে অন্য কূলে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া—

মমতা যে ঠিক এই ভাবিয়া কথাটা বলিয়াছিল তা নয়—তা ছাড়া সে এমন অবলা নয় যে নরেন আজ তাহাকে ছাড়িয়া গেলে কাল সে কলিকাতায় যাওয়ার কোন উপায় করিতে না পারিয়া এই ঘরে বসিয়া বসিয়া কাঁদিলে কিংবা কাহারও নিকট গিও সাহায্য ভিক্ষা করিবে। কিন্তু কথার ধারা যখন এমনি ঘুরিয়া দাঁড়াইল তখন আর কিছু বলিয়া বেশী অপদস্থ হওয়ার চেয়ে নীরব থাকাই ভাল মনে করিয়া মমতা আর কোন কথা বলিল না। বলিলে, মমতা হয়ত অনেক কথাই বলিতে পারিত—অন্ততঃ এও বলিতে পারিত, এক সঙ্গে দুই কূলই যদি না ভাঙে সে কি নদীর অপরাধ! আর যে কূলে ভাঙ্গন ধরিয়াছে সেই কূলে নিশ্চেষ্ট ভাবে

দাঁড়াইয়া থাকিয়া মাটির সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে নদীর জলে বিসর্জন দিলে হয়ত দার্শনিকতার খুব বড় পরিচয় দেওয়া হয় কিন্তু কোন স্বাভাবিক ও স্বস্থ প্রকৃতির মানুষই তা পারে না, বিশেষ করিয়া অনিবার্য মৃত্যুর সময় ছাড়া মানুষের জীবনে দার্শনিকতা যখন অচল! আরও হয়ত অনেক কথা বলিতে পারিত।

মমতার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা কহিবার জন্য নরেন স্যুটকেসটা নামাইয়া রাখিয়াছিল কিন্তু মিনিট দুই-তিন অপেক্ষা করিয়াও মমতা যখন কথা কহিল না, স্যুটকেসটা পুনরায় উঠাইয়া লইয়া বলিল—চললাম, মমতা।

নরেন চলিয়া গেল। কিন্তু নরেন যে কোন আড়ম্বর না করিয়া এমনি ভাবে বিদায় লইবে এ কথা মমতা ভাবিতেও পারে নাই।

আকাশের অপর পারে তখন সমস্তা রাত্রির কালো অকূল পরিয়া উবা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—

মমতার মনের আকাশে ঘনাইয়া উঠিয়াছে একখানা কালো মেঘ আর তারই সজল আভা ওর একটি মাত্র চোখে!

## পাঁচ

প্রকাশ হইল সেই ধরণের ছেলে যাহারা কোনদিনই ভবিষ্যতের আশায় বর্তমানকে অবহেলা করে না, অতীত তাহাদের নিকট মৃত আর বক্রণা সেই শ্রেণীর মেয়ে যাহারা অতীতকে বড় করিয়া দেখে, বর্তমান লইয়া করে খেলা আর ভবিষ্যৎ তাহাদের স্বপ্ন রচনার জন্য। তাই এই এক মাসের পরিচয়ে প্রকাশ মনে করে বক্রণাকে সে বুঝিয়াছে বক্রণা মনে করে প্রকাশকে করিয়াছে বন্দী।

একটু আগে প্রকাশ চলিয়া গেছে, কাল বক্রণা পশ্চিমের কোন এক সহরে বক্তৃতা দিতে যাইবে। ঘরে আর কেহ ছিল না। আপনমনে একটি গানের দুইটা লাইন আবৃত্তি করিতে করিতে পায়চারি করিতে লাগিল

এবার উজাড় করে লও হে আমার

যা কিছু সম্মল

ফিরে চাও ফিরে চাও

হে চঞ্চল—



গানের এই কয়টি লাইন বারকতক খুরাইয়া ফিরাইয়া গাহিয়া অত্যন্ত অবসরের মত ইজিচেয়ারে বসিয়া পড়িল। যে অতীতকে ভুলিবার সে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে আজ এই নিঃসঙ্গ রাত্রির প্রতি মুহূর্ত্তী যেন তাহারই স্মৃতিতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। চুপ করিয়া বসিয়া থাকা বরুণার পক্ষে অসম্ভব। বিশেষ করিয়া আজিকার রাত্রে। প্রকাশের কথাগুলো যেমন সমস্ত অহুভূতিকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করিয়া তাহার মনের আকাশে এক প্রচণ্ড ঝড় তুলিয়াছে। ‘অতীতে যারা তোমার কাছ থেকে ফিরে গেছে বরুণা, আমার মনে হয় তারা তোমাকে ভুল বুঝেই গেছে। দেহকে ঘিরেই পুরুষ ও নারীর প্রথম ভালবাসা একথা সত্যি এবং এইজন্যই আমাদের বহু পুরণো বিয়ের প্রথাটা আজও কোনরকমে বজায় আছে, কিন্তু ভালবাসার সবটুকুই দেহকে ঘিরে নয় বলেই অমরেশ তোমার ভালবাসা পেলেনা এবং সে আরও ভুল করেছে তোমাকে স্বাধীনতার লোভ দেখিয়ে—আরও বলিয়াছিল—‘তুমি ভুল বুঝনা, বরুণা, প্রকারান্তরে তোমাকে ভালবাসা জানাবার কোন উদ্দেশ্যই আমার নেই, ও জিনিষটা কাগজ কলমের সাহায্যে বেশ নির্দিষ্টভাবে সেরে নেওয়া যেত, শুধু এইটুকু বলতে চাই তোমার বিদ্রোহের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে—

প্রতিবাদ করিতে গেলে বাধা দিয়া প্রকাশ বলিয়াছে—

তর্ক থাক, মমতা, কাল তোমাকে আমার সঙ্গে পার্টনার হেতে হবে, সাতদিনের জন্যে তারা একটা স্বদেশী মেলা বসিয়েছে, দেখানে তোমাকে বক্তৃতা দিতে হবে। তৈরী হ’য়ে থেক, কাল সাড়ে নটার এসে তোমাকে নিয়ে যাবে...

না, বরুণা আর ভাবিতে পারে না! সহসা দেহ মনের একি অবসন্নতা! বরুণা আশ্চর্য্যভাবে ইজিচেয়ারে চোথ বুঝিয়া শুইয়া রহিল! কিন্তু এমনিভাবে বেশীক্ষণ শুইয়া থাকিতেও পারিল না—কে যেন অলক্ষ্যে আসিয়া তাহার মনের চারি পাশে আগুন লাগাইয়া গেছে। সে চেয়ার ছাড়িয়া আবার ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল—কেমন করিয়া প্রকাশকে নিজের অতীত দিনের কথাগুলো জানান যায় কেমন করিয়া সে প্রকাশকে বুঝাইবে...কিন্তু কিই বা বুঝাইবার আছে—আর প্রয়োজনই বা কি, কাল প্রকাশের সঙ্গে দেখা হইলে সে স্পষ্ট তাহাকে বলিবে—তুমি আমার পথ থেকে সরে যাও প্রকাশ—

কিন্তু প্রকাশ ছেলেটি এমনি, একথা তাহাকে বলিলে হয় ত বেশ নিঃসঙ্কোচেই বলিয়া বসিবে—আমি যে তোমার দৃষ্টিপথ আড়াল কোরে আছি, এত আমি জানতাম না, বরুণা, সত্যি কি লজ্জা!

তাহার পর আর একটি কথাও ত বরুণা বলিতে পারিবে না—  
(ক্রমশঃ)

## আমার পৃথিবী

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

অনেক দিন আগেকার কথা —

বিধাতার মনে একদিন একটা সুন্দর কল্পনা দেখা দিল। সেদিন স্বর্গের পারিজাত সুরভি অতিরিক্ত সৌগন্ধে বুঝি বাতাস মত্ত করিয়া তুলিয়াছে, বিধাতা লীলায়িত হাতে যে সুরা-পাত্র ধরিয়াছেন, উহা ফেন-হাস্যে ছলছল করিতেছে, সুর-বালিকাদের চরণ-ছন্দে পদে পদে মূর্ত্তিহীন স্বরের মূর্ছনা আগিতেছে।

বিধাতা স্বজনের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন, অনেক নীচে অনেক সমুদ্র ও নদী ধৌত পর্বত-বেষ্টিত এক বিপুল পৃথিবী, সূর্য্য এবং চন্দ্র সেখানে দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন আসিতেছে; বলিষ্ঠ মানব মানবী নিঃশঙ্কচিত্তে পরস্পরের হাত ধরিয়া প্রান্তর ও অরণ্য অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। চোখে তাহার সূর্য্যের আলো জালিয়াছে, তাহাদের ওষ্ঠের হাসি প্রভাত আকাশের মত শুভ্র।

স্বপ্ন-ঘোরেই বিধাতা ঠিক করিয়া লইলেন, এই কল্পনাকে রূপ দিতে হইবে। স্বধার ঘোর হয়ত তখনও কাটে নাই, সুর-বালিকাদের পায়ে পায়ে তখনও সুর কাঁদিয়া মরিছে। কিন্তু বিলম্ব করিবার কথা বিধাতার নহে ; বিধাতা বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন।

প্রকাণ্ড আগুনের একটা পিণ্ড নীচের দিকে গড়াইয়া আসিল। নীচে ছিল শুধু জল, সেই জলে আগুন নিভিল। মাটি জাগিল, আলো আসিল ; জীবের জন্ম শুরু হইল। এক বছ হইল।

শোনা যায়, পৃথিবীর বছ লক্ষ বর্ষ লইয়া দেবতাদের এক একটি দিন। যদি তাই হয়, তবে আজ হয়ত বিধাতার চোখ হইতে মোহ মত্ততা কাটিয়াছে। আজ নীচের যন্ত্র কুৎসিত, সভ্যতা পঙ্কিল কলঙ্কিত। ধরিত্রীর দিকে চাহিয়া তিনি হয়ত আবার চোখ মুদিয়াছেন। নিজের বীভৎস সৃষ্টির দিকে চাহিয়া বিধাতার আজ আর লজ্জার অনু নাই—সেই সঙ্গে মানুষেরও।

বিধাতার মত আমিও একদিন স্বপ্ন দেখিতাম ; মানুষের মাঝখানে স্বন্দরকে খুঁজিতাম ; ভাবিতাম, এই ক্লেদকর্ণ পৃথিবীতে নন্দনের ছায়ালোক রচনা করিব। সেদিন আমার চোখেও স্বধার বিহীনতা। জীবনের সেই কৈশোর-লগ্নে আমারও চোখের সামনে দিবারাত্র সুরবালিকাদের নৃত্য হইত। দর্শনিক বাহু বিস্তার করিয়া আমায় কাছে টানিত। মানুষকে আমি চাহিতাম। আমার চোখের মোহের মশাল জালিয়া আমি প্রত্যেক নর নারীর মুখের দিকে চাহিয়া দেবতাকে খুঁজিতাম ; রমণীর কেশগন্ধ আমার সেই কৈশোর স্বর্গলোকে পারিজাতের সুগন্ধ দিয়া অবাস্তব করিয়া রাখিত ; মানুষকে আমি ভালবাসিতাম।

অভিধানে মানুষের যতগুলি সংপ্রবৃত্তির উল্লেখ আছে—যেমন, পবিত্রতা, দয়া, স্নেহ প্রেম, ধর্ম, ভীকৃত্য সেই সব দিয়া কল্পনায় একটি কল্পলোক সৃষ্টি করিয়াছিলাম।

পৃথিবীকে সে দিন একখানি অমধুর কাব্যগ্রন্থ বলিয়া মনে হইত—প্রত্যেকটি দিন ও রাত্রি যেন সেই গ্রন্থের এক একখানি পাত। প্রত্যেকটি ফুল যেন তার একটি কবিতা। সেদিন আকাশকে আত্মীয়ের মত মনে হইত ; ছায়া-পথে কাহার আঁচলের আভাস মিলিত এবং আরও কত কি !

তার পর বাস্তবের রুঢ় আঘাত লাগিয়া আমার সেই ধ্যানলোক একদিন কোন্ রসাতলে নাগিয়া গেল। মনে হইল যে বিরাট পিণ্ড হইতে এই পৃথিবীর উৎপত্তি উহার আগুন বুঝি আজও নিভে নাই ; নহিলে আজ আর পৃথিবীতে ভূমিকম্প জাগিত না ; নিদ্রাহীন রজনীতে মানুষ দুঃস্বপ্ন ভূতাবনায় ঈশ্বরকে অভিশাপ দিত না। ভাল করিয়া চোখ মেলিয়া দেখিলাম, এই পৃথিবীর প্রত্যেক তৃণ তরুতে, ধূলাও কঙ্কর অনাদ্যন্ত এক লজ্জার ইতিহাস ; সে ইতিহাস যেমন নিষ্ঠুর তেমন শোচনীয়। দেখিলাম, দয়ার দাম নাই ; স্নেহ বিড়ম্বনা এবং প্রেম পাপ।

অনন্তকে পরিবার স্বপ্ন যেদিন ভাঙিল সে দিন ক্যাটোর মত আত্মহত্যা করাও আমার পক্ষে কঠিন ছিল না ; কিন্তু ক্যাটোর আদর্শ বোপ করি আমার চেয়ে বৃহৎ ছিল। তাই ধীরে ধীরে আমারও একদিন অপমৃত্যু ঘটিল, তবে ক্যাটোর মত গলায় ছুরি দিয়া নয়।

আমার বিস্তীর্ণ আকাশকে আমি অঙ্ককার ঘরের চতুঃসীমানার মধ্যে বন্দী করিলাম। গভীর রাত্রে আমার শয়ন শিয়রে বাহাদের কেশপুংস আমাকে উতলা করিত তাহারা কে কোন্ দিকে গেল তার কোন হিসাবই রহিল না।

পাপের আবেগে আমার শিরার শোণিত চঞ্চল হইয়া উঠিল। বর্ষের বীভৎসতার মূর্তি দেখিবার জন্ম লালায়িত হইয়া উঠিলাম।

আমার অভিধান হইতে স্বন্দরের নাম আজ তুলিয়া দিয়াছি।

## বঞ্চিত

শ্রীমুকুমার সরকার

হৃদয় চলিছে তবুর শ্মশান ছাড়িয়া  
নিদয় জগৎ পেছনে ফিরিয়া হাসিছে !  
মৃত্যু আমার জীবন নিতেছে কাড়িয়া  
নয়নের আলো আঁধার আসিয়া গ্রাসিছে !  
ধরনীরে আমি দিয়েছি গান উপহার  
সে আমার সাথে তবু কোনো কথা কহে নাই ;  
হাসি দিয়ে আমি কিনিয়াছি শুধু আঁখিধার  
আমার প্রেম সে হৃদয়ে তাহার বহে নাই !  
নদী চলিয়াছে ভাব-মন্ডর গতিতে  
আমি বালুপরে গণিয়াছি শুধু শুধু ঢেউ ;  
কালিমা কেবলি ঘনায়েছে আঁখি-জ্যোতিতে  
সলিলাঙ্গনা এলো না, আমার কাছে কেউ ;  
আমি শেফালীর ঝরার বিদায় বাঁশীতে  
দিয়েছি আমার চোখের শিশির ছিটায়ে ;  
সে মুখ লুকালো তুণের শ্রামল হাসিতে  
মরণেও মোরে দিলোনা তিয়াসা মিটায়ে !  
বমানীর স্নেহে হৃদয় উতলা হয়েছে  
পল্লব-করে তবু সে আমারে ডাকে নাই,

যুদিত হু' আঁখি আলোকেতে কথা কয়েছে  
অরুণ তবুও ললাটে আশীষ রাখে নাই !  
ফুলের পরাগে আমার দৃষ্টি-ভ্রমরা  
কত শতবার উড়িয়া উড়িয়া গিয়াছে ;  
রূপের স্বপনে সৃষ্টি করেছে অমরা  
কুসুম তবুও কপোল ফিরায়ে নিয়াছে !  
মেঘের তড়িৎ-নয়নের পরে আমি গো  
দেখেছি আমার মনের বনের রানীকে ;  
শ্রাবণ-আকাশে তবু কোনো দিবা যামি গো  
দিলোনা সে তার সজল মোহাগ-বাণীকে ।  
হেরি বাসন্তী অনন্ত ফুল-শয়নে  
নিখর নয়নে জেগেছে মুখর তিয়াসা ;  
মালিকা গাঁথিয়া কুসুম-কলিকা চয়নে  
জানিতে চাহেনি তবু সে এ বুকে কি আশা !  
আমার কল্প-অলকায় আমি বারে বার  
পাঠাতে চেয়েছি আমারি বিরহ-মেঘেরে ;  
হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে শুধু হাহাকার  
কেহ নাহি সেথা আঁখি দীপ জ্বলে জেগেরে ।



## পাথর

শ্রীফণীন্দ্র পাল

মোড়ের মুখটায় ভীষণ রক্তের একটা হৈ চৈ পড়ে গেছে, এমন কি পাথু গোসাই পর্যন্ত হাতের কব্জের স্থখটানটা না দিয়েই, দোকান খুলেই বসন শাসন করতে করতে ছুটে এসেছে ভিড়ের মাঝখানে। ব্যাপারটা এমনিই !

কোন কথা নয়, যে যেখান থেকে পারছে, বেচারাকে কিলটা, চড়টা বকশিস দিচ্ছে। যে নাগাল পাচ্ছেনা, সে দূর থেকেই খোয়াগুলো নির্মমভাবে ছুঁড়ে ছুঁড়ে আপন আপন পৌরুষ জাহির করছিল। কক্ষকর্তা নহুখুড়ো, লোকটীর লম্বা লম্বা কথু চুলগুলো প্রাণপণ শক্তিতে টানতে শুরু করেছেন। বিশেষ পরিশ্রমে হাঁপিয়ে উঠেছেন খুব কিন্তু কণ্ঠব্য ভোলেননি একটুও।

ভিড়ের মাঝখান থেকে শিশু সামন্তের মেজ ছেলে বিশ্ব চৈচাচ্ছে : চুরি করবার জায়গা পেলে না শালা ? তোমায় একেবারে আধমরা কোরে দশটা বছরের জন্তো কালাপানির ঘানি না টানাই তবে আমার—ভীষণ একটা দিব্য নিঃসঙ্কোচেই করে ফেললো।

কিন্তু কালাপানির ঘানি টানবার আগেই শীগ্গীরই যে সে দক্ষিণদিকের কালপুরীর অতিথি হ'তে চললো বলে—বোধ করি একথাটা বিশ্বনাথ উত্তেজনার নোঁকে খেয়াল করেনি—কেউ কেউ আবার লোকটার অসীম দুঃসাহস দেখে দুঃসহ বিষ্ময়ে একেবারে ঘেন বোবা হয়ে গেছেন। কান্নর বা হাতের বিড়ি হাতেই নিভে গেল।

লোকটীর কিন্তু পরমায়ুর জোর আছে বলতেই হবে। অকস্মাৎ অসিত ভিড় ঠেলে ঢুকে পড়েই জিজ্ঞাস করলো : ব্যাপার কি ?

অত্যন্ত আশ্চর্য উপায়ে নহুখুড়োর হাত লোকটীর কেশ-পাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল এবং জনতার লঘুদের সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনমণ্ডলীর স্বর এমন নেমে গেল, যে মনেই হয় না কিছুকাল পূর্বে এখানেই বিংশ শতাব্দীর মহাযুদ্ধের মহলা মহা সমারোহেই চলছিল।

বিশ্ব কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়, ইতিমধ্যে এগিয়ে এসে জোর গলায় বলে : ও কি করেছে জানেন ?... অসিত জানতো না, তা সে বেশ দীরভাবেই স্বীকার করলে। বিশ্ব একটু গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বলে : আমরা পাথু গোসায়ের দোকানে গেলো কচি হঠাৎ হলো হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলে, টেঁপী গোসাইজীর দোকানের দিকেই আসছিল এমনি সময় এই শূয়ার ওকে ছেলেমাছুষ পেয়ে ডোবাটার পেছন দিকের বাদাড়টার ভেতর ওকে নিয়ে ঢুকে পড়েছে—টেঁপীর গলার হার আর হাতের বালা জোড়াটার লোভে। আর যায় কোথায় আমরা তক্ষুণি এসে পড়েছি। অসিত বলে : হাঁ তা' বেশ করেছ কিন্তু লোকটা মারা গেলে দায়ী হ'তে তোমরা...কৈ টেঁপী কোথা ? টেঁপী তখন একপাশে দাঁড়িয়ে লোকটার মার দেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। অসিত তাকে টেনে কোলে তুলে নিয়ে বলে : হাঁরে টেঁপী এ তোর হার খুলছিলো ?

টেঁপী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলো : না কাকা, বিশ্বদা-ওরা শুধু শুধু মারছিলো, এ আগায় আদর করলে, ঠিক তোমার মতন। এই দেখনা আগায় কেমন লজেনচুষ দিলে—

বাস্তবিক টেঁপীর দু'হাতে দুটো বড় বড় লজেনচুষ আর ওর লাল কচি ঠোঁট দুটি দিয়ে 'লাল' গড়াচ্ছে।

অসিত তাড়াতাড়ি সম্মেহে লোকটীকে মাটি থেকে টেনে তুলে বলে : আমার কাঁদটা পরে আশ্বন—বেশীদূর যেতে হবে না এই কাছেই—

লোকটা একবার আপনার জর্জরিত পা দুটোয় কোনো রকমে ভর দিয়ে অশ্রুগ্নান, বিষন্ন চোখ দুটি তুলে অসিতের দিকে তাকালো। সে দৃষ্টি ঘেন মাতুষের নয়—তার কোন অভিব্যক্তি নেই। অসিত সামনের মেটো পথটার দিকে মুগ ফেরালে—

টেপী তখন কাকার কোলে পরমানন্দে লঞ্চেচুষ খাচ্ছে আর লোকটার তালি দেওয়া ছেঁড়া জামাটার আড়ালে রক্তের ছোপ্ আর কালশিরের দিকে ছলছল দৃষ্টিতে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। শিশুর বোবা ব্যাধিত মনটা সাধনার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না হয়তো।

অসিত টেপীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো : তুই কি করতে এসেছিলি ? কে তোকে পাঠিয়েছিলো ?

টেপী ভারী গলায় জবাব দিলে : না !—আমি মুড়ী কিনতে যাচ্ছিলুম।

ওদিকে বিরাট প্রহারপর্ক এই রকম মধ্যপথে থেমে যাওয়াতে জনতা অসিতকে দণ্ডবান দিচ্ছিল না।

সহর বলে সহর, গ্রাম বলে গ্রাম।—তা থাকেন সেখানে অনেকেই। উকিল, ডাক্তার, পুলিশ এবং বনিয়াদি অভিজাত সম্প্রদায়েরও অভাব নেই। এমন কি পোষ্টাপিস, হাট বাজার, ইস্কুল থেকে শুরু করে মাঝ মনোহারী দোকানটা পর্যন্ত। নেই শুধু কলেজ, গোলদীঘি, সেনেট-হাউস আর রাইটাস বিল্ডিং।

অসিত কলকাতারই এক কলেজে কোর্গইয়ারে পড়ে। বাপ-মা আগেই বিদায় নিয়েছেন। এখানে থাকেন অসিতের বৌদি এবং একমাত্র অগ্রজের একমাত্র সন্তান টেপী। আর তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে বুড়ো বিশ্বস্ত চাকর বেহারী। ভাল নাম হয়ত ওর আছে একটা কিছু, কিন্তু টেপী এখনও ভালো নামে ডাকার পৌরব পায়নি।

শনিবারের ক্লাস করে বাড়ী ফেরবার মুখে এই বিষম বিভ্রাট।

সেই অবস্থায় বাড়ী ফিরেই বাইরের ঘরটায় অতিথিটিকে বসিয়ে এগোতেই সামনের দরজায় বৌদির সঙ্গে দেখা। দেখা হতেই অসিত বলে : খুব জোর বকুনি একটা তোমার রিসার্ভড্ রইল বৌদি।

কতক শুনে এবং বেশী ভাগই না শুনে স্বরমা বিশেষ উদ্বেগে ওদের প্রতীক্ষা করছিলেন। অকস্মাৎ টেপীকে কাছে পেয়ে যুগপৎ আনন্দে এবং ক্রোধে তাকে ধমকান শুরু করলেন : ধন্টি মেয়ে যা হোক বাবা তুই, তোকে দৌড়ে নিয়ে আসতে বল্লুম, আর তুই পোড়ারমুখী এতক্ষণ—

অসিত তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে : ধমকানটা এখন কিছুক্ষণ মূলতুবী থাক বৌদি, সে বীরে স্বস্থে পরে হবে। তুমিও একটু জোর কোরে নাও, ও-ও একটু জিরিয়ে নিক। এখন আপাতত বেহারীর কাছে ওকে রেখে বাইরের ঘরটায় একটু গরম জল—

স্বরমা ব্যাকুল উৎকর্ষায় জিজ্ঞেস করলে : কেন ঠাকুর-পো কি সেই চোরটাকে বাড়ী এনে আপ্যায়িত করবে নাকি ? অসিত ধীর ভাবে বলে : চোর কিনা তা জানি না বৌদি, কিন্তু আমি না এসে পড়লে আজ এমন একটি নিরীহ মানুষ মারা পড়ত—কিন্তু সে যাক সে পরে শুনো এখন যা বল্লুম একটু শীগ্গীর কোরে দাও আর 'ত' দেবী করবার সময় নেই, আমি বরফ আনতে চল্লুম। অসিত উর্দ্ধ্বাসে বেরিয়ে পড়লে।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। হঠাৎ পশ্চিম আকাশের পানে চেয়ে স্বরমার মনে কি জানি কেন কান্নার সাগর ফেনিয়ে উঠলো। দিনান্তের মূর্ছিত আকাশ যেন তখন মৃত্যু বাসরের পৌরহিত্যে বসেছেন। গোপুলির ম্লান রক্তাক্ত যেন তার কান্না-হোমের শেষ অর্ঘ্য।

শেষকে নিঃশেষ করবার সে কী বিপুল সাধনা !

বেহারীর কাছে মেয়েকে রেখেই স্বরমা তক্ষুনি বিছানা-পতর নিয়ে বাইরের ঘরে ঢুকেই চমকে দাঁড়াল।

লোকটি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে উত্তর বন্ধুর, মেঠো পথ-টার ওপারে বিদায়ের শেষ স্বর্ষ্যের পানে চেয়েছিল। তার ইসারার সাড়া দিচ্ছিল বোধ করি তারপর ; হঠাৎ মুখ ফেরালে।

ওর ব্যাখ্যাতুর, ক্রান্ত, চোপ ছোটো হঠাৎ খুসীর আলোয় হেসে উঠল যেন। ওর স্বরমার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকার মধ্যে কি যেন মধুর বেদনা গুমরে উঠছে।

স্বরমা কিছুক্ষণ বিমূঢ়বিস্মলের মত শুক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর স্বদূরগত গীত রেখার মতো অশ্রুটধ্বনি উচ্চারণ করলে : স্বরেশদা তুমি !

কি জবাব দেবে স্বরেশ ! এইটুকু শুধু বোঝা গেল সন্ধ্যার আব্জা, ধূসর আলো-আঁধারির মধ্যে তার বিকৃত

পাংশু মুখটি আরো বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। গভীর লজ্জায় অপরিসীম বেদনায় সে অপরাধীর মতো মাথা নীচু করে বসেই রইল। অথচ চোখ তার ছল ছল কোরে উঠেছে।

মামুষের চেনা মনটার আড়ালে যে আর একটা মন চুপি চুপি ঘুমিয়ে থাকে সেই মনটারই বিকৃত রূপটি আজ স্বরেশের সামনে প্রোক্ষল হয়ে উঠতেই, সে ভয়ে, লজ্জায়, বিস্ময়ে, একেবারে অধীর হয়ে উঠলো। কোন রকমে সে যেন বলতে পারল : চল্লুম স্বরমা! শুধু আমার এই কথাটি তুমি বিশ্বাস করে! যে এখানে আসবো বলেই আমি আসিনি।

স্বরমা তখন কঠোর হয়ে উঠেছে। এ যেন সেই শুচি শিক্ষা বেদনাময়ী নারী নয়, যেন বিদ্যুতের জ্বালাময়ী অগ্নি-শিখা; তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিলে : তা জানি কিন্তু এত শীগ-গীর যাবার জন্যেও ত' আসো নি? তোমাকে চলে যেতে দিলে আমার যে আতিথেয়তার কটি ঘটবে।

নিরুপায় স্বরেশ এই তীক্ষ্ণ বিদ্যাপের উত্তরে কিছু বলতে না পেয়ে রুদ্ধ অভিমানে জানালার দিকে তাকিয়ে রইল। স্বরমার মুখে চোখে তখন মেঘ ও বোঁদেব লুকোচুরি, দাঁত দিয়ে কম্পিত ঠোঁটটুকু চেপে ধরে বললে : মাপ করো স্বরেশদা। অকস্মাৎ সে ঘর থেকে চলে গেল।

স্বরেশ তখন ভাবচে—“স্মৃতিকে পঙ্কিল করতে কি সে আবার জড়িয়ে পড়লো?” তার মনে পড়লো—কতখানি পরিবর্তন আজ স্বরমার হ'য়েছে? কিন্তু সে কি শুদ্ধ বাইরের।

অর্থের কোন অভাবই ত সেদিন তার ছিল না। স্বরমার মেজদা' সমীরের সঙ্গে তার যে বন্ধুত্ব তার গাতিরেই সে তার বোন স্বরমাকে ছোট বোনটির মতোই ভাল বাসতো। কিন্তু স্বরমা তার উন্মুখ যৌবনের সমস্ত কামনা দিয়ে মনে মনে স্বরেশকেই বরণ করেছিলো সে তা ঘূর্ণাকরেও জানেনি! স্বরমার স্বরূপমূর্তি যে দিন তার চোখে পড়লো সেদিন সে আত্মঅহঙ্কারের বশে তাকে রুঢ় প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারপর নিঃস্ব বৈরাগীর মতই জীবনের বৈচিত্র্য জালে বন্ধনমুক্ত মানবশিশুর মতোই ক্রমশঃ জড়িয়ে পড়েছে।

পল্লীতে পল্লীতে মুসাফের হয়ে ঘুরে বেড়ায়—রাতের

নিশ্চক্ৰতায় ভাঙা খোড়ো ঘরের ফাটাল দিয়ে তৃতীয়ার শীর্ণ ব্যথিত পাণ্ডুর চাঁদটার পানে চেয়ে চেয়ে ওর মনে হয় স্বরমার স্মান ছায়া যেন ওরই মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

এইত সেদিন একটা সাপুড়ের জাতহীন অস্পৃশ্য মেয়ের বিছানায় বসে তার শেষনিঃশ্বাসের স্পন্দনটুকুর মধ্যেও স্বরমার নিঃশ্বাস অনুভব করে তার সমস্ত দেহের অনুপর-মাণু পর্যন্ত হিম হয়ে গেছে। মনে মনে বলেছে—নিজেকে ঠকিয়ে আর কতদিনই বা চলে। কিন্তু নিজের আসল রূপটি তো এখন চোখে পড়লো।

তার পর খেয়ালের বোঁকেই একদিন সহরতলীটায় এসে পড়েছে এবং তার—তার চেয়ে অভাবনীয়রূপে যখন দেখলে স্বয়ংের জানুলাটায় একখানি বিষন্ন বিদবার অশ্রুমান আতুর চোখটুকু সন্ধ্যাতারার মতোই স্নিগ্ধ, আর সে স্বরমা তখন সে একেবারে বিহ্বল হ'য়ে পড়লো। পরিবর্তনের অনেক রূপই তার চোখে পড়েছিল।

অনুভূতির প্রত্যেকটি রক্তবিন্দু যাকে কামনা করেছে তার সঙ্গে লুকোচুরি আর চলে না।

স্বরমা আবার ঘরে এসে বলে : স্বরেশদা উঠে মুখটা ধুয়ে ফেল! বিমূঢ়ের মতো স্বরেশ বসে বসে ভাবছে—সে এখন কি করবে? ওকি ছুটে গিয়ে বলবে : স্বরমা আমি ফিরে এসেছি, আমায় মাপ করো, নিজেকে চিন্তে পারিনি সেদিন। স্বরমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলে নিরীকার কঠিনভাব, কোনো মানির রেখাও সেখানে নেই।

টে'পী সব সময়েই তার নতুন কাকাবাবুর রোগশয্যার পাশে বসে থাকে। অনর্গল বকুনি তার খামুতেই চায় না। সেদিন বসে স্বরেশকে তার পুতুল বিবাহের আয়োজন পার্কের ফর্দ শোনাচ্ছিল। পাকা গিল্লি আর কি!

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। বাইরের বাতাসকে ঘরের ভেতর মনে হচ্ছিল যেন কার তৃপ্ত দীর্ঘশ্বাস।

আলো আলো স্বরমা ঘরে ঢুকলো। বিগত দিনের লীলাময়ী মেয়েটি কঠিন সংযমের আড়ালে নিজেকে এমন ভাবে লুকিয়ে রেখেছে যে মাঝে মাঝে স্বরেশের বিস্ময় লাগে

এ কি অভিনয় না সত্য ? স্বরেশের দিকে তাকিয়ে সে বলে : যা টেঁপী তোকে তোর ঠাকুমা খেতে ডাকচে ।

ছোট্ট মেয়ের অভিমান থাকতে নেই এমন কথা কোন অভিধানেই লেখে না । ঠোট উন্টিয়ে টেঁপী বলে : যাবো না যাও ! দেখ দিকিনি কাকা আমায় সকলে খারাপ নামে ডাকে ।

স্বরেশের বিছানায় টেঁপীর কাঁচের পুতুলটা পড়েছিল সেটা তুলে নিয়ে থাকে ধমক দিয়ে বলে : আমার মেয়ের সামনে আবার টেঁপী বলে ডাকলে সাড়া দেবো না বলে দিচ্ছি কিন্তু ।

স্বরেশ তাকে নাম জিজ্ঞেস করতে স্বরমা বলে : ওর নাম অশ্রমতী । অশ্রম গালটা সম্মুখে টিপে দিয়ে স্বরেশ বলে : আর কেউ তোমায় অশ্রম বলে নেই ডাকুক, আমি ডাকবো ।

টেঁপী তাড়াতাড়ি লফিয়ে উঠে এই স্বসংবাদটা ঠাকুমাকে দেবার জন্যে ছুটে বেরিয়ে গেল ।

স্বরেশ নিম্পলক মমতামাখা চোখে তার দিকে চেয়ে রইল । তার পর সামনের খোলা জান্নাটার দিকে মুখ ফেরালে । নীল আকাশটার গায়ে ভাঙা চুড়ির মতো কাটা চাঁদটি পড়ে আছে, আর মেঠো বাঁকা পথটা বনরেখার ধারে এসে নিঃশব্দে থেমে গেছে । ওখানে কতখানি রহস্য, কী মায়া !

স্বরমা বিছানার পাশে বসে পরমস্নেহে ওর লম্বা কৃষ্ণ চুলগুলোর জট ছাড়াতে লাগলো । ক্লান্ত ম্লান দৃষ্টিতে স্বরেশ একবার ওর দিকে তাকালে । এই অবিশ্রাম সেবাতৎপরা বিধবা মেয়েটির ভেতর কী যেন মধুর প্রেরণা উজ্জল হয়ে উঠেছে—সে মমতার তীব্রতাকে রূপ হয়ত দেওয়া যায় কিন্তু সে অপ্ৰাণীত ।

বিকেল হয়ে এসেছে । পড়ন্ত রোদের বিলিমিলি গাছপালার চিকণ পল্লবের বুকে আলোর ফুলঝুরি ফোটাচ্ছে ।

নতুনখড়োর বৈঠকখানায় জমাট মজলিস অর্থাৎ নরক গুল-জার । পাড়ার যেকটি নিকশা প্রবীন ব্যক্তি আছেন, সকলেই জমায়েৎ হয়েছেন । মশলাদার পান আর তাওয়াদার তামাকের

বিনামূল্যে বিতরণ হয় এখানে তার সঙ্গে আবার পরকুৎসার মুগরোচক চানাচুর । স্বতরাং এহেন আকর্ষণ ছেড়ে বাড়ীতে কি আর মন টেকে ? আজকের আসরে এক নতুন চানাচুর বিতরিত হচ্ছে—তার বালও যেমন উগ্র, স্বাদও তেমনি অপূর্ণ ।

গাঁয়ের গেজেট পাক্স গৌসাই তার বিক্যাচল তুল্য বিরাট বপুভার তাকিয়ায় কৃত্ত ক'রে বেশ র'সিয়ে র'সিয়ে এতক্ষণ বলছিলেন : আরে শুনেছ হে আড্ডি খুড়ো অসিতদের বাড়ীতে যে আজকাল কেই-নীলে চলচে । বাজারের সেই সেদিনকার চোরটাকে নাকি অসিত বাড়ীতে পুরেচে ! বৌ-ঠাকুরণের সে কী সেবার ঘটনা...কী দরদ ।.....

নতুন আড্ডি হাড্ডিসার শুক মাথায়, রস কসের বড় একটা ধার ধারেন না । বড় বড় ঝাঁপালো গৌপের তলা থেকে কাঠ ঠোকুরার আওয়াজের মত অদ্ভুত স্বরে বলে উঠলেন : দরদ না ইয়ে !.....ছোঁড়াটাও ডব্বা জোয়ান আর ছুঁড়িটাও বিধবা সোমন্ত.....হঁ চুলে পাক ধরলো ও সব কিছু জানতে কি আর বাকী আছে বাবাজী ? ব'লে বার্কিকোর খেত পতা-কার গর্কে চারিদিকে সবজান্তা দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করলেন ।

শিবু সামন্ত হেঁপো কগী । বারমাসই ফ্রান্সে শার্টের দুর্গের আড়ালে ঠাণ্ডার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করেন । শুনে বললেন : পাড়ার মধ্যে একি বাভিচার (থক্ থক্) এর এর একটা বিহিত (থক্ থক্ থক্ থক্) কাসির ধমকে কথার খেই হারিয়ে গেল ।

পাক্স গৌসায়ের অকস্মাৎ নজর পড়লো উঁচু নীচু পায়-চলা মেঠো পথের পানে । অসিত হাতে বাজারের থলের মত কি একটা ঝুলিয়ে বাস্তবাবে হন্ হন্ করে যাচ্ছিল ।

“—অ—অসিত, শুন্চ”—গৌসাই ডাকলেন ।

নতুন খুড়ো কেমন একটু সন্ত্রস্ত হয়ে অপ্রসন্ন মুখে বললেন : কেন আবার ওই অলক্ষণে ই-ঘেটাকে ডাকলে বাবাজী ? একে কলিকালের ছোঁড়া ভায় ছ'পাত ইংরিজি পেটে ঢুকেছে বাপ্ খুড়োর মান রেখে আর কথা কয় না । ধরাকে সরা জান করে.....

—এই যে অসিত এসো বসো । ই্যা বলছিলেন যে আমা-



দের অসিতের মতো বিদ্বান ছেলে পাড়ায় বিরল—হ্যাঃ  
হ্যাঃ—

খুড়োর কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ অত্যাশ্চর্যরূপে কড়ি থেকে  
একেবারে কোমলে নেমে এলো।

গৌসাই একটু ভণিতা করার পর শুধুলেন : ই্যা অসিত,  
শুনলুম তুমি নাকি সেই চোর ব্যাটাকে বাড়ীতে ঠাই  
দিয়েছ ?

নম্রভাবেই অসিত জবাব দিলে : আজ্ঞে ই্যা। বেচারার  
তখনকার অবস্থা দেখলে আপনাদেরও দয়া হতো।

খুড়ো এতক্ষণ পড় পড় করে ঘন ঘন ভাঁকো টানছিলেন।  
ধোঁয়ার কুণ্ডলীর আড়াল থেকে কথাগুলো ছুঁড়ে দিলেন  
কিন্তু শুনলুম যে তোমার বোঁঠানু তার শুশুয়া করছেন সেটা  
কি ভালো দেখায় বাবাজী ? হাজার হোক সে পরপুরুষ,  
আর বিধবা ই-য়ে—

দপ করে অগ্নিস্কলিঙ্গ অসিতের প্রণাস্ত চোখ দুটো  
থেকে ঠিকরে এলো যেন। রুখে উঠে বলল : খবরদার,  
আপনারা বয়ঃস্ফোর্ট নিজেদের সম্মান বাঁচিয়ে কথা কইবেন।

তারপরই ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গ্যালো।

—কেমন আছেন আজ সুরেশ বাবু। বলতে বলতে  
অসিত এসে ঘরে ঢুকলো।

অদূরে ফসল ক্ষেতের বুকে অন্তরুণের অস্তিম চুসন তখন  
বিহ্বল আবেশে লুটিয়ে পড়েছে—জান্নার ধারে ব'সে ব'সে  
সুরেশ আনন্দে তাই দেখছিলেন। ভাবনার অর্থই পাথারে  
মন তার নিকরদেহেই পাড়ি জমিয়েছিল বোধ করি।—অতীত  
স্মৃতির ব্যাকুল হাতছানি।

অসিতের ডাকে এই স্মৃতি দেয়ানী মানুষটির চমক  
ভাঙলো।—কে ? আপনি।……ই্যা, ভালোই তো আছি।  
যা গুলোও শুকিয়ে এসেছে। জরটাও বোধ করি নেই।

—কিন্তু আপনার দেহের দুর্বলতাটুকু এখনও ঘোচেনি।  
আরো কিছুদিন আপনি বলকারক পথ্য খান—

একটা অদম্য বাষ্পচ্ছাসে সুরেশের কণ্ঠ সহসা প্রায়  
কঙ্ক হয়ে এলো। গাঢ়স্বরে সে বলে উঠলো : মানুষকে  
আজো আমি বুঝে উঠতে পারলুম না অসিত বাবু! কখনো

মনে হয় হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতাই তার আপন রূপ—পরমুহূর্তে  
সুশীতল স্নেহে আমার সে ধারণা বদলে যায়……আপনি  
কেন সেদিন আমায় ঘৃণা করে চোর ব'লে ধরিয়ে দিলেন  
না ? এই পথে কুড়িয়ে পাওয়া অচেনা ছয়ছাড়াটাকে কোন্  
সাহসে বাড়ীর মধ্যে ঠাই দিলেন। প্রণাস্ত কণ্ঠে অসিত  
জবাব দিলে : মানুষকে আমি তা'র দুর্বলতা, গ্রানি সঙ্গেও  
শ্রদ্ধা করি। আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি বলে পাড়ায় কুৎসিত  
একটা আন্দোলন চলেচে কিন্তু নিন্দুকের বিষোদগারকে  
আমি ভয় করিনে।

ঘরের মধ্যে পনায়মান আবহাওয়ার দরুণ অসিতের মুখ  
দেখতে পাওয়া গেল না। শুধু দুটি অলঙ্করে চোখ জ্যোতি-  
ষ্কর মতোই জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেচে।

আলো থাকলে আরও দেখা যেত, যে সুরেশের ক্ষত-  
কিত মথণান! অকস্মাৎ হেমন্তের পাণ্ডু আকাশের মতো  
রক্তহীন হয়ে গেছে।

……পাড়ায় আন্দোলন চলেচে।

ধানিকবাদে অসিত উঠে গেল। যাবার আগে বলল :  
কাল কলকাতায় যাচ্ছি। কলেজ কামাই করবার আর  
দরকার নেই। দেখবেন রুগ্নদেহের ওপর কোনরূপ অত্যা-  
চার কোরবেন না যেন!

জরটা আবার বেড়েচে।

ডাক্তার বলছেন : অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনার ফলেই  
নাকি এ জরের উৎপত্তি। রোগীকে নিকরদেহে রাখা  
দরকার।

সুরমার সেবাকুশল স্নেহকোমল হাত দুখানির যেন  
ক্রান্তি নেই। সুরেশের শুশুয়ায় সদা তৎপর।

টেম্পারেচার নেওয়ার পর একবাটা গরম হুখ এনে  
সুরমা বোললে : গেয়ে নাও তো, জুড়িয়ে যাচ্ছে।

সুরেশ মুদিত চোখে নিখুঁত হ'য়ে প'ড়েছিল। চোখ না  
মেলেই বললে : ফুলের বদলে যে তোমায় কাটা দিয়েচে,  
যে তোমায় নিশ্চয়মভাবে প্রত্যাখ্যান কোরেচে, তার প্রতি  
তোমার কেন এ সেবা ? পুরাণো স্মৃতি কি আজো  
ভুলতে পারো নি সুরমা ?



প্রশ্ন শুনে সুরমার চোখের তারায় ব্যথার ঘনিমা ছেয়ে এলো। তবু অবজ্ঞা মেশানো সুরে বোললে : বাঁয়ে গ্যাচে আমার সে সব কথা মনে করে রাখতে—সহসা রাগা চোখের ঘোলাটে দৃষ্টি ওর মুখের পানে নিবন্ধ করে সুরেশ অস্বাভাবিক আবেগের সঙ্গে বলে উঠলো : ছলনা কোরোনা সুরমা !..... আজ কেবলই মনে হচ্ছে তোমার দেওয়া বরণ-মালা সেদিন গলায় না পরে আমি নিজেকেই বঞ্চিত করে-ছিলুম বুঝি ! সে ভুল কি আজ শোধরানো যায় না ?

সুরেশের মনে হোল, সুরমা বুঝি প্রাণপণে একটা উদ্বেলিত দার্শন্যাস চেপে ফেললে। কিন্তু মুখের পানে চেয়ে দেখলে সেখানে প্রভাত আকাশের নির্দীকার নির্মলতা।

অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে সুরমা বলে : আর বাজে বোকো না বাপু ! দুখটা খেয়ে নাও। আমি ভাতের হাড়ীটা নাবিয়ে আসি।

ওর অকস্মাৎ চলে যাওয়াটাও হতত ছিল !

সুরমা চলে গেলে সুরেশ একলা শুয়ে নিজের মনটা তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান কোরতে লাগলো। দেখলে তার আত্ম-অহংকারের উদ্ধত প্রাসাদ আজ ধূলিসাৎ হ'য়ে লুটিয়ে পড়েছে। শুধু বুকজোড়া মকুভূমি বিপুল হৃদয় হা হা কোরুচে। আপনমনেই সে বোলতে লাগলো : ওরে কাঙাল ! ওরে সর্ব্বনেশে। দুর্ভিক্ষ পীড়িতের মত এ কী সর্ব্বগ্রাসী নোর বুড়ুফা !

সুরেশ আজ বুঝতে পারলে—সে মানুষ—দুর্দল মানুষ ! শঙ্কায় সে শিউরে উঠলো।

নিঃশব্দ নিশীথ ! বাইরে শুধু বিঁবিঁর কুনুঝির এক-টানা সুর। সুরেশের চোখ দুটো বিন্দ্র। সুরের তাড়সে মাথার মধ্যে অসহ্য যাতনা। পাশে লুপ্তিতা লতার মতো তন্দ্রাতুরা সুরমা ! এতক্ষণ সুরেশকে পাথার বাতাস কোরতে কোরতে ওর জাগরণ-কান্ত চোখ দুটো ঘুমের নেশায় জড়িয়ে এসেছে।

সুরেশের নজর পড়লো ওর অনাবৃত অকুণ্ঠিত ঘুমন্ত মুখখানির ওপর। নিশান্তের নিম্ভ্রত চন্দ্রমার মতোই ঈষৎ রান বোধ হয় উপযুপরি রাজি আগার আস্থির দরুণই।

ওর পানে চেয়ে চেয়ে সুরেশের মনে হোল, এ যেন উদ্গতখোঁনা কামচঞ্চলা কুমারিটি নয়—অপূর্ণ মহিষসৌ মগতানয়ী এক নারী !

রজনীগন্ধার গোপন-গন্ধের মতোই সুরমার প্রচ্ছন্ন অথচ পবিত্র প্রেমকে শুধু অনুভব করা যায়—উপভোগ নয়। উপভোগ কোরতে গেলেই বুঝি কলুষিত ক'রে ফেলবে !

কিন্তু, ওর বুক-ভরা উপভোগের তৃষ্ণা !

অসিতের প্রশান্তোজ্জল মুখখানি সহসা মনে পড়লো। কি উদার বিশ্বাসের সঙ্গেই ও নিজের বাড়ীতে তাকে আশ্রয় দিয়েছে। ওর সেই নিশ্চিত বিশ্বাসের মর্যাদা যদি সে কোন দুর্দল মুহুর্তে রাখতে না পারে ?

নিম্নকের বিমোদগারকে ওই তরুণ নীলকণ্ঠ হয় ত ভয় করে না। কিন্তু এই নির্দোষিনী নারীটি একটা ছয়ছাড়ার জন্যে কুংসা-বিষের জ্বালায় কেন মরবে ?

সুরেশের মন অশান্তিতে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠলো।

ধীরে ধীরে সে জান্নার কাছে সরে গেল।

সমুখে পথ—অনন্ত, উদার, তারার অক্ষুটি আলোয় মাহাময়। পথিকের মনে আবার পথের নেশা লাগে।

সুরেশ ভাবলে যে পথ দিয়ে সে একদিন সুরমার কাছে এসেছিল সেই পথ দিয়েই আবার ফিরে যাবে। যে মান-সিক দ্বন্দ্ব তার অন্তরকে বিক্ষত কোরে তুলেছে এমনি কোরেই তার অকাল অবসান হোক—

কিন্তু যাবার আগে একটা স্মৃতি ?

নিদ্রিতা সুরমার ললাটের ওপর সুরেশের তৃষিত ওষ্ঠ বুকে পড়লো—পরক্ষণেই মনে হোল সুরমাকে কাপুরু-ষের মত অপমান করবার অধিকার তা'র নেই !

সর্ব্বথ হারিয়ে যে কাঙাল পথিক ফিরে চলেচে, যাবার—যাবার বেলায় একী তার দুর্দলতা ? সোজা হোয়ে দাঁড়িয়ে আলোয়ানটা বেশ করে জরতপ্ত দেহে জড়িয়ে সুরেশ নিঃশব্দে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

আবার চলা শুরু—

মাথার ওপর অসংখ্য তারা।

ওগুলো যেন যুগে যুগে চলে যাওয়া সুরেশের উদ্দেশে বিরহিনী সুরমার অশ্রু।

## অনির্বচনীয়

শ্রীমগনাশ দাশ

বলার মাঝে না বলা যে কথা,  
সেই কথাটি শুন্তে তোমার এমন ব্যাকুলতা,  
কেন হল শুনি,  
মূচ্ছনা যার বকের মাঝে উঠছে রণরণি।  
ভাষায় তারে বুঝিয়ে দেওয়া  
প্রাণে যাহায় নিবিড় কবে যায়না কভু পাওয়া  
সে যে কঠিন বড়ো  
মানসী মোব সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান কবো।

আমাব হৃদয় নদী  
শ্রোত-হারা সে চলত বহি শুধুই নিরবধি,  
বাতাস তারে দোল দিতনা হয়।  
কোনমতে রইতো বেঁচে শীর্ণকায়া বালুর কিনারায়।  
অজকে ঠাণ্ড নতুন জোয়ার জলে  
তীব ভাজি' সে গর্জি' উঠি ছুটেছে বিপুল বলে।  
কেমন করে ঘটলো এমন তাই—  
নিজেই আমি বুঝতে নারি তোমায়  
আমি কি বুঝাবো ছাউ।

আঁধার রাতে কুহেলিকা ছিন্ন ক'রে ফেলি  
ঝড় ঝাপ্টা দীর্ণ করা দীপ্ত পাখা মেলি  
রক্তাক্রণের আলো উজল পাখী  
দীপ্ত ভয়াল বিপদ-নাশন মেলি তাহার আঁখি,  
চিরদিনের বন্ধ করা বকের পাষণ কাবা  
মুক্ত করে তুলল গানের ধারা ;  
সে গানখানির রেশ

তোমার মাঝে এইটুকু সে বুঝি  
আজ বুঝি তাব মূহল পরশ পেলাম আমি খুঁজি।  
অন্ধ নয়ন দুটি—  
যে অরূপের দরশ আশে বেদন ভরে পড়েছিল লুটি,  
তাহার রূপের বেখা,  
আলো ছায়াব পরদা ভেদি দিল ক্ষণিক দেখা।  
চিন্তে দিল ভবে

বোঝা তাহার হয়নি প্রিয়া আজো আমাব শেষ। হৃদয়খানি ভরিয়ে দিল সুধায় পূর্ণ ক'রে

সঞ্চিত যা' প্রাণে,  
ওগো আমাব বাথার সাথী ! তোমাব কানে কানে  
বলতে আমি যাই—  
নীবব হ'য়ে চেয়ে থাকি বলার ভাষা খুঁজে নাহি পাই  
পরম অভিমানে  
মুখ ফিরায়ে থাকো তুমি চাও না আমার পানে।  
কেমন করে বোঝাই ওগো হয়।  
অনির্বচনীয় সে যে বলাই নাহি যায়।

# প্রবোধ কুমারের ছোট গল্প

শ্রীহীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবোধ কুমার সাত্যাল মনে প্রাণে সত্যকারের সাহিত্যিক। তাঁর গল্প মাসিক-পত্রে চোখে পড়লে না পড়ে কিছুতেই পারা যায় না। বিদেশী গল্প-লেখকদের যথা মৌপাসা, বালজাক সোহ্‌ভ, ও'-হেনরী প্রভৃতির গল্প চুরি করে যে সব প্রবীন ও নবীন লেখক সাহিত্যের পোষাক পরছেন প্রবোধ কুমার তাঁদের কেউ নয়। প্রবোধকুমার ভূমিষ্ঠ হয়েছেন লেখক হয়ে। চিন্তার মৌলিকতা, জীবনের গভীর উপলব্ধি, ঠাইলের নূতন ঢং, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, নিখুঁত চরিত্র-চিত্রণ, প্রবোধকুমারকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে উচ্চাসন দিয়েছে, এই গুণ এঁর মত আরো কয়েকজন অতি আধুনিক সাহিত্যিকের অল্প বিস্তর আছে, যথা প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, শৈলজা-নন্দ, বিভূতিভূষণ।

প্রবোধকুমারের লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে কিছু দিন আগে। উত্তরপাড়ায় আমি তখন ছিলাম। সেই সময় একখানি 'নবশক্তি' আমার হাতে এসে পড়ল। দেখলাম একটি মাত্র গল্প সেই সংখ্যায় রয়েছে। ঠিক গল্প নয়, চিত্র। নাম 'তেপান্তর' লেখাটি পড়ে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। দুঃখ দৈন্য নিপীড়িত বাংলার এক নগ্ন ভাড়াটে বাড়ীর চিত্র কী আশ্চর্য সুন্দর অভিনব ভাবেই না লেখকের অনাড়ম্বর ভাষায় ফুটে উঠেছে। গল্পটি পড়ে পড়ে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলো। সেদিন মনে হয়েছিল নব্য বাংলার উদয়-চলে এই যে শিল্পীটি আত্মপ্রকাশ করেছে একদিন এই শিল্পী সাহিত্য-রসিকদের প্রীত করবে, তৃপ্ত করবে, বিম্বিত করবে। প্রবোধকুমারের সঙ্গে পরিচয় সেই থেকে, জন-বিরল এক পথের প্রান্তে তাঁর দেখা পেয়ে তাঁকে উৎফুল্ল হয়ে অভি-নন্দন জানিয়েছিলাম।

অতি-আধুনিক সাহিত্যের স্বর দুঃখের স্বর। জীবনের নগ্ন বীভৎস দারিদ্র্যের প্রকাশ এই অতি আধুনিক সাহিত্যে, এই জীবনের এই দিকটাকে অতি আধুনিকেরা চিত্রিত

করেছেন বলে তাঁদের কত গালিগালাজ, নিন্দা ব্যঙ্গোক্তি কটুকথা শুনে হোয়েছে, জীবনের নগ্ন নিষ্ঠুর দারিদ্র্য পাগ-লামি মানুষের জীবনকে কী ভাবে ধ্বংস ব্যর্থ করে তার জাজ্জল্য প্রমাণ শৈলজানন্দের "অতসী" "ধ্বংস পথের যাত্রী এরা," প্রেমেন্দ্রের "বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাদে," অচিন্ত্যকুমারের "দুইবার রাজা" এবং প্রবোধকুমারের 'দুতী' এবং 'তেপান্তর'। সমস্ত সংস্কার-যুক্ত হোয়ে এগুলি পড়লে বোঝা যায় অতি-আধুনিকরা মর্মে মর্মে দারিদ্র্যকে কী ভাবে উপলব্ধি করেছেন। "তেপান্তর" গল্পের সেই দুঃখ দারিদ্র্য ক্লিষ্ট অসহায় মেয়েটির আত্মকণ্ঠে সব ছাপিয়ে এখনও যেন আমাদের কানে এবং প্রাণে নির্মম ভাবে বাজছে "মরে গেলাম ভাই বড় তৃষ্ণা একটু জল।" কিন্তু তার বুকের সেই অনির্বাক্য পিপাসা কি মিটেছে? এক-বিন্দু জল কি সে পেয়েছে?

'নিশিপদ্মে' লেখক দেখিয়েছেন একদিকে নরনারীর মিথ্যা জঘন্য আত্ম-প্রবঞ্চনা, অন্যদিকে সুন্দর হোয়ে এই পৃথিবীতে দশ জনের মত হাসি অশ্রু আনন্দ আশা নিয়ে বেঁচে থাকবার অসীম অনির্বাক্য পিপাসা। সংসারের বোঝার তারা হুইয়ে পড়েছে, পাকের ভিতর দিন দিন একটু একটু করে অসহায় ভাবে ডুবছে, তাদের চারিদিকের আব-হাওয়া পঙ্কিল পুতিগন্ধময়, নীচতা শাঠ্য পাগলামী জঘন্য কদর্যতা, তাদের রক্তের সঙ্গে মিশে এক হোয়ে গেছে, অবি-চারে অত্যাচারে তারা জর্জর, তুচ্ছ স্বার্থ নিয়ে তারা পর-স্পরে মাপামারি কামড়াকামড়ি করে তারা ক্ষত-বিক্ষত হয়। আমাদের সমাজের কোন অন্ধকার গিরিগহ্বরে যে সব হতভাগ্য দিনের পর দিন জীবনমৃত হোয়ে নামে মাত্র বেঁচে ছিল প্রবোধকুমার তাদেরকে আমাদের চোখের সামনে তুলে দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি শুধু তাদের দেখিয়ে দিয়েই যদি ক্ষান্ত হোতেন তাহোলে হয়তো তাঁকে সাধারণ

লেখকের একটু উপরে স্থান দিয়ে ক্ষান্ত হোতাম। কিন্তু এসব হতভাগ্য নীচ মুমূর্ষু নরনারীর অন্তরের গভীরতম প্রদেশে আলোকপাত করে যা দেখিয়েচেন তাতে আমরা বিস্মিত ব্যাধিত হোয়ে পড়ি। দেখি তাদের অন্তরের সমস্ত নীচতা পাপ-প্ৰাণি পাকের তলায় একটু ফুল ফুটে রয়েছে আর রয়েছে সুন্দর হবার দশজনের ভেতর মানুষের মত বেঁচে থাকবার একটা, স্বাভাবিক ইচ্ছা, এই যে কামনার সুন্দর ফুলটি তাদের অন্তরের সমগ্র আবর্জনার নীচে অন্ধশুন্ধ হোয়ে ফুটে রয়েছে এ খবর তারা জানে না। দৈবাৎ ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে এই সত্যটির সন্ধান তারা পায় কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্যে। তারপর জীবনকে সমস্ত পাপপ্ৰাণী কদ্যাতা অনেক মুক্ত করে পবিত্রভাবে সুন্দর ভাবে জীবনকে চালিত করবার চেষ্টা করে, মানুষ যাইহোক, যত গলদই তার থাকুক না কেন তবু সে মানুষ সমগ্র নিশিপদ্মে প্রবোধকুমার এই সত্যটিই আমাদের কানে কানে গুঞ্জন করেচেন।

নিশিপদ্মের প্রথম গল্পটি ত দেখি একটা বিধবা মেয়ে কাল্পনিক নীড় বেঁধে তার স্বামীর সঙ্গে দিন কাটাচ্ছে। নিম্নলিখিত লাইন কটি পড়লেই পাঠক গল্পের মর্ম্মকথার পরিচয় পাবেন, মেয়েটির নাম পার্কতী, পার্কতীর এক বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা, স্থগী নবদম্পতী ভ্রমণ করে ফিরছিল। দুজনের ঘর সংসারের কথা আরম্ভ হোল—

পার্কতী বলে : কালকেই চলে যাবে? ইস্ আমি ভাব-ছিলাম তোমাকে একদিন নেমন্তন্ন করে নিয়ে যাবো, দেপতে তোমার ভগ্নীপতিটা কেমন মোখিন। দুজনে মিলে কেবল ঘরই সাজাচ্ছি ঘরটি আমাদের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী; সামনে ফুল বাগান দিনরাত গন্ধে ভুর ভুর করে। তাঁর পাগলামি শুনে তুই হাসবি ভাই, রোজ একটি করে বকুলের মালা তাঁর জন্যে গাঁথা চাই, বিছান হবে রোজ ফুলশয্যা। এমন জায়গায় হবে যেন তাঁদের আলো এসে পড়ে, জানলার ধারে নীমগাছ তার তলায় রজনীগন্ধার বন...

নিশিপদ্মের এই গল্পটিতে একটা বঞ্চিত নারীর বুকে স্বামী-সংসারের একটি অতৃপ্ত তৃষাকে কী সুন্দর করেই না লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। জীবনে যে নারীর সুন্দর হবার মনোহান হবার কোন উপায় নেই মধুর মিথ্যার কল্পলোকে

স্বামী সংসার রচনা করে যে জীবনটা স্থখে কাটাতে চায় প্রবোধকুমারের অনুভূতির নিবিড়তা সুদূরপ্রসারী কল্পন এই লেখাটিকে আশ্চর্য্য সুন্দর করে তুলেছে। এই গল্পে তাঁর চিন্তার মৌলিকতার পরিচয় আছে।

তারপর তাঁর অন্য গল্পগুলির কথা ধরা যাক। 'মর্ম্ম-কামনা' 'প্রসাধন' 'কঙ্কাল' প্রভৃতি গল্পের স্বর এক হোলেও প্রথমটির সঙ্গে শেষোক্ত গল্পগুলিতে মানব জীবনের কুশ্রীতম দিকগুলিই লেখকের তুলিতে ফুটেছে। এই গল্পগুলিতে লেখক দেখিয়েচেন মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় যতই পঙ্কিল কদ্যাতা থাকুক না এর অন্তরালে একটা কামনার ফুল অগোচরে ফুটে রয়েছে। এই কথা আমি প্রথমেই বলেছি। এই কামনাটি তাদের অন্তরে হঠাৎ সত্য হোয়ে ওঠে এবং সমস্ত পাপপ্ৰাণী পঙ্কিলতা থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিষ্পাপ জীবন যাত্রার চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়, ব্যর্থতার এই অসহ্য মর্ম্ম-স্পর্শ ট্যাঁজিডি আশ্চর্য্য ভাবে ফুটে উঠেছে 'মর্ম্ম-কামনা' গল্পটিতে। মানুষ সুন্দর হবার চেষ্টা করলেই সে সুন্দর হোতে পারে না এই কথাটি প্রবোধকুমার বার বার বলেচেন।

রচনা সব দিক দিয়ে সত্য হয় লেখকের সত্য অনুভূতির নিবিড়তায় সুদূর-প্রসারী কল্পনার নিখুঁত চরিত্র চিত্রণে এবং লেখকের রচনার ঢঙের এইসবগুলি গুণ থাকলে লেখকের রচনা সার্থক হয়। কিন্তু প্রবোধকুমারের এসবগুলি গুণ একত্রে থাকলেও সব গল্পে তার পরিচয় পাইনি। 'নিশিপদ্ম' 'প্রসাধন' 'মর্ম্ম-কামনা' 'কঙ্কাল' প্রভৃতি গল্পে আটটি প্রবোধকুমারের অসমাপ্ত শিল্প চাতুর্য্যের পরিচয় থাকলেও 'ছন্দপতন' গল্পটি ব্যর্থ হোয়েছে। এই গল্পে লেখক যা বলতে চেয়েচেন তা না বলেও কিছুই এসে যেত না, আর আমার মনে হয় প্রবোধকুমার যেন পাঠককে চমক দেবার চেষ্টা করেচেন। 'বাতাস দিল দোল' গল্পটি মিষ্টি হোলেও প্রবোধকুমারের অসামান্যতার পরিচয় পাইনি কিন্তু কবি প্রবোধকুমারের পরিচয় পেয়েছি।

"শুধু কেবল অশোক আর শিমুলের বনে বনে যখন আগুন লাগে রজনীগন্ধার সক্রমণ ইঙ্গিত যখন চন্দ্রালোকের দিকে উদ্ভাসিত হোয়ে ওঠে বন মর্ম্মর যখন ছায়া পথের সঙ্গীত

রচনা করে আর দিশেহারা দক্ষিণের হাওয়া যখন ঘরের  
ভিতর সকল কোণ বিশৃঙ্খল করে যায়—

মধ্যরাত্রে পক্ষিরাজের আগমন সংবাদে চকিতা ও ত্রস্তা  
রাজকন্যার ঘুম ভাঙে।

কিন্তু আশ্চর্য্য রস-সৃষ্টি হয়েছে ‘গভীর’ এবং ‘নারায়ণ’  
গল্প দুটিতে। নিত্যন্ত সাধারণ দুটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে  
এ দুটি লেখা হয়েছে। এ যেন সন্ধ্যা আকাশের দুটি  
উজ্জ্বল নক্ষত্র।

‘গভীর’ গল্পটি রোমাঞ্চিক। ‘নিশিপদ্মের’ মধ্যে গাঁটি  
ফেরিওয়ালার জীবনের একটি রাত্রে ঘটনা। কয়েক ঘণ্টা  
জন্মে যে একটি কিশোরী বধূ সম্পর্কে এসেছিল গল্প পড়া  
শেষে হোলে দেখি কিশোর ফেরিওয়ালার করুণ দীর্ঘশ্বাস  
আকাশে বাতাসে ব্যপ্ত হয়ে পড়েছে। এই সামান্য  
ঘটনাটুকু নিয়ে এই রকম উচ্চ শ্রেণীর রস সৃষ্টি-শুধু প্রবোধ  
কুমারের দ্বারাই সম্ভব। এবং আমরা রসগ্রাহি পাঠক গল্পের  
এইখানে দেখি ভাদ্রের ভরা নদীর মত রস ঢলে ঢলে উঠে—

সামান্য কিশোর ফেরিওয়ালার সঙ্গে যখন কিশোরী বধূটির  
আলোচনা একটু গভীর হোচ্ছে তখন সে এই বলছে কথা—

বদরি অনেকক্ষণ তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে :  
আমি তোমাকে চিনি।

মেয়েটি বলে, দূর কোন দিন দেখেচো না কি যে চিম্বে !  
অভিভূত হোয়ে বদরি বলল: হ্যাঁ চিনি, নিশ্চয় চিনি  
আমি তোমাকে দেখেছি এর আগে।

—কোথায় দেখেছিলে ?

ঘাড় ফিরিয়ে বদরি একবার রেল পথের দিকে তাকালো,  
কোথায় দেখেছে তা সে কেমন করে বলবে ? স্বপ্নের পর-  
পার পন্থা সে একবার হাতড়ে দেখল। সমাগরা ধরিত্রী  
আর নক্ষত্র খচিত অনন্ত আকাশ সে মনে মনে তোলপাড়  
করে এলো। তারপর ঘাড় বাঁকিয়ে বলে হুঁ ঠিক আমি  
চিনি তোমাকে—দেখেছি যে আগে।

কী সুন্দর কী অনির্দুর্লভ এই কথা কটা। হতভাগ্য  
সামান্য ফেরিওয়ালার সে, জীবনে কোন সুন্দরী মেয়ের অতো  
কাছে সে কোন দিন আসেনি, তাই মেয়েটির সঙ্গে কৃত্রিম  
হাসিতে কথাতে তার মনে হোল তার বৈচিত্র্যহীন অতীত  
জীবনে একদিন এই মেয়েটি যেন মেঘের কোলে বিদ্যুতের  
মত ঝিলিক মেরে বিলিয়ে গেছে কোন দাগ কাটেনি, এবং  
ধরাও দেয়নি।

‘নারায়ণ’ গল্প একবার পড়লে কখনো ভুলতে পারা  
যাবে না। নিশিপদ্ম প্রবোধকুমারকে চিরস্মরণীয় করে  
বাগবে।

চারণকবি শ্রীযুক্ত সুকুমার সরকারের বিশ্বয়কর কাব্যগ্রন্থ

রক্ত দেবতা

ও

মাতালের বাঁশী

শীতলই বাহির হইবে

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ও ডি, এম লাইব্রেরী, কলিকাতা।



# বাজালার কাব্যসম্পদ

( মৈমনসিংহ গীতিকা )

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর সামন্তরায় সাহিত্য-সরস্বতী

এক টাকা বেতনের মূলীখানার কর্মচারী দীন সাহিত্য সেবী চন্দ্রকুমার দে মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কর্তৃক সঙ্কলিত মৈমনসিংহ গীতিকা কাব্য সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ, আমরা এই পুস্তকের ১ম ভাগ ২য় খণ্ড পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। পুস্তকখানি দেখিলে আপাততঃ ‘এক ঘেয়ে’ বলিয়া মনে হয় এবং পাঠকের দৈর্ঘ্যচ্যুতির যথেষ্ট সম্ভাবনা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু একবার পাঠ আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া শান্তি পাওয়া যায় না, পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে ইচ্ছা হয়। চন্দ্রকুমার বাবুর অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবুর ছেঁড়া পুথি ঘাঁটা সার্থক হইয়াছে। যে সমস্ত পান্না গান, পল্লীগাথা ইত্যাদি একদিন নিরক্ষর ছোটলোকেরা গাহিত আর শত শত চাষা নাজলের উপর বাহুভর করিয়া দাঁড়াইয়া শুনিত, সেই গান আজ ইংরাজী শিক্ষা-গর্ভিত সমাজকে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছে, ইহা দীনেশচন্দ্রের অল্প কৃতিত্ব নহে। বাস্তবিকপক্ষে বাঙ্গালী ঘরের যে সমস্ত শোভা শতদলের গত ফুটিয়া জগৎকে সুষমা বিতরণ করিয়াছিল—আমাদের—পোড়া দেশের সেই অমর আলেখ্য এতকাল আমরা তুচ্ছ ত্যাগিয়া করিয়াছি। মহরা মনুয়া, লীলা প্রভৃতি আমাদের হৃদয়ে যে সুর লাগাইতে সমর্থ হইয়াছে মিসেলেণ্ডা, ডেসডেমোনা প্রভৃতি সে সুর আমাদের মধ্যে জাগাইতে পারিবে না।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে পৌরাণিক উপাখ্যান বিষয়ক কাব্যে কথার অভাব বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না; কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকার উল্লিখিত মনুয়া, মনুয়া, কল্ললীলা প্রভৃতির ত্রায় কাহিনী বা উপাখ্যানের অভাবে বঙ্গসাহিত্য বাস্তবিকই শ্রীহীন হয়। ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার যথেষ্ট

মূল্য রহিয়াছে। ইহাতে বঙ্গসাহিত্যের একটা নূতন দিকের উপর আলো পাত করিয়াছে। এই প্রকার গাথা বা পান্না গান চন্দের শব্দেবর্ষের বা তাল-লয়ের মাপ কাটিতে হয়ত দীন হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে কারুণ্য ও কবিত্ব উৎসের যে অফুরন্ত স্রোত বহাইয়া দিয়াছেন তাহা আদৌ দীন বা হীন নহে। ডাক্তার দীনেশ বাবু তাঁহার সুদীর্ঘ ভূমিকার উল্লেখ করিয়াছেন;—“এই অপূর্ণ জিনিস বঙ্গ-সাহিত্যে অদ্বৈত। বঙ্গসাহিত্য পৌরাণিক উপাখ্যান-গুলিতে সংস্কৃত শব্দের সোনালী চুম্বকি দেওয়া বেণারসী চেলী পরিয়া ঝলমল করিতেছে—কিন্তু পাঁড়া গায়ের এই সরল কথা, যাহাতে সংস্কৃতের একটুকুও ধার করা শোভা নাই, যাহা নিজ স্বাভাবিক রূপে অপূর্ণ সুন্দর,—তাহার নমুনা আমরা কোথায় পাইতাম। নানা দিক দিয়া এই সকল পল্লী গাথায় খাটি বাঙ্গালী জীবনের অফুরন্ত সুখা অচিন্ত্যপূর্ণ মাধুর্য্য ব্যরিয়া পড়িতেছে। ইহা স্বর্গ হইতে আহৃত অমৃতভাণ্ডার নহে, ইহা আমাদের দেশের আম গাছের মোচাক এজ্ঞ এই খাটি গধুর আশ্বাদ আমাদের নিকট এত ভাল লাগিয়াছে। চন্দ্রকুমার বঙ্গসাহিত্যের নিজ ভাঁড়ার ঘরের সন্ধান দিয়াছেন, উহা হোটেলের মসলা দেওয়া মুখরোচক বিলাস খাণ্ডসম্ভার নহে উহা আমাদের পল্লী—অল্পপূর্ণার শ্রীকর কমলের দান—জীবনদায়ী অল্পব্যঞ্জন।” বাস্তবিকপক্ষে অবজ্ঞাত অশিষ্ট (?) ভাষার অনাড়ম্বর সরলতায় পল্লীলক্ষ্মীর দরদভরা প্রাণের খোঁজ মিলিয়াছে।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে ১০টি উপাখ্যানের মধ্যে এক কাজল রেখা (রূপকথা) ব্যতীত সবগুলি যথার্থ ঘটনা ও ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত। পল্লী কবিগণ কাল্পনিক আজগুবী ঘটনার অবতারণা করিয়া সাধারণের মনোরঞ্জন চেষ্টা করেন নাই। তাঁহাদের নিকট উপাখ্যান সম্বলিত ঘটনার

দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না। সময় ক্রমে সে সব দৃষ্টান্তের অভাব হইয়াছে এবং তৎসম্বলিত গানও গাহিবার লোকের অভাব হইয়াছে। কবিগণ আখ্যায়িকার প্রতিমার দর্শন ও সন্ধান যে তাঁহাদেরই কুটীরে পাইয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। গ্রামের অনেক প্রভাব প্রাচীন কবিদের মধ্যে দেখা যায়। চিত্রকর যেমন চিত্রশালের আদর্শ লইয়া অঙ্কন ও নয়নরঞ্জন স্বাভাবিক বর্ণ সন্নিবেশ ও উহার প্রতিকলনে কোশল প্রদর্শন করিয়া থাকেন, কবিগণও সেইরূপ এক একটি ঘটনা আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া স্বরচিত গ্রন্থে সেই সমস্ত ভাব পরিস্ফুট করিয়া থাকেন। ডাক্তার দীনেশচন্দ্র তাঁহার সুদীর্ঘ ভূমিকায় উপাখ্যানগুলির কাল ও স্থান নির্দেশ করিয়াছেন, এমন কি প্রথম খণ্ডে মানচিত্র সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ঐ সমস্ত ঐতিহাসিক নির্দেশনের অধিকাংশগুলি এখনও লোকচক্ষুর অগুরাল হয় নাই।

নিরক্ষর কবিগণ সরল বাঙ্গালা কথার উদ্দীপনার ছন্দে হিন্দুসমাজের যে আনন্দময় মর্ম্মস্পর্শী অভিনব চিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা শ্রাবণের নদীপ্রবাহের গায় শক্তি ও ক্ষুধিতে ভরপুর হইলেও তাহার মধ্যে ঘেচ্ছাচারিতা ছিল না। এই গাথার মধ্যে নারী ধর্ম্মের যে জীবন্ত মূর্তিগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাদের পাতিব্রত্য বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, বিপদে দৈন্য উপায় উদ্ভাবনায় এবং একনিষ্ঠতায় তুলনা কোথায়? প্রত্যেকের চরিত্র সমাজের উপর অল্প প্রভাব বিস্তার করে নাই। মহয়া জীবনে শত দুঃখ অকাতরে সহ করিয়া যে প্রেমের মুক্তাহার কণ্ঠে পরিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছে সে নির্ভীক প্রেমের তুলনা মিলে না। সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি মহয়া হুখে দুঃখে সমভাবে থাকিয়া শাপগ্রস্তা লক্ষ্মীর গায় অতল জলে নিমজ্জিত হইয়া আমাদের অন্ধ অনুদার পল্লীসমাজের চক্ষু যেভাবে ফুটাইয়া গিয়াছে তাহা যেমন প্রাণস্পর্শী সেইরূপ আদর্শমূলক। কঙ্কের অদর্শনে লীলার শোকাচ্ছন্ন ও লীলার লীলাবসানে কঙ্কের শোকাবেগ কঠিন পাঠকের হৃদয়েও গভীর রেখাপাত করে। প্রেম প্রত্যাখ্যাতা চন্দ্রাবতীর

চিরকুমারীব্রত পর্ব্বতের গায় অচল অটল হইলেও তার মধ্য থেকে প্রেমের পবিত্র মন্দাকিনী বারির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কমলার উপাখ্যান অনেক লেখকের মনে মসলার (plot) সন্ধান দিয়াছে। দম্ম্য কেনারামের কাহিনী পাঠে দম্ম্য রত্নাকরের কথা মনে উদিত হয় এবং অশ্রুবেগ সংবরণ করা যায় না। প্রত্যেক উপাখ্যানের চরিত্রগুলি এতই প্রাণস্পর্শী ও মনোমোহক হইয়াছে যে কোনটির বিষয় উল্লেখ না করিয়া তৃপ্ত হওয়া যায় না। এইরূপ সংক্ষিপ্ত আংশিক আলোচনা দ্বারা এইরূপ মূল্যবান কার্যের যথোপযুক্ত প্রশংসা করা ত হইই না, অধিকন্তু তাহার খর্ব্বতাসাধন করা হয়। বাহুল্যের ভয় ও লেখকের যোগ্যতার অভাব বিস্তৃত আলোচনার পরিপন্থী।

গাথা বর্ণিত উপাখ্যানগুলির মধ্য দিয়া তাবৎকালীন হিন্দু সমাজের অনেক রীতিনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের যে অন্ধ, অনুদার পল্লীসমাজের কর্তারা আজ অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ, অস্পৃশ্যতা নিবারণ প্রভৃতির কথা শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন এবং তাঁদের সাপের কৃত্রিম জীবন্ত প্রাচীন হিন্দুসমাজ অতল জলে ডুবিয়া যাইবে বলিয়া ক্ষোভে দুঃখে বর্ত্তমান শিক্ষার ও প্রবৃত্তির প্রতি দোষারোপ করেন তাঁহাদিগকে কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বের পল্লীজীবনের আদর্শ ও রীতিনীতি এই সব গাথাবলীর মধ্য দিয়া লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করি। তখন গৌরীদান আচার বিচারের চূলেচেরা হিসাব এরূপ ছোঁয়াচে ছিল না যার জগু আজ সমাজ ও জাতিরক্ষা কল্পে সর্দা আইন (বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন) প্রণয়ন কর্ত্তে হয়েছে। এই সকল গীতিকার নায়ক নায়িকাদের কাহারও বাল্যকালে পরিণয় হয় নাই। চৌদ্দ পনের এমন কি সতের বৎসর পর্য্যন্ত মেয়ে অবিবাহিতা ছিলেন। হিন্দু নারী আজন্ম কুমারীব্রত অবলম্বন করিলেও জনক জননী পিতৃপুরুষের নরক গমনের আশঙ্কা মনে স্থান দিতেন না। কুমারী ব্রত ধারিণী চন্দ্রাবতীকে তাঁহার পিতা “শিব পূজা কর আর লেখ রামায়ণ” বলিয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাকি সমাজগর্হিত ছিল? তখন সমাজে অস্পৃশ্যতা এরূপ কঠিন ও কঠোর নিগড়ে আবদ্ধ হয় নাই। যে কঙ্ক এক বৎসর বয়স হইতে

পুরো পাঁচ বৎসর পর্যন্ত চাঁড়াল মায়ের স্তন্য পান করিয়া  
চাঁড়ালের ঘরে প্রতিপালিত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণকুলতিলক  
গর্গ নিজের গায়ের নামাবলী দিয়া সেই অম্প্ৰাণ্য বালকের গা  
মুছাইয়া তাহাকে ব্রাহ্মণসমাজে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়া  
ছিলেন। বর্তমান ছুৎমার্গের যুগে তাহা সম্ভবপর হইত  
কি? চাঁড়াল মাতাকে ব্রাহ্মণসন্তান শতকোটিবার প্রণাম  
করিয়া তাঁহাকে গঙ্গা যমুনার তায় পবিত্র বলিয়া ঘোষণা  
করা ও বর্তমান যুগের পিতৃপুরুষের তক্কাওয়ালা অভিজাতা

রোগগ্রস্ত সমাজের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। বেদের মেয়ে  
মহম্মার রাঁধাভাত খাইয়াও নদের চাঁদ জাতি রক্ষা করিতে  
পারিয়াছিল। দেওয়ান সাহেবের হাকুনিতে মহম্মা হিন্দুর  
যে আদর্শ ব্রহ্মচর্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা শত  
শত আচারবিচার ও দ্রুস্ত আইন কানুনে বাঁধা বর্তমান  
যুগের কয়জন স্বেচ্ছাচারহীন (?) ব্যক্তি পারেন?

ক্রমশঃ

## সুরবাহার

শ্রীপ্রণব রায়

আজ এসেচে ফাগুন রাঙা করবীকানন,  
এই রঙিন ভোরে নীড় রচিবার ক্ষণ।  
ফুল শাখায় হের পাখী বাঁধিচে বাসা,  
মুখে মধুর গীতি বৃকে নবীন আশা :  
তবে রচনা কর মধু বাসর মিলন।

হায় মোদের এ-নীড় জানি দু'দিন পরে  
ভেঙ্গে লুটাবে ধূলায় কাল-বোশেখী ঝড়ে !  
তবু গাহ লো গীতি, ঢাল ক্ষণিক সুরা,  
হোক দু'দিন তরে প্রাণ-পাত্র পূরা :  
ওই কাজল চোখে সখি ঘনাক্ স্বপন ॥

০০

জানিনি মিলিয়ে যাবে এই ফাগুনের ফাগ,  
তোমার হৃদয় রাঙাবে ফের নবীন অনুরাগ।  
আজকে যে চাঁদ অস্ত যাবে,  
আর কি তা'কে খুঁজলে পাবে?  
কালুকে ভোরেই শুকিয়ে যাবে স্মৃতির গোলাপবাগ।

তোমার প্রাণের পান্থশালায় অনেক মুসাফির  
নতুন ফোটা কুসুম নিয়ে নিত্য করুক ভীড়।  
না-ইবা ধোরে রাখলে মনে,  
থাকুক শুধু একটি কোণে  
নীড়-বিবাগী এই পথিকের চ'লে যাওয়ার দাগ ॥

## বাতায়ন

জানতামামি। পাঠক পাঠিকাদের আমাদের নব বর্ষের সম্ভাষণ জানাই।

কালপুরুষের অক্ষমালায় আর একটি বৎসরের আবর্তন শেষ হইল—১৩৩৮ সাল তার লাভ ক্ষতির বেসাতি লইয়া অতীতের গর্ভে ঢলিয়া পড়িল। এই এক বৎসরে জাতির জীবনের উপর দিয়া অনেক আশা ও নৈরাশ্যের আলোছায়া আনাগোনা করিয়া গিয়াছে। কংগ্রেস ও সরকারে একটা সাময়িক সন্ধির ফলে গতবৎসর এমনি সময়ে একটা স্থিতি ও ভরসার ভাব সর্বত্র জাগিয়া ছিল, দেশের বাতাস যেন একটু লম্বু হইয়া আসিয়াছিল। দেশবাসীর আশা ভরসার পেটিকা হস্তে মহাত্মা যেদিন শেষ মুহূর্ত্তেও গোলটেবিলে যোগ দিবার সম্মানে যাত্রা করিলেন সে দিন অনেক আশঙ্কার মধ্যের একটু ক্ষণ আশার রশ্মি দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু অল্প বর্গশেষে শান্তির কোন সম্ভাবনাই আর দূরদিগন্ত-রেপাতেও দেখা যায় না।

স্বয়ং মহাত্মা ও তাঁহার সতীর্থগণ তাঁহাদের চিরাভ্যস্ত কারাগারে মোন তপস্যায় দুর্দিনের রাত্রি জাগিয়া কাটাইতে ছেন। কারার বাহিরেও সারাদেশ জুড়িয়া একটা নিষ্ফল কোভ ও চাঞ্চল্যের গুমোট চাপিয়া বসিয়াছে। দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশনের সম্ভাবনায় আমরা ভাবিতেছিলাম যে বুঝিবা আরার একটা বোঝাপাড়ার পথ সেখানে উন্মুক্ত হইবে, কিন্তু সরকার অন্যরূপ আশঙ্কা করিয়া সেপথ আইনের বলে বন্ধ করিয়া দিলেন। এ আঁধারে পথ কে দেখাইবে?

স্বাধীন ফিলিপাইন। ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টার পাশাপাশি নজরে পড়ে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের বিচিত্র ও করুণ কাহিনী। প্রশান্তমহাসাগর ও চীনসমুদ্রের মধ্যবর্তী এই দ্বীপপুঞ্জ অশেষ প্রাকৃতসম্পদে সমৃদ্ধ, কিন্তু এই সম্পদই তাহার কাল হইয়াছে। সভ্যতার অন্ত্রপাতে মানুষের লালসা যে কত বাড়িয়া চলিয়াছে তাহার প্রমাণ পাই

হতভাগ্য ফিলিপাইনদের ইতিহাসে। উহার লোকসংখ্যা কিস্কিদধিক এককোটি। ষোড়শশতকের শেষ চতুর্থাংশে ইহার স্পেনের বণিকদের লোন্মুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও দেশের শাসনরশ্মি ধীরে ধীরে স্পেনীয়দের হস্তগত হয়। স্পেনীয়দিগের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া ফিলিপাইন বীর আইন্যালডো বৈদেশিক শাসন পাশ হইতে দেশকে মুক্ত করিবার প্রয়াসে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বীর ১২০১ সালে আমেরিকান গভর্ণমেন্টের হস্তে বন্দী হন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ স্পেনীয়দের গ্রাস হইতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের কবলে পড়ে। এতদিনে আগুইন্যালডোর স্বাধীনতার স্বপ্ন বুঝি সফল হইল, কারণ সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের স্মৃতি হইয়াছে—এখন হইতে আট বৎসরের শেষে তাঁহারা ফিলিপাইনদের স্বাধীন সাধনার বরষরূপ স্বরাজ্য দিতে সম্মত হইয়াছেন। স্বাধীনতার যথার্থরূপ যাহারা উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে এই বস্তু একজাতি আর একজাতিকে ভিক্ষামুষ্টির ত্রায় দান করিতে পারে না। ইহাকে অনেক ত্যাগ ও তপস্যা দ্বারা অর্জন করিতে হয়। ফিলিপাইনের অধিবাসিগণের ব্রত উদ্‌যাপন হইতে চলিল—কিন্তু “ভারত তবু কৈ?”

বীরপূজা—মানবমনের অন্ধাভক্তির অর্ঘ্য যে ভূগোলের ও সংকীর্ণ জাতীয়তার জ্বরদন্তী শাসনকে অগ্রাহ্য ও অতিক্রম করিয়া চলে তাহার একটা উজ্জল দৃষ্টান্ত পাই বাঙ্গালীর গায়টে স্মৃতিপূজায়! এই সকল নাম গোত্রাতীত মহামানবের রাজচ্ছত্রতলে বিশ্বের মানব মানবী যে একত্ব উপলব্ধি করে, একদিন হয়ত প্রাচী, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ তাহারই স্বর্ণসূত্রের রাখিবন্ধনে বাঁধা পড়িবে। সেই দিনই গান্ধী বোলা রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন কায়া লাভ করিবে। সেদিন আর জাতিসঙ্ঘ গড়িয়া পরস্পর—বিবদমানজাতির মধ্যে সখ্যতা স্থাপনের বিড়ম্বনা থাকিবেনা। বিশ্বমানব সেই দিনটিরই প্রতীক্ষায় উন্মুগ্ন চাহিয়া আছে?



**চী-জাপানে।** অনেক অগ্রপশ্চাতের পর চীন জাপানে একটা আপোষের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এই ব্যাপারে গত কয়েকমাস ধরিয়া জাতিসংঘের কতগুলো নিদেঁশই না ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সে যা হোক এতদিনে যে শেষরক্ষা হইল ইহাতেই আমরা আশ্বস্ত হইলাম। জাতিতে জাতিতে যখন স্বার্থের দ্বন্দ্ব তুমুল হইয়া উঠে তখন সকল ন্যায়বুদ্ধি ম্লান হইয়া পড়ে আশা করি জাপান এতদিনে তাহার সহজ বুদ্ধি ফিরাইয়া পাইরাছে।

এসিয়ার এই দুইটি স্বাধীন দেশই একদিন গৌতমের শান্তি ও অহিংসার বাণীকে উদ্ধুদ্ধ হইয়াছিল, আজ সে প্রেম ও সান্ন্যাসের দৃষ্টি হিংসাধূলিতে আচ্ছন্ন হইল কিসে ও কেন?

**“জয়শ্রীশ্রীশ্রী শ্রী গো”**—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিমানযোগে পারস্য যাত্রা করিলেন। শাস্ত্রকারের বাবস্থা লঙ্ঘন করিয়া এই সুপরিণত বয়সেও তিনি যে তরুণ-মূলভ সাহস ও উদ্যমের পরিচয় দিতেছেন তাহা স্মরণ করিলে বিশ্বর ও গর্কের উদয় হয়। জগা মুক্ত চির নবীন মন এমন করিয়াই দেহের অপটুতাকে অগাহ্য ও জয় করে। হাকিজ ও ওমারের কাব্যকুঞ্জে বাঙ্গালার ও বিশ্বের কবি আজ অতিথি—এ এক অপূর্ব সমাবেশ। যাত্রার পাকালে কবির কণ্ঠে যে শেষবিদায়ের মূচ্ছনা জাগিয়াছিল তাহা মর্মস্পর্শ করে সন্দেহ নাই। জয়ন্তী উৎসবেও তিনি এই সুরে কথা কহিয়া ছিলেন আমরা কিন্তু কবিরকে এখনও অনেক দিন ধরিয়া দিকে দিকে ভারতীয় কৃষ্টি ও আদর্শের বাণী বহন করিতে দেখিব এই আশাই করি, তাই তাঁহারই কথায় পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিঃ—

“জয় যা রায় যা গো,

ওঠো ওঠো জয়রথে তব!”

**শোকসংবাদ** যশোহরের বংশী সন্তান রায় বাহাদুর বিজয়কৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে যশোহর বাসী আজ শোকবিহ্বল। তাঁহার কণ্ঠজীবন দেশসেবার একটা অতুল্য উদাহরণ। মৃত্যুমুহুর্ত পর্যন্ত তিনি যশোহর মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি ছিলেন। ইহার পূর্বে বহুবৎসর ধরিয়া তিনি কৃতিত্বের সহিত প্রথমে জেলা বোর্ডের সহকারী

সভাপতি ও পরে সভাপতি হিসাবে দেশসেবা করিয়াছেন। উচ্চপদবী ও খ্যাতির সহিত একপ অনাড়ম্বর অসাম্প্রদায়িকতার সমাবেশ আমরা কচিং দেখিয়াছি। আইনগীর্ষি হিসাবেও তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন। মক্কেলগণের মূখে তাঁহার সদাশয়তা, বিচক্ষণতা ও সরলতার কথা ধরিত না। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভ্রাতৃবিয়োগ প্রভৃতি কয়েকটি পারিবারিক দুর্ঘটনার ব্যথায় তাঁহার দেহমন তিলে তিলে ক্ষয় হইতেছিল, মিত্রমহাশয়ের পরিণত বয়সের শ্রেষ্ঠসেবায় নক্ষিত হইয়া যশোহরের ক্ষতি ও আক্ষেপের অন্ত নাই। আমরা ভক্তিনয়নে তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করি এবং তাঁহার মন্তপ পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

**সাহিত্যের ভূরিভোজ**—কথাশিল্পের বাহুর শরচ্ছন্দ রসিক সমাজকে পুলকিত করিয়া বিচিত্রার মারফত বহুদিন পরে আবার তাঁহার সুপরিচিত রসের পরিবেশন করিতেছেন। পথেরদাবী ও শেষপ্রশ্নে উদ্দেশ্যের গন্ধ পাইয়া বাহারা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন শ্রীকান্তের এই নব পথ্যায়ে তাঁহারা সকল ক্ষতি উত্তল করিয়া লইবেন এ আশা করিতে পারি। আশঙ্কা শুধু এই যে শেষ প্রশ্নের ন্যায় শ্রীকান্তের পালা শেষটা মাসিক না হইয়া “কালে ভদের” কোঠায় না নাগিয়া পড়ে!

**বে-পরোয়া**—ওনিয়া পুলকিত হইলাম শীঘ্রই ‘প্রবাহ’ নামে একটি মাসিকের অভ্যুদয় হইবে। আধুনিক সাহিত্যের কয়েকজন তরুণ শিল্পী হইবেন “প্রবাহের” ভগীরথ। “প্রবাহের” বিশেষত্ব এই যে কোনো মতের গণ্ডী বা বন্ধন দিয়া ইহাকে বাধা হইবে না। ইহার উদার বুক সকল শ্রেণীরই উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা স্থান পাইবে। আমরা এই “বে পরোয়া” সহযোগীর আগমন প্রতীক্ষায় রহিলাম।

**স্বাগতম**—শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় আর এক বৎসরের জগ্জ কালকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হইলেন। কংগ্রেসবিরোধী ইউরোপীয়ানগণও যে তাঁহার পক্ষে ভোট দিয়াছেন, রায় মহাশয়ের ষোগ্যতা সম্বন্ধে ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে চিফ ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ সম্পর্কে যে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ হয় যে এখনও সেই পুরাতন মনো-মালিন্যের জের চলিয়াছে! আমরা আশা করি যে রায় মহাশয়ের নেতৃত্বে এই রেবারিষি নিশ্চিহ্নভাবে মুছিয়া যাইবে।



## পুস্তকপরিচয়

**কাজল লতা**—শ্রীপ্রবোধকুমার সাহাচার প্রণীত। ১৫নং নয়ানচাঁদ দরুষ্ট্রীট, কলিকাতা মেটকাফ প্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীশশীভূষণ পাল কর্তৃক মুদ্রিত এবং ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত স্বদীপচন্দ্র সরকার কর্তৃক প্রকাশিত। দাম দেড় টাকা, ছাপা ও কাগজ ভাল।

এই লেখকের রচিত যাবাবর, নিশিপদ্ম প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠক মহলে সুপরিচিত।

আলোচ্য উপন্যাসের নায়িকা সুলতা অখ্যাত কোনো গায়ের নিতান্ত নগন্য গৃহস্থের মেয়ে, যা বাপ ছিল না। বাল্যকালে গ্রামান্তরের একটি কিশোরকে সে ভাল বাসল, কিন্তু ঐ প্রথম ও শেষ ভালবাসার চঞ্চল কিশোর একদা কোথায় উধাও হয়ে গেল—আর সে এল না—সমাজ পরিত্যক্ত আশ্রয়হীন একটি লোকের সঙ্গে সুলতার বিয়ে হল, কিন্তু সন্যাস রোগে স্বামীটি একদিন ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন। তার পর বিধবা সুলতা উকিল সত্যেনের অবিবাহিতা স্ত্রীরূপে পরে সত্যেনের আত্মহত্যার পর তাহার বন্ধু উপেনের সাহায্যে সন্যাসীর এক আশ্রমে ও তৎপরে দেবদত্ত নামক এক যুবকের আশ্রয়ে চলে গেল। পুস্তকখানি এই উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত।

সুলতার একরাস রূপ—যে রূপ প্রশংসায় বলা যায় না, বর্ণনায় বোঝানো যায় না, যে রূপ দেখিয়া রূপাভিমানিনী সন্যাসিনী হিংসাপরায়ণ হয়! এক কথায় সুলতা অপার্ণব সুলন্দরী, স্বল্পভাষিনী, করুণাময়ী, পরহুঃখ কাতর, সেবাপরায়ণা ও অপারিসীম কৃতজ্ঞ। দুর্গীতির বোঝা, কলঙ্কের কালিমা এ মেয়েটির শুভ্র নিম্নলুপ্ত মুখখানিকে মলিন করতে পারেনি, কিন্তু নিজকে বাঁচাবার মত মেরুদণ্ড তার নাই। বাইরের ঝড়-ঝাপটা থেকে-টেকে রাখবার জন্যে কোনো না কোনো একটা আশ্রয় তার চাইই। সে কারণে প্রথমে স্বামী পরে সত্যেন ও আশ্রমের মধ্য দিয়া লতিয়ে দেবদত্তর কাছে গিয়ে সে নিজের সুলতা নামের সার্থকতা দেখিয়েছে। তাই মনে

হয় বই খানির নাম কাজল-লতা না হইে সুলতা হইেও মন্দ হ'ত না। কাজল লতার অঙ্গন চোখে লাগার চেয়ে সুলতার লতানে ভাব মনে লাগে ঢের বেশী।

লেখক দেখাতে চান যে নারীত্বের সঙ্গে সতীত্বের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য নয়। পাপ যার মধ্যে নেই, দরকার হলে সে দুর্নীতি সবাই মাথাপেতে নেবে এই ধারণায় লেখক তাঁর নায়িকাকে অশেষ গুণসম্পন্ন ক'রেও সতী করবার চেষ্টা করেন নি। নারী শুধু নারী—তার জাত নেই, ধর্ম নেই, সমাজ নেই, নীতি নেই, শুধু ফোটবার জগ্গেই সে ফুটে উঠেছে। মোট কথা এই যে নারীসুলভ অল্প গুণ থাকলে সতীত্ব ও অসতীত্ব কোনো আলোচনাই চলতে পারে না। এই কথাগুলি মনে রাখলে লেখকের চিত্রিত নায়িকাকে সকলেরই ভাল লাগবে। কিন্তু সাধারণে বিশেষতঃ নীতিবিদেরা এ সকল কথা স্বীকার করবেন না তাঁহারা বলবেন দুর্গীতিই পাপ এবং সতীত্বও নারীর একটি বিশেষ গুণ এবং বাঙালী সমাজে তার প্রয়োজন আছে নচেৎ সমাজ চলে না। বাঙালী সমাজের এই সংস্কার সম্বন্ধে লেখকও বেশ সচেতন তা না হলে তিনি সুলতাকে অজ্ঞাত কুলশীলা আর তার স্বামীকে ভবঘুরে, সমাজ পরিত্যক্ত ও আশ্রয়হীন রূপে অঙ্কিত করলেন কেন?

আলোচ্য বইখানিতে উপেনের চরিত্রও বেশ ফুটে উঠেছে। উপেন সত্যেনের মজ্জল ও বন্ধু দুইই। উপেন সৌমিন, ধনী অবিবাহিত, নারীজনোচিত ভাঁজ করে শিশু দিতে দিতে রাস্তায় চলে সে এমন একটা কিছু চায় যা কোনো দিন ফুরাবে না, এমন একটা আনন্দ যার বৈচিত্র্য হারাবে না, পুরাণো হবে না। উপেন রূপে ও গুণে মুগ্ধ হয়ে মনে মনে সুলতাকে ভালবেসেছিল। নিজের সম্বন্ধে উপেন বলেছে যে কোনো রকম সত্যের ধারণা তার নেই, কোনো ধর্মবোধ নেই, সেই ভাল লোক হয়ত সে নাও হতে পারে কিন্তু মেয়েদের চোখের জল তাহাকে চিরকাল চঞ্চল

# মোহনভোষ ভাদাস

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

অভিজ্ঞ ভূতপূর্ব ক্রীড়াশিক্ষক দ্বারা পরিচালিত—

রাজা মহারাজা, কর্পোরেশন, কলেজ ও স্কুল

শিক্ষক দ্বারা পৃথপৃথকিত স্থলভে টেকসই

ও মনোরম জিনিষাদি সবববাহ

আমাদের বিশেষত্ব।

## ফুটবল ও ক্যারমবোর্ড

পত্র লিখিয়া আমাদের বিভিন্ন জিনিষের বিভিন্ন  
ক্যাটালগ গ্রহণ করুন—

ব্যাডমিণ্টন	ফুটবল	বারবেল	স্বাস্থ্যসঙ্গক্রিয় ও
টেনিস	ডাঙ্কেল	ইণ্ডিয়া ডাঙ্কেল	স্বাস্থ্যোন্নতি
ক্রিকেট	ডেভোলেপার	পুলিওয়েট	ও অগ্রাণু যাবতীয়
হকি	ক্যাবণ	দায়ামো উপকরণ	পুস্তকাদি

ব্রাঞ্চ—৩৮ ক, আশুতোষ মুখার্জি বোর্ড, ৩বাণীপুৰ  
কলিকাতা।

## চর্ম রোগের ঘৃণা স্কীনলীন

একজিমা, ছুলি, দাদ, ব্রণ, খোস, পাঁচড়া, চুলকণা হাজা  
মেছেতা, বাতের ও কাণের যন্ত্রণা, ক্ষুবে কামান বিষাক্ত ঘা,  
মাথায় টাকপড়া, চুলগুঠা, মাথা ধরা, মবা মাস, আঁচলি,  
শয্যাগত, কাটা ও পুড়িয়া যাওয়া, বিছানা বা কেটেব দংশন  
ও যাবতীয় চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ। ব্যবহারে মাত্রই  
স্থানীয় উদ্দীপনা বা উত্তেজনার শাস্তি ও হাস হয়।

মূল্য বড় শিশি ১০, মাঝারি ৫, ছোট ২ আনা।

সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যিক।

কলিকাতার প্রধান প্রধান ঔষধালয়ে  
পাওয়া যায়।

## স্কীনোলিন কেমিকেল ওয়ার্কস

৩৪নং ষ্ট্রাণ্ড রোড--রুম নং ২ এইচ ৪  
কলিকাতা

এজেন্ট—মহেশ ভট্টাচার্য এণ্ড কোং

১০ নং বনফিল্ড লেন।

# EVER READY STORE

88/1, Harrison Road, Calcutta.

Regular No 12—Rs 2-8as. Self-filling  
No 52—Rs 3-8as. Safety No 32—Rs 3-8as



Junior Rs 7.

Senior Rs 10.

Parker Model:—

The very Name of the Pen stands as an  
univalled one.

The only and reliable House for repairing  
Pens of all descriptions.

To Execute mufossil order promptly is our  
speciality.

Special concession to the mufossil Dealers.  
Apply for particulars.

## কাজল কালী

=ফাউন্টেন পেনের=

সর্বোৎকৃষ্ট কালী

ক্রাউন

সু

ক্রীম

জুতার চামড়া নরম ও স্বাস্থ্য করে।

কেমিক্যাল এসোসিয়েশন

৫৫নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা।

# ঘোষবাদাস

ম্যাকফ্যাকচারিং জুয়েলার্স।

জুয়েলার্স ম্যান্সন

১১৪নং, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।

একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্মাতা

আমরা স্বর্ণ অলঙ্কার ব্যবসায়ে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছি, কারণ আমাদের প্রস্তুত অলঙ্কার ব্যবহারান্তে আমাদের নিকট পুনরায় বিক্রয় করিলে আমরা পানমর্য বাদ না দিয়াই তাহা পুরা গিনি স্বর্ণের মূল্যে খরিদ করি।

ইহাই কি আমাদের সততাব অগ্নি পরীক্ষা নয়? হুই

৮০ আনার ট্যাম্প পাঠাইলে ক্যাটালগ পাঠাই।

## রমণীদের

নিয়মিত ঋতুই নারীর পূর্ণ স্বাস্থ্যের পরিচায়ক। যখনই ঋতু বন্ধ হইয়া যায় বা অতিমাত্রায় আসব হইতে থাকে তখনই নারীর স্বাস্থ্য ভগ্ন হইতে থাকে। অতএব যখনই ঋতু বন্ধ হয় বা অতিমাত্রায় আসব হয় ও টকরা টকরা রক্ত পড়ে তখনই ঔষধ ব্যহার করা কর্তব্য। নচেৎ মৃত্যু অনিবার্য। “মেনসল” এই রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা বিদ্যাৎ শক্তিঃ মত মাজায় বেদনা, ঋতু বন্ধ হওয়া মাথা ধরা, অজীর্ণ, প্রদর, বাধক, যুগী প্রভৃতির কীট নষ্ট করিয়া ঋতু নিয়মিত করে এবং পূর্ণ স্বাস্থ্য দান করে। মূল্য এক শিশি ২।০

**পাণ্ডার—**ইহা একটি অদ্বুত ও শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। ইহা সেবনে শুভ্রশক্তি বর্দ্ধিত করিয়া অসীম আনন্দ দান করে। এবং বল, জীবনীশক্তি অটুট অক্ষুণ্ণ রাখে। মূল্য এক বটি ১০ ডজন ৫/-

**প্রাপ্তিস্থান—সেক্সি কোং**

১৬০ ক্রশ স্ট্রীট, কলিকাতা।

## The All India Mutual FINANCING CORPORATION Ltd.

HEAD OFFICE

PATNA

Consulting Actuary

Director-In-Charge

Mr. G S Marathey Mr. B. B. Ghosh. M.A. B.L.

Issues Membership Certificate of Rs 100/ each payable by monthly instalment of Rs 2/ only.

BECOME A MEMBER AND ENJOY THE FOLLOWING BENEFITS:—

(1) Free-Cash Bonus (Death Bonus) to the heirs of deceased certificate holder according to graded scale. (2) Guaranteed return of Rs 200/—on each certificate of Rs 100/—at Maturity. (3) Financial aid to the members by way of loan on nominal interest.

WANTED—Organisers and Agents on liberal commission or salary with permanent renewal benefits.

For particulars please apply to:—

Secretary

The All India Mutual Financing Corporation Ltd.

Patna. or 15 Clive Row, Calcutta.

## কথা ও কাহিনী সাপ্তাহিকী

শ্রীরণজিৎ মিত্র সম্পাদিত

প্রতি সপ্তাহ্য মূল্য এক আনা মাত্র  
অতি-আধুনিক কথা-সাহিত্যিকদের গল্প এবং  
ছবি প্রকাশিত হইতেছে

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন ও শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী সম্পাদিত

## উত্তরা

প্রবাসী বাঙ্গালীর মুখপত্র

৪৬, ভেলুপুরা, বেনারস সিটি।

করে তোলে। সে দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয়, দুরাশাগুলোকে নিয়ে মনে মনে মালা গাঁথে—সত্যেন কর্তৃক উপেক্ষিত স্নানতাকে দেখে একদিন সে বলল “আমার অনেক দোষ আছে বুঝলেন, কিন্তু অন্যেরে বীরত্ব করবার ইচ্ছারোমো আমায় নেই।’ উপেন জানে বাঙালীর মেয়ের মেরুদণ্ড ভয়ানক দুর্বল, সে তাদের একটুও বিশ্বাস করে না। কিন্তু এই প্রণয়-বুদ্ধি দুশ্চরিত্র উপেন ঝড়ের রাতে পাড়ারগাঁয়ের নিভৃত পাঠশালা ঘরে স্নানতার সঙ্গে একত্র থেকেও যে ভাবে সংযম রক্ষা করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত সেই ভাব বজায় রেখে স্নানতাকে কাশীতে পৌঁছে দিয়ে আখ্যায়িকা থেকে চিব বিদায় নিয়েছিল তা সত্য সত্যই প্রশংসার বিষয়।

অগ্রাগ্র চরিত্রের মধ্যে শীতলা, মান্নুর মা প্রভৃতি বেশ ভাল হয়েছে।

বই খানির ভাষা ও লিখনভঙ্গী সুন্দর, কিন্তু লেখকের কল্পনা উদ্ভ্রাম, লেখনী অসংযত এবং বর্ণনা স্থানবিশেষে অশ্লীলতাব্যঞ্জক ও অস্বাভাবিক। তিনি যে ভাবে গ্রন্থের অবতারণা করেছেন এবং উপাখ্যানের ঘটনাবলী যে ভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারেন নি। কুসংস্কারমুক্ত গুণগ্রাহী বন্ধুর মুখেও শুনেছি যে তিনি বইখানি প্রথমবার পড়তে আরম্ভ করে কয়েক পাতার বেশী পড়তে পারেন নি এবং বারান্তরে পাঠ করে মোটের ওপর তাঁর ভাল লাগে নি। মেদিনীপুরের মেয়েদের সম্বন্ধে কুৎসিত ইঙ্গিত আমাদের খুব খারাপ লাগল।

বইখানিতে অনেকগুলি ছাপার ভুলও আছে।

শ্রীশবচন্দ্র বসাক

## ইঙ্গিতের অভিনব প্রস্তাবের জের ✓

চৈত্র সংখ্যায় “ইঙ্গিতে”র অভিনব প্রস্তাবের কথা পাঠক পাঠিকাগণ অবগত আছেন। মাসিক পত্রে এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ নূতন এবং ইহা “ইঙ্গিতের” গ্রাহক হইবার পক্ষে কতদূর সুবিধাজনক তাহা সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণেব বিবেচ্য।

গ্রাহক হইলে আপনি নিয়মিত কাগজ ত পাইবেনই অধিকন্তু আর একটি জীবনবীমার সুবিধাও ভোগ করিতে পারিবেন।

সাধারণের অবগতির জন্ত নিম্নমাবলী পুনরায় দেওয়া গেল :—

বৈশাখ ১৩৩৯ হইতে ষাঁহার “ইঙ্গিতে”র বাৎসরিক গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবেন তাঁহাদিগকে একটি নির্দিষ্ট জীবন বীমার সুবিধা দেওয়া হইবে।

আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে বাৎসরিক গ্রাহক হইতে হইবে। গ্রাহকগণকে নিয়মিত কাগজ পাঠান হইবে কিন্তু যে জীবনবীমার সুবিধা দেওয়া হইবে তাহার জন্য কোন অতিবিক্র চাঁদা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে দিতে হইবে না।

বাৎসরিক গ্রাহকগণের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার বৈধ ওয়ারিশগণই এই বীমার সুবিধা পাইবেন। বীমার টাকা দশ টাকা হইতে পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারিবে।

কিরূপ ভাবে “ইঙ্গিত” কর্তৃপক্ষ কোনরূপ অতিরিক্ত চাঁদা না লইয়া এই সুবিধা দিতে সক্ষম হইবেন, নিয়ে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল।

সেন্ট্রাল বিপোর্ট অনুযায়ী বৃদ্ধ, শিশু, রুগ্ন, ধবিয়া হাজার

গ্রাহকগণেব নিকট হইতে সংগৃহীত চাঁদাব এক তৃতীয়াংশ  
এই বীমাফণ্ডের জন্য জমা থাকিবে, অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ  
মাত্র ইঙ্গিতের কাব্যে ব্যয়িত হইবে।

উক্ত সঙ্কিত অর্থের এক চতুর্থাংশ বীমার হিসাব ইত্যাদি রাখার খরচস্বরূপ ব্যয়িত হইবে বাকী টাকা মৃত গ্রাহকেব ওয়ারিশগণকে দেওয়া হইবে। গ্রাহক ৭ত অধিক হইবে দাবীর টাকার পরিগণও তত বাড়িবে।

উদ্ধারণ স্বরূপ বলা যায় যে আলোচ্য বর্ষে যদি আগবা  
গ্রাহক সংখ্যা এক হাজার ধরি, তাহা হইলে আমাদের চাঁদা  
আদায় হইবে তিন হাজার টাকার কিছু কম। উহা হইতে  
ষীগা শাখার জন্য একতৃতীয়াংশ অর্থাৎ এক হাজার টাকা  
বিজার্ত রাখা হইবে।

উক্ত এক হাজাব টাকা হইতে বীমাশাখার পঞ্চ বাবদ এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ দুই শতটাকা বাদ আগাদেব হইতে মোট আটশত টাকা থাকিবে। ইহাই মৃত গাহকগণের বৈধ-  
ওয়াবিশগণের মধ্যে সমানাতঃ বণ্টন করা হইবে।

মহাশয়! “ইঙ্গিতেন” বাৎসবিক গাহক ইণ্ডিয়া ইন্ডিয়া আংশিত চাঁদ। এক টাক। পাঠাইলাম। অমুগহ কবিতা।  
আমাকে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবেন।

॥

পে:-----

প্রাথমিক

জেলা \_\_\_\_\_

\* সঙ্কল্প পাঠক পাঠিকাগণের নিকট অনুরোধ যে তাঁহারা অভিনব প্রস্তাব পড়ার পর যেন তাঁহাদেব বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনকে পড়িতে দেন এবং ইহাব উপকারিতা বুঝাইয়া দেন কারণ ইহাব বহু প্রকার বাঞ্ছনীয়।—ই:সঃ

✓ আচাৰ্য্য প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ বায়েৰ সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে জ্যৈষ্ঠ মাসেৰ “ইঙ্গিত” “প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ সংখ্যা” কৰা হহবে। ঐ সংখ্যায় আচাৰ্য্যদেৱেৰ অসংখ্য ছাত্ৰ এবং ভক্ত ৭ তাঁহাদেৰ ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্ৰদান কৰিবেন। ডাঃ নীলবতন ধৰ, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক চাক্যন্দ্ৰ ছট্টাচাৰ্য্য প্ৰভৃতি এবং মানকুমাৰী বসু প্ৰভৃতি প্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিকগণও ভক্তি-অৰ্ঘ্য উপহাৰ দিবেন।



# ইঙ্গিত

সর্বধর্ম্যানু পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।  
অহং হ্যং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥

১ম বর্ষ	}	জ্যৈষ্ঠ	}	১৩৩৯
৮ম সংখ্যা				সাল

## শেষপ্রশ্ন

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র সেন আই-সি-এস

হায়দ্রাবাদ, সিদ্ধ

২৬শে মার্চ, ১৯৩২

প্রিয় শরণ বাবু,

আমাকে বোধ হয় আপনার মনে আছে। আশা করি ভালই আছেন। আমি সম্প্রতি এই মরুভূমির দেশে বদলী হ'য়ে এসেছি। তিন বছর বসেতে ছিলুম, ছেলেপিলের অল্প বিস্ময়ে বড় ছুঁখেই ছিলুম। ছুটি নিয়ে তাদের বিলেতের স্কুলে রেখে এসে এই মরুভূমির মাঝখানে নিশ্চিত হ'য়ে বসেছি। সকলে জিজ্ঞেস করেন, ঘ'্যা, আজ কালকার দিনে বিলেতে পড়াচো? বলি, আজকালকার দিন বলেই ওদের বিলেতে রেখেছি। অথচ সিবিলিয়ান হলেও শপথ করে বলতে পারি আমি দেশদ্রোহী নই।

যাক সে কথা। সম্প্রতি আপনার 'শেষপ্রশ্ন' পড়লুম। পড়তে ভারি দেবী হয়ে গেল। লোকে যাকে বলে সাহিত্য-চর্চা তা আর করি না। বিলেতে একবার বাঙালী ছেলে-দের কাছে আপনার এ বই খুঁজেছিলুম কিন্তু পাই নি।

শ্রীমান অন্নদা শঙ্কর আপনার এই বইখানি নিয়ে অতি তীব্র এক সমালোচনা করেছেন, বলেছেন আধুনিক বাঙালী মেয়ের সঙ্গে নাকি আপনার পরিচয় নেই, আর এই বই গল্প নয়, শুধু তর্কের ম্যাজিয়ম, এ কথা শুনেছি। তার সমালোচনা পড়িনি, তবে সংবাদ পেয়েছি এ নিয়ে তার আর তার বন্ধ মণ্টুর বাক্যলাপ বন্ধ হয়ে গেছে।

আমি কত কুঁড়ে মানুষ তা বোধ করি আপনি কতকটা জানেন। কারু চিঠির জবাব দিতে গেলে আমার হুঁচার মাস লাগে। আপনার খবর অনেক দিন নিই নি, কুঁড়েমি তার অনেকটা কারণ নিশ্চয়। তবু আপনার বইখানা পড়েই আপনাকে লিখতে বসেছি, তার কারণ ওটা পড়তে পড়তে মনটা বিশেষ রকম নাড়া খেয়েছে, শুধু তাই নয়, একটু গভীর আনন্দও পেয়েছে। আপনার এ-বইখানিতে যেমন অদ্ভুত শক্তি দেখলুম, কমলের চরিত্র গড়বার কাজে আপ

নারী-প্রতিভাও তেমন অপ্রতিহত মনে হ'ল। সত্যি বটে বইখানার আগাগোড়া তর্কেতে ঠাসা। গল্প হিসেবেও একে বোধ হয় আপনি নিজেই খুব উঁচু স্থান দেন না। আর আপনি আধুনিক বাঙ্গালী মেয়ের চিত্র আঁকতে চেয়েছেন এ কথা কে বলে? আপনি যার চিত্র আঁকেছেন সে তার চেয়ে অনেক বড়, আমাদের সমাজ ও তা' নিয়ে আমাদের আত্মপ্রসাদ ও আত্মগৌরবের বিরুদ্ধে সে এমন একটা ঐকান্তিক বিদ্রোহ যার অন্তর্মুখিতা শুধু মেয়ে চরিত্রেই ফুটে উঠতে পারে এবং যার সত্যতাই তার শক্তির উৎস। শরৎ বাবু, বিদেশে থেকে থেকে আর রায় লিপে লিপে বাংলা লেখবার শক্তি হারিয়েচি, আমাদের উদ্ধার করুন। নিজের মনের ভাব ত প্রকাশ করতে পারলুম না। কমল ত শুধু তর্ক আর কথা কাটাকাটির সমষ্টি নয়, ওকে এত জ্যান্ত করলে কিসে? খুব শক্ত কাজে হাত দিয়েছিলেন আপনি। “নারীর মূল্য”র লেখক বলেই আপনি এ কাজটা নির্বিশেষে সমাপ্ত করতে পেরেছেন। অনেক দিন চলে গেছে, কিন্তু যে নারী সেদিন আপনার লেখার ভেতর দিয়ে নিজের দাবী জানিয়েছিল মনে হয় কমলের দেহে তারই পুনর্জন্ম হয়েছে। কতকগুলি মতামত নিয়ে একটা চরিত্র, বিশেষ করে স্ত্রী চরিত্র গড়া যায় না, একথা সহজেই বলা যায়। তা' গড়তে যাওয়া যতটা কাঁচা কাজ হ'ত, এক্ষেত্রে এ-রকম সমালোচনা যে তার চেয়েও কাঁচা। তবে শ্রীমান অন্নদা শঙ্কর যে ‘সবুজ পত্রের মতই কাঁচা ( “ওরে তরুণ ওরে আমার কাঁচা ) তা' ত ভোলা যায় না। যাক, আপনার ক্ষম্বে আপনারই ওকালতী করতে এ চিঠি লিখতে বসি নি।

কমলকে আপনি আশ্চর্য্য হৃন্দর করে গড়েছেন। তার বিদ্রোহ আশ্চর্য্যরকমের হৃন্দর! আমাদের সমাজের আত্মপ্রসাদের স্বচ্ছ জলাশয়ের জলে যেন হেলব ভরে সে মাঝে মাঝে মূঢ় পদাঘাত করতেই সে জল ঘুলিয়ে যাচ্ছে। এ দৃশ্য চমৎকাব। তার কথাগুলো নিষ্ঠুর ঠেকে কিন্তু অত দরদ, মনুষ্যত্বের জন্তে অত বেদনা, অস্ত্র কার বুকে আছে? জানি আপনারই দরদ দিয়ে তার এ সৌন্দর্য্য ফুটিয়েছেন। আপনার সমস্ত বিদ্রোহ এ দরদেরই ও-পিঠ। জানি উচ্ছৃঙ্খল ব'লে আপনার এক দুর্গম আছে; যারা একথা বলে তারা আপনার বিদ্রোহ বুঝবে কি করে?

পাস'ন্যাল কথা এসে পড়ল, ক্ষমা করবেন। শুধু আপনাকে জানাতে বসেছিলুম আপনার এ বইখানা আমাকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছে। মনে হয় ইচ্ছে করেই বইখানা লেখবার সময়ে নভেল লেখার কোনো নিয়মকানুন মানেন নি। তাই সে কমলের মত বিধিব্যবস্থার বাইরে গড়ে উঠেছে। সংস্কারের দাঁড়ি টানতে চায় নি বলেই এ শেষ পর্য্যন্ত একটা প্রশ্ন চিহ্নই থেকে গেছে। এ পড়ে যদি আমাদের তরুণ তরুণীদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের জীবন এমন প্রশ্নচিহ্নে পবিণত করতে পারেন তা হ'লে আনন্দের কথা হবে। আমার বিশ্বাস ‘পাকচূষণ মার্কণ্ডেলোর’ মধ্যে দাঁড়িটাকে আমরা বড় বেশী সম্মান দিয়ে ফেলেচি; ওদের যে রাজা সেটা প্রশ্নচিহ্নের ছদ্মবেশ পরে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। \*

\* পত্রখানি বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট লিখিত। শরৎচন্দ্রের অনিচ্ছা সত্ত্বেও পত্রখানি প্রকাশ করিবার জন্য আমরা দায়ী। ই: স:



# অবিচার ধারা

শ্রীঅরবিন্দ

জীবনের যত সমস্যা মানুষের চিন্তাকে বিব্রত করিয়াছে এবং বহুবিধ ও বিরোধী মীমাংসার জন্ম দিয়াছে, অমঙ্গলের সমস্যাও তাহাদের অন্ততম। যাহারা জড়াতিরিক্ত কোন বস্তুকে বিশ্বাস করিতে চাহেন না সেই যুক্তিবাদীদের নিকট এই সমস্যার কোন অস্তিত্বই নাই। তাঁহারা বলেন প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা বিবর্তনের চালে উদ্ভূত। প্রকৃতি অন্ধ ও নির্কোষ; সুতরাং ভাল মন্দের কোন ধারণা তাহার নাই। মানব মনই এই ধারণার অধিকারী—ভাল মন্দের বোধ সামাজিক বুদ্ধি প্রসূত এবং সুখ দুঃখের ধারণাও সম্পূর্ণ স্পষ্ট স্বাভাবিক রীতিতে মানুষের মধ্যে বিকাশলাভ করিয়াছে। তবে যাহারা বিশ্বাস করেন যে একটা সজ্ঞান শক্তিই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত ও বিকশিত করিয়া তুলিতেছে, তাহাদেরই এই সমস্যা—অশুভের অস্তিত্ব কেন, উদ্দেশ্যে কি?

ভগবানের মধ্যেও অমঙ্গল থাকিতে পারে ইহা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক যে ভক্তসুলভ ভাব তাহা হইতেই Maninean তত্ত্বের নানা রকমফের সৃষ্টি হইরাছে; এই মতামুসারে এত যুগ্মশক্তি বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিতেছে—কল্যাণশক্তি ভগবান আর অকল্যাণ-শক্তি শয়তান। জগতের মূলে আছে একটা সজ্ঞান অশুভশক্তি এই বিশ্বাসকে যাহারা কুসংস্কারাত্মক বলিয়া মনে করেন তাঁহারা মানুষের আপন স্বাধীনতার অপব্যবহারের মধ্যে অমঙ্গলের মূল নিহিত দেখিতে পান—মানুষই তাহার ভগবৎ বিদ্রোহের ও স্বেচ্ছাচারিতার বশে পাপের জন্ম দেয়। কিন্তু এই মীমাংসার কিছুই মীমাংসা হয় না, কারণ ইহাতে পরি-

কার ব্যাখ্যা করা যায় না যে জগতে মন্দের সম্ভাবনা আদৌ হইল কেন? বিশ্বের উৎস ও স্রষ্টা ভগবান, তাঁহা হইতেই জগতের সমস্ত পদার্থ উদ্ভূত—ভগবান সন্দেহে এই ধারণাটি যদি আমরা কাটিয়া সঙ্কীর্ণ না করিয়া ফেলি, তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে জগতের সুব্যবস্থায় ঠিক শুভেরই মত অশুভও ভগবান হইতে উদ্ভূত। আর যদি আমরা ঈশ্বরের অখণ্ড বিশ্বজনীনতাকে জোরজবরদস্তি করিয়া খণ্ডিত করি এবং আরও একজন স্রষ্টাকে স্থাপন করি, তাহা হইলে আমাদের গানিতে হইবে সে অমঙ্গল নিবারণ করার সামর্থ্য সত্ত্বেও তিনি ইহার সমর্থন করেন বা সম্মতি দেন। কারণ তিনি সর্বশক্তিমান—তাঁহার সর্বজ্ঞানময় ঐশী-বিশ্বানের নির্দেশ ব্যতিরেকে এ সংসারে কাহারও কিছু করিবার সামর্থ্য নাই। আর যদি আমরা তাঁহার অনন্তশক্তিমত্তাকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে তিনি কেবল একজন দেবতাবিশেষ (Demimrgus), একজন বড় শিল্পীমাত্র—জগতের বিভিন্ন শক্তিনিচয়ের মধ্যে চিরদিন দ্বন্দ্বরত; কিন্তু তাহাদের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নাই। এরূপ সিদ্ধান্ত একান্তই অদার্শনিক এবং সমস্ত মানবজাতির সকল অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বিরোধী। এখানেও সেই প্রশ্ন, সেই সমস্যাই থাকিয়া যায় যে, যদি তিনি সৃষ্টি না করিয়া থাকেন তবে তাহাকে অনুমোদনই বা করিবেন কেন? ভগবান যদি আদৌ থাকেন তাহা হইলে তিনিই সব—আমাদের মতে, এ বিশ্বাস হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। সবই তাঁহা হইতে উদ্ভূত—দ্বিতীয় আর কোন উৎস হইতে আসিবে

\* এই প্রবন্ধটি স্বদেশী যুগে শ্রীঅরবিন্দ সম্পাদিত সাপ্তাহিক “কর্মযোগীনের” “The Principle of Evil” নামক মূল প্রবন্ধের একটা অদৃশ্য অনুবাদ। “The Principle of evil” প্রবন্ধটি বর্তমানে মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের “The need in nationalism” পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত। জীবনে সুখদুঃখ সমস্যার যে অপূর্ণ সমাধান ইহাতে আছে তাহা বাঙ্গালী পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিবার লোভ সঞ্চার করিতে পারিলাম না। আন্তরিক এবং জিজ্ঞাসু পাঠক যাদেরই ইহাতে মূর্তন আলোকের সন্ধান পাইবেন।

সমস্তই তাঁহার মধ্যে অবস্থিত—আর দ্বিতীয় কোন সত্ত্বায় বা আশ্রয়ে থাকিতে পারে? সুতরাং অমঙ্গলও তাঁহা হইতে সত্ত্বাত এবং তাঁহাতেই বিদ্যমান। তিনি সর্বজ্ঞ, সমুদয় জ্ঞানই তাঁহাতে নিহিত; এই অবিজ্ঞাশক্তিও তাঁহাতে কোন সর্বজ্ঞসুন্দর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রহিয়াছে। তিনি প্রেম-ময়, সুতরাং কল্যাণের পরিপন্থী কোন জিনিষের সেবায় নহে—তাঁহা মঙ্গল সাধনের জন্যই রহিয়াছে। তবে কথা এই, তাঁহার জ্ঞান অনন্ত, আমাদের সান্ত্ব, তাঁহার সম্পূর্ণ, আমাদের অপূর্ণ। তাঁহার প্রেম অসীম জ্ঞানময়, আর আমাদের প্রেম সক্ষীর্ণ ও অজ্ঞানাত্মক; মায়াচ্ছন্ন জ্ঞান আর সাময়িক সুখের, তৃপ্তির উপর আসক্তিই আমাদের এই অন্ধ অবোধ প্রেমকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। ভগবানের প্রেম দেশকালাতীত, সুদূরপ্রসারী, আর আমাদের দৃষ্টি ক্ষণিকের মধ্যে নিবদ্ধ।

সাক্ষাৎ অমুভবই সকল খাঁটি জ্ঞানের ভিত্তি হওয়া উচিত, কিন্তু সে অমুভব আবার খাঁটি উপলব্ধির দ্বারা আলোকিত হওয়া চাই—ভাষাভাষা ইন্দ্রিয় স্পর্শের দ্বারা পরিচালিত অমুভব হইলে চলিবে না। যে মন সর্বতোভাবে শাস্তিকে আলিঙ্গন করিয়াছে, জীবনের রূঢ়তম আপদে সস্তাপ দুর্ভোগে আপন ঐশ্বর্য বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছে, কেবল তাঁহার অমুভবই বরণীয়। যে মন ধীর নয়, দুঃখ শোকের অধীন, যাহা আবেগ আসক্তির প্রভায় চিন্তা করিয়া চলে সে আবেগ আসক্তি যত উচ্চাঙ্গের হোক না কেন—এরূপ মন কোনদিনও সত্যজ্ঞানে উপনীত হইতে পারে না। ভাবাবেগ হৃদয়ের ধর্ম—ইহা বুদ্ধিকে যেন অভিভূত না করে; বুদ্ধির প্রকৃত কাজ লক্ষ্য করা, বুঝা—সংস্কার অথবা আবেগের দ্বারা কিঞ্চিৎমাত্রও আচ্ছন্ন হওয়া বুদ্ধির পক্ষে কর্তব্য নয়। “ধীর” ব্যক্তি প্রত্যেক ঘটনাটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখেন এবং ঘটনার চরম উদ্দেশ্য ও পরিণতি কি তাহা তৎক্ষণাৎ দেখিতে না পাইলে, সেইজন্য ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করেন। এইরূপ প্রতীক্ষায়, ধীরভাবে এইরূপ বিবেচনার ফলে তাঁহার মনে জীবনের অর্থ ফুটিয়া উঠে—তিনি দেখেন ভালমন্দ; ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত ঘটনা ও বস্তুর মধ্যে এক অনন্ত উদ্দেশ্য আপনাকে ব্যক্ত করিতেছে। সহস্র সহস্র প্রাণীকে নিরাশ্রয়

নিঃশ্ব করিতেছে যে বন্যা তাঁহার মধ্যে, নগর পট্টন বিধ্বস্ত করে যে ভূমিকম্প তাঁহারও মধ্যে এমন কি ক্ষুদ্র পক্ষীটির পতনের মধ্যে এবং পিপীলিকাটিরও মৃত্যুর মধ্যে এক সর্বজ্ঞ বিধাতার বিধান প্রকটিত। একাধারে ক্ষুদ্র ও শিবের প্রকাশ চলিতেছে। যোগী সর্ব বস্তুতে কেন, সর্বঘটনায় ঈশ্বর দর্শন করেন। ভগবান বন্যা, তিনি ভূমিকম্প, উচ্চস্তর জীবনে উন্নীত হইবার যে মৃত্যু তাহা তিনি বৃহত্তর আনন্দ লাভের উপায়স্বরূপ বেদনাও তিনি। ইহা যুক্তি তর্কের বিষয় নহে—ইহা দেগিবার, বুঝিবারই বিষয়—পরিপন্থিত ধীরাঃ। এই দৃষ্টি ধীর স্থির অন্তঃকরণের এবং অবিস্মৃদ্ধ বুদ্ধির পক্ষেই সম্ভব।

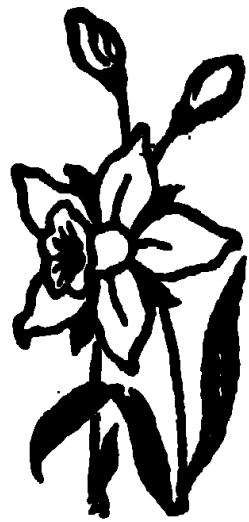
জড়বাদী যখন বলেন যে, ভালমন্দ দুইই প্রকৃতির ক্রিয়া, প্রকৃতি নিরপেক্ষভাবে কোন প্রভেদ না করিয়া উভয়কেই তাহার কাজে ব্যবহার করিয়া চলিয়াছে, এই প্রভেদ ক্রম-পরিণামের ফলে মানব মনে উদ্ভূত—তখন তিনি ভুল করেন না। মহত্তর কল্যাণকে গড়িয়া তুলিবার জন্য যে কল্যাণ ভাঙ্গিয়া গড়িতেছে ( Evil is good One goes to the bad to disintegrating for higher good ) তাহারই নাম অকল্যাণ এখন যাহাকে আমরা বলি অত্যাচার, মানব সমাজকে দৃঢ় গঠিত করিবার জন্য এক সময়ে তাহারই প্রয়োজন ছিল। সমাজের যে অবস্থা এক সময়ে আদর্শোচিত ছিল, এখন আবার তাহাই হয়ত অকল্যাণকর ও অশিষ্ট সুলভ বলিয়া পরিগণিত। মানবজাতির মধ্যে দিব্য ও ভাগবত ভাবের পূর্ণতর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নীতির উন্নতি হইতেছে, ধর্মেরও প্রসারতা বৃদ্ধি পাইতেছে। অমঙ্গল মঙ্গলে নিঃশেষ হইয়া মঙ্গলই হইয়া উঠিতেছে; ক্ষুদ্রতর কল্যাণকে পরিবর্তন করিয়া যাহাতে মানুষ বৃহত্তর কল্যাণে উঠিয়া যাইতে পারে সেই জন্যই অকল্যাণের আবির্ভাব—এই সত্যটি ব্যষ্টির পক্ষেও যেমন, একটা জাতি ও জগতের পক্ষেও তেমনই প্রয়োজন।

তবুও কিন্তু দুঃখ সমস্যাটি থাকিয়া যায়। মহত্তর কল্যাণ সাধনের জন্য ব্যষ্টির জীবনে দুঃখ যন্ত্রণা কি একান্তই প্রয়োজনীয় ছিল? এক সময়ে দুঃখ যন্ত্রণাবোধের ক্ষমতা মানুষের জীবনে বর্তমানকাল অপেক্ষা লক্ষগুণ কম ছিল—এত কম



ছিল যে তাহাকে “কিছু না” বলিলেও অত্যাঙ্কি হয় না। ইহা একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে মানুষের আধার তাহার গঠনে যতই একটা সৌকুমার্য লাভ করিতেছে, মাজ্জিত হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার রোগ শোক, যন্ত্রণার অনুভূতিও ততই তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। বস্তুতঃ ইহা প্রগতির একটা সাময়িক ধাপ মাত্র—একটা উচ্চতর জাতিকে দুঃখ যন্ত্রণাভীত অবস্থায় উন্নীত করিয়া একটা উচ্চতর সুখ শান্তিলাভের সমর্থ্য দিবার নিমিত্ত ইহার প্রয়োজন। নিম্নতরস্তরে মানুষের আধার ছিল রুঢ় উপাদানে নির্মিত—এই রুঢ়তার কল্যাণেই দুঃখ শোকের সংস্কার গুলিকে প্রতিরোধ করিত, দুঃখকে দুঃখ বলিয়া জানিত না বলিয়াই সে দুঃখ হইতে মুক্তি পাইত। কিন্তু ভবিষ্যতে মানবজাতি পাইবে যে উচ্চতর পদবী তাহা এইরূপ ব্যবস্থার নিম্নে থাকিবে না—ইহার একধাপ উর্দ্ধেই উঠিবে। ভালমন্দের জ্ঞানই ত সংসারে শোক ও পাপ আনিয়া দিয়াছে; সেই জ্ঞান অতিক্রম করিয়া গেলে তবে মানুষ শোক পাপের অতীত হইতে পারিবে। জ্ঞানফল আশ্বাদনের পূর্বে মানুষ ছিল পশুর ন্যায় নিম্পাপ; আবার যখন সে-ফল আশ্বাদনে বিরত হইবে তখন সে লাভ করিবে দেবতার নির্মলতা। বস্তুতঃ কথা কি ইহা নয় যে সৃষ্টির মধ্যে দুঃখ একটা সম্ভাবনা এবং তাহার ক্ষয়সাধন প্রয়োজন ছিল। এই উদ্দেশ্যে মানুষকে গ্রহণ করা হইয়াছে আশ্রয়, অন্তরূপে যাহাকে ধরিয়া ব্যাধিটি সঙ্কীর্ণ দেশকালের মধ্যেই প্রকাশ পাইতে পারে ও ভোগের অবসানে সমস্ত সৃষ্টিকেই পূর্ণ নিরাময় করিয়া দিয়া যাইতে পারে। এইভাবে দেখিলে “ক্রশের উপর মানবপুত্র” এই খুষ্টানতর এক নূতন অর্থ গ্রহণ করে; এবং স্বয়ং মানুষই হয় বিশ্বের খুষ্ট।

আর একটা প্রশ্ন স্বতঃই উঠে। দুঃখটা প্রকৃত না, ছায়া। বৈদান্তিকের বিশ্বাস যে আত্মা ভগবানের অর্ধাৎ পরমাআর একটা অংশ, কিম্বা, ভগবানের সহিত এক-অভিন্ন, সেই জন্য আনন্দ, কেবল আনন্দ ব্যতিরেকে দুঃখ শোক অনুভব করিতে পারে। জীব বা আত্মা সকল বৈতের রস—হর্ষ গ্রহণ করে এবং উহাই তাহার স্বভাবে আনন্দে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু আত্মার এই ক্রিয়া অজ্ঞানের আবরণে আচ্ছাদিত; অজ্ঞানই জীবের স্বরূপকে হৃদয় মন হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। দুঃখটা হইতেছে অভাবাত্মক (negative) বিকার—মনের মধ্যে আসিয়া সত্য উপলব্ধি যে রকমে দূষিত হইয়াছে; আর সুখ হইতেছে ভাবাত্মক (Positive) বিকার। আসল সত্য হইল আনন্দ কিন্তু এই জ্ঞানের জন্য মানবজাতি আজও প্রস্তুত হয় নাই। কেবলমাত্র যোগীরাই এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন এবং সুখে দুঃখে, ভালমন্দে, সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যে সম-নির্বিষ্কার থাকিয়া থাকেন। উভয়ের স্পর্শ হইতেই ইহার রস গ্রহণ করিয়া থাকেন, উভয়েই তাঁহাদিগকে দেয় আনন্দ; কারণ তখন মন ও আত্মার অন্তর্ভুক্তি আচ্ছাদনটা অপসৃত হইয়াছে; বাহ্য মানুষটি তাহার স্বরূপের সহিত এক হইয়া যায়। সমগ্র মানবজাতি যদি এই জ্ঞানের সহিত অকালে পরিচিত (Come too early by that knowledge) হইত, তাহা হইলে পূর্ণ মঙ্গল্যের গতি হইত বিলম্বিত। তাহা হইলে দয়া ও প্রেমের চরম মাধুর্য্য বিশ্বলীলা হইতে কোন দিনও নিঃসৃত হইতে পারিত না।



# প্রার্থনা

শ্রীকৃষ্ণনাথ মিত্র

হয়ত' কখন মধুর হেসে

দাঁড়িয়েছিলে পথের পাশে,

তাইতে কি গো পরশ তোমার

ছাড়িয়ে গেছে মলয় শ্বাসে ?

হয়ত' কখন কথার ছলে

ভ্রান্ত আমায় গেছ ছ'লে—

না-জানা মোর সেই অপরাধ

হবে কি শোধ নয়ন জলে ?

ভবের হাটের বেচা কেনা

পাওনা যে মোর শুধু দেনা ।

এবারকারের বেসাতি মোর

হবে শুধুই তোমায় চেনা ।

ঐ ত শুনি তোমার বাঁশী,

কই গো তবে তোমার আলো

অন্ধকারেই যেতে হবে—

সেই ভাল মোর সেই ত ভাল ।

দিশা হারা, সীমা হারা,

স্তব্ধ গভীর মলিন সাঁঝে,

মোহন বাঁশীর রেশটি শুধু

বাজিয়ে যেও প্রাণের মাঝে ।

নাও কেড়ে নাও চোখের নেশা

যাক্ নিভে ঐ সূর্য্যভাতি,

পথ দেখাবে আমায় আবার

অনুরাগের রঙীন বাতি ।

শুনতে দিও মোহন বাঁশী

আলো না হয় নাই বা দেখাও,

বারেক তোমার পরশ দিও

বসতে কাছে যদিই না দাও ।

# আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কথায় বলে “চাষার আদর কাণ্ডের ঠোকর।” নিতান্ত গ্রাম্যলোকের কাছে অপরের প্রতি উপদ্রব করে তাকে বিব্রত করাটা খুবই হাস্যোদ্বীপক হতে পারে বটে, কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে হাস্যরস সৃজন করা হয় সে বেচারার দুর্বলতার আর সীমা থাকে না। পিচ্ছিল রাস্তায় যদি কেউ চিৎপাত হয়ে পড়ে যায় তা হলে ব্যাপার চারদিকের লোকের কাছে খুবই উপভোগ্য হতে পারে কিন্তু যে বেচারী পড়ে গেল তার পক্ষে যে মোটেই উপভোগ্য নয় তা ভুক্তভোগী মাত্রেই স্বীকার করবেন।

আলঙ্কারিকেরা বলেন বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাব প্রভৃতি কয়েকটি ভাবের সমষ্টির নাম রস। রস কথাটার কোনও ভিন্ন অর্থ নাই। রস আবার নয় রকমের—হাস্য-রস সেই নব রসের একটি। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে হাস্য-রস সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে হাস্যরস বলতে আমরা কি বুঝি তা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া আবশ্যক। যা হাসির উদ্বীপক তাই কি হাস্যরস? বাস্তব জীবনের হাস্যরস এবং সাহিত্যের হাস্যরস এক নয়। গোপালভাঁড়ের ভাঁড়ামী হাসির উদ্বীপক সন্দেহ নেই কিন্তু তা বলে কি সেই ইতর ভাঁড়ামীগুলোকে সাহিত্যের আসরে স্থান দেওয়া যেতে পারে? প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে দেখি যে অশ্লীল রচনাকে হাস্যরস বলে চালাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সাহিত্যে ফাঁকি বেশীদিন চলে না। প্রাচীন সাহিত্যিকদের ফাঁকিও ধরা পড়ে গিয়েছে। বিদ্যাসুন্দর কাব্যে সুন্দরের রাজসভায় বক্তৃতাতেও এই ফাঁকি দেবার চেষ্টা চলেছে। সুন্দরের—

“শুন শুন ঠাকুর শুন শুন ঠাকুর।  
আমার পিতার নাম বিজ্ঞার শুনর।”  
বিজ্ঞাপতি মোর নাম বিজ্ঞাপতি মোর নাম!  
বিদ্যাধর জাতি মোর বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম।”

প্রভৃতি ভঙ্গ পয়ারে রচিত রসিকতা অথবা রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দরের রানী ও গর্ভবতী বিদ্যার শ্লেষপূর্ণ বাগ্‌বিতণ্ডা হয়ত সপার্বদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রাণ খুলেই উপভোগ করে ছিলেন। বঙ্গভাষার প্রথম উপন্যাস প্যারিটাদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলালের মূল্য যতই থাকুক না কেন তার হাস্যরসকে প্রকৃত হাস্যরস আখ্যা দেওয়া যায় না। এই সমস্ত অশ্লীল গ্রাম্য রসিকতাগুলি পড়ে আজকাল আমাদের হাসতেও লজ্জা করে। অশ্লীলতাকে হাস্যরসের আড়ালে ঢাকা আর আজকাল সম্ভবপর নয়। আগেই বলেছি যে কতগুলি ভাবের সমষ্টি নিয়ে রস। একলা ছানার কোন আদর নেই কিন্তু যেই ছানার সঙ্গে চিনি মিশল অমনি সেটা সন্দেহে রূপান্তরিত হল। সব জায়গাতেই তার আদর কিন্তু চিনির মাত্রা যদি একটু বেশী হয়ে গেল অমনি সন্দেহের যা মাধুর্য সব চলে গিয়ে সেটা আবার রূপান্তরিত হল চিনির ড্যালাতে। নিমজ্ঞের আসরে তার আদর নেই। কিন্তু চিনি ও ছানা দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। সেরকম হাসি রস দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। কিন্তু সমান মাত্রায় যেখানে দুটো মিশল সেখানেই প্রকৃত হাস্যরসের সৃষ্টি হ’ল। এই জিনিষটাকে সবাই প্রাণভরে উপভোগ করে থাকেন। কিন্তু যদি হাসির মাত্রা রসের চাইতে বেশী হয়ে পড়ে তা হলেই হাস্যরসের মাধুর্যটুকু চলে যায়। সাহিত্যিকের আসরে অধিক হাস্যমিশ্রিত রসের কোনও আদর নেই।

কিন্তু প্রশ্ন উঠে সাহিত্যে হাস্যরসের কোনও প্রয়োজন আছে কি? হাস্যরসের প্রয়োজন কি কেবল মাত্র পাঠককে হাসাবার জন্তই? পাঠককে হাসিয়েই যে রচনার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেল তা হাস্যরসই নয়—তা ভাঁড়ামী। ভাঁড়ামীর স্থান সাহিত্যে নেই। যে রচনা পাঠকের মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে না পারবে তার স্থান সাহিত্যের ইতিহাসে নেই। তাই গোপালভাঁড়, দৈবচন্দ্র গুপ্ত, ভারত

চন্দ্র প্রভৃতির হাস্যরসাত্মক রচনার স্থান স্থায়ী বঙ্গসাহিত্যে চিরকালের নয়।

পাগলা-ঝোরা, ফোয়ারা, সাহারা প্রভৃতির কথাই ধরা যাক। জিজ্ঞাসু পাঠক প্রশ্ন তুলবেন এই পুস্তকগুলি পাঠকের কোনও প্রয়োজনে আসবে কি?

উত্তর হল আসবে। কেননা এগুলি কেবলমাত্র পাঠককে হাসাবার জন্তই রচিত নয়। এগুলির ভিতর শিক্ষনীয় বিষয় এবং চিন্তা করবার খোরাক অনেক আছে। হাসি ও কান্না যেন দুইটি যমজ বোন—তারা এক সঙ্গে চলে। ললিত কুমারের রচনার ভেতরও এই জিনিষটির সন্ধান পাই। শক্তিশালী লেখক হাসি ও কান্না এক সঙ্গে গাঁথে গাঁথে তার কল্পনাকে এই কয়টি মালায় পরিণত করেছেন। গতীর বিষয়গুলিকেও তিনি হাস্যরসাত্মক রচনার ভেতর দিয়ে অতি নিপুণ ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এখানে হয় ত একথা বলা অপ্ৰাসঙ্গিক হবে না যে ললিতকুমারের এবং Jerome K. Jerome-এর রচনার মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কিন্তু ললিতকুমার এবং Jerome K. Jerome সমসাময়িক। অতএব ললিতকুমারের লেখা Jerome K. Jerome-এর লেখার দ্বারা প্রভাবান্বিত একথা বলা ভুল হবে। ললিতকুমারের মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের যে ক্ষতি হয়েছে তা দূরপন্থে ললিতকুমার ছিলেন হাস্যরসের ফোয়ারা। পাগলা ঝোরার জলোচ্ছ্বাসের মতো তাঁর হাস্যরসের ভাণ্ডার অফুরন্ত ছিল। ললিতকুমারের হাস্যরস উদ্দাম না হলেও বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে ললিতকুমারের রচনার মূল্য আছে। কেননা যে ধরনের রচনা তাঁর লেখনীর ভেতর দিয়ে বেরিয়েছে তা বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন। তাঁর হাস্যরস অফুরন্ত বটে কিন্তু ফোয়ারার জলোচ্ছ্বাসের মত উচ্ছ্বাল নয়, তা গঙ্গার প্রশান্ত বকের মত ধীর স্থির ও শান্ত। প্রথম দৃষ্টিতে হয় ত পাঠক তাঁর রচনার কোনও রস পাবেন না। কিন্তু একান্ত্রচিন্তা পাঠক তার ভেতরকার রূপটুকুর সন্ধান পাবেন। ফোয়ারার প্রথম প্রবলটি ঘাতে গরুর গাড়ীর সঙ্গে বাষ্পীয় যানের তুলনা করা হয়েছে—তা সত্য সত্যই উপভোগ্য। অনেককে বলতে শুনেছি যে ললিতকুমার নিজে ছিলেন মাষ্টার, তাই তাঁর রচনাতে

মাষ্টারী ফলানোর চেষ্টা খুবই স্পষ্ট। এ কথা আংশিক সত্য হতে পারে বটে কিন্তু মনোযোগী পাঠকের নিশ্চয়ই চোখে পড়েছে যে তাঁর রচনায় জিজ্ঞাসার অভাব নেই।

ককারের অহংকার, ব্যাকরণ বিভীষিকা, অমুপ্রাসের অট্টহাসি, ফোয়ারা, পাগলা-ঝোরা, সাহারা প্রভৃতি হাস্যরসাত্মক পুস্তকগুলির ভেতর দিয়া তার উদার প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরস ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। শিশুসাহিত্যও তার কাছে কম ধনী নয়। শিশু সাহিত্যে হাস্য রসের প্রবর্তন বলতে গেলে তিনিই করে যান। তাঁর ‘রসকরা’ ‘সাতনদী’ প্রভৃতি ছেলেদের জন্ত লেখা বইগুলি পাবার জন্ত এখনও ছেলেদের মারামারি করতে দেখেছি। শিশুসাহিত্যে হাস্যরসের উন্নতির পরাকাষ্ঠা আমরা দেখতে পাই স্বকুমার রায়ের লেখায়। তাঁর লেখা আবোল তাবোল ই য ব র ল ! লক্ষণের শক্তিশেল প্রভৃতি পড়ে শিশুদের বাবাকেও হাসতে দেখেছি। তাঁর অকাল মৃত্যুতে শিশু সাহিত্যের যে কতদূর ক্ষতি হয়েছে তা বলে শেষ করবার নয়। স্বকুমার বাবুর অনুসরণে কাজী নজরুল ইসলাম ‘ঝিক্কেফুল’ নামে এক শিশুদের উপযোগী কবিতার বই প্রকাশিত করেছেন। কিন্তু একথা বলা বাহুল্য যে স্বকুমার বাবুর লেখার সঙ্গে তার লেখার তুলনাই হয় না। সে বইটির রচনা অত্যন্ত কষ্টকল্পিত, তা ছাড়া স্থানে স্থানে ছন্দের গোলমালে রচনার মাধুর্য নষ্ট হয়ে গেছে। শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসুও এই দিকটা সম্বন্ধ করবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাও যে খুব সার্থক তা নয়। কিছুদিন হল তিনি “ছেলেদের তেরসিকা” নামে এক কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আমাদের মনে হত যে এই কবিতার সংগ্রহটির নাম যদি “বড়দের চয়নিকা” হত তা হলেই বইখানির নাম এবং গিরিজাবাবুর পরিশ্রম সার্থক হত। শিশু সাহিত্যকে আরও সম্বন্ধ করেছেন শ্রীযুক্ত গিরিন্দ্রশেখর বসু। তাঁর “লাল কালো” বইখানা বঙ্গসাহিত্যের গৌরব।

বঙ্গসাহিত্যে নির্মল হাস্যরসের প্রবর্তন করে যান বঙ্কিম চন্দ্র। তাঁর রচিত লোকরহস্য, কমলাকান্তের দণ্ডর প্রভৃতিতে হাসতে কোথাও আটকায় না—কোথাও জোর করে হাসি আনতে হয় না। কিন্তু সে হাস্যরসাত্মক রচনা চিন্তনীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ। সে হাস্যরস বঙ্কিম-পূর্ব বঙ্গসাহিত্যের



অসহ্য ত্রাকামী এবং অশ্লীলতা হতে মুক্ত। লোকরহস্যের প্রত্যেকটি প্রবন্ধে, বিশেষত মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে তৎকালীন বঙ্গসমাজ এবং বাঙ্গালীর যে চিত্র পাই—তা অতুলনীয়। কমলাকান্তের দপ্তরে হাসি ঠাট্টার ভিতর দিয়ে আলোচ্য প্রসঙ্গ অবতারণা করা হলেও তা পাঠককে ভাববার যথেষ্ট অবসর দেয়। তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধগুলিও গভীর। কমলাকান্তের দপ্তর এবং De Quincey's Confessions of an Opium-eater একধরনের। হয়ত বা শেষেরটির অমুসরণে প্রথমটি রচিত।

বাস্তব জগতের মত সাহিত্য জগতও ভিন্ন ভিন্ন যুগে এবং স্তরে বিভক্ত। এক যুগের ভিন্ন ভিন্ন লেখকদের রচনার ভাবভঙ্গিতে প্রায়ই একের সঙ্গে অন্যের কিছু না কিছু মিল থাকে। বাস্তব জগতের মত সাহিত্যজগতেও পূর্ববর্তী যুগ হতে পরবর্তী যুগ উৎপন্ন—তাই পূর্ববর্তী যুগ পরবর্তী যুগের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ইন্দ্রনাথের ভারত উদ্ধার নামক ব্যঙ্গ কাব্য এবং পঞ্চানন্দ মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধাবলী, দ্বিজেন্দ্র লালের হাসির কবিতা এবং গানগুলি এবং বঙ্কিমের লোক-রহস্য প্রভৃতি প্রায় একই স্তরের। তাদের আলোচ্য বিষয়ও প্রায় একই। তারা প্রত্যেকেই তদানীন্তন সমাজের গলদগুলি নিয়ে আলোচনা এবং তাদের তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন।

দীনবন্ধু মিত্র এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের হাস্যরসাত্মক রচনা যদিও অশ্লীলতা মিশ্রিত তবুও তাদের রচনার প্রশংসা না করে পারা যায় না। দীনবন্ধু বাবুর নিমিষ্টাঙ্গ চরিত্র বঙ্গ-সাহিত্যের এক অপূর্ণ সৃষ্টি। এ পর্যন্ত নিমিষ্টাঙ্গের মতো চরিত্র বঙ্গসাহিত্যের আর কোনও সাহিত্যরথী সৃষ্টি করতে সক্ষম হন নি। কালীপ্রসন্ন বাবুর 'হতুম পেঁচার নক্সা' যদিও স্থানে স্থানে অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট তবুও তৎকালীন বঙ্গসমাজের এগন নিখুঁত চিত্র এবং এরকম তীব্র সমালোচনা আর কোনও লেখক দিতে পারেন নি। বঙ্গসাহিত্যে নক্সার প্রবর্তন তিনিই করে যান! নক্সা-রচয়িতারূপে আজও তার জুড়ি মিলল না। কিন্তু আজকাল কেদার

বাবুর রচনায় নক্সা যত সাফল্য লাভ করেছেন কালীপ্রসন্ন বাবুর পর আর কারও লেখায় তত সাফল্য লাভ করে নি।

গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, কীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি নাট্য-কারেরাও তাদের নাটকের মধ্যে হাস্যরসাত্মক দৃষ্টাদি যোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু সেগুলি স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পেতে পারে না। কেন না সেগুলির প্রয়োজন অনেকটা চাটুনির মতো। নাটক যাতে করে এক ঘেয়ে হয়ে না যায় তার জন্য ঐ সব দৃশ্যগুলি মধ্যে মধ্যে ছাড় দেওয়া হয়েছে। অতএব এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করবার কোনও প্রয়োজন নেই।

বঙ্গসাহিত্যের এই অনাদৃত দিকটি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এবং শরচ্চন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায় নি। কিছু দিন আগে ভারতবর্ষে শরচ্চন্দ্রের হিউমার নামে এক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ বেরিয়ে ছিল। এবং সে প্রবন্ধের বিরুদ্ধে আলোচনাও অন্য কোনও কোনও পত্রিকাতে হয়েছিল। এখবর মাসিকপত্র-সেবী শ্রোতামাত্রেরই জানবার কথা। প্রবন্ধকার হিউমার নমুনা রূপে শরৎ সাহিত্য থেকে যে পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছিলেন তা আর যাই হোক হিউমার নয়। কিন্তু সে অবাস্তব প্রসঙ্গ এখানে অবতারণা না করাই উচিত। কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্যে হাস্যরস সম্বন্ধে আলোচনা ইতিপূর্বে যতদূর জানি হয়নি। তাই এই বিষয়টি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। রবীন্দ্রনাথ ও শরচ্চন্দ্রও নানাবিধ উপাঙ্গাস নাটক কবিতা এবং প্রবন্ধের ভেতর দিয়ে বঙ্গসাহিত্যের এই দিকটি সম্বন্ধ করেছেন এবং করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ কোতুক চিরকুমার সভা, শেষরক্ষা, শোধবোধ প্রভৃতি নাটিকা এবং ক্ষণিকা মানসী প্রভৃতি কবিতা পুস্তকের সেকাল ও একাল, হিং টিংছট, হুরস্থ আশা প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের যে বইখানা বেরিয়েছে তার মধ্যেও হাস্যরসের প্রাচুর্যের সন্ধান পাই। কিন্তু সে হাস্যরস আর চিরকুমার সভা প্রভৃতির হাস্যরস এক প্রকৃতির নয়। এখানে রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসের খোলটা ঠিকই আছে কিন্তু নল্চেটা একেবারে নোতুন। অতি আধুনিক ফ্রেঞ্চ জার্মান আমেরিকান সভ্যতার এক জাগা-খিচুড়ি বাঙ্গালী যুবক যুবতী সমাজের যে চিত্র তিনি আমাদের দিয়েছেন তার জুড়ী মেলে না

শরচ্চন্দ্রের হাস্যরসাত্মক কোনও ভিন্ন বই না থাকলেও তাঁর হাস্যরস সমস্ত উপজ্ঞানের ভেতর ছড়িয়ে আছে। তাঁর হাস্যরস কেবল মাত্র পাঠককে হাসাবার জন্ত নয়। তাদের মধ্যে একটা দুঃখ, ক্রোধ, দিনযাপনের মানি এবং নির্ধ্যাতিতের বাঁধন ছেড়ার প্রয়াসের সন্ধান পাই। স্বরেশ, কিরন্ময়ী, রমেশ, শেখর, ইন্দ্র, শ্রীকান্ত প্রভৃতি চরিত্রগুলির কথোপকথনের মধ্যে হাস্যরসের ভেতর দিয়ে এই বিষয়গুলিই আমাদের সব চাইতে আকৃষ্ট করে। শরচ্চন্দ্রের হাস্যরস নিজেকে লুকিয়ে রাখে। তাকে খুঁজে বার করে নিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস দুই রকমের। এক রকম হাস্যরস নিজেকে গোপন রাখে না। তা পাঠকের কাছে আপনি ধরা দেয়। তা পাঠককে হাসায় বটে কিন্তু তাকে চিন্তা করবার খোরাক খুব বেশী যোগায় না। আবার আর এক রকমের হাস্যরস নিজেকে এমন ভাবে গোপন করে রাখে যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাকে খুঁজে বার করা সব সময় সম্ভব হয় না। প্রথম শ্রেণীর হাস্যরসের প্রাচুর্য নাটক নাটিকাগুলির মধ্যে এবং তার মূল্যও যে খুব বেশী তা নয়। কিন্তু শেষের শ্রেণীর হাস্যরসের দৃষ্টান্ত তার উপজ্ঞান এবং পঞ্চভূত কর্তার ইচ্ছায় কৰ্ম প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির মধ্যে এবং চতুরঙ্গ প্রভৃতি কোনও কোনও গল্পের মধ্যে পাওয়া যায় এবং এইগুলিই সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে মূল্যবান, কেননা এইগুলিই ভবিষ্যৎ সাহিত্যিকের মূলধন। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের এবং শরচ্চন্দ্রের হাস্যরসের পার্থক্য।

রবীন্দ্রনাথ এবং শরচ্চন্দ্রের পরই যারা বঙ্গসাহিত্যের এই শাখাটিকে সনাক্ত করেছেন তাঁদের মধ্যে রাজ শেখর বসু (পরশুরাম), কেশবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী এবং হরিদাস হালদারের নামই সর্বাগ্রে আমাদের মনে পড়ে। হরিদাস বাবুর গোবর গণেশের গবেষণাকে ললিত কুমার এবং রাজশেখর বাবু এবং কেশব বাবুর রচনার সংযোজক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। রাজশেখর বাবুর গডলিকা কচ্ছলী এবং অন্তান্ত মাসিক পত্রে প্রকাশিত ছেলেধরা, হুম্যানের স্বপ্ন প্রভৃতি গল্পগুলি, কেশব বাবুর কোটীর ফলাফল, আমরা কি ওকে কবুলতি এবং নানা সাময়িক মাসিক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ, নক্সা এবং গল্প

গুলির স্থান বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে অমর। কোনটি বাদ দিয়ে কোন্টির নাম করব ভেবে পাই না। কিন্তু রাজশেখর বাবু এবং কেশবনাথ বাবুর রচনার ভেতরও পার্থক্য আছে। কেশবনাথ বাবুর লেখনী সামাজিক গলদগুলির বিরুদ্ধে সর্বদাই উজ্জ্বল। ধর্মের নামে সমাজপতিদের অত্যাচার অবিচার জর্জরিত পরাধীনতার অভিশাপে অভিষেক জনসাধারণের দুঃখে তার প্রাণ যে সত্যসত্যই কাঁদে তার প্রমাণ আমরা তার প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে পাই। এই দিক দিয়ে শরৎবাবুর সঙ্গে কেশব বাবুর রচনার মিল আছে। এ কথা বলা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে কেশব বাবুর রচনায় Lamb এর প্রভাব বেশ স্পষ্ট ভাবে চোখে পড়ে।

রাজশেখর বাবুর শক্তি অতুলনীয়। যে ভঙ্গীর রচনা তাঁর লেখনীর ভেতর দিয়ে বেরোচ্ছে তা বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন। তার প্রত্যেকটি রচনা ভাষার মাধুর্য্যে বক্তব্য বিষয়ের অভিনবত্বে নিজের মনের ভাবটি ফুটিয়ে তুলবার অভূতপূর্ব ক্রমতায় সমৃদ্ধ। তার রচনার একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে যেগুলিতে কোথাও ইচ্ছে করে অথবা জোর করে হাসাবার চেষ্টা মাত্র নেই অথচ জিনিষগুলি এমন ভাবে লেখা যে পাঠক না হেসে পারে না। সাহিত্যের আসরে রাজশেখর বাবু খুব বেশীদিন হল আত্মপ্রকাশ করেন নি কিন্তু প্রতিভা কখনও গোপন থাকে না। রাজশেখর বাবুর মত এত অল্প সময়ে এত সাফল্য লাভ করতে খুব কম লেখককেই দেখেছি। এঁদের সঙ্গে স্বরেশচন্দ্র সমাজপতির নামও উল্লেখ যোগ্য। অধুনা-বিলুপ্ত সবুজপত্রে প্রকাশিত স্বরেশবাবুর লেখা 'হাসি' প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধ মূল্যবান সন্দেহ নাই। হাসি প্রবন্ধটিতে তিনি হাসির যে প্রকার ভেদ এবং বিশ্লেষণ করেছেন তা সত্যসত্যই উপভোগ্য।

রাজশেখর বাবুর অশ্রু করণে আজকাল অনেক লেখক লেখনী চালনা করবার প্রয়াস পাচ্ছেন। তাদের প্রয়াস যে কতদূর সার্থকতা লাভ করেছে তা বলতে পারি না। খুব যে সার্থকতা লাভ করেছে তা নয়। এই নবীন লেখকদের নিরুৎসাহিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কেননা বঙ্গসাহিত্যের এই একটি বিশাল ক্ষেত্র প্রায় অনাদৃত

অবস্থায় পড়ে আছে। আংশিক সাহিত্য মহারথীরা এই দিকটা এতদিন অবজ্ঞা করেই এনেছেন। কিন্তু আজ তাদের এ কথা বোঝবার সময় এসেছে যে সাহিত্যের এই শাখাটি অগ্রাগ্র শাখা হতে কম প্রয়োজনীয় নয় এবং শাখাটি যত সমৃদ্ধ হয় ততই মঙ্গল, কেন না হাস্যরসাত্মক রচনা যত কার্যকরী হয় আর কিছুই তত হয় না—অবশ্য তা যদি প্রকৃতই হাস্যরসাত্মক হয়। নইলে কতগুলি ভাঁড়ামীর সৃষ্টি করে জঞ্জাল বাড়াবার কোনও দরকার নেই।

নবশক্তি, বাংলার বাণী প্রভৃতি সাপ্তাহিক গুলিতে হাস্য কৌতুক অথবা রঙ্গরস নাম দিয়ে যে চুটকিগুলি বার হয় সে গুলি আর যাই হোক হাস্যরস নয়। সেগুলি ভাঁড়ামীর

উচ্ছেদ স্থান পেতে পারে না এবং তাদের প্রয়োজনও সাময়িক। সেই তথাকথিত হাস্যকৌতুকগুলি দিয়ে চাট্‌নীর কাজ চলতে পারে বটে কিন্তু তা সাহিত্যের পরিপুষ্ট সাধন করে না।

নবীন লেখকদের দৃষ্টি আমরা এই দিকে আকর্ষণ করছি, তাঁরা এক ঘেয়ে স্নাকামীপূর্ণ প্রেমের কবিতা লিখে অথবা লিখবার চেষ্টা করে যতটা সময় এবং শক্তির অপব্যয় করেন তার কিছুমাত্র অংশও যদি সাহিত্যের এই শাখাটির পরিপুষ্ট সাধন কল্পে ব্যয় করেন তা হ'লে বঙ্গ-সাহিত্যের একটা স্বায়ী অভাব পূরণ হয়।

( হস্তলিখিত 'তরুণ' পত্রিকার সৌজন্যে )

## বাধা

শ্রীরাখাল বন্ধু নিয়োগী

বাধা যদি কোথাও থাকে মনেই সে তোর রয়,  
পাঁজির পাতেব বিধান বিহিত মিথ্যা যত ভয়।  
টিকটাকি আর হাঁচির পিছে  
সময় দেওয়া ভাবনা মিছে,  
মন যদি তোর মুক্ত থাকে সদাই হবে জয়।

অশুভ আর শুভ যত পঞ্জিকা তার বিধান দাতা,  
অর্থবিহীন আচার পায়ে গোটা জাতি নোয়ার মাথা  
বন্ধ মাঝে কুর্ম সম  
চুকিয়ে মাথা ও অক্ষয়,  
অন্ধকারের বিভীষিকাই দেখিস্ জগৎময় ?

যেদিক পানেই যাসনা কেন ইচ্ছা যে পা  
বাড়াস্ আগে,  
শুধু দেখিস যেন মনে অরুণ কিরণ পরশ লাগে,  
তুচ্ছ যত পাঁজির বাধা  
মিথ্যা হত অন্ধ আঁধা  
অশ্রেষা ও মঘায় যত দুর্বলেরি ভয়।

মুক্ত আলো মুক্ত হাওয়া জগৎ জুড়ে বইছে ওই,  
মুক্ত মানব আকাশ পাতাল উর্দ্ধ অধঃ বিশ্বজয়ী ;  
মৃত্যু মনে হৃদয় রণে  
রক্ষা করে আপন পণে,  
জয়ের মালা হস্তমুখে হেলায় কেড়ে লয়।

# মোক্ষদা

শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোট বড় সকলের সঙ্গে এমনি অমায়িক ভাবে মেলা-যেনা করিত যে মোক্ষদাকে বাদ দিয়া ছোট গ্রামটিকে কল্পনা করা বাইত না।

সেই মোক্ষদা আজ মারা গিয়াছে তাই তাহার প্রাণনে আজ আর লোক ধরে না—

বৃদ্ধ গ্রামবাসীদের জীবনের কোন সময় যে মোক্ষদা এই গ্রামে আসিয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

গ্রামের সে বাড়ীটিতে মোক্ষদা এতদিন তাহার জীবন অতিবাহিত করিয়াছে তাহা মোক্ষদার কাকার। কাকার মৃত্যুর পর আর কোনও আত্মীয় না থাকায় মোক্ষদাই ভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়া একলাই কাকার সম্পত্তি ভোগ-দখল করিয়া আসিতেছিল।

মোক্ষদার টাকা কড়ি আছে কি না এই লইয়া গ্রামের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক চলিলেও ঐ প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার মধ্যে শৃগাল-কুকুরের অবাধ গতায়াত দেখিয়া কেহই এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারিত না। অথচ এ পর্য্যন্ত কেহই মোক্ষদার গৃহ হইতে কোন দিন কোনও প্রার্থীকে বিফল হইয়া ফিরিতে দেখে নাই।—যে যখনই দুর্বস্থায় পড়িয়া মোক্ষদার কাছে সাহায্য চাহিয়াছে, মোক্ষদা তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছে। উপরন্তু যাহারা মোক্ষদার শয়ন গৃহে গিয়াছে তাহারা সমস্ত রক্ষিত একটি তোরঙ্গ দেখিয়াছে এবং তোরঙ্গটির প্রতি মোক্ষদার যত্ন দেখিয়া ভাবিয়াছে যদি টাকা কড়ি নাই থাকিবে তো অত সাবধানে রাখিবার কারণ কি?

মোক্ষদার বয়স কত জানিবার বাসনা হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু মোক্ষদার মুখের দিকে দেখিয়া তাহার বয়স কল্পনা করা কঠিন।

গ্রামের মেয়েরা প্রত্যেকেই প্রায় মোক্ষদার কাছে তাহাদের বিবাহিত জীবনের সুখ-দুঃখের গল্প করিয়াছে; মোক্ষদার

বিবাহিত জীবনের কোন গল্পই কিন্তু কেউ জানে না। কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে মোক্ষদা গম্ভীর হইয়া বাইত—বলিত আমার বিয়েই হয়নি।

সে দিন অলকাকে দেখিতে আসিয়াছিল! পাত্র পক্ষীয়েরা চলিয়া গেলে—ঘাটের মজলিসে—নিভা জিজ্ঞাসা করিল—যে তোর বর হবে, সে এসেছিল নাকি?

অলকা মুখ রাঙা করিয়া বলিল—হ্যাঁ—

নিভা বলিল—পছন্দ হোল?

‘দ্যুৎ’ বলিয়া অলকা নিভার পিটে একটি কিল লাগাইয়া দিয়া বলিল—আচ্ছা ভাই, মোক্ষ’দিকে যখন দেখতে এসেছিল তখন উ’ন কেমন সেজেছিলেন বলতো?... ঐ ফাটা-ফাটা পায়ে আলতা পোরে, উন্টো দিকে চুল টেনে খোঁপা বেঁধে, চওড়া কপাল খানাকে আরও চওড়া কোরে, পানখেয়ে ঐ মোটা ঠোঁট দু’খানাকে লাল কোরে, মোক্ষ’দি যখন তাদের সামনে গিয়ে বসেছিলেন, তখন তারা কেমন কোরে উঠেছিলো বল দেখি?

নিভা সুন্দরী এবং নববিবাহিতা, এই সেদিন স্বস্তর বাড়ী হইতে আসিয়াছে—অলকার ও-কথার কোন জবাব না দিয়া বলিল : আচ্ছা মোক্ষদিকে কি ও’র বর ফুল শয্যার রাতে আদর কোরেছিলো?

মোক্ষদার স্বামী মোক্ষদাকে ভালবাসিত কিনা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু পুরুষ জাতটার উপর মোক্ষদার যে একটা রাগ ও ঘৃণা ছিল তাহা বলিতে পারি।

ছোট ছোট মেয়েদের মোক্ষদা অত্যাধিক স্নেহ করিত আদর করিয়া এটা-ওটা খাইতে দিত কিন্তু ছোট ছোট ছেলেদের দেখিলে সে ‘দূর’ ‘দূর’ করিয়া তাড়াইয় দিত।

ছোট ছেলেদের প্রতি মোক্ষদার এই রুঢ় আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মোক্ষদা বলিত ওরা আমার পুষিকে মারে যে।



গ্রামে এমন কোনও জননী নাই যাহার প্রসববেদনার সংবাদ পাইয়া মোক্ষদা আঁতুর ঘরে উপস্থিত হয় নাই। নবাগত যদি ছেলে হইত তো মোক্ষদা তাহার হাতে একটি টাকা দিয়া তৎক্ষণাৎ কোননা কোন কাজের অছিলায় সে স্থান ত্যাগ করিত ; আর যদি মেয়ে হইত তো মোক্ষদা তাহাকে কোলে তুলিয়া, ধোয়াইয়া মুছিয়া—তাহাকে লইয়াই সমস্ত দিন কাটাইয়া দিত, স্থান-আহারের কথা মনেও থাকিত না, এবং ঘাইবার সনয় চুপিচুপি ছোট্ট হাত দুটির মধ্যে চারি টাকা পুরিয়া দিয়া বিদায় লইত।

তাহার পক্ষপাতিত্বের কারণ দ্বিজ্ঞাসা করিলে কোন জবাব না দিয়া প্রশ্ণকারিকে ধমক দিয়া বলিত এ আমার খুসী।

মোক্ষদার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইবার ষষ্ঠাংগনেক পরেই তাহার এক দূরসম্পর্কের ভাই আসিয়া হাজির হইল— নাম হরেন। অদ্ভুত প্রকৃতির এই লোকটি জগতের কিছুই যেন ইহাকে স্পর্শ করে না। চোখে জল নাই, মুখে হাসি নাই, সর্কদাই শ্রাবণের আকাশের মত গম্ভীর দেখিলে মনে হয় ওর মত নিষ্ঠুর লোক জগতে খুব কমই আছে।

হৃদয় যেন পাষাণে গড়া। সকলই হরেনের আগমনের কারণ বুঝিল। মোক্ষদার যখন আর কোথাও আত্মীয় নাই তখন, সম্পত্তির মালিক ইনি হইবেন বইকি ! তবুও সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল এতদিন এ ভাইটি ছিলেন কোথায় ?

হরেন তাহাদের কাণাঘুসা শুনিতে পাইয়া উল্টা চাপ দিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল ; কি বেয়াদপ্ এই গ্রামের লোক শুলো, আমাকে একটা খবরও দিলে না, একটা ডাক্তার দেখাবার সময় পেলাম না—বোনটা আমার বেঘোরে মারা গেল...

ভট্টাচার্য্য খুড়ো বলিলেন—কেউ কি আর জানতে পেলে যে মোক্ষদার অস্থখ হ'য়েছে ! কাল দেখলাম দিব্যি মানুষ, ঘুরে বেড়াচ্ছে...আহা ! হাঁ, তা ছাড়া ডাক্তার কি আমাদের গাঁয় আছে ভাই, ডাক্তার বোগতে ত হবিসপুরের ঐ জ্ঞান ঘোষ কিন্তু...তারপর তিনি হরেনকে বুঝাইয়া বলিলেন—

ডাক্তারের মাম শুনিলেই মোক্ষদার কেন গাভদাহ হইত

তাহা বলিতে পারেন না। ডাক্তারের নাম শুনিলেই মোক্ষদা সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইত।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে কে একজন যৌবনে ডাক্তারের এক কেলেকারীর কথা মোক্ষদার কাছে গল্প করে : ডাক্তার নাকি যৌবনে একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়া পরিত্যাগ করে ; পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, কারণ বাপ মার অজ্ঞাতেই বিবাহ করে।

গল্প শুনিয়া মোক্ষদা জলভরা চোখে সে স্থান ত্যাগ করে।

মেয়েদের প্রতি মোক্ষদার পক্ষপাতিত্ব ঐ চোখের জলের— যাক সে কথা—

জীবিত অবস্থায় মোক্ষদা, ডাক্তারকে তাহার গৃহের কাছে না আসিতে দিলেও, মৃত্যুর পর ডাক্তারকে মোক্ষদার বাড়ী আসিতে হইয়াছিল—বাধ্য হইয়াই।

মোক্ষদার গৃহে প্রবেশ করিয়া, মোক্ষদাকে দেখিয়া ডাক্তার চম্কাইয়া উঠিল। তাহার পর, বোধ হইল বহুকষ্টে দেওয়াল ধরিয়া মোক্ষদার মৃতদেহের পাশে গিয়া বসিয়া মোক্ষদার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। নিজের অজ্ঞাতেই বোধ হয় বেশ স্পষ্টস্বরে ডাকিল—‘মোক্ষদা মোক্ষদা’। ডাক্তারের ভাব কেহই লক্ষ্য করিল না, কারণ সকলেই তখন দাহ করিবার তোড়জোড় করিতে ব্যস্ত।

অন্য সকলে যখন নানা কাজে ব্যস্ত হরেন তখন মোক্ষদার সেই যত্ন-রক্ষিত তোরঙ্গটি খুলিতে ব্যস্ত। দাহ করিবার একটা খরচ আছে তো ? হরেন ভাবিল—টাকা পয়সা খরচ করার দরকার কি ? তার বাক্সর মধ্যে কত আছে তাও তো দেখার দরকার।

বাক্স খুলিয়া দেখা গেল ভিতরের জিনিষ পস্তর একটু কাগজে মোড়া। মোড়ক খুলিয়া হরেন তো অবাক ! বাক্সর মধ্যে সস্ত-বিবাহিত নববধূর পোষাক পরিচ্ছদ। চেলীর জোড়, খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে একতাড়া চিঠি মাটিতে ছড়াইয়া পড়িল—প্রত্যেকখানিই প্রেম-পত্র।

প্রত্যেক রহস্যই হরেনের কাছে জলের মত সোজা বলিয়া বোধ হইল। মনে পড়িল, যৌবনে মোক্ষদা পাড়ার এক ছুবক ডাক্তারকে ভালবাসে। মোক্ষদার পিতামাতা উহাদের

প্রথম ব্যাপার জানিতে পারিয়া, যুবকটিকে, মোক্ষদাকে বিবাহ করিতে বাধ্য করে। যুবকটিও আর কোনও উপায় না দেখিয়া, পিতামাতার অজ্ঞাতে, মোক্ষদাকে বিবাহ করে। কিন্তু ঐ বিবাহ করা পর্য্যন্তই। বিবাহের পর ডাক্তারের আর কোনও খবরই পাওয়া যায় নাই।

মোক্ষদার জীবনের গত ইতিহাস কল্পনা করিতে করিতে হরেন হাতের চিঠিগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল হঠাৎ মনে হইল যে কক্ষে মোক্ষদার মৃতদেহ ছিল সেই কক্ষে কে যেন বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল,—মোক্ষদার গলার স্বর।

ভীত হরেন দৌড়াইয়া মোক্ষদার গৃহে গিয়া দেখিল মোক্ষদা ঠিক সেই ভাবেই আছে।

কাহাকেও কিছু না বলিয়া, হরেন নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিয়া একে একে একে সমস্ত জিসিম পস্তুর তোরঙ্গর মধ্যে পুরিয়া ঢাবি বন্ধ করিয়া দিল।

মোক্ষদার মৃত দেহের সহিত চিতায় তাহার তোরঙ্গটি স্থান পাইল। কারণ জিজ্ঞাসা করায় হরেন বলিল : ঐ রকম আদেশ ছিল।

উত্তর শুনিয়া সকলে ইঁা করিয়া চাহিয়া রহিল। আদেশ ছিল বলিয়া টাকা কড়ি সমেত তোরঙ্গটি চিতায় তুলিয়া দিতে হইবে ?

## একা

### শ্রীমুকোমল বসু

একটি বিশাল আকাশের পরে একটি তারা  
একটি চাঁদেরই পাশে কেঁপে কেঁপে হ'ল সারা।  
নিশাচরী পাখী কেঁদে ফেরে বুঝি সেও বা একা  
আজিকার রাতে পিয়ার তাহার পায়নি' দেখা।  
জানালার পাশে ঝুম্‌কো ফুলের ঘন সে ঝাড়ে  
একটি সে ফুল আপনারে ধরি' রাখিতে নারে।  
বিকাশোন্মুখ একটি যে কুঁড়ি—তাহারই পাশে  
নূতন জীবন লভিয়া বুঝি বা গরবে হাসে।  
একা আমি জাগি তাহাদেরই সাথে জানালা পরে  
কি জানি একটি ব্যথা দহে মোরে—নয়ন ঝরে।

## প্রেমের তালিম

শ্রীউৎপলাসনা দেবী

শরতকাল। বেলা সবে সাতটা। মনীশ তাহার মেসের ঘরে বসিয়া পড়িতেছিল ও এক একবার, জানালা দিয়া বাহিরে চাহিতেছিল। হঠাৎ হাতের বইখানি টেবিলের উপর সজোরে নিক্ষেপ করিয়া, কোণ হইতে এসরাজটি লইয়া গাহিতে লাগিল,—

“শরতে আজ কোন্ অতিথি এলো প্রাণের দ্বারে  
আনন্দ গান গারে হৃদয়, আনন্দ গান গারে।”

এমন সময়ে কে আসিয়া তাহার হাত হইতে বাজনাটি কাড়িয়া লইয়া বলিল, “কি গো ভাল ছেলে, সকাল বেলা পড়া ছেড়ে গান গাওয়া হচ্ছে যে!”

মনীশ চাহিয়া দেখিল তাহার পাশের সিটের ছাত্র শিশির।

মনীশ অর্মান এক লাফ দিয়া গলা টিপিবাদ ভঙ্গী করিয়া থিয়েটারি, কায়দায় বলিল—

“তবেরে পাষণ্ড নরাধম! এই তোর—”

শিশির ছাড়্ ছাড়্ বলিয়া কৃত্রিম চীৎকার করিয়া উঠিল।

মনীশ তাহাকে ছাড়িয়া দিলে, শিশির হাসিয়া বলিল, “হঠাৎ এত ক্ষুর্ভি কেন?”

ঘরের মধ্যে অন্ধ ধারে অন্ধ একটি যুবক পড়িতেছিল; সে শিশিরকে বলিল, “তুমি একটি আস্ত বোকা; বুঝতে পারছনা? ২০শে তারিখে পূজোর ছুটি আরম্ভ হবে, মোটে আর ১২ দিন যে!”

ইত্যবসরে আর একটি যুবক মনীশের তেলের শিশি হইতে তেল ঢালিতে ঢালিতে বলিল, “ওরে লাভ নেই, লাভ নেই।”

শিশির হাসিয়া বলিল “কর?”

তেলের শিশিটি রাখিয়া যুবকটি বলিল, মনীশের।

পাশের যুবকটি বলিল, “আপাতত: তোমারই লাভ

নেই দেখছি যে। ছুটির কথা নয়, তোমার তেল চুরীর কথা বলছি।”

সেই জাত গেল, পেট ভরল না।

শূন্য শিশিটিতে তেল না পাইয়া ছেলেটি হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, “কি করি বল! মনীশ হতভাগা আমার জন্ত তো দু দিন অন্তর তেল কিনবে না!”

আরও গুটি কয়েক যুবক ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিল, তোমরা এত কিসের হল্লা করছ?

শিশির তাহার মুখখানিকে যথাসম্ভব গম্ভীর করিয়া কহিল; এই মনীশকে নিয়ে আমরা বড় গুরুতর সমস্যা পড়েছি।”

তাহার মধ্যে একজন বলিল, “তার মানে! মনীশ কি পড়েছে? প্রেমে না বোমারুর দলে ভিড়েছে।”

মনীশ হাসিয়া বলিল, “দুটো কাছাকাছি বটে।”

শিশির বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, প্রেমে পড়াইতো চাই আমরা, ও যে পড়ছে না, এই তো হয়েছে মুশ্কিল।”

“কেন তোমার বোন টোন কিছু আছে বুঝি?”

“তা কেন হবে, মনীশ ওব স্ত্রীর প্রেমে পড়ুক।”

ঘরের মধ্যে কয়েকটি যুবক তাহাদের চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সমস্তর চীৎকার করিয়া বলিল; “ওরে মার পাজী-টাকে মার! ফেলুক ও তিরিশ টাকা, নইলে, আজ ওকে খুনই করব। কবে চুপে চুপে বিয়ে করে এসে, বেড়াল-তপস্বী হয়ে বসে আছে; আমাদের একটুও জানায় নি।”

একজন বলিল, এই মনীশ হতভাগা। এইবার পূজার ছুটিতে আমরা তোর ওখানে যাবো, আর পাত পেতে বসে তোর বিয়ের নেমস্তম্ভ আদায় করবো আর তোর বোয়ের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিবি; বুঝলি!”

মনীশ বলিল, “তা বটে, আমার বোকে আমিই বড় দেখেছি কিনা তা তোদের দেখাব !”

তার মানে !

মনীশ চুপ করিয়া রহিল ।

শিশির বলিল, “মনীশটার বিয়ে একটা নূতন রকম ।”

কি রকম ! কি রকম ! যেন ভীমরুলের চাকে কে যেন খোঁচা দিলে । সকলে মনীশের দিকে উৎসুক নেত্রে চাহিল ।

শিশির বলিল ; “মনীশের বাবা মনীশের জীবন মরুময় ক’রে দিয়েছেন ।”

“অর্থাৎ ?”

অর্থাৎ কিনা ব্যর্থ ! ব্যর্থ ! একটি পাড়ারগেয়ে মেয়ের সঙ্গে মনীশের বিয়ে দিয়েছেন ।

“কেন মনীশ বিয়ে করলে ।”

মনীশ বলিল, “কি করি বল ! বাবার কাছে আপত্তি করতে, বাবা রেগে বলেন তোমায় তেজ্য পুত্র ক’রব, মা কাঁদতে বসে গেলেন । পরে শুন্লাম আমার বিয়ে দিয়ে তাঁরা যা পাবেন, তাতে আমার বোন শোভার বিয়ে হয়ে যাবে । কাজেই, আমি তাঁদের সব পাইয়ে দিলাম । কিন্তু দিলে হবে কি ? আমি সেই জংলীটার মুখ দেখিনি ।

একটি যুবক বলিল, “তবে সে যে অশিক্ষিতা তাই বা কি ক’রে জানলে ?”

“বাঃ, যখনই শুনেছি, তাদের বাড়ী গফরগাঁও, তখনই আমি তার সব পরিচয় পেয়ে গেছি ।”

“তুমি একটি হস্তিমূর্খ । সকলেরি জীবন অত কবিশূন্য হয় না । সে যদি সত্যই অশিক্ষিতা হয়, তবে, তাকে তুমি শিক্ষিতা করে তোল না কেন ? একটা ভুলের মধ্য দিয়ে দুটো জীবনই ব্যর্থ করে দেবে”

মনীশ বলিল, সে আমি পারব না । তাকে গড়ে তোলা শক্ত জানতো, হেমবাবু বাঙ্গালী মেয়েদের কি পরিচয় দিয়ে গেছেন ?

“দারাপাতে মূর্তিমান, চারুপাঠ পড়া

পেটের ভিতরে গজে দান্তরায়েয় ছড়া ।”

তার সঙ্গে আমার মিশ্তে হবে ? সে হ’ল গিয়ে একটা

আঙ গরু ; আর তার সঙ্গে মিশ্লে” — সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ।

মনীশ বলিতে লাগিল, জীবন পথের সজিনী যদি সমান তাহলে পা ফেলে না চলতে পারে, তা হ’লে সে মিলন স্থখের হয় না । আর এর ফলে এই হয় যে, সন্তানেরা তাদের মায়ের কাছে যা শিক্ষা পায় তাতে বংশের অসম্মান হয় । সেই পাড়ারগেয়ে নোলোকপরা মলপায়ে ঘ্যান্ ঘেনে প্যান্ পেনে মেয়েগুলোর কথা মনে হলে আগার পিত্তি জলে উঠে, বলিয়া মনীশ এমন মুগ্ধকী করিল যে তাহা দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল ।

মনীশ শিশিরকে বলিল, “আজ শরতের সকালটা আমার চোখে বড়ই সুন্দর লেগেছিল, তা তুই এসে রসভঙ্গ করলি” । শিশির বলিল, এদিকে যে শরৎরাণী ওদের ওই ছাদে বেড়াচ্ছেন । শিশিরের কথায় সকলে সম্মুখের বাড়ীর ছাদের দিকে চাহিয়া দেখিল, মনীশ চাহিয়া চক্ষু ফিরাইতে পারিল না । দেখিল একটি তরুণী আলিসার উপরিস্থ টবের গোলাপ গাছ হইতে গোলাপ ফুল তুলিতেছে । তরুণী শুধু রূপসী ! গোলাপ ফুলের মতনই যেন তাহার গায়ের রং ও গোলাপ ফুলের মতনই গঠনটি কমনীয় ।

কিয়ৎকণ পরে আর একটি তরুণী তাহার ফ্যান্সি সাড়ীর জাঁচলটি দোলাইতে দোলাইতে আগিয়া প্রথমার জাপানী ফ্যান্সানের খোঁপাটি নাড়িয়া দিয়া মনীশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল । তরুণী ঘাড় ফিরাইয়া মনীশকে দেখিল । অমনি তাহার সুন্দর মুখখানিতে কে যেন একমুঠো ফাগু ছিটাইয়া দিল । সে বিদ্যায় রেখাটির মতন ছাদের উপর হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল । দ্বিতীয় তরুণীও হাসিতে হাসিতে প্রথমার অনুসরণ করিল ।

মনীশ মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিল । উহারা চলিয়া গেলে সে ঘরের মধ্যে চাহিয়া দেখিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সকলে হাসিতেছে ।

সে লজ্জিত হইয়া শিশিরকে জিজ্ঞাসা করিল, “ইয়ারে, ও বাড়ীতে কারা এসেছে ?

শিশির বলিল, “তোমার মনে আছে আমাদের সঙ্গে বি, এ, ক্লাশে পড়তো, সুখীর ? এটা তাদের বাড়ী । আগে



ভাড়া খাটতো ; সম্প্রতি এখন ওরা নিজেরা বাস করছে ।  
আমার সঙ্গে সেদিন এসে কত আলাপ করলে ; আর  
তোকেও নিয়ে যাবে বলেছে ।’

( ২ )

সন্ধ্যা বেলা সুধীর আসিয়া মনীশ ও শিশিরকে তাহাদের  
বাড়ী লইয়া গেল ও তাহার ভগ্নী দুটির সহিত আলাপ  
করাইয়া দিল ।

বড়টি আজ যাহাকে মেসের ছেলেরা ফুল তুলিতে  
দেখিয়াছিল, সে সুধীরের কোন নিকট আত্মীয়ের কন্যা, নাম  
মণিকা । ছোটটি সুধীরের সহোদরা, নাম রমলা ।

মণিকা এই বছরে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে, আর রমলা  
এইবার ম্যাট্রিক ক্লাশে উঠবে ।

মণিকার আঁকা ও ইংরাজিতে কেমন ব্যুৎপত্তি ও সে  
শিল্প গান বাজনাও কেমন সুদক্ষ এবং রন্ধনে কি রকম  
সুনিপুণ তাহাই সুধীর মনীশের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা  
করিতেছিল, মনীশ একাগ্রমনে তাহা শুনিতোছিল ও এক  
এক বার মণিকার লজ্জাবনত মুখের দিকে চাহিতোছিল ।

রমলা বেশ সম্প্রতিভ ভাবে উহাদের সহিত আলাপ  
করিতেছিল ; কিন্তু মণিকা তাহা পারিতেছিল না, সে একটা  
চেয়ারে বসিয়া একটা মাসিকের পাতা উন্টাইতেছিল ।

কিছুক্ষণ পরে সুধীর বলিল, “ইয়ারে মনি ! আমার  
অতিথিদের তোর তৈরী কিছু খাবার এনে দে ; সেই  
পানতোয়া, ক্ষীরের কচুরী, স্যুওউইচ চপ্, কি কি যে তুই  
করেছিস ? সেই গুলো এনে দে ।”

রমলা বলিল, “সবই তৈরী আছে দাদা । আমি আনছি”  
রমলা খাবারগুলি টেবিলে সাজাইয়া চা আনিতে গেল ।

মনীশ বলিল, “আমি দুবারের বেশি চা খাইনা । চা  
আর দেবেন না আমাকে ।”

তখন সুধীর বলিল, “বেশ ; তাহ’লে ওকে আইসক্রিম  
এনে দাও ।”

এইরূপে মনীশ ও শিশিরের সান্ধ্য আসরটা সুধীরদের  
বাড়ীতে জমিতে লাগিল ।

এই ষাওয়া আসা নিম্না মেসের কয়েকটি যুবক মনীশকে

একদিন উপহাস করিল । মনীশ লজ্জিত হইয়া মনে মনে  
ভাবিল “দূর ছাই আর সুধীরদের বাড়ী যাবনা ;” কিন্তু দুদিন  
না যাইতে সুধীর আসিয়া তাহাকে বলিল, “দেখ মনীশ তুমি  
আমার বন্ধু ! তাই তোমায় জোর করে বলছি যে, মণির  
পরীক্ষা কাছে এসেছে ; এই সময় যদি তুমি ওকে একটু  
আধটু সাহায্য কর, তাহলে বড় ভাল হয় ।”

মনীশ সানন্দেই রাজী হইল ।

মণিকার পরীক্ষা নিক্ষিপে হইয়া গেল । এইবার তাহাদের  
বাড়ীতে মনীশের সম্মুখে মণিকার বিবাহের কথা  
উঠিল ।

মনীশ শুষ্কমুখে বলিল “এখন কেন বিয়ে ? আই-এটা  
পড়ুক ।”

সেদিন রাতে মনীশ মনটাকে ভারাক্রান্ত করিয়া মেসে  
ফিরিল । অনেকদিনের একটা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা, তাহার  
কাছে আজ যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিল ।

সেই প্রথম দিনই তাহার মন অজ্ঞাতসারে মণিকাকে  
তাহার হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া দিয়াছিল । এতদিন যেন  
তাহাকে একটা নেশায় পাইয়া বসিয়াছিল ; কিন্তু এতো  
তাহার ভাল নয় ।

মণিকে পাওয়ার দূরন্ত আকাঙ্ক্ষা তাহাকে যাতনা দিতে  
আরম্ভ করিল । মনকে অনেক যুক্তি দেখাইয়া বুঝাইতে  
চেষ্টা করিল ; কিন্তু আকাঙ্ক্ষার প্রবল স্রোতে তাহার সকল  
যুক্তি ভাসিয়া গেল ।

তখন একদিন নিজনে সুধীরকে তাহার বিবাহের  
আমূল ঘটনা বলিয়া বলিল, “সে জ্ঞী নিয়ে আমি কখনই  
সংসার করবনা ; কাজেই তোমরা যদি মণিকাকে আমায়  
দাও, তো আমার সমস্ত জীবন মন ধন্য হয় । মণিকে না  
পেলে আমার সকল জীবন ব্যর্থ হবে ।”

সুধীর গম্ভীর হইয়া বলিল “তোমার আর্জি আমি  
মণির বাবার কাছে পেশ করব, আর মণিও বড় হয়েছে ;  
কাজেই তার মতটাও নিতে হয় ।”

মণিকা পরীক্ষা সসম্মানে উত্তীর্ণ হইল ! গ্রীষ্মের  
ছুটির পর মনীশ আবার মেসে আসিল । সুধীর এই  
দু’মাসের মধ্যে আর কোনও খবর মনীশকে দেয় নাই ।

ইহাতে মনীশ তাহাদের অমত বুঝিতে পারিয়া, স্বধীরদের বাড়ী আর যাইবে না ঠিক করিল।

কিন্তু তিন দিন থাকিয়া চার দিনের দিনই প্রত্যুষে মনীশ স্বধীরদের বাড়ী গেল।

স্বধীর তখন দৈনিক সংবাদপত্রখানি মাত্র হাতে করিয়াছে। এমন সময়ে, এই প্রত্যুষে মনীশকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল “কি মনীশ, এত সকালেই যে, কিছু দরকার আছে?”

স্বধীরের এই প্রশ্নে মনীশ যেন লজ্জায় মরিয়া গেল। স্বধীর ডাকিল, “মণি!”

মণি আসিলে স্বধীর তাহাকে বলিল, “মনীশের জন্ম চায়ের ব্যবস্থা করো।”

মণি চলিয়া গেলে স্বধীর বলিল, “তারপর মনীশ, তোমার কি কোন অশুখ করেছে? চেহারা তোমার অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে যে!”

মনীশ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, “স্বধীর, ভাই, তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারবে না?”

স্বধীর কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল, “ও সেই কথা! হাঁ তা মণির বাবা প্রথমে রাজী হনুনি বটে সেই প্রস্তাবটায়; পরে আমি অনেক বোঝাতে বললেন, মণির মত থাকলে, আমার অমত নেই।”

স্বধীর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে আবার বলিল, “আচ্ছা আজ বিকেলে মণিকে নিয়ে আমাদের মোটরে বেড়াতে যেও, বুঝলে?”

মনীশ লজ্জামিশ্রিত হাসি হাসিয়া বলিল, “তুমি যদি অনুমতি দাও ও আমায় সহায় হও, তা’, হ’লে তো যাই-ই।”

স্বধীর বলিল, “মণির মতটা তোমার জিজ্ঞাসা করা ভাল; বুঝলে কিনা! আচ্ছা তা’হলে আজ বিকেলে এস।”

( ৩ )

বৈকালে মনীশ মণিকাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল। চোরিকীতে আসিয়া শোফার জিজ্ঞাসা করিল, “কোন্ দিকে যাব?”

মনীশ মণিকে জিজ্ঞাসা করিল, “কোন্ দিকে যাবেন?”

মণি একটু ভাবিয়া বলিল, “না, আমার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানটা বেশ ভাল লাগে।” মনীশ শোফারকে হুকুম দিল “মেমোরিয়ালের বাগানে চল।”

হ’জনে মেমোরিয়াল হলের চারিদিকে বেড়াইতে লাগিল। মনীশ মণিকে যাহা বলিবে, তাহা পূর্বেই ভাবিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু এই নির্জনে এই তরুণীকে সে সব কথা বলিতে মনীশের লজ্জা বোধ হইতেছিল। কোন্ জায়গায় কথাটা আরম্ভ করিবে তা মনীশ ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

মনীশ বারান্দায় বসিতে গাইলে, মণি বলিল, “আপান কি এই বারান্দায় বসবার জন্ম এই বাগানে এলেন? চলুন, ওই পুকুরের ধারে গাছের তলায় বসিগে।”

স্বর্গদেব তখন পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছেন সত্য! কিন্তু তাহার বিদায় বেলার শেষ চুসনের দাগ বাগানের গাছগুলি হইতে তখনও মুছিয়া যায় নাই। আশে পাশের মেঘগুলি সোনার রং এ সাজিয়া স্বর্গদেবকে বিদায়কালের অভিনন্দন জানাইতেছিল।

স্বর্গদেবের রাঙা আভা আসিয়া মণির মুখের উজ্জলতা আর একটু বাড়াইয়া তুলিল, মিষ্ট ঝিকঝিকেরে হাওয়া আসিয়া তাহার কাল রেশমের মতন চুলগুলি লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

মনীশ মণির মুখের দিকে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়াছিল। একটা ফুলের পাপড়ি ছাড়াইতে ছাড়াইতে মনীশ ডাকিল “মণি!”

এই ডাকে মণিকার গণ্ড দুটি ঈষৎ রাঙা হইয়া উঠিল। সে উত্তর করিল “কি বলছেন?”

মনীশ। “তুমি বোধ হয় সব শুনেছ?”

মণি লজ্জিত হইয়া আশ্বে বলিল, হ্যাঁ।

মনীশ “তাহ’লে তোমার কি মত? আমায় বলবে?” বলিতে বলিতে আবেগে মনীশের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল; সে মণির নিটোল হাত দুখানি ধরিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, “বল মণি বল আমার হবে? বল!”

আশ্বে আশ্বে তাহার হাত দুটি মনীশের কাছ হইতে ছাড়াইয়া মণি যখন মনীশের দিকে চাহিল, তখন তাহার মুখখানিতে একটি ছোট হাসির আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সে বলিল “আজ আমাকে বিয়ে করতে চাইছেন ; কিন্তু বিয়ের পর বলবেন, তুমি একটি গরু, তোমায় আমি স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে পারব না ।”

মনীশ মরিয়া হইয়া বলিল, বল কি মনি !

“না আপনার উপর আমার আর বিশ্বাস নেই ; আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে আমার কাছে রাখেন, অর্থাৎ তাকে আপনি স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করেন ; তবেই আমি রাজি আছি । কিন্তু সে কি আমার সঙ্গে সংসার করতে রাজি হ'বে ?”

মনীশ কিছুক্ষণ চক্ষু বিস্তারিত করিয়া, মণির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “মনি তুমি দেবী ! তুমি বুঝতে পারছনা যে, তোমার কতখানি ক্ষতি হবে ! সে অবশিষ্ট রাজি হবে, আর সে জংলীটাকে কি আর আমি রাজি করাতে পারব না । কিন্তু এককম আমি চাই না । আর আমার মনে হচ্ছে, আমার সঙ্গে রহস্য করবার জন্ত তুমি আমায় এই কথা বলছ ; নয় কি ?”

মোটের নয় । এই ব্যবস্থা না করলে আমি আপনার কথায় রাজি হতে পারব না । সে এই সর্ব্ব রাজি আছে, এই মর্মে তার নিজের হাতের লেখা চিঠি আমি চাই । তার হাতের লেখা আমি চিনি ।”

“তুমি তার হাতের লেখা কি করে চেন ? তুমি কি তাকে চেন ?”

“হ্যাঁ, আমার মামার বাড়ীর দেশে তাদের বাড়ী ।”

মনীশ বলিল, “আচ্ছা তাকে লিখবো । সেটা হলো একটা গোঁয়ো ভূত ; তাকে লিখতে ঘৃণা হয়, কিন্তু কি করব ! তোমার কথাতেই লিখব, কিন্তু তুমি ভাল ক'রে ভেবে দেখ !”

“আমার ভেবে দেখা আছে । চলুন এইবার বাড়ী ফেরা যাক !” দুজনে গিয়া গাড়িতে উঠিল ।

মনীশ বাসায় ফিরিয়া আসিয়া তাহার স্ত্রীকে এই মর্মে পত্র দিল যে, তোমায় নিয়ে কোন দিন সংসার করব এ কল্পনা আমি কোন দিনই করিনি, কিন্তু এই মহিলাটির জন্তই আমি রাজি হ'লাম । আর এতে ভাল বই মন্দ হবে না ; কাজেই তুমি আমার এ বিবাহে অমত করবে না ও তোমার ইহাতে মত আছে, ইহাই তুমি আমায় শীঘ্র জানাও ।

কিন্তু মাস খানেকের মধ্যে কোন উত্তর আসিল না । উপরন্তু আরও দু'খানি পত্র দিল, তাহারও কোনই উত্তর আসিল না ।

মনীশ এইবার প্রমাদ গণিল ।

জংলীট! যে ভাগ্যকে এই রকম জ্বল করিবে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই । এখন কি করিয়া বা সে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে ।

শুভুর বাড়ীর কত নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ সে উপেক্ষা করিয়াছে, ও তাহার পিতার কাছ হইতে সেজন্ত কত তিরস্কার গল্পনা সহিয়াছে তাহার ঈয়ত্তা নাই । নিজের বাড়ীতে তাহার স্ত্রী আসিলে সে কলিকাতায় পলাইয়া আসিয়াছে ।

এখন তাহার স্ত্রী পিত্রালয়ে । মনীশ সেখানে বিনা আমন্ত্রণেই বা কি করিয়া যায় ? কিংবা দেশে গিয়া, লজ্জার মাথা খাইয়া কি করিয়াই বা পিতাকে বলে তাহার স্ত্রীকে আনিতে । মনীশ মহা সমস্যায় পড়িয়াছে ।

এদিকে সুধীররা কি একটা উপলক্ষ্যে তাহাদের দেশে গিয়াছে, এখন যে মণির আজগুবি প্রস্তাবটা কোন রকমে বদলাইবার চেষ্টা করিবে, তাহারও যো নাই ।

( ৪ )

সেদিন সন্ধ্যার সময়ে ঘন ঘটা করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছিল । মনীশ ঘরের মধ্যে বসিয়া রবিবারের বর্ষার একটা কবিতা পড়িতেছিল । এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া বলিল, “বাবু আপনার একটা তার আছে ।”

মনীশ বসিবে সেই করিয়া রুদ্ধনিঃশ্বাসে তার খুলিয়া ফেলিল । পড়িয়া একটু আশ্চর্য হইল ।

টেলিগ্রাম তাহার শুভুর বাড়ী হইতে আসিয়াছে ; তাহার একটি শ্যালিকার বিবাহ । হঠাৎ বিবাহ স্থির হওয়ায় তাঁহারা মনীশকে পূর্বে জানাইতে পারেন নাই ।

অন্য সময় হইলে মনীশ রাগ করিয়া সেখান হুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিত ; কিন্তু আজ ইহাকেই সে অমূল্যধন ও পরম বান্ধব মনে করিল ।

( ৫ )

বিবাহ বাড়ী মহা হৈ চৈ । তাহার মধ্যেও মনীশের স্বস্তির

ক্রটি হইল না ; বরং এতটা যত্নে মনীশ কুঠা বোধ করিতে-  
ছিল। পরদিন বিবাহ।

মনীশ একটা ইঞ্জি চেয়ারে শুইয়া একখানি বই হাতে  
করিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল। জীব সঙ্গ দেখা  
করার কথা তো মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। বাড়ীর  
সকলের ভাব দেখিয়া তাহার মনে হইতেছিল, ঘুমাইতে  
যাওয়ার পূর্বে ছাড়া তাহার জীব সহিত সাক্ষাৎ হইবে  
না। কি বিপদেই না পড়িয়াছে!

১১টা বাজিলে গৃহকর্তা মনীশকে শুইবার ঘরে লইয়া  
যাওয়ার জন্ত বাড়ীর লোকেদের হাঁক ডাক দিলেন ও  
'বাবাজীর বড়ই কষ্ট হ'ল' বলিয়া নানা রকম আফশোষ  
করিতে লাগিলেন।

বাড়ীর মেয়েরা আসিয়া মনীশকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল।  
ঘরের দরজার কাছে আসিয়া যেন মনীশের আর পা উঠিতে-  
ছিল না। মনীশের রকম দেখিয়া তাহার এক অত্মীয়া  
বলিলেন, “আপনি কি আপনার অপরিচিত স্বামীর ঘরে  
যাচ্ছেন? যেমন হুকো মেয়েরা করে.” বলিয়া তিনি  
মধুর হাসি হাসিলেন।

মনীশ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতেই, বাহির হইতে  
কাহারো শিকল টানিয়া দিল।

মনীশ দেখিল, বিছানার উপর সাড়ী দিয়া আপদমস্তক  
ঢাকা একটি মানুষ বসিয়া আছে তাহাকে দেখাইতেছে  
যেন একটি পুঁটলী।

মনীশ হাসিয়া মনে মনে বলিল, “আমি এই জগুই তো  
তোমাকে ঘৃণা করি। যাক্ সারা গা ঢাকিয়া ভালই করেছ,  
এখন তোমার সঙ্গে কি করে এই ঘরে রাত কাটাৰ!”  
ভাবিতে মনীশের সারাটি গা ঘামিয়া উঠিল। পরে সে  
পুঁটলীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি নিশ্চয়ই আমার  
চিঠি পেয়েছ?”

পুঁটলী কোন উত্তর দিল না। আবার জিজ্ঞাসা করিল,  
এবারও কোন উত্তর দিল না। বার বার তিনবার জিজ্ঞাসা  
করিয়া কোন উত্তর না পাইয়া মনীশ বড় চটিল; কিন্তু  
পরক্ষণেই সামুিয়া লইল। সে বুঝিল এই পুঁটলিতে শক্ত

রকমের গিট দেওয়া আছে। পরে আবার জিজ্ঞাসা করিল  
“তবে তোমার মত নেই?”

পুঁটলী স্থির।

মনীশের মনে হইল, তখনই সেখান হইতে চলিয়া যাব।  
কী! এই জংলীটার কাছে ভিক্ষা চাওয়া! তাহার উচ্চ  
মাথা এই জংলীটার কাছে নীচু করা! কিন্তু পরক্ষণেই  
মনীশের মনশ্চক্ষে মণিকার আনন্দিত মুখ খানি ভাসিয়া  
উঠিল। বুঝিল রাগিলে সব পণ্ড হইবে। যেমন করিয়াই  
হোক ইহার মত করিতে হইবে।

সে পুঁটলীর হাত ধরিয়া অনুরোধ করিবে মনে করিয়া,  
হাত ধরিতে পুঁটলীর পায়ে হাত দিয়া ফেলিল। পর মুহূর্তে  
পুঁটলী ঘোমটা খুলিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মনীশ সবিস্ময়ে তাকাইয়া দেখিল—সে মণিকা! ঠত্য-  
বসরে শিকল খুলিয়া আশ্রয় কয়েকজন প্রবেশ করিল।  
তাহারা সকলে হোঁ হোঁ করিয়া হাসিয়া হাত তালি দিল।  
রমলা বলিল, “মনীশ বাবু দ্বিধিকে ছুঁতেইতো আপনার মানুষ  
হ’তে ভেড়া প্রমোশন হ’ল? এখন সংসার কবুলে কি  
কি হবেন?”

সুধীর উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে হাসিতে বলিল—“এবার হবেন  
বানর! বানর!”

মনীশ স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় দাঁড়াইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া  
তাহাদের দেখিতেছিল।

রমলা আবার বলিল

“মনীশ বাবু! দ্বিধিকে এখন কি জংলী বলে ঘৃণা ক’রে  
চলে যাবেন?”

এই নিদারুণ প্রশ্নের মনীশ কোন উত্তর দিতে পারিল  
না; শুধু ছল ছল নেত্রে করুণ দৃষ্টিতে উহাদের মুখের  
দিকে চাহিল।

মণির বোদি বলিলেন, “আর কেন বেচারিকে বাদর  
নাচ নাচাও? ওঁকে যদি এখন মণির চরণামৃত খেতে  
বল তোমরা, তাতেও রাজি হন বোধ হয়।”

“কি যে ব’ল বোদি!” বলিয়া মণিকা মনীশের দিকে  
চাহিয়া চক্ষু নত করিল।

বাহিরে তখন উৎসবের সুরে নহবৎ বাজিতেছিল।



## কবিত্ব কোথায়

শ্রীহরিপদ ঘোষাল এম. এ. এম. আর. এ. ৫ম.

সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত কত জানা, কত অজানা কবি তাঁদের বিশাল হৃদয়রত্নাকর মন্ডন ক'রে মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ সম্পদে ভূষিত করেছেন। তাঁদের চিন্তা-বীণায় নব নব সুর ধ্বনিত হয়েছে, তাঁদের হৃদয়-কুঞ্জে নব নব ভাব মুকলিত হয়েছে। এই সকল রসস্রষ্টাগণ কোন নূতন ভাব বা ভাষা সৃজন করেন নি, কোন মৌলিক গবেষণার সাধনায় ব্যস্ত হন নি,—তাঁরা ছিলেন সৃষ্টির উপাসক, মনুষ্য হৃদয়ের মণিকোঠায় লুকায়িত ব্যথা ও বেদনার প্রচারক।

কবি নূতন ভাষা সৃষ্টি করতে প্রয়াস পান না, ভাষা-তত্ত্বের জটিল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন না। তারহীন বার্তাবহ কাজ করে অদৃশ্যভাবে। অসীম ব্যোমের অনন্ত বক্ষে যে অগ্নি লুকায়িত আছে, তাহাই মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের আকারে স্থানে স্থানে ঝিলিক মেরে চলে যায়, সমস্ত গগন আলোকিত হয়ে উঠে, অন্ধকারময় আকাশে যেন আলোর ঢেউ খেলে যায়। কবিরূপ সেইরূপ। বিশ্ব মানবের অশ্রুত বেদনা-রাশি, স্মৃতি-দুঃখের স্পন্দন, প্রেম ও আশার রুদ্ধ বাসনা ঘনীভূত হয়ে প্রকাশিত হয় কবি-হৃদয়ের উজ্জ্বল আদর্শে। ভাব চিরন্তন, ভাষা সনাতন। এই চিরন্তন ভাবকে সনাতন সর্জন-ব্যবহৃত ভাষার রূপ দিয়ে কবি লোকলোচনের সামনে এনে দেন। কবি আলোকের দূত। তাঁর চিন্তা উদার মুক্ত পার্শ্বত্যা-নিবারণের মত। সেই মধুস্রাবী ধারায় কর্দ্দমের আবিলতা নাই, বদ্ধজলের পৃতিগন্ধ বা মলিনতা নাই—সে ধারা দর্পণের মত স্বচ্ছ, সহজ ও সুন্দর।

যথার্থ কবি মানবতার পূর্ণ বিকাশ। তাঁর হৃদয় আনন্দের লীলানিকেতন, সৌন্দর্যের বিকাশভূমি। বিশ্বের সমস্ত আনন্দ যেন জমাট হয়ে তাঁর ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়।

প্রকৃতি চিরসুন্দরী। কিন্তু তাঁর সৌন্দর্য কলবধুর মত অবশুষ্ঠনে ঢাকা। লীলাময়ী প্রকৃতিরানী দুর্ভেদ্য মায়াজাল বিস্তার ক'রে নিজের অনিন্দ্যসুন্দর রূপ বহিদৃষ্টির অন্তরালে

লুকায়িত রেখেছেন। কবিপ্রতিভা তাঁর অবশুষ্ঠন মোচন ক'রে, বিচিত্র ভঙ্গীতে “বিচিত্রের লীলাকে” বাহিরে লীলায়িত করে। ইহাই কবির কাজ,—তাঁর সাধনা—তাঁর তপস্যা।

রুদ্ধগৃহের কোণে বসে কাব্য রচনা করা কবির কাজ নয়—তাঁর কাজ হৃদয়ের চিরনবীনটিকে, চির সবুজটিকে রূপ-রস-বর্ণহিল্লোলে আন্দোলিত করা—অসাড় মৃতকল্প চিন্তে প্রাণের বিপুল স্পন্দন এনে দেওয়া,—সৌন্দর্য্যাত্মকতার প্রচণ্ড আঘাতে তাকে সজীব জীবন্ত ক'রে তোলা—আনন্দ ও সুখময় পরিপূরিত ক'রে দেওয়া।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই তত্ত্ব, এই নিগূঢ় অথচ স্পষ্ট খাঁটি সত্য পরিস্ফুট হ'য়েছে। রবীন্দ্রনাথ কবি, পূর্ণমাত্রায় কবি। কিন্তু বিরলে বসে ছন্দ-তান-লয় যোগে মধুর বাক্যবিন্যাস করা তাঁর প্রকৃতি নয়। কাব্যের সুধাভাণ্ড হাতে নিয়ে কবি মহামানবের মহামেলায় এসে দাঁড়িয়েছেন, অনন্ত রসের আধার তাঁর বিরীচি হৃদয়খানি খুলে দিয়ে অনিন্দ্য-সুন্দর কবিজীবনের প্রভাব শতধা বিস্তার ক'রে বাঙ্গালীর সমগ্র জীবনটিকে সৃষ্টির দিকে প্রধাবিত করেছেন। তাঁর শুভ্র সংযত মার্জিত জীবনের মায়াকাঠিস্পর্শে সাধারণ বাঙ্গালীজীবন প্রস্ফুটিত হয়েছে—বাঙ্গালীর রসবোধ ও রুচি মার্জিত ও সুসংস্কৃত হ'য়েছে।

সৌন্দর্য্যসৃষ্টির অনাবিল আনন্দরস পরিবেষণ ক'রে যারা চিরবরণ্য হয়েছেন—বিশ্বের কাব্য-উজ্জানে মধুচক্র রচনা ক'রে যারা অমরতা লাভ ক'রেছেন—শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ সত্যের পথে চলে যারা অমরাবতীর অগ্নান দীপ্তিতে স্বীয় মহিমা-মুকুট গৌরবান্বিত ক'রেছেন—সেই কবিকুলচূড়ামণি-গণের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের উচ্চ সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। হোমর ভার্জিল, দান্তে, গ্যোটে, সেক্সপীয়র, ইন্সকিলাস, সফোক্লিস, কালিদাস যে যজ্ঞের পৌরহিত্য করে গিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ সেই যজ্ঞের হোতা ও উদগাতা। একাধারে অনন্তরসের

সমাবেশ রবীন্দ্রসাহিত্য ব্যতীত অন্য কোথাও দেখা যায় না।  
তাঁর মহাপ্রাণতা-ভৌগোলিক সীমা দ্বারা আবদ্ধ হয় নি—  
হ'তেও পারে না। অনেকদিন পূর্বে তিনি বলেছিলেন—

জগৎ জুড়ে উদার সুরে

আনন্দ গান বাজে।

মহাকবি, তোমার স্বপ্ন কার্যো পরিণত হ'য়েছে—তোমার  
আশা ও সাধনা সার্থক হ'য়েছে। বিশ্বজোড়া সুরের সহিত  
তোমার হৃদয় সত্যি নৃত্য ক'রছে। তাই বিশ্বের মুক্ত  
হাওয়ায় পুষ্টিলাভের জন্য বাঙ্গালী আজ মুক্তিকামী—  
মুক্ত হবার দুর্জয় কল্পনা ও অনাস্বাদিত আনন্দ আজ  
বাঙ্গালীকে দুঃখবরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

রবীন্দ্রযুগে জয়লাভ করা কম গৌরবের কথা নয়।  
জানিনা জগতের অন্য কোন কবি চিরস্বন্দরকে এতখানি ব্যক্ত  
করেছেন কিনা। যে রূপ-রস তিনি মোহন তুলিকামুখে  
ফুটিয়ে তুলেছেন—যার প্রভাবে বাঙ্গালী-জীবন অধিকতর  
সৌন্দর্য্য ও গৌরবে অলঙ্কৃত হয়েছে—তার মাধুর্য্য শুধু বাংলার  
হাটে-বাটে পল্লীপথে নয়,—যাত্রিক সভ্যতার লীলানিকেতনে,  
“ধনদুগ্ধ পশ্চিমের কটাক্ষ সম্মুখেও” হতাদর হয় নি। বাংলার

জাতীয় জীবনে ও বিশ্বমানবের কল্যাণচিন্তার প্রেরণায়  
তাঁর দান কিরূপ বিপুল ও গভীর তা' নির্ধারণ করবার স্পর্শ  
আমার নাই, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও তা নয়। তাঁর  
সর্বতোমুখী প্রতিভা বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যেই পরিস্ফুট  
রয়েছে। তাই তাঁর বাণী আজ ভারতের বাণী ব'লে জগতের  
মনোবীণা সাদরে গ্রহণ করেছেন। এই স্থানেই তাঁর  
কবিত্বের সার্থকতা। সৌন্দর্য্য অমূল্যত্বের পরিণতি ও চরম  
মৌলিকতা।

বিচিত্র সুরের সমবেত সংঘাতে ঐক্যতানবাদের সৌন্দর্য্য  
কত সূক্ষ্ম হয়, কত অভিনব বিচিত্র ছন্দের সমাবেশে তার  
মাধুর্য্য! সেইরূপ অনন্ত বিশ্বের সমবেত সুর সর্বদা ধ্বনিত  
ও ঝঙ্কত হচ্ছে। যার হৃদয় সেই অনাহত ধ্বনির অপকূপ  
তানে নেচে উঠে, যার স্বপ্নসহরার উপর লহরী মিশিয়ে  
সেই নীরব নৃত্যের নুপুরনিকণের সঙ্গে নেমে চলে। যিনি  
সেই অপকূপ নৃত্যের ঝঙ্কার স্তললিত শব্দে, বিচিত্র ছন্দে  
পরিস্ফুট ক'রে তোলেন, তাঁহারই ত শ্রেষ্ঠ কবির উচ্চ  
আসনে স্থান, তিনিই ত মহাকবি এবং সেই স্থলেই ত  
কবিত্বের চরম পরিণতি।

## উষর মরুপথে

শ্রীতেজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উষর মরু পথে যাত্রী দল চলে  
বুকেতে ঘন ব্যথা; রক্তটীপ ভালে,  
সমুখে আঁধার নামিছে ধরা পরে  
দীঘল রজনী পথ কি পাবো নারে ?  
মুখেতে কথা নাই, তৃষ্ণা, ফাটে বুক  
যাত্রীদল চলে উভয়ে চাহি মুখ।  
এমনি সাঁঝে আজ সহরে প্রতি ঘরে  
জ্বলিছে শত বাতি কতনা ধরে ধরে,  
হাসিছে কত স্নেহে গাহিছে কত গান  
এ ধারে যাত্রীর মরুতে অভিযান।

কতনা আশা করে এসেছি গৃহছেড়ে  
জীবন বিনিময়ে পথ কি পাব নারে ?  
চোখের জল মুছে যাহারা আসিয়াছে  
বলিতে হবে তারে শেষেতে পথ আছে।  
ক্ষুধায় জলে পেট, তৃষ্ণা, জল চাই  
জল সে কোথা পাব ? শূন্য পরিখাই।  
তোমরা ঘরে ঘরে পুত্র জননী,  
দেউল চূড়ে বসি বাঁধিছ স্নেহ নীড়।  
তোদের পাশে আজ কাঁপিছে ধসুধরা !  
তাইতো আমাদের কঠিন ত্রুত করা।

# সাহিত্যের কাজ

—বেদপন্থী—

সাহিত্যের আসল কথা যা তাহা ঠিক কাজের কথা নয়, সে কারণে অনেকে ইহাতে পেটের বা পিঠের স্ততারটি ঠিক মনোনীত পান না বলিয়া মুখখানি ভার করিয়া বলেন, তা হইলে আর কি হইল! কি যে হইল ইহা বুঝাইয়া বলিবার নয়, ইহা বুঝিবার, ইহা শুনাইবার ততখানি নয় যতখানি শুনিবার। ইহা আশ্বাদনের—সমক্ষে নয় অলক্ষ্যে, স্থলে নয় স্থল্লে, চক্ষে নয় বক্ষে।

পুরাণ ইতিহাস বা ধর্ম-কর্মের বিবৃতি নয় বলিয়া সাধু সজ্জনও ইহাকে সহজ অবজ্ঞায় এড়াইয়া চলেন। ইহা লইয়া সবাক তর্ক বা সশস্ত্র যুদ্ধ চলেনা, তাই সাহিত্যিককে নির্দীক ও পাঠককে অবাক হইয়া থাকিতে হয়, কালে-ভদ্রে কোলাকুলি চলে। লেখক-পাঠকের মিলন পথে-ঘাটে হোটলে-কেফে সত্যকার মিলন নয়, তাঁদের মিলনের নিবিড় বন্ধন সবাক নয় নির্দীক জগতে, কথায় নয়, চিন্তায়। ইহাতে দেশ-কাল বাধে না, জাত-অজাত বাধে না, ছোট-বড়োর ভেদ নাই। মানুষের সহিত মানুষের মিলনের এমন স্ফূর্তি সেতু আর নাই, এবং নাই বলিয়াই স্মৃষ্টিকার আদর সর্বদেশেই এমন উপমাহারা।

সাহিত্যের কাজ মানুষকে মানুষের নিকটে আনা, সংযোগ ঘটাইয়া দেয়া। নর নারীর অন্তরে একটি আদিম প্রাথমিক ভাব আছে যাহা বহিঃপ্রকৃতির সহিত সংলগ্ন, তার নিগূঢ় চেতনায় তেমনি আরো একটি স্নমধুর বৃত্তি আছে, যথা রূপ হইতে রসে ও রস হইতে রসময়ের সহিত সংযোগ ঘটাইয়া দেয়, ঋতুর স্পর্শে যেমন তৃণতরুরাজি নব কলেবর ধারণ করে, রসের সংস্পর্শে অন্তরেরও তেমনি একটা পরিবর্তন ঘটে, সে পুণিমার কোটালের মত স্বীত ও সন্ধ্যালের রক্তিমার মত মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া উঠে। সাহিত্য মানব-জীবনের সমগ্রতার ইতিহাস, সে দৃষ্টি যার নাই সে ইহার মধ্যকার সত্যটিকে সহজ দৃষ্টিতে দেখিতে পায়না, নিজের খণ্ড জীবনের শত বিখণ্ড পাতাগুলির সহিত টপ্ করিয়া মিলাইতে গিয়া হারাইয়া বসে।

ইহা সত্যই সৃষ্টিছাড়া কথার সমষ্টি। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে সংসারী মনটা বিকল হইয়া যায়, বৈরাগ্যে নয় বিরহে, বাহিরের তরে নয়, ভিতরের আস্থানে। কর্ম জগৎ ও কল্পজগৎ দুটিই পাশাপাশি চলিতেছে, দুটিরই স্রষ্টা এই মানব-মন। একটি সবাক, অপরটি নির্দীক।

## তরুণী

শ্রীসখানাথ দাস

শ্লিষ্ট শাস্ত্র সুকোমল নয়ন-নীলিমা—  
মধুর হাসিটি তব, অয়িমনোরমা!  
বিশ্বের প্রবাসী যত ক্লান্ত পথিকেরে  
আকর্ষণ করিতেছে তোমার ছুয়ারে;  
স্নেহোৎপল ওষ্ঠ দুটি মৃদু শিহরণে  
মায়া-স্বর্গ আনিতেছে প্রণয়ীয় মনে;  
তোমার উজ্জ্বল গালে ভালে আছে লেখা  
বাসনার কামনার দীপ্ত রশ্মি-রেখা।

বাসন্তী প্রকৃতি মাঝে তব সিংহাসন  
বন্ধের গোপন ঘরে তোমার আসন;  
হাস্তে লাস্তে কটাক্ষের ছন্দে নিত্য তুমি  
তৃপ্ত মুগ্ধ পুলকিত করিয়াছ চুমি।  
তাই আজি দাঁড়াইনু বিমুগ্ধ অন্তরে  
প্রথম পূজাটি মোর দিনু তব করে।

# উদয়-তারা

(পূর্বাহ্নস্মৃতি)

শ্রীমুনীল কুমার ধর

পুরুষের প্রতি একটা দুর্নিবার আক্রোশ যেমন তাহাকে ঘরের মোহ কাটাইয়া বিদ্রোহিনী করিয়াছে তেমনি পুরুষের প্রিয়া হইবার জন্মগত মোহ ত' সে আজও কাটাইতে পারিল না। কিন্তু এত সঙ্কোচই বা কেন! বরুণা নিজেকে প্রশ্ন করিল। লজ্জাই বা কিসের?

কৈশোর জীবনের রৌদ্রজ্বল প্রভাত আকাশ লইয়া ভবিষ্যতের যে অপরূপ স্বপ্ন সে রচনা করিয়াছিল তাহাতে এতটুকুও নূতনত্ব ছিলনা বটে কিন্তু মাধুর্য ছিল—একটি সুস্থ সবল প্রিয়দর্শন পুরুষকে ঘিরিয়া তাহার নারীজীবন সার্থক হইয়া উঠিবে! একান্ত নিজের একটি সংসার! তাহার সে মধুর স্বপ্ন চিরকালের জন্ত ব্যর্থ হইয়া গেছে, রাজপুত্রও আর ফিরিয়া আসিবেনা তবুও তাহার ভিতরে যে চিরন্তনী বুভুক্ষু নারী আছে সগয় অসময় দুখানি ছোট হাতের কোমল স্পর্শ, ছোট একটি মধুর আশ্বানের জন্তে ব্যাকুল হইয়া ওঠে! বরুণা কোনরকমেই ভুলিতে পারে না যে, সে নারী!

কিন্তু এ দুর্বলতা বরুণাকে কখনই বৈশীকণ তদ্রাগন্ত রাখিতে পারে না, একটি শীতসন্ধ্যার বীভৎস দৃশ্যের দুর্বহস্মৃতি তাহাকে ক্লিপ্ত করিয়া তোলে। নির্জন অরণ্যের মাঝে নিরীহ বালিকার অসহায় দেহ ঘিরিয়া কামাতুর পুরুষের সে কি বিকট উল্লাস! ভয়ে আতঙ্কে ও লজ্জায় অগ্নে অগ্নে কেমন করিয়া যে সে চেতনা হারাইয়াছিল তাহা মনে পড়েনা কিন্তু প্রভাতে যখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল দেখিল তাহাদেরই পাছদুয়ারের আবর্জনার মধ্যে সে পড়িয়া আছে এবং তাহাকে ঘিরিয়া আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবাসীর মধ্যে নানা রকম বচসা চলিতেছে। তাহারা যে এমন নিঃসঙ্কোচে পরস্পরের সামনে প্রকাশ্যভাবে এত কুৎসিত ও অভদ্র কথা উচ্চারণ করিতে পারে একথা বরুণা এর পূর্বে কোনদিন ধারণা করিতে পারে নাই। লজ্জায়

তাহার সর্বদেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সর্বদা অসহ্য বেদনা, মাথার ভিতরে যেন আগুণ জলিতেছে—কণ্ঠ শুকাইয়া শ্বাস বন্ধ হওয়ার মত। তবু কেহ তাহাকে ধূলিশয্যা হইতে উঠাইয়া ঘরে লইয়া গেল না, এতটুকু তৃষ্ণার জল দিতেও নারাজ! সে একবার অতি কষ্টে চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল অদূরে তাহার মা কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়াইয়া নীরবে কাঁদিতেছেন, পিতা তাঁহার পিছনে গম্ভীর মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তাহার চেতনা ফিরিয়া আসায় মা ছাড়া কেহ একটু চঞ্চল হইল না। সান্ত্বনা দিবার জন্ত তাহার নিকটে আগাইয়াও আসিলনা! সে সকলের অস্পৃশ্য! মানুষের আয়ু অপেক্ষা সংস্কারের মূল্য যাহাদের নিকট বেশী তাহাদের কাছে কোন দয়া ভিক্ষা করাই মর্থতা। একটা মানুষকে এরা দাঁড়াইয়া তিলে তিলে মরিতে দেখিতে পারে তাহাকে উদ্ধার করিবার কিম্বা বাঁচাইবার কোন চেষ্টা ইচ্ছা করিয়াই করিবে না। তাহার জন্ত যত সহায়ত্ব মরণের পর! এই সমাজ আর এর উপর নির্ভর করিয়া সংসার করে বাঙ্গালী জাতি! তাহার মুখে একটুকু জল দিয়াছিলেন বলিয়া বরুণার মায়েই বা কি লাঞ্ছনা! বরুণা সেদিন বার বার নিজের মৃত্যুকামনা করিয়া ছিল। তাহার পর বিদায়ের পালা।

শয্যাশ্রয় দূরের কথা অতবড় গৃহের এক কোণেও তাহার জন্ত আর এতটুকু স্থান ছিল না। রক্তের সম্বন্ধের চেয়ে পিতার নিকটে সমাজ বড় কেননা সে সমাজ পুরুষের গড়া, তাই নারী বলিয়াই তিনি পৈতৃক কন্যাকে অগন মুমূর্ষু অবস্থায় নিঃসঙ্কোচে পরলোকের দোহাই দিয়া বিদায় করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু বরুণা যদি তাহার কণ্ঠ না হইয়া পুত্র বরুণ হইত তখন তাহার এ অপরাধ, অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইত না, যদিই বা হইত তাহার প্রায়শ্চিত্তের মূল্য হইত কয়েকটি রজতখণ্ড। কেবল নারীর বেলায় বিধান দিয়াই



সমাজ দায় খালাস ! কিন্তু নারীর দেহ নিষ্ঠার উপর যদি সমাজের এতই শ্রদ্ধা তবে নিরীহ বালিকার দেহের উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়া অত্যাচারী কেন শাস্তি পায় না ? সমাজকে সে অবহেলা করিতে চায় নাই, পারিবারিক জীবনে শাস্তি ও শৃঙ্খলার জন্তে যে সমাজের অস্তিত্ব, সে সমাজ নিরপেক্ষ নয় কেন ? কলুষিত-দেহ পুরুষের যদি বিবাহ করিবার, পিতা হইবার কোন বাধা বা বিপত্তি সমাজের না থাকে, অনিচ্ছায় অত্যাচারিতা নারীকে গৃহকোণে আশ্রয় দিতে এত কুষ্ঠিত কেন ? যত আইন-কাহুন, শাস্ত্রের দোহাই কি কেবল তাহারই জন্তে ! পিতা হইবার অধিকার লইয়া পুরুষ তাহার অতীত ভুলিতে পারে, পাপ ভুলিতে পারে, আর নারী পারে না ! অথচ এই পুরুষই বারবনিতার চরণে প্রেম নিবেদন করে ! এবং শোনা যায় পিতা ভিক্ষা করিয়া পুত্র কন্যার লালন পালন করেন ।

—সেদিন সমাজই ঐ নিরীহ নিষ্পাপ মেয়েটির মনে পাপের প্রলোভন জাগিয়েছে—আজ সে পাপিনী, কাউকেই ক্ষমা করবে না,—দৃঢ়স্বরে এই কথা কয়টি বলিয়া আপন মনে একবার জোরে হাসিয়া উঠিয়া বরুণা গাহিতে লাগিল—

দীপ নিবেছে নিবুক নাক

আঁধারে তব পরশ রাখ.....

বরুণাকে এখন দেখিলে মনে হয় ও বুঝি রাজপুত্রনার একটি দুঃসাহসী মেয়ে, রাত্রি প্রভাতে শত্রুর বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী পরিচালনার জন্তে প্রস্তুত হইতেছে । এমনি ধারালো তাহার ঠোঁটের ঐ ক্ষীণ হাসির রেখাটি. এমনি তাহার সর্বদেহের গতি চঞ্চলতা ।

কিন্তু একটু পরেই ওর এ চঞ্চলতা শান্ত হইয়া গেল, চোখ দুটি হইয়া উঠিল বর্ণনোন্মুখ মেঘের মত—ওর সারামুখে যেন বিফলমনা অভিসারিকার স্নান ছায়া পড়িয়াছে ! বরুণা ধীরে ধীরে ওধারের জানালায় গিয়া স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইল । ঠিক সামনের বাড়ীর মুখোমুখি ঘরটিতে ও বাড়ীর যে মেয়েটি থাকে আজ তাহার স্বামী আসিয়াছেন, তাই এদিকের জানালা একেবারে বন্ধ । দিন চারেক হইল বরুণার সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছে, শান্ত মেয়েটি, বিবাহ হইয়াছে মাত্র তিনমাস

তাই স্বামীর প্রতি ওর ভালবাসার আর সীমা হয়না । এরাতে ও ঘরে প্রেমের চিরন্তন অভিনয় চলিয়াছে ।

ঘরের বাহিরের শীতের তন্দ্রাতুর সহর কুয়াশার আবরণে রহস্যময়ী । এবাড়ীটার অগ্ন্যাগ্ন চপলা মেয়েগুলি যাহারা ভবিষ্যতের এক রঙীন স্বপ্নের আশায় তাহার ছায়ায় আসিয়া নীড় বাঁধিয়াছে, তাহাদের কেহ আর জাগিয়া নাই । সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে । অদ্ভুত মেয়ে ঐ সাহানা, ঠিক এই নিশীথ রাতের নিস্তব্ধ নগরীর মত । সারাদিন ওর আর কলরবের অন্ত নাই কিন্তু সন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর দুটি চোখ যেন স্বপ্নাতুর হইয়া ওঠে । বরুণা ভাবিতেছে । একটু পরে বরুণা আস্তে আস্তে সাহানাদের ঘরে গিয়া দেখিল, সে নিবিষ্টচিত্তে একখানা ফটোর দিকে তাকাইয়া আছে এবং সে ছবিখানার দিকে তাকাইয়া এমনি তন্ময় হইয়া গেছে যে, বরুণা এঘরে আসিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ফের ফিরিয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিলনা । ঘরের বাহিরে গিয়া একটু স্নান হাসিয়া বরুণা আপন মনে বলিল—নারীর একি দুর্বলতা, যে তাকে পায় দলে তারই চরণ পূজার জন্ত পাগল ! ফটোখানা যে সাহানার পূর্বপ্রণয়ী অমরনাথের বরুণা তাহা বুঝিল । অথচ এই অমরনাথ সাহানার উপর কি অত্যাঘ্র অবিচারই না করিয়াছে ! বাংলার নারী যতদিন না পুণ্য সঙ্কয়ের এই লোভ সম্বরণ করিতে পারিবে ততদিন তাহাদের দাসীপনা করিতেই হইবে । সাহানার মত মেয়ে লইয়া অনেকের কবিতা লেখা চলে—সংসারও চলিতে পারে, কিন্তু বিদ্রোহ চলে না ।

\* \* \*

পরের দিন সকালে এবাড়ীর অগ্ন্যাগ্ন মেয়েরা প্রত্যেকেই বরুণার ঘুমন্ত দেহের দিকে তাকাইয়া অবাক বিষয়ে স্তব্ধ হইয়া গেল । পরণে একখানি ফিকে বাসন্তীরঙের সাড়ী, গায়ে রক্তের মত রাস্তা রাউজ, সিঁথিতে উজ্জ্বল সিঁদূর রেখা—কপালে ছোট একটি সিঁদূরের টিপ । সবচেয়ে প্রথম দেখিল সাহানা, তখন আটটা বাজে. বরুণা তখনও ঘুমাইতেছে । গায়ের র্যাগটা পাশে সরিয়া গেছে, শ্রবণবসনা বরুণাকে দেখিয়া মনে হয় নব বধু, কাল রাত্রেই বুঝি তাহার বিবাহ হইয়াছে । ঘরের ও দিকে বরুণার তোরঙ্গটি খোলা, তাহার পাশে রূপার

সিঁদুর কোঁটাটি রহিয়াছে এবং আলতা পরিয়া বরুণা যে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে এদিক ও দিক তাহার ছাপ স্পষ্ট।

স্মিতার পিছনে সারা বাড়ীর মেয়ে আসিয়া বরুণার দরজার সামনে উপস্থিত হইল, সকলেই বরুণার অদ্ভুত বেশ দেখিয়া কৌতুক অন্বেষণ করিতেছে কিন্তু এক স্মিতা ছাড়া প্রত্যেকেই বরুণাকে অত্যন্ত ভয় করে, তাহাকে ঠাট্টা করিবার সাহস ওদের কাহারও নাই। স্মিতা বরুণার খাটের দিকে আগাইয়া গিয়া ধীরে ধীরে তাহার ঠোঁটে একটি চুম্বন করিয়া ডাকিল। ওগো—

কেবল এই দৃশ্যটুকুর জন্যেই বরুণা এতক্ষণ ঘুমের ভাণ করিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল। স্মিতার চুম্বন-স্পর্শে চমকাইয়া উঠিয়া, খতমত খাইয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—কিগো—

বরুণা এতক্ষণ চোখ বুজিয়াছিল, এইবার চোখ চাহিয়া স্মিতার মুখের দিকে তাকাইয়া যেন অত্যন্ত নিরাশ ও বিরক্ত হইয়াছে এমনি ভাবে বলিল—তুই!

ঘরের অপর মেয়েগুলি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং তাহাদের কলকণ্ঠের হাসিতে লজ্জা পাইয়াছে এমনি ভাবে বরুণা অত্যন্ত আশ্বে আশ্বে বলিল—যাঃ, পাল—

এখন বরুণাকে দেখিয়া কে বলিবে যে, সে সঙ্গপরিণীতা নববধূটি নয়! ওর সারা মুখখানি প্রথম প্রণয়মুগ্ধা কিশোরীর মত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে—চেখ দুটিতে পড়িয়াছে এক অপরূপ আলো!

সাহানার দিকে তাকাইয়া বরুণা মৃদু হাসিয়া বলিল—কাল রাত্রে যে আমার বিয়ে হয়েছে! আমার বর যখন এল তখন তোরা সকলেই ঘুমিয়ে, একবার ইচ্ছা হোল তোদের ডাকি—

শয্যার অপরাংশ দেখাইয়া বলিল—এখানে শুয়েছিল, সারারাত্রির ধরে কত গল্পই না কোরলে, কিন্তু এমনি দুষ্টু, ভোরবেলা না বোলে কখন যে পালিয়ে গেছে...

তাহার পর মুখ নীচু করিল।

কবি প্রকাশের সঙ্গে বরুণা ইদানিং এমন ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে যাহাতে সকলের মনেই এমনি একটা পরিণতির কথা কয়দিন ধরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছিল, এমন কি

স্মিতাও বিশ্বাস করিল যে, কাল অনেক রাতে প্রকাশ আবার আসিয়াছিল। কেবল বিশ্বাস করিল না সাহানা।

সাহানা কি যেন জিজ্ঞাসা করিতেও গেল, কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই সিঁড়িতে জুতার শব্দ পাওয়া গেল। মৃদু হাসিয়া বরুণা বলিল—ঐ আসছে—

প্রতি মেয়েটির মুখে একটু আগে যে চপল হাসির আলো দেখা গিয়াছিল—তাহা যে ওদের অজ্ঞাতে কখন মিলাইয়া গেছে বলা কঠিন। তাহারা যেন এ ঘর হইতে কোন রকমে বাহিরে যাইতে পারিলে বাঁচে! বরুণা বলিল—যাচ্ছি স্ কেন, দাঁড়ান। তোদের সামনেই এমন ঝগড়া করব—

কথার মাঝখানেই প্রকাশ আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। দরজার সামনে আসিয়া মেয়েদের দেখিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইতেই বরুণা হাসিয়া বলিল—লজ্জা পেলেন নাকি!

প্রকাশের বিশ্বয় মুগ্ধ মুখের দিকে তাকাইয়া বরুণা আবার বলিল—এরা জান্তে পেরেছে, আর লুকিয়ে লাভ নেই—

বেচারী প্রকাশ বরুণার বিচিত্র বেশ দেখিয়া অবাক হইয়া গেছে।

শয্যা হইতে নামিয়া প্রকাশের দিকে আগাইয়া গিয়া বরুণা হাসিয়া বলিল—এই-ই ত তুমি চাচ্ছিলে! তাহার পর তাহার হাত ধরিয়া ঘরের ভিতর আনিয়া খাটের উপর বসাইয়া বলিল—তোমার বলার অপেক্ষা না কোরেই আমি বউ সেজে বসে আছি—

প্রকাশ অনেক কষ্টে এবার বলিল—এ কি ছেলে মানুষী, বরুণা—

কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল বরুণা বলিল—তোরা শুনলি... কিন্তু ইতিমধ্যেই সকলে যে কখন বাহিরে চলিয়া গেছে বরুণা তাহা জানিতে পারে নাই, মুখ ফিরাইয়া দেখিল ঘরে কেহ নাই, কেবল সে ও প্রকাশ।

এতক্ষণ সে প্রকাশের হাত ধরিয়া সামনে দাঁড়াইয়াছিল, এইবার তাহার পাশে বসিল। বলিল—একথা ত দুদিন বাদে হয়ত বা আজকে ট্রেনে উঠেই বোলতে, আমি না হয় আগে থেকেই তৈরি হ'য়ে আছি...

প্রকাশ কোন কথা বলিল না।

বরুণা বলিল—পুরুত আসেনি, মস্তুর পড়ায় নি—শাঁখ

বাজেনি বলেই কি তোমার আপত্তি! কথা বোলছ না যে?

প্রকাশ বলিল—কি বলব! আমি শুধু ভাবছি তুমি এমন চমৎকার অভিনয় কোরতে পার!

—তুমিও বোলছ অভিনয়! সত্য হোত নারায়ণ শিলার সাগনে সিঁদূর পরলে!

—এর ঠিক উত্তর দিতে এখন পারব না, বরুণা, তা ছাড়া আমার উত্তর শুনেই যে তুমি এখনি সিঁদূর মুছে ফেলবে এমনও নয়।

—তুমি যা ভাবছ সেটা আংশিক সত্য কিন্তু যা তুমি অস্বীকার কোরতে চাইছ সেটা আরও বড়ো।

অর্থাৎ—

—এর মধ্যে অর্থাৎ বা কিন্তু নেই। একসঙ্গে থাকতে গেলে আমাদের দেশে একটা সম্বন্ধ না থাকলে নানালোকে নানা কথা বোলবে, তা ছাড়া—

—কিন্তু এবশে তোমাকে নিয়ে আমি পার্টনার যেতে পারব না—

প্রকাশের কথা শুনিয়া বরুণা এত জোরে হাসিয়া উঠিল যে প্রকাশ একেবারে অপ্রস্তুত। বলিল—লজ্জা কোরবে বুঝি, কিন্তু ভুলে যাচ্ছ, কনেটি 'পাড়াগোঁয়ে ব্রীড়াবনতা' গেয়েটি নয়—

এইবার প্রকাশ না হাসিয়া পারিল না। বলিল—ফুল-শয্যা কি পার্টনার ক্যাম্পেই হবে...

—আজকের টেণেও হ'তে পারে...

বরুণার ওষ্ঠ প্রান্তের ক্ষীণ হাসি-রেখাটি দেখিয়া প্রকাশ বুঝিল বরুণার কাছে আজও সে শিশু তবুও বরুণার নববেশ দেখিয়া সে প্রলুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তখনই এতদিন পরে হঠাৎ কি জানি কেন অমরেশের কথা তাহার মনে পড়িল। অমরেশের বিদায় বেলার করুণ মুখের ছবি!

কিন্তু বরুণা যখন প্রকাশের সঙ্গে মটরে উঠিল তখন তাহাকে দেখিলে কেহই অবিশ্বাস করিতে পারিত না যে, বরুণা প্রকাশের পরিণীতা নয়। ওর চরণ-ছন্দে, দৃষ্টিতে, সঙ্কোচ কিংবা লজ্জার লেশ মাত্র ছিল না।

হুটু সাহানা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া উলু দিয়া উঠিল

—আর বরুণার ঘরে ঢুকিয়া ছোট এক টুকরা কাগজ হাতে লইয়া স্মৃতি একবার মাত্র বলিল—বেচারী প্রকাশ!

\* \* \*

প্রেম বিষয়ে কবি প্রকাশের মতবাদ অত্যন্ত আধুনিক হইলেও বরুণার নিকট উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মত। পুরুষের সাধারণ মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান অনুযায়ী প্রকাশও নারীকে ফুলের সহিত ( চির প্রচলিত পদ্ধতি ) এবং নিজকে ভ্রমরের সহিত তুলনা করে এবং এতদিন এই ধারণা লইয়া তাহার কাটিয়াছে। কিন্তু পার্টনার পথে টেনে উঠিয়া প্রকাশ প্রথম বুঝিল যে এত বড় ভুল উপমা একমাত্র বাঙ্গালী কবির পক্ষেই সম্ভব, যাহাদের দেশে দেবী নামে নারী শুধুই সেবাদাসী। ও দেশের সাহিত্যেও ঠিক এমনি ধরণের মিষ্টি কথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় তবে তফাৎ এই যে, ওরা স্বর বদলাইয়াছে এবং সেও আজ অনেকদিনের কথা।

সারাদিন বেশ নীরবে কাটিল, প্রকাশ কিম্বা বরুণার একটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না। সামান্য দু একটি ছোট কথা ছাড়া আর কোন কথাই তাহারা বলে নাই। বছর কয়েক আগে হইতে অর্থাৎ প্রকাশ যখন কবিতা লিখিতে শুরু করিয়াছে তখন হইতেই বায়রণের মত ওর নূতন নূতন নারী জয় করিবার বাসনা এবং এই জগুই ও প্রেমের কবিতা লিখিতে লিখিতে শুর ধরিয়াছে বিদ্রোহের। অবনী, নরেন

● প্রভৃতির সহিত তাহার পরিচয় এই জগুে হইলেও ও আজও ভোলে নাই যে, ওর এ বিদ্রোহের কবিতা কেবল দুর্বলচিত্ত বীরপূজরিণী নারীচিত্ত জয় করিবার জগুে। বরুণার সহিত এতদিন মিশিয়াও ওর এ ধারণা ও বিশ্বাস আজও যায় নাই যে সত্যিকার কোন বিদ্রোহ করাই নারীর পক্ষে অসম্ভব এবং ওর এ বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে বরুণার আজ সকালের অদ্ভুত ব্যবহারে, ও একবার ভাবিল পার্টনার না গিয়া সোজা দিল্লী কিংবা আগ্রায় যায় এবং দিন কতক বরুণার সঙ্গে দেশ বিদেশ ঘুরিয়া পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসে। দিন-গুলি মন্দ কাটিবেনা। বরুণার মত মেয়েকে সঙ্গে লইয়া পথের জীবন বেশ রোগ্যাটিকভাবে কাটান চলে, তাহাকে লইয়া স্থায়ীভাবে সংসার করা চলেনা—একথা প্রকাশ জানে তাই ও একান্ত ভাবে বিশ্বাস করিয়াছে বরুণা তাহাকে সত্যই

ভালবাসিয়াছে এবং ওর আজকের ব্যবহার একেবারে অভিনয় নয়। জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রকাশ এই সব কথাই ভাবিতেছিল। সন্ধ্যার ছায়ায় দূরের গাছ-পালা, মাঠ-প্রান্তর অস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, আকাশের বৃকে দ্বিতীয়ার সরু চাঁদের আলোয় চারিদিক উজ্জল হইয়া উঠিতেলাগিল। গাড়ীর অপরদিকে জানালার ধারে বসিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া বরুণা ভাবিতেছে প্রকাশের কথা। প্রথমে বিশ্বাস করিতে সাহস না হইলেও প্রকাশ যে এখন নিঃশংশয়ে বিশ্বাস করিয়াছে তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বরুণার কোন সন্দেহই নাই, একথা বরুণা বুঝিয়াছে এবং বুঝিয়াছে প্রকাশের সারাদিনের সসঙ্কোচ ব্যবহারে। প্রকাশের কথা কওয়ার নূতনতর ভঙ্গী, হাবভাব দেখিয়া ও যে সারাদিন কত কষ্টে হাসি চাপিয়া আছে তা ঐ জানে। ট্রেন তখন একটা স্টেশনে থামিয়াছে, প্রকাশকে ডাকিয়া বরুণা বলিল—একটা চা-অলাকে ডেকে চা নেও না—

প্রকাশ বলিল—তুমিই ডাকনা বাপু।

গ্রীবা ঢুলাইয়া অপরূপ ভঙ্গীতে বরুণা বলিল বেশ-যা-হোক কেলনারের চা-অলাকে ডাকিয়া বরুণা ডবল চায়ের অর্ডার দিল এবং প্রকাশের পাশের সিটে গিয়া একে বারে তাহার গা ঘেঁষিয়া বসিল। কাল পর্য্যন্ত বরুণা মনেবদূরে ছিল বলিয়া প্রকাশ তাহার সঙ্গে বেশ নিঃসঙ্কোচে মিশিয়াছে, তর্ক করিয়াছে কিন্তু আজ তাহাদের মধ্যে কোন অন্তরায় নাই বলিয়াই সে যেন সহজ ভাবে কথা বলিতেও পারিতেছে না। আসল কথা বরুণার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইলেও হঠাৎ এতখানির জ্ঞাত সে মোটেই প্রস্তুত ছিলনা। বরুণা প্রকাশের একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া বলিল—সারাদিন যে একেবারে চুপ চাপ রয়েছে—ভাল লাগছে না বুঝি!

প্রকাশ বলিল—খুব ভাল লাগছে না সত্যি

কেন, ভাল লাগছেন কেন, শুনি—বলিয়া প্রকাশের মুখের দিকে বরুণা এমনভাবে তাকাইল যে, প্রকাশ বিহ্বল হইয়া আর একটু হইলেই তাহাকে বৃকের উপর টানিয়া লইয়া চুষন করিয়া ফেলিত কিন্তু ঠিক এমনি সময় বয় চা লইয়া কামরায় প্রবেশ করিল। প্রকাশ আশা করিয়া ছিল চা-

পর্ক শেষ হইয়া গেলে বরুণা নিশ্চয়ই আবার তাহার কাছে এমনি অন্তরঙ্গের মত আসিয়া বসিবে এবং ভাবিয়াছিল এবার বরুণাকে আয়ত্ত করিতে সে একটুও সঙ্কোচ করিবে না। এবং চা পর্ক শেষ হওয়ার পূর্ক মুহূর্তটি পর্য্যন্ত বরুণা এমনি হাসিখুসি মুখে প্রকাশের সঙ্গে কথা कहিলেন যে বরুণা সত্যি সত্যি তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতে এতটুকুও দ্বিধা করিবে না! এ বিশ্বাস প্রকাশের আরও প্রবলতর হইল। কিন্তু একটু একটু করিয়া নিঃশব্দে বরুণা যে কখন নিজেকে আড়ালে লইয়া গেল যে, প্রকাশ বুঝিতেও পারিলনা। এটা যখন ধরা পড়িল তখন আর নুতন করিয়া কথা আরম্ভ করা যায় না। দুই মিনিটের ছোট অবসরের মধ্যে এমনিই একটা আড়াল তাহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। চা পর্ক শেষ হইয়া গেলে বরুণা অবশ্য প্রকাশের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেলনা তবুও প্রকাশের এমন সাহস হইল না যে বরুণার হাতখানিও স্পর্শ করে।

গাড়ীতে অপর তিনজন যাত্রীর ছোট সংসারটি আগের স্টেশনে নামিবার জন্তে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। বেডিংটা বাঁধা হইল প্রৌঢ়া মহিলাটি তাহার গায়ের কাপড়খানা ভাল করিয়া সর্কাজে জড়াইয়া লইলেন—অল্পবয়সের মেয়েটি, বোধ হয় যুবকটির স্ত্রী, ওভারকোটটি গায় জড়াইয়া বোতাম আঁটিতে লাগিল, আর ছেলেটি তখন টিফিন করিয়ার ও অন্যান্য ছোটখাট ফটুকি নাটুকি জিনিষের তদ্বির করিতে ব্যস্ত। বরুণা বেশ প্রশান্ত দৃষ্টিতে ঐদিকে তাকাইয়া ওদের গোছগাছ দেখিতেছে, প্রকাশ ভাবিতেছে যদি পরের স্টেশন হইতে কোন যাত্রী এ কামরায় না উঠে তাহা হইলে নিঃসঙ্গ কামরায় বরুণাকে লইয়া ও হাঁফাইয়া উঠিবে। বাহিরের ঐ ঘন জ্যোৎস্নার অপরূপ মায়ী পাশে বরুণার মত মেয়ে হুন্দরী না হোক ওর মত রহস্যময়ী মেয়েকে লইয়া কবি চিন্তা আপনা হইতেই চঞ্চল হইয়া উঠে কবি না হইলেও সাধারণ যে কোন মনুষ্যের পক্ষেও কম অস্বস্তিকর নয়।

পরের স্টেশনে গাড়ী থামিতেই অপর দলটি নামিয়া গেল এবং নামিবার পূর্কে সকলের পিছনে থাকিয়া বধূটি পিছন ফিরিয়া বরুণার দিকে তাকাইয়া এমন একটুখানি সাস্থ্যক



মধুর হাসিল যে বরুণার দৃষ্টি আপনা হইতেই গিয়া পড়িল প্রকাশের উপর। এবং মেয়েটির অভিনন্দনদৃষ্টির সামনেই প্রকাশ ও বরুণার এই ক্ষীণদৃষ্টি বিনিময়ের মধ্য দিয়া ওদের দুজনের কাছেই যে কথা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল তাহা যে প্রেমের নয় একথা বলা চলে কিন্তু বরুণাও ঠিক অমনি একটু খানি শুভ্র হাসিয়া বধুটিকে সমর্থন করিল। সে ষ্টেশন হইতে কোন যাত্রী এ কামরায় উঠিল না।

ট্রেন পরপর দুইটি ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া তৃতীয়টির দিকে ছুটিয়াছে—

প্রকাশ বরুণাকে ডাকিয়া বলিল—কথা বোলছ না যে—  
বরুণা মৃদু হাসিয়া বলিল—ঠিক এই টুকুর জন্তই অপেক্ষা করছিলাম—ভাল, কিন্তু ও মেয়েটি নামবার সময় তোমার দিকে তাকিয়ে হাসলে যে, চেনা বুঝি?

ও বয়সের মেয়েদের চেনা শোনার দরকার হয় না, ওরা অমনি কারণ-অকারণেই হাসে—তা ছাড়া,—

খামলে যে—

সঙ্গে তুমি রয়েছ কিনা—এমন রাতে এ কামরায় কেবল তুমি আর আমি...

প্রকাশ কোন কথা না বলিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার বরুণার দিকে তাকাইলে, তাহার পর মুখ ফিরাইয়া লইয়া গাড়ীর বাহিরে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিল। বরুণা কেবল একটুখানি হাসিয়া সরিয়া বসিল।

একটা অস্পষ্ট রহস্যের যে প্রাচীর প্রকাশ ও বরুণার মাঝে আড়াল করিয়া আছে বাহির হইতে তাহাকে দেখা যায় না, বোঝা যায় না কেবল যাহাদের মাঝে এই প্রাচীর তাহারা

শুধু অনুভব করিতে পারে। আর এই আড়ালে তখনই অনতিক্রম্য হইয়া ওঠে যখন এক পক্ষ কেবল উঁকি দিয়া দেখিতে চায়, ধরা দিতে চায় না। তাই প্রকাশ আপনাকে লইয়া বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

বরুণা বলিল—মুখ ভারী কোরে বসে না থেকে, তুমি বরং একটা কবিতা আবৃত্তি করো—

স্নান হাসিয়া প্রকাশ বলিল—অন্তের কাছে আমাদের হয়ত আজ কবিতা আবৃত্তিকরবারই রাত, কিন্তু আমি ভাবছি কতক্ষণে পাটনার মাটিতে পা দেব—

একান্ত বিস্ময়ের ভাণে বরুণা বলিল—কেন বলো দেখি!

অল্প একটু উদ্বিগ্নরে প্রকাশ বলিল—কেউ যখন জেনে শুনে ঝাকা সাজে, আমার ইচ্ছা করে তাকে স্মৃতি করি...

কথাটা অবশ্য প্রকাশ ঝাঁক সামলাইতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিল।

হঠাৎ যেন বরুণার মুখ কাল বৈশাখীর আকাশের মত হইয়া উঠিল, বেশ একটু তীব্রস্বরে বলিল—কথা রাখতে হলে প্রথমে তোমাকেই আত্মহত্যা করতে হবে! তোমার চেয়ে বড়ো ঝাকা আমি সাজিনি! সিঁথির সিঁদূর দেখেই মনে কোরলে বরুণা যেচে বউ সেজে তোমাকে দেহ দেবার জন্তে এসেছে, বরুণা যেন এতদিন তোমার জন্তেই তপস্যা করছিল।

প্রকাশের অন্তরের ডনজুয়ান যেন এ অপমানের কশাঘাতে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে, এ পরাজয় কেবল তাহার পৌরুষের নয়—এর কলঙ্ককালি যেন তাহার অতীত, বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব লেপিয়া একাকার করিয়া দিল!

ক্রমশঃ

# বাঙ্গালার কাব্যসম্পদ

মৈমনসিংহ গীতিকা ।

পূর্বানুবৃত্তি ।

( ক্রীউপেন্দ্র কিশোর সামন্ত রায় সাহিত্য সরস্বতী )

ময়নামতীর গান গোরক্ষবিজয়, শূন্য পুরাণ, সূর্য্যের ছড়া, চণ্ডী ও মনসা দেবীর আদি গান ব্রতকথা রূপকথা ডাক ও খনার বচন প্রাচীন সাহিত্যের এই বিশিষ্ট রচনার সঙ্গে এই গুলির এক পংক্তিতে স্থান হইবে বলিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র নির্দেশ করিয়াছেন । এই সকল গাথা শুধু বঙ্গরমণীর কথা নহে, আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক দিক স্পষ্ট হইয়াছে । বাঙ্গালীর বাহুবলের কাহিনী তাহার জয় পরাজয়ের কাহিনী তাম্র, শিলায়, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে যেমন পরিস্ফুট রহিয়াছে কাব্যে গাথায় ও সেরূপ পরিস্ফুট দেখিতে পাই । এই প্রকারের কাব্য-সম্পদ যে শুধু মৈমনসিংহের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল তাহা নহে । বিভিন্নজেলার বিভিন্নপল্লীতে এই প্রকার কাব্যসম্পদ যথেষ্ট রহিয়াছে এখন ও সংগৃহীত হয় নাই । মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য পরিষদের ২১শ বাৎসরিক অধিবেশনের অভিভাষণে বলিয়াছেন যে এই সব কাব্যসম্পদ কেবল বাঙ্গালাদেশে নহে বাঙ্গালার বাহির হইতে ও সংগ্রহ করিতে হইবে । ডাক্তার দীনেশচন্দ্র ও তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের এমন পল্লী অতি অল্পই আছে যেখানে প্রাচীন কালে দু' একজন পল্লী কবির আবির্ভাব হয়নাই । বাস্তবিকই বিভিন্ন জেলার পল্লী কবিগণের এই প্রকার কাব্যসম্পদ সংগ্রহ করিতে হইবে । আমরা দীনেশ বাবুর ভূমিকোল্লিখিত গ্রীয়ারসন সাহেবের স্মরে স্মর মিলাইয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি “আপনি এই পরম উপাদেয় জিনিষগুলি শুধু পূর্ববঙ্গে নহে সমস্ত বঙ্গদেশ হইতে সংগ্রহ করুন । আমরা বিভিন্ন স্থানের এই প্রকার কাব্য সম্পদের দুই একটি উদাহরণ প্রদান করিবার লোভ-সংবরণ

করিতে পারিলাম না । সমস্ত ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত সাহিত্যের সঙ্গে ইহারা একছন্দে ও একতানে বাঁধা না হইতে পারে কিন্তু রচনা ও ভাবগত ঐক্যের অভাব হইবে না ।

ময়নামতীর পুঁথিতে দেখা যায় যে, রঙ্গপুর জেলার ডিমনা থানার অন্তর্গত ধরমপুর নামক গ্রামে ধর্মপাল রাজত্ব করিতেন । ইনি বঙ্গরাজ্যের রাজা মাণিকচন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতীর ভগিনী বনমালাকে বিবাহ করেন । মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর ধর্মপাল তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন, কিন্তু ময়নামতী সৈন্য সংগ্রহপূর্বক তিস্তা নদীরতীরে ঘোরতর যুদ্ধে ধর্মপালকে পরাজিত করিয়া পুত্রগোবিন্দচন্দ্রকে (গোপীচন্দ্রকে) রাজা করেন । এইগোবিন্দচন্দ্র সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের কন্যা অতুনা (অদৈতুমালা) ও পতুনা (পদ্মমালা) কে বিবাহ করেন । রতুমালা ও কাঞ্চনমালা নামে তাঁহার আরও দুই স্ত্রী ছিলেন । গোবিন্দচন্দ্র সমস্ত বিলাস-সম্ভার পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিলেন তাঁহার স্ত্রীগণ নুতন রাজা খেতুর গৃহে গমন করিয়া নবদাম্পত্যের অভিনয় করিয়াছিলেন । সেকালে রাজ প্রাসাদের এইরূপ প্রথা ছিল বলিয়া ইহাতে অবশ্য সেরূপ কোন দোষের কারণ হয় নাই । কিন্তু একমাত্র অতুনা ঘণার সহিত এই প্রথা পদদলিত করিয়া স্বামী গোবিন্দচন্দ্রের প্রতি একনিষ্ঠ হইয়া ছিলেন । এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া এই করুণ গীতি রচিত হইয়াছিল । গোবিন্দ চন্দ্রের বা গোপীলালের গীত পূর্ববঙ্গের দ্বারে দ্বারে ধবনিত হইত । লক্ষ্মণদাস প্রমুখ উত্তর ভারতের কবিগণ ইহাদের বিরহ মিলন গাথা গাহিয়া ধন্য হইয়াছেন । ভারত বর্ষের বিভিন্নপ্রদেশে পূর্বে এইসকল কাব্য কাহিনী পারসিক হিন্দী উর্দু প্রভৃতি ভাষায় লিখিত হইয়াছে । এই গীতিকার

নাগিকা মৈমনসিংহ গীতিকার নাগিকাদের সহিত একপর্ধ্যায়ে বসিবার যোগ্য ।

পাঠক মৈমনসিংহ গীতিকার মহা ও সখিনাকে বঙ্গ রমণীর রণরঙ্গিনী মূর্তিতে দেখিয়াছেন । ঘনরামের ধর্ম মঙ্গলে মেদিনীপুর জেলার কংসাবতী নদীর তীরস্থ ময়নাগড় দুর্গের রাজা লাউসেনের পত্নীদ্বয়ের বীরত্ব কাহিনী পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয় । যুদ্ধে জ্যোষ্ঠারানী কলিঙ্গদেবী হত হন । কনিষ্ঠা রানী কানাড়া দেবী কমলীয় কোমল শরীর বীরসঙ্গে সজ্জিত করিয়া ও অশ্বারোহণে পুররক্ষী সৈন্য পরিচালনা করিয়া বিরূপ অলৌকিক শৌর্য বীৰ্য প্রদর্শন পূর্বক যুদ্ধে জয়লাভ করেন তাহা এই কাব্যে জলন্তঅক্ষরে পরিস্ফুট হইয়াছে । যাঁহারা রাজপুত রমণী মীরাবাই লক্ষ্মীবাদী প্রভৃতির বীরত্বের কাহিনী পাঠ করিয়া মুগ্ধ হন তাঁহাদিগকে দেশের এইপ্রকার কাব্য সম্পদের মধ্য দিয়া নিজেদের ঘরের মেয়েদের শক্তি ও গৌরবের প্রতি লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করি । এইসব কাহিনী জানিতাম না বলিয়া আমরা এতকাল মীরাবাদী প্রভৃতিকে যে বীরত্বের গৌরব প্রদান করিয়া আসিয়াছি, সে গৌরব পারি নাই প্রদান করিতে আমাদের কলিঙ্গ, কানারা, ময়নামতী, মহা, সখিনাকে । এতকাল সীতা সাবিত্রীকে লইয়া গৌরব করিয়াছি এখন আগরা মলুয়া, মদিনা কমলা, অতুনা প্রভৃতিকে লইয়া তদপেক্ষা অধিক গৌরব করিতে পারিব, যেহেতু তাঁহারা ঘাঘরাপরা বিদেশিনী নহেন, শাড়ীপরা আমাদেরই ঘরের মেয়ে ।

পূর্ববঙ্গের মাঘমণ্ডল ব্রতকথা প্রভৃতির অন্তরালে যে ঐ তিহাসিক তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা বাঙ্গালীকে সমর কুশল জাতি বলিয়া পরিচিত করে—তাহা আজিও অশ্বপৃষ্ঠে বঙ্গনারীর রণচণ্ডিকা মূর্তি নয়নসমক্ষে উপস্থিত করে । বিস্তৃত বঙ্গের নানা স্থানে অনুসন্ধান করিলে এখন ও এইরূপ নানা ব্রতকথা ও গাথা প্রভৃতির ভিতর প্রাচীন ইতিহাসের ক্ষীণ-শ্রুতি জাগ্রত দেখিতে পাওয়া যাইবে । পাঠক ময়মনসিংহ গীতিকার দেওয়ানা মদিনা, কাজলরেখা প্রভৃতির মধ্যে নৌযাত্রার পরিচয় পাইয়াছেন । কবিকঙ্কন চণ্ডীতে শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রা, মনসার ভাসানে চাঁদ ও ধনপতি সদাগর দিগের

কাহিনীতে নৌসাধন ও নৌযাত্রার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে ।

মৈমনসিংহ গীতিকায় গর্গের চরিত্র হইতে সমাজের ষথেষ্ট উদারতার পরিচয় পরিলক্ষিত হইয়াছে । তিনশত বর্ষ পূর্বে পাবনা জেলার বরবরিয়া গ্রামনিবাসী ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ যে রামায়ণ রচনা করিয়া ছিলেন তাহা একসময়ে অদ্ভুতচাচাঘোর রামায়ণ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এই রামায়ণের একস্থানে দেখিতে পাই,

বল করি জাতি যদি লঞা যবনে,  
ছয় গ্রাস অন্ন যদি করা এ ভক্ষণে,  
প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পায় সেই জন ।  
ছয় পুরুষ পর্যন্ত ব্রহ্মতেজ নাহি ছাড়ে ।  
ব্রহ্মতেজ নাহি ছাড়ে গোমাংস ভক্ষণে ।  
সমাজের এতখানি উদারতা হয়ত অতীতি বলিয়া

মনে হইতে পারে কিন্তু তখনকার সমাজ এখনকার অনুদার সমাজের মত এতখানি নির্মম কঠোর হয়ত ছিল না ।

মেদিনীপুর জেলার কবিদয়ারামের (ইঙ্গিত মাঘ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) বিনন্দরাখালের পালায় দেখিতে পাই, দরিদ্র রাখাল-ও যোগ্যতার গুণে রাজকন্ঠার পাণিগ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া ছিল । এইপ্রকার কাহিনী আজ কাল উপ-কথার উপাদানে পরিণত হইয়াছে । বর্তমান সমাজের আভিজাত্যগর্ভিত অসবর্ণবিবাহ-বিরোধী ব্যক্তিগণ এইপ্রকার দৃষ্টান্ত দেখিয়া কি বলিবেন জানি না ।

মাণিকচাঁদের গানে মূর্খদাগানের নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য । বোধহয় কান্নার সাধনা করিয়া এই গানের আবিষ্কার হইয়াছিল ; তাই এর মধ্যে কান্নার বন্ধার বাজে । কবে কোন গ্রামের মেয়ে তার বুক ফাটা কান্নায় নিশীথ রাতের বৃকে বেদনার ডেউ তুলিয়া দূরদেশে তার হারান ধনকে খুজিতেছিল । এ গান কান্নার গান এর স্বর চোখের জলের বান্ধন হারা ধারায় সিক্ত । গৌরো কৃষ্ণকের কাদন ধোয়া কণ্ঠে এর স্থিতি ।

গাথা, গীতিকা প্রভৃতি, কাব্য বা সাহিত্য সম্পদের মধ্য দিয়া আমরা এইভাবে সমাজের অনেক প্রাচীন ঐতি-

হাসিক ও সামাজিক তথ্যের নিদর্শন দিতে পারি। বাহ্যিক ভাষায় অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে বিরত হইলাম।

এক্ষণে মৈমনসিংহের প্রাচীন খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের সহিত স্বদূর মেদিনীপুর জেলার বাঙ্গালা শব্দের প্রাচীন খাঁটি ভাবের বিরূপ সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহারই চারিটি উদাহরণ না দিয়া পারিলাম না। যাহারা মেদিনীপুর জেলার ‘কাট্যা’ (কাটিয়া) ‘কুট্যা’ (কুটিয়া) ‘লুট্যা’ (লুটিয়া) লওয়ার ভাষায় আতঙ্কিত হন, তাঁহারা মৈমনসিংহের ‘বাক্যা’ (বাঁধিয়া), ‘তুইল্যা’ (তুলিয়া), ‘ডাক্যা’ (ডাকিয়া) দেখিয়া নিশ্চয়ই আশস্ত হইবেন। মৈমনসিংহের ‘থাইক্যা’ (থাকিয়া), কুট্যা (কুটিয়া), ‘বল্যা’ (বলিয়া), ‘কাট্যা’ (কাটিয়া), ‘পাক্যা’ (পাকিয়া), ‘বেচ্যা’ (বেচিয়া), ‘পাল্যা’ (পালন করিয়া) ‘সঁপ্যা’ (সমর্পণ করিয়া ইত্যাদি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের সহিত মেদিনীপুরের খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের কোন পার্থক্যই নাই। লাছাড়ী (পড়াংশ ১৯৮ পৃঃ) বাউরা বা বাউলা (পাগল ২৪৭ পৃঃ), সাটিয়ারা (যষ্ঠীদিন ২৫২ পৃঃ) ছেউরা (মাতৃহীন ৩৩৭ পৃঃ) কিরা (শপথ ৮৪ পৃঃ) শাণে (প্রস্তরে ৩০ পৃঃ) সন্না (পরামর্শ ২৫ পৃঃ) রোসনই (আলো ১২২ পৃঃ) কাছলা (গামছা ১২৩ পৃঃ) আটকুঁড়ি (হীন, অপুত্রক ১৩০ পৃঃ) খোন্দল (কোণ বা গর্ত ১৩০ পৃঃ) বাথান (গোচারণ মাঠ ১৩৯ পৃঃ) কঁকই (চিকণী ১৪৬ পৃঃ) প্রভৃতি শব্দের মধ্যে স্বদূর মেদিনীপুর ও মৈমনসিংহ জেলার কোন প্রকার ভাব বা অর্থের অসামঞ্জস্য নাই।

‘যখন নাকি বাইছার ছেরি (মেয়ে) বাঁশো মাইলো লাড়া

মৈমনসিংহ গীতিকা ৭২১ পৃঃ—

“হাত পাখলিতে গেছে ছিরে (মেয়ে) চণ্ডালিনী”

লক্ষ্মীচরিত্র—দয়্যারাম দাস

“অন্ধেক ওনাইল কথা সেদিন বিয়ানে” (প্রভাতে)

মৈ—গী—১৬ পৃঃ—

“বিয়ানে (সকালে) বুনিয়া ধাতু দিবে তুমি কাল।”

বিনন্দ রাখালের পালা, দয়্যারাম দাস।

এইরূপ শব্দের সাদৃশ্য অসংখ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কখনও বিভিন্ন জেলার পল্লীগাথা ইত্যাদি সংগৃহীত হয় তাহাইলে খাঁটি বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত

হইবে এবং খাঁটি বাঙ্গালা যে প্রাকৃতের কত নিকট ও সংস্কৃত হইতে কত দূরবর্তী তাহা সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে। তৎসঙ্গে অভিধানের সাহায্যে প্রাকৃত শব্দ সংশোধনপূর্বক সেই সংশোধিত ভাষাটাকেই বাঙ্গালা ভাষা বলিয়া পরিচয় দিতে প্রবৃত্তি হইবে না।

এক্ষণে ভাবের মধ্যে বিরূপ সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহারও এক আধটি দৃষ্টান্ত দেওয়ার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। শ্রদ্ধেয় দীনেশবাবু মৈমনসিংহের ‘পীড়িতে’ বসিয়া আরাম অনুভব করিয়াছেন এবং শালিধানের চিড়া, সবরীকলা ও গামছাবাঁধা দৈ এর স্বাদ গ্রহণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, আমরা মেদিনীপুর হইতেও কিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলাম। তাঁহার ত্রায় রসিকের নিকট সমাদর পাইবে আশা করা যায়।

“তোমার লাইগ্যা ছিকায় তোলা গামছা বান্দা দৈ”

মৈঃ—গীঃ—কঙ্ক ও লীলা ২৫৯ পৃঃ—

“আমার বাড়ীতে যাইওরে বন্ধু বহিতে দিয়াম পিরা।

জলপান করিতে দিয়াম শালিধানের চিরা।

শালিধানের চিরা দিয়াম আরও সবরী কলা।

ঘরে আছে মইষের দইরে বন্ধু খাইবি তিন বেলা।

মৈঃ গীঃ মহায়া ৩৪ পৃঃ—

ছিকাতে তুলিয়া রাখে গামছা-বান্দা-দৈ।

শাইল ধানের চিরা কত যতন করিয়া

হাঁড়িতে ভরিয়া রাখে ছিকাতে তুলিয়া।

মৈঃ গীঃ—দেওয়ানা মদিনা ৩৫৯ পৃঃ

সয়া এলে সয়ের বাড়ী বসতে দিব পিড়া

জলপান খেতে দিব সরুধানের চিড়া।

সরু ধানের চিড়া নয়রে বিনিধানের ই

ঘরে আছে সবরী কলা গামছাবাঁধা দই।

সয়লার গান (সংগৃহীত)।

বিভিন্ন জেলার গাথা ও গীতিকার মধ্যে এইপ্রকার ভাবের সামঞ্জস্যের অভাব নাই। আমরা ক্ষীণ আশার চক্ষে চাহিয়া আছি এমন এক শুভদিন আমাদের মধ্যে আসিবে যেদিন এইসব গানের নেশা সবার প্রাণে পৌঁছাবে এবং তৎসঙ্গে খাঁটি বাঙ্গালার ভাবের ভাষার কাব্য-সম্পদ দেখিয়া জগৎ বিন্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবে এবং বাঙ্গালা ধাতু হইবে, বাঙ্গালী ধাতু হইবে।



## খ'য়ে বন্ধন

( গল্প )

শ্রীঅতনু গুপ্ত

বাইশ বছর তারাদাস মিলার কোম্পানীর আপিসে ঢুকেছিলো। সে কি আজকের কথা? সে দিনের সকল কথা মনে কর্তে হ'লে চোখ দুটি বুঁজে মনের তলায় ডুব দিতে হয়। সে যেন আর এক জগতের কথা। আজ না আছে সে ঘোড়ার ট্রাম, গ্যাসের আলো, না আছে ভিস্তির পিঠে সেই অতিকায় মশক। তার ওই আপিসটারই কি কম পরিবর্তন হ'য়েছে? মাথার ওপর ঝুলতো একটা নড়বড়ে টানাপাখা, পাঁচ মিনিট অন্তর বুড়ো পাখাওয়ালাটা ঘুমে ঢুলে ঢুলে পড়তো, আর আপিসময় বাবুর দল তাকে ডাক হাঁকে সজাগ কর্তার চেঁচায় গলদঘর্ষ হ'য়ে উঠতেন; আজ আর সে সব ঝন্ঝাটের বালাই নেই। স্বইচ্ছা টিপ্লেই বিজলী পাখার অক্লান্ত সেবা। কিন্তু এর চেয়ে আরো বেশী পরিবর্তন হয়েছিলো তারাদাসের দেহে আর মনে। ভামিনীর যত্ন আস্তির বিরাম নাই, আপিস যাবার আগে আলনার ওপর একখানি করে কৌচানো ধুতি এখনও তার জন্ত অপেক্ষা করে থাকে, জুতো জোড়াটিও দিব্যি বার্ষিককরা। কিন্তু এত গেরো দিলে আর হবে কি? আয়নার সামনে দাঁড়ালে তারাদাসের অন্তরপুরুষ বেশ একটু শুকিয়ে উঠতো।

অনেক কিছু বদলেছে, শুধু যে ব্যাপারটি আজ তিরিশ বছর ধ'রে দিনের পর দিন ঘড়ি ধরে ঘটে চলেছে সেটি হচ্ছে আপিস আর বাড়ীর মধ্যে তাঁতের মাকুর মত আনাগোনা, দাঁত নড়েছে ও পড়েছে, চুল ফিকে থেকে সাদায় পৌঁছেছে, ঋতু দেহ সামনে কিছু হুয়ে পড়েছে কিন্তু দশটা পাঁচটার বিরাম নেই।

অমনি করে যখন তারাদাস খেয়া নৌকার পাটনির মত এদার ওপার করে শেষ পাড়ি জমাবার প্রতীক্ষায় বসে আছে, তখন এলো এক আকস্মিক মুক্তি। ভামিনীকে লুকিয়ে আপিসের ছোট সাহেবের পীড়াপীড়িতে দুটি টাকা দিয়ে

কিনেছিলো এক ডার্কির টিকিট। অন্ততঃ দু'দিন ধরে এই দুটো টাকার খোঁচা তার বুকে খচ্ খচ্ করে বিধেছিলো।

সে আজ তিনমাস হ'য়ে গেলো, টিকিটের কথা ত মনেই নেই, ভামিনীকে লুকোবার জন্তে মনে মনে যে আত্মতির-স্বারের কালো মেঘটুকু জমে উঠেছিলো, আশ্বে আশ্বে সে টুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে।

সেদিন শনিবার। সকাল থেকে টিপ্ টিপে বৃষ্টি। ক্রমে যত আপিসের বেলা হ'তে লাগলো বৃষ্টিও তত বাড়তে লাগলো। ঠন্ঠনের গোড়ে বেশী জল জমে উঠেছে। তারাদাস আজ তেমনি কৌচানো ধুতির ওপর চুনোট করা পাঞ্জাবী আর উড়নি চাপিয়ে বাসে চেপে আপিসে চলেছে। বৃষ্টির জন্ত দেবী হ'য়ে গেছে, পোড়া আপিসেও তেমনি কাজের চাপ বেড়েছে। শনিবার হ'লে কি হবে, আজ আবার মাসকাবারী—আজ বাড়ী ফিরতে সেই ছ'টা। ক' দিন থেকে ভামিনী বায়না ধরেছে 'কপালকুণ্ডলা' দেখবে', তারাদাসের নিজেরও কি সাধ ইচ্ছে নেই! ভাবতে ভাবতে ক্রান্তি ও বিরক্তিতে তার মন ভারী হ'য়ে উঠলো।

প্রায় ১৫ মিনিট দেবীতে তারাদাস পৌঁছলো। ঢুকতেই ছোট সাহেবের ঘর থেকে তারাদাসের জরুরি তলব এলো। ব্যাপার কি?

দেবীতে আসার জন্ত তারাদাসের মনটা তেমন প্রসন্ন ছিলো না, তার ওপর আপিসে পা বাড়াতে না বাড়াতে সাহেবের ডাক! মনটা কেমন বিষণ্ণ হ'য়ে উঠলো, কিন্তু সাহেবের নামের এমনি গুণ যে পা দুটো বেশ দ্রুত বাস্তব সাহেবের কামরার দিকে এগিয়ে চললো, কোনো বিদ্রোহের লক্ষণই দেখা গেলোনা তাদের।

পাঁচ মিনিট পরে তারাদাস যখন সাহেবের কামরা থেকে বেরিয়ে এলো তখন ত সবাই অবাক। তারাদাসের

কাঁধ চাপড়াতে চাপড়াতে সঙ্গে সঙ্গে বের হ'য়ে এলেন ছোট এবং বড় দুই সাহেব । আফিস শুদ্ধ লোক ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো । সাহেবেরা কি দিন দুপুরে মাতলামি জুড়ে দিলে নাকি ? বেচারী তারাদাসের কি ঘাম দিচ্ছে, দু' পাশে দুই সাহেব, তার আবার পিঠ চাপড়াচাপড়ির ধুম, সে কীভাবে কি হাসবে ঠিক কর্তে পাচ্ছে না ।

বড় সাহেবের মুখে আপিসের বাবুরা যে খবর শুনলে তার সারমর্ম এই যে ডাক্তার টিকিটে তারাদাস কমসে কম পঞ্চাশ হাজার টাকা জিতেছে সেই খবর এইমাত্র টেলিগ্রাম যোগে ছোট সাহেবের কাছে এসেছে ।

সে দিনকার মত তারাদাসের ছুটি মজুর করে' সাহেবরা স্ব স্ব কামরায় ঢুকতে না ঢুকতেই তারাদাসের চারপাশে ভিড় জমে গ্যালো । আপিসের একটি ফাজিল ছোকরা এসে তারাদাসের গায়ে হাত বুলিয়ে দেখে বললে, “কই না ত, ‘তার মানে ?’ ব’লে তারাদাস তার পানে চাইলে ছেলেটি উত্তর দিলে “শুনেছিলুম যে হঠাৎ টাকাকড়ি পেলে নাকি পেট ফুলে ওঠে, আর দম ফেটে মাতুষ মরে যায় ।” “ওরে বাপরে ফুলবার যো কি ? দু'পাশে দুই যম, তার ওপর আবার মিষ্টি হাতের আদর !”—বলে তারাদাস মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো ।

যাক, তার না হয় সাহেবদের কল্যাণে মাথা ও পেট ঠিক আছে, কিন্তু ভামিনীর দশা কি হবে ? চিন্তিত মনে তারাদাস বাড়ীর দিকে পা বাড়ালে । ইচ্ছে করেই সে ট্যাক্সি নিলে না বা বাসে চড়লো না । দুপুর রোদে হেঁটে হেঁটেই সে বাড়ী চললো । রুষ্টি তখন থেমেছে । আফিস থেকে বেরবার আগে কি ভেবে তারাদাস আফিসের দারোয়ানদের কাছ থেকে একখানা কবুল চেয়ে নিয়েছিলো । হেঁটে হেঁটে তার ভিতরের উত্তেজনা বেশ খানিকটে জুড়িয়ে এসেছে । বাড়ীর কাছে এসে কবুলখানি খুলে বেশ করে' গায়ে জড়িয়ে নিলে ।

খাওয়া দাওয়া সেরে ভামিনী সবে একটু দিবানিদ্রার আয়োজন করছিলো এমন সময়ে সদর দরজায় জোরে কড়া নড়ে উঠলো । দরজা খুলতেই এই ভরা দুপুরে আপাদ মস্তক কবুল মুড়ি দিয়ে তারাদাসকে অসময়ে বাড়ী ফিরতে

দেপে উষ্মে তার মুখখানি শুকিয়ে গেলো । “বড্ড জর এলো গো” বলে কাঁপুনির ভঙ্গীতে তারাদাস ঘেয়ে সোজা খাটের ওপর সটান শুয়ে পড়লো । তন্তে ব্যন্তে ভামিনী তারাদাসের মাথার কাছে ঘেয়ে বসলো, বললে—“এই ভালো মাতুষ নেয়ে খেয়ে আপিস গেলো, এর মধ্যেই জর করে বসলে ! কই দেখি” বলে সে তারাদাসের মাথায় ও গায়ে হাত দিয়ে দেখতে লাগলো । ততকণে তারাদাস পাশ ফিরে ফুলে ফুলে নিঃশব্দ হাসছে, কাঁহাতক আর অভিনয় করা যায় ! তার রকম সকম দেখে বিনোদিনী, কিন্তু আরো ঘাবড়ে গেলো, জরের সঙ্গে আবার বিকারও যোগ দিলে নাকি !

কবুল ছুড়ে ফেলে তারাদাস তখন দিব্যি উঠে বসলে ও আন্তে আন্তে ব্যাপাখানা সব ভেঙ্গে বললে । হঠাৎ সুসংবাদ শুনে পাছে বিনোদিনীর মাথা বিগড়ে যায় তাই তাকে একটু ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছিলো ।

২

আঃ বাঁচা গেছে : একেবারে একটানা মুক্তি ! আর টানা পোড়েন না ! নাকে মুখে শুঁজে সেই দশটা বাজতে না বাজতে আপিসে ছোট, ছোট বড় মাঝারী সাহেব ও উপরআলার মুখখিচুনী, সাতঘণ্টা কলম পেশা ও তার পর ধুকতে ধুকতে বাড়ী ফেরা—আজ থেকে এ সবে একদম ইস্তফা । অথও অবসর ও নিশ্চিন্ত সচ্ছলতার ছবি এঁকে দম্পতীর দিন কাটতে লাগলো । চন্দননগরে গজার একেবারে গায়ে বাগানবাড়ী কেনা হ'য়েছে । ৭সখানকার ঘরকন্নার আয়োজনে ভামিনীর আর মরবার ফুরাস্ত নেই । তারাদাসকে সে ঢালা হুকুম দিয়ে দিয়েছে যেখানে ইচ্ছে সে বেড়াতে যেতে পারে । তাগিদ দিয়ে দিয়ে সে তারাদাসকে আজ চিড়িয়াখানা, কাল যাদুঘর, পরশু শিবপুরের কোম্পানীর বাগানে পাঠিয়ে দেয়, সঙ্গে দেয় ছোট একটি হাতব্যাগে করে খাবার আর পানের ডিবে ।

এক একদিন ভামিনীও সঙ্গে যায় । কয়েকদিন বেশ কাটলো, কিন্তু ভামিনীর কড়া চোখে কিছু এড়াবার যে

নেই। সে দেখলো তারাদাসের উৎসাহ যেন ক্রমে নিভে আসছে। বেড়াতে যাবার নাম হ'লে তার যেন গায়ে জ্বর আসে। মেজাজ প্রায়ই বিগড়ে থাকে, ভালো কথা বললেও অকারণে বিরক্তি প্রকাশ করে। রাত দিন মুখখানি চুণ করে এঘর ওঘর ঘুরে বেড়ায়। বাহিরে পা বাড়াবার নামটি নেই। সে ভালো করে খায় না, হেসে কথা কয় না। ভামিনীর মনটা কেমন ভারী হয়ে উঠলো। চন্দননগরে সংসার পাতবার জন্ত যে ক্ষিপ্ত আয়োজন চলছিলো তাতেও যেন ভাঁটা পড়ে এলো।

ঘড়ির কাঁটা যত এগুতে থাকে তারাদাসের চাঞ্চল্যও তত বেড়ে ওঠে। হঠাৎ একদিন তারাদাস সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে কোথায় বেরিয়ে গেলো, বিকেলে যখন সে বাড়ী ফিরলে তখন তার মুখে চোখে বেশ একটা খুসীর দীপ্তি উপচে পড়ছে দেখে ভামিনীর মনের মেঘ একটু কেঁটে গেলো, সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। সেই থেকে তারাদাস রোজ সকাল সকাল খেয়ে বেরিয়ে যায় আর ছটা নাগাং ফেরে, কিন্তু কোথায় যায় কি করে কিছুই বলে না। ভামিনীও কিছু অহুমান কর্তে পারে না। নাই পারুক, তারাদাস যে আর মুখ গোমড়া করে থাকে না, বেশ খায় দায় হেসে কথা কয় এইটুকুই তারপক্ষে যথেষ্ট। এমন সময়ে এক অবাক কাণ্ড! দিন পনেরো পরে একদিন দুপুরে ভামিনী একটু গড়িয়ে নিচ্ছে, বেলা প্রায় দুটো হবে। এমন সময়ে জোরে কড়া নড়ে উঠলো, দরজা খুলতেই অপূর্ব দৃশ্য— মুখ কাচুমাচু করে তারাদাস দাঁড়িয়ে আর তার হাত ধরে

মূর্তিমান যমের মতো এক লালপাগড়ী। ব্যাপারটি সংক্ষেপে এই।—তিরিশ বছরের অভ্যাস তারাদাসকে ভূতের মত পেয়ে বসেছিল। সে দুটো নাকে মুখে গুঁজে সেই পোড়া আফিসেরই আশে পাশে ঘুরে বেড়ায়! লজ্জায় সেখানে ঢুকতে আর পারে না। আনাচে কানাচে ঘুরে পাঁচটা বাজলে বাড়ী ফেরে। এমন করেই সে তিরিশ বছরের থ'য়ে বন্ধনের জের টেনে যায়। এখন আপিসের কাছেই ছিলো একটা গাছের তলায় একটা চিঠির বাক্স। বিটের সাবেক পাহারাওয়ালার সংপ্রতি বদলী হ'য়ে গেছে, নতুন পাহারা-ওয়ালার তারাদাসকে চেনে না। কয়দিন ধরে সে লক্ষ্য করে যে তারাদাস সেই গাছতলার কাছে ঘুরে বেড়ায়! সহরে তখন দিন গেলে দু'পাঁচটা চিঠির বাক্সে কারা সব আঙুল লাগিয়ে দিচ্ছে, আর যায় কোথা! আজ পাহারাওয়ালার সাহেব তারাদাসকে পাকড়াও করে বসেছে। সে আর কোন্ মুখে বলে যে মৃদাদোষের বেশেই আজ তার এমন বিপত্তি! আপিসে গেলে হয়ত সব গোল চুকে যেতো, কিন্তু কেলেকারীর ভয়ে তারাদাস আপিসের পরিচয় চেপে গেলো। অনেক কাকুতি মিনতিতেও যখন পাহারাওয়ালার সাহেবের মন ভিজলো না, তখন অগত্যা তারাদাসকে সেপাইজীর সঙ্গে বাড়ী আসতে হ'ল, ভামিনী সনাক্ত কর্তে তবে সে মুক্তি পেলো।

ভামিনী মুখ টিপে হেসে বলে “থ'য়ে বন্ধন আর কাকে বলে!”

## কৈফিয়ৎ

যাঁহাদের আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি পাইয়া আমরা এই মাসে আচার্য্য সংখ্যা বাহির করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাঁহাদের প্রবন্ধাদি পাইতে বিলম্ব হওয়ায় বাধ্য হইয়াই আমরা তাহাতে নিরন্তর রহিলাম। তবে আশা করি আগামী প্রাবণ মাসে আমাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিতে পারিব।

বিনীত

সম্পাদক

## সঙ্গীতোৎসব

শ্রীহরভূষণ সেন

অপূর্ব সঙ্গীত মূর্ছনায়  
স্বপ্নাত্ত ছায়াপথে চিত্ত মোর ধীরে চলে যায় ;  
অতুল আনন্দলোকে রহস্তের পারাবারে  
নব নব সৃষ্টির উন্মেষে  
উন্মুক্ত উদার সুরে ছুটিয়াছে লক্ষ্যহারা  
সে বিহ্বল দৃষ্টির আবেশে ;  
মায়াময় সংসারের সে ক্রন্দন আজিকে নিঃকল  
নির্বাকের অন্তঃপুরে ঘুরে মরে কাতর বিহ্বল ;  
আজি মনে হয় মোর, সেই অলৌকিক মুগ্ধ মন্ত্র  
মধুর মঙ্গল সুর ঝঙ্কারিয়া ওঠে দেহ-যন্ত্রে ।

( ২ )

উর্বশীর কলকণ্ঠ হ'তে  
নন্দনের পথ বহি' সে যে আসে যেন মর্ত্যপথে  
পূত মন্দাকিনী ধারা ; সেই মহাতীর্থ মাঝে  
চিত্ত যেন ধীরে নেমে যায় ;  
অতল গভীর সে যে,—অস্তহীন পারাবার,  
যত যায় সীমা নাহি তায় ;  
আনন্দের রসাবেশে উদ্ভাস্ত চপল চিত্ত মোর  
রহে তবু নির্বিকার ; কী এক সুন্দর বাহুডোর  
অনন্ত মুক্তির পথে ধীরে যেন টেনে নিয়ে চলে ;  
আমারে ঘিরিয়া তাই উৎসবের তরঙ্গ উছলে ।

পুষ্প -

‘ইন্দিতির অভিনব প্রস্তাব’ সম্বন্ধে চৈত্র ও বৈশাখ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ।



# জীবনবীমা ও বাঙ্গালার কর্তব্য

শ্রীশরৎ ঘোষ

বাঙ্গালী সাহিত্যে বড়, বিজ্ঞানে বড়, দেশপ্রেমে বড় কিন্তু ব্যবসা ও বাণিজ্যে অল্প দেশের তুলনায় তার কৃতিত্ব অতি তুচ্ছ। কলে বাংলা শাস্ত্রসম্পদে অতুলনীয় হইলেও তাহার ধনশক্তি অল্প প্রদেশের উद्यোগী ব্যবসায়ীদের করতল গত। আমদানি রপ্তানি পাট ও চা কয়লা ও যানবাহন ইহাদের কোনটিতেই বাঙ্গালীর আজ আধিপত্য নাই। চাকরী নিশ্চিন্ততার কি মোহ যে বাঙ্গালীকে পাইয়া বসিয়াছে যে আজ তাহার ফলে বাঙ্গালার সম্পদ লুপ্ত হইতে দেখিলেও, বাংলার বুকে অবাঙ্গালীর প্রাসাদ কারখানা নিত্য জুড়িয়া বসিয়াছে দেখিলেও তাহার মনে অনুশোচনা জাগে না! একথা তাহার মনে হয় না যে, দাসত্বে তার স্থখ নেই দারিদ্র্য কখনও সত্যিকার নিশ্চিন্ততা হইতে পারে না; পরানুগ্রহ জীবীরা একান্তই অমানুষ। দেশকে বড় করিতে হইলে চাই জ্ঞান ও ত্যাগ, বীৰ্য্য ও শৌর্য্য, সঙ্গঠন শক্তি ও অর্থ! বিচার অনুশীলন ও পরার্থে আত্মত্যাগে, আদর্শের জন্তে কষ্ট সহিষ্ণুতায় এবং নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখে নির্ভীকতায় ভারতবর্ষে বাঙ্গালীর স্থান আজ অনেক উচ্চে। ইহাদের পিছনে সজ্ঞশক্তির এবং অর্থের সচ্ছলতা নাই বলিয়া এদেশের উন্নতি যত দ্রুত হওয়া উচিত ছিল তাহা হইতেছে না; সজ্ঞবদ্ধতা এবং অর্থশক্তি একটা অনুষ্ঠানকে কতদূর সফল করিয়া তুলিতে পারে গত মুক্তি আন্দোলনে বোম্বাই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছে। যে ত্যাগ শক্তি একমাত্র বোম্বাই সহরে আবির্ভূত হইয়া সেধানকার ব্যবসায়ীদের সহায়তায় ঐ রকম অঘটন ঘটন সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল, সেই ত্যাগশক্তি বাংলার প্রতি জেলায় ভদ্রপেঙ্গা বেশি পরিমাণ থাকিয়াও হুধু সজ্ঞশক্তি ও অর্থের অসচ্ছলতার জন্য আশাহুরূপ সফলতা অর্জন করিতে পারে নাই।

সম্প্রতি একটু আশার লক্ষণ দেখা দিয়াছে যে, দেশের প্রধান প্রধান ব্যবসায়ে বাঙ্গালী আজ যোগ দিতে আরম্ভ

করিয়াছে। কাপড়ের কল, নিত্য নৈমিত্তিক আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি নির্মাণ, ঔষধ ও প্রসাধন দ্রব্য প্রস্তুত করা প্রভৃতি কাজে বাঙ্গালীরা আজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। জীবন বীমার ক্ষেত্রেও এদেশের লোকের কিছু তৎপরতা দেখা যাইতেছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশে যে কয়েকটি বীমা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত তুচ্ছ করিবার মত নহে। এ কথা ভুলিলে চলিবেনা যে, দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাঙ্কিং এর নীচেই এই জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানের স্থান। আমেরিকা আজ যে শিল্পে ও বাণিজ্যে এত বড় হইতেছে তাহার মূলে, এই জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান সংগঠনে তাহাদের অসাধারণ সাফল্য।

জীবনবীমা প্রণালী এমন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে অসাধুতা ও অবिवেচনা না থাকিলে ইহার কোম্পানী কখনই নষ্ট হইতে পারে না। শুধু যে নষ্ট হইতে পারে না এমন নয়, অতি শীঘ্রই ইহার ভাঙারে এত অর্থ সঞ্চিত হয়, যে কোম্পানীগুলি জীবনবীমাকারীদের দাবী মিটাইয়াও অনায়াসে দেশের শিল্পকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। বস্তুত যে সব বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি সফল হইয়াছে তাহাদের সম্মুখে সমস্যা এই যে কি করিয়া তাহাদের সঞ্চিত অর্থ তাহারা নিয়োগ করিবে। এই হিসাবে যে দেশে একটি সফল বীমা প্রতিষ্ঠান থাকে, সে দেশে নূতন নূতন শিল্পের আবির্ভাব ও পরিপুষ্টি অনিবার্য। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে, জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে দেশ বাসীর কি কর্তব্য তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। আমরা সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার সমর্থন করি না। কিন্তু যেখানে এই প্রদেশের শিল্পগুলি অর্থাভাবে নিজ্জীব সেখানে যদি বাঙ্গালীরা অবিবেচকের মত অপর প্রদেশের অথবা বিদেশের বীমাকোম্পানীতে তাহাদের জীবনবীমা করিয়া নিত্য রাশি রাশি টাকা বাংলা হইতে বাহির করিয়া দেন, তাহা হইলে

আমরা কিছুতেই ক্ষুদ্র না হইয়া পারি না। জীবনবীমা সম্বন্ধে বাঙ্গালীর প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত এই যে, যে বীমা প্রতিষ্ঠান এদেশীয় তাহাতেই যেন তাঁহারা জীবন বীমা করেন। বিশেষতঃ যে সব বীমাকোম্পানী তঁহারা দেশীয় শিল্পকে সাহায্য করিতেছে তাহারা যেন অন্য বীমা কোম্পানী অপেক্ষা বাঙ্গালীর সহায়ভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতার অধিকারী হইতে পারে।

এ সম্পর্কে আমরা আমাদের সব প্রতিষ্ঠান ইষ্টার্ন-ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কথা দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। এই কোম্পানী শুধু বাঙ্গালী দ্বারা প্রবর্তিত এবং বাঙ্গালীর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিপুষ্ট তা নয়, পরন্তু ইহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য বাংলার প্রধান শিল্পগুলিকে সহায়তা করা। এই উদ্দেশ্যে ইহার পরিচালকেরা বাংলার বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা ইণ্ডিয়ান কিনেমা আর্টস লিমিটেড

পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। দেশীয় শিল্পের মধ্যে চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের স্থান যে কত উচ্চে তাহা আমেরিকার কথা মনে করিলে অনায়াসেই বুঝা যায়। আমেরিকার সহস্র সহস্র নরনারী চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে তাহাদের জীবিকা অর্জন করিতেছে। ইণ্ডিয়ান কিনেমা আর্টস চলচ্চিত্র নির্মাণে কতদূর কৃতিত্ব দেখাইয়াছে তাহার পরিচয় ‘কণ্ঠহার’ ‘শঙ্করাচার্য’ ও ‘ভাগ্যলক্ষ্মীতে’ পাওয়া গিয়াছে। যাহারা দেশীয় শিল্পের মঙ্গল কামনা করেন তাঁহাদের কাছে আমরা এ দাবী অনায়াসেই করিতে পারি যে জীবনবীমা করিবার সময় তাঁহারা যেন ইষ্টার্ন ন্যাশন্যাল প্রভৃতি কোম্পানীর কথা স্মরণ রাখেন। তাঁহারা যেন ভুলেন না যে ইষ্টার্ন ন্যাশন্যাল প্রভৃতিকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিলে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলা হইবে।

## বাতায়ন

### “আপনি কৃপাণ ধরুন গো”

আইন অমান্য আন্দোলন প্রসঙ্গে বাংলার কুলবধূরা যে শক্তি ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতেছেন রাজনীতির দিক দিয়া আমরা আজ তাহার লাভকৃতির পরিমাপ করিতে চাহিনা। কিন্তু এই ব্যাপার হইতে আমরা নিঃসংশয়ে এই সত্য সংগ্রহ করিলাম যে প্রয়োজন হইলে বাংলার চির অবহেলিত নারীসমাজ এক দিনেই অবরোধ ও অক্ষমতার সকল ঘানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া সংস্কারমুক্তা কল্যাণীকপে সার্থক হইয়া উঠিতে পারেন। এই আগরণের জন্ত স্কুল কলেজের শিক্ষা, এমন কি অক্ষরজ্ঞান পর্যন্ত যে অত্যাবশ্যক নয় সে প্রমাণ আজ বাংলার অনেক পল্লীগ্রামে পাওয়া গেল।

কিন্তু এই জাগৃতির পাশাপাশি রহিয়াছে এক অতি লজ্জার কথা। কতকগুলি মাংসলোলুপ নরপশুর হস্তে দিনের

পর দিন নারীর যে লাঞ্ছনা ও ধর্ষণ চলিয়াছে তাহাতে নিরীক্ষ্য পুরুষ সমাজের লজ্জা রাখিবার ঠাই নাই। ধর্ষণকারী হিন্দু কি অহিন্দু সে তর্ক থাক, তবে তাহারা পুরুষ এবং আফশোষের বড় কথা এই যে তাহারা স্ত্রী কন্যা ভগিনী জননী লইয়া বসতি করে। নারীরক্ষার জন্য কোথাও কোথাও যুবকগণ সম্মুখ হইতেছেন শুনিয়াছি, কিন্তু আমাদের মনে হয় এ রোগের এ ঔষধ নহে। অস্তঃপুরের কারাঙ্ককারে পুরুষের আওতায় থাকিয়া থাকিয়াই আজ নারী পুরুষের প্রতি একান্ত নির্ভরশীল। তাই তাহার এত দুর্গতি। আপনার মান আপনি রাখিতে না পারিলে তাহার আর কল্যাণ নাই। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় বাংলার নারীশক্তির বোধন হইয়া গিয়াছে—নারী এবার স্বয়ং কৃপাণ ধরিয়া আপনার মান রাখিতে পারিবে এমন আশা হয়।

## আচার্য্য জম্মতি

দৈনন্দিন আরাম বিরামের সন্ধীর্ণ গভীর মধ্যে যাহাদের তিন শত পয়ষট্টি দিন কাটে, মহাপুরুষদের ত্যাগপূত চরিত-কথা আলোচনায় তাহাদের মনের গ্রন্থি কথঞ্চিৎ শিথিল হইতে পারে। যুগে যুগে তাই বড়োর পূজা বা বীরপূজা। এ পূজা স্বাজাত্য বা স্বাদেশিকতার অপেক্ষা রাখেনা, তাই আজ সুদূর বাংলার পূজাগণ্ডে আসন পড়িয়াছে জর্জ ওয়াসিংটন ও গায়টের। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন এক অপূর্ণ যজ্ঞবিশেষ। জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমের ত্রিধারা মিশাইয়া যে অনির্কণ শিখা তিনি অন্ধকার দেশের বুকে জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন তাহার আলো বছবৎসর ধরিয়া দিশাহারা দেশবাসীকে পথ দেখাইবে। অনেকে বলেন যে জনসেবায় তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার যে অপচয় হইল দেশের ও জগতের পক্ষে সে এক বিষম ক্ষতি। আমরা বলি যে মুক্তিযজ্ঞ তিনি বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কানে দিতেছেন সেই ত শ্রেষ্ঠ রসায়ন যাহার গুণে মাটি সোনা হয়, যতদেহে জীবনের স্পন্দন জাগে।

## অসুস্থ

শিক্ষায়াতনে বালক বালিকা ও যুবক যুবতী অবাধ মেলামেশার প্রথার প্রচলন এদেশে বেশী হয় নাই এখনও। কিন্তু এরই মধ্যে দু'একটি অধ্যাপক বন্ধুর মারফৎ যে সকল কথা আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে তাহাতে মনে হয় অন্ততঃ কতকগুলি ছাত্রের মনে এখনো স্বস্থতার অভাব আছে। অধুনিকতার পুরোধা হইয়াও বন্ধুগণ এরই মধ্যে একত্র শিক্ষার সমীচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহান হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু এ আতিশয্য প্রকৃতির প্রতিশোধ বই আর কিছু নহে। অভ্যাস ও সময়ের গুণে ছাত্র ছাত্রীদের সম্বন্ধ স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর হইয়া উঠিবেই।

## পুনরুপ

মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আততায়ীর হস্তে নৃশংস-ভাবে নিহত হইয়াছেন। গত বৎসর প্রায় এমনই সময়ে এই সহরে অসুস্থ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছিল। রক্তের পিচ্ছল পথে দেশের মুক্তিরথকে আগাইয়া আনিবার কল্পনা যাহারা করেন

তাঁহাদের দৃষ্টিতে আর যাহাই থাকুক সত্য ও শিবের স্থান নাই।- এ পথ ভারতের নহে। আমরা সর্বাস্বঃকরণে যুতের পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জানাই এবং প্রার্থনা করি,—দূর হউক সকল বিঘ্নেঘের মানি, জয় হউক প্রেমের।

**রবীন্দ্র পরিভ্রমণ**—পারস্য পরিভ্রমণ শেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ইরাকে পৌছিয়াছেন। কবির ৭১ তম জন্মতিথিতে তেহরান নগরে যে উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরব ও আনন্দের কথা নহে। প্রাচীনকালে এশিয়াবাপী যে কৃষ্টি ও দৃষ্টির সামঞ্জস্য ছিল, কালক্রমে তাহা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিলেও লোক-লোচনের অন্তরালে তাহা ক্ষুধারার জ্বালা প্রবাহিত হইত। আজ রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করিয়া সেই মিলনের স্বর্ণমুত্র দৃঢ় হইতে চলিয়াছে। ইতঃপূর্বে চীন, জাপান ও যবদ্বীপে রবীন্দ্র প্রতিভার আলোকপাত হইয়াছে। পারস্য ও ইরাক পরিভ্রমণ শুধু কবির বৈচিত্র্যময় জীবনের একটি ঘটনা নহে, এশিয়ার ইতিহাসে ইহা একটি নূতন অধ্যায়।

**বিপিনচন্দ্র**—চুয়াত্তর বৎসর বয়সে মহামনীষী বিপিনচন্দ্র সন্ন্যাস রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কি মনীষায়, কি বাগ্মিতায় বিপিনচন্দ্রের একটি বিশিষ্ট আসন ছিল। এক সময়ে বিপিনচন্দ্র বাঙ্গালা দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে অন্যতম পুরোধা ছিলেন। অনেক দেশ-সেবক সেদিন বিপিনচন্দ্রের কাছে তাঁহাদের প্রাণের প্রদীপ জ্বালাইয়া ছিলেন। ধর্মতত্ত্বে তথা বৈষ্ণব সাহিত্যেও তাঁহার দান তুচ্ছ করিবার নহে। কয়েকবৎসর হইতে তাঁহার রাজনৈতিক মতামত একটু ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে বিচার করিবার সময় আজ নহে, প্রধানত-চিত্তে আমরা আজ তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি।

**প্রকৃতির প্রহার**—প্রকৃতির ভয়াল রাকসী মূর্তির সম্মুখে মানুষ যে ভূণের মত অসহায় দেশের দিকে দিকে সেই নিষ্ঠুর সত্যের সাক্ষাৎ মিলিতেছে। খুলনা ও ময়মনসিংহে যে ধ্বংসলীলার অভিনয় হইয়া গিয়াছে

তাহাতে আমরা ব্যথিত ও বিস্মিত হইয়াছি। অর্দ্ধশনজীর্ণ, কোপীন-সম্বল কুটীরবাসী কৃষকদের পক্ষে প্রকৃতির এ প্রহার যে কত নির্মম তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। খুলনা জেলা বোর্ডের তরফ হইতে এরই মধ্যে যে সেবার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার বিষয়। শুধু এই ব্যাপারে নহে, অন্যান্য অনেক বিষয়ে এই জেলাবোর্ডের কার্যকলাপ প্রশংসার ও অনুকরণযোগ্য। বোর্ডের সভাপতি রায়বাহাদুর যতীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় গত কয়েকবৎসর ধরিয়া যেরূপ যোগ্যতা ও সহৃদয়তার সহিত দেশের সেবা করিয়া আসিতেছেন তাহা শুনিতে পুলকিত হইতে হয়। সেবাব্রত আচাৰ্য্য রায়ের স্বদেশে

তাহারই পুণ্য আদর্শের প্রাতিষ্ঠা হইবে ইহাতে বিশ্বাসের কি আছে ?

**বোম্বাই যুদ্ধ**—মহরম উপলক্ষে বোম্বাই নগরে রক্তশ্রোত বহিয়াছে। মৌলানা সৌকত আলীর দূরদৃষ্টির তারিফ করিতে হইবে। তুচ্ছ ঘটনা অবলম্বন করিয়া ধর্মের নামে যে মৃত্যু-লীলার অভিনয় হইল ইহা ভারতবর্ষের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বিদ্রোহের বিষয় মন্বন করিয়া জাতির ভাগ্যবিধাতা কোন অমৃত সঞ্চয় করিতেছেন তাহা কে বলিবে ?

দেখিয়া শুনিয়া ক্রমে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে এর চাইতে আমরা নাস্তিক নিরীক্স হইলাম না কেন ?

## পুস্তকপরিচয়

**পাঁচমিশালী**—শ্রীঅবনীনাথ রায় প্রণীত। ডি, এম, লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। বইখানি দশটি প্রবন্ধের সমষ্টি, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে নিয়েই সাতটি লেখা হয়েছে, বাদ বাকী তিনটিতে লেখক বিষয়ান্তরের অবতারণা করেছেন। এমনি একটা শ্রেণী বিভাগ করলে বইখানির পাঁচমিশালী নাম সার্থক হ'য়েছে বলা যায়। গোড়ায় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা। চৌধুরী মহাশয় ঠিকই বলেছেন যে সমালোচনা সাহিত্যে বঙ্গবাণীর পুঁজি এখনও অকিঞ্চিৎকর। অবনী বাবুর প্রবন্ধগুলি যে অভাব কিয়ৎ পরিমাণেও দূর করবে সন্দেহ নাই।

বিষয়বস্তু আলোচনা করবার আগে প্রমথ বাবুর আর একটা কথা প্রতিদ্বন্দ্বি না করে' পারি না। অবনী বাবুর বলার কথা ও অধিকার আছে আর সে কথা তিনি এমন স্বরস্বরে সাবলীল ভঙ্গীতে বলেছেন যে বইখানি পড়তে পড়তে মন খুসীতে ভরে ওঠে। প্রবন্ধ বা সমালোচনা সাহিত্যের নামে ধারা ভয় পান অতঃপর এ বইখানি পড়লে

তাঁদের সে আতঙ্ক কেটে যাবে আশা করি। এর কোথাও কষ্টকল্পনা নাই, স্বচ্ছ দর্পণের মত বইয়ের পাতায় পাতায় লেখকের বক্তব্য ফুটে উঠেছে। 'অচলায়তন' ও 'ফাল্গুনী'র রূপক দু'টির যে সহজ ব্যাখ্যা অবনীবাবু দিয়েছেন তা' আমাদের মত গদ্য-সর্বস্ব লোকেরও বুঝতে কিছু বেগ পেতে হ'য়না। শরৎচন্দ্রের নামক নাট্যিকা সম্বন্ধে যে কয়টি প্রবন্ধ আছে সেগুলি পড়লে একটা কথা শুধু মনে হয়—কি গভীর ভাবেই না শরৎসাহিত্য লেখককে আকৃষ্ট ও আচ্ছন্ন করেছে! অথচ তাঁর দৃষ্টি কোথাও ঘোলাটে হয়নি-আগাগোড়া বেশ সচেতন ও স্বচ্ছ আছে। দরদী লেখকের দরদী সমালোচক—এমন সমাবেশ বড় উপভোগ্য। কে যেন বলেছেন যে অবনীবাবুর এসব লেখা নিতান্ত ভক্তিয়োগের কথা। হ'লই বা! বড়ো বা ভালো জিনিষকে অন্ধাভক্তি দিয়েই যখন আমরা গ্রহণ করি তখনই বড়ত্ব ও ভালত্বের বীজ অজ্ঞাতে আদের চরিত্রের মধ্যে রোপিত হ'য়ে যায়। চুলচেরা তর্কে শুধু তর্কই বেড়ে যায়—রস থেকে যায় অনা-স্বাদিত। 'তর্কে বহুদূর'। প্রথমবাবু ভূমিকায় বলেছেন



জজিয়াতি করা ক্রিটিকের কাজ নয়। অবনীবাবু সে চেষ্টা করেন নি।

পাঁচমিশেলী সম্বন্ধে অনেকে অনেক আলোচনা করেছেন, এ প্রসঙ্গের দৈর্ঘ্য না বাড়িয়ে একটা নতুন কথা বলে শেষ করি। কাব্যে ও কথা-সাহিত্যে লেখক তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে খানিকটা করে ধরা পড়ে যান পাঠক-পাঠিকার কাছে। কিন্তু সমালোচনা-সাহিত্যে পাই শুধু তাঁর মগজের, যুক্তি-শক্তির ও বিচার বুদ্ধির পরিচয়। পাঁচমিশেলীতে কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। পাঁচমিশেলী পড়বার আগে স্বয়ং অবনীবাবুকে পড়বার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছে। বই-খানির লাইনে লাইনে লেখকে ও লেখায় মিলে মিশে একাকার হ'য়ে গেছে।

বিশেষতঃ শরৎ সাহিত্যের সমালোচনায় অবনীবাবুর সকল যুগোস খুলে পড়েছে। বিজ্ঞেরা মাথা নেড়ে হয় ত বলবেন—‘উঁহ, ওসব চলবেনা, ভালো লেখককে হ'তে হবে ষোল আনা নিবৃত্তিক, হৃদয় বা দরদ বলতে যা' কিছু সব ঘুচিয়ে দিতে হবে, আর সার কর্তে হবে শুধু একরাশ মগজ ও ছ'টা স্তূতিক চোখ যার দৃষ্টি হবে রঞ্জনরশ্মির মত সঙ্কানী।’ আমরা অতশত বুঝি না, আমরা ভক্তিবোধের মধ্যেই স্বাস্থ্যের আভাষ দেখতে পাই।

বইখানিতে স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীগণের প্রচুর শিক্ষার বস্তু আছে।

### জহুরী

**বামুনবাগ্‌দী—‘রক্তের টান’ ও ‘প্রণয়-প্রতিমা’**  
লেখক শ্রীযুক্ত অরবিন্দ দত্ত প্রণীত উপন্যাসগ্রন্থ। ২০৩।১।১  
কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটস্থ ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনরেন্দ্র নাথ কোঁড়ার কর্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। সোনার জলে লেখা, কাপড়ে বাঁধাই ২২৪ পৃষ্ঠা মূল্য দুই টাকা; ছাপা ও কাগজ ভাল।

সাময়িক পত্রের পাঠকদিগের নিকট লেখক সুপরিচিত। বইখানি সুপ্রসিদ্ধ “প্রবাসী” পত্রে সূদীর্ঘকাল ধরিয়া ধারা-বাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

আলোচ্য উপন্যাসখানির আখ্যানভাগ খুব সাধারণ।

খুলনা জেলার উত্তরপাড়া নিবাসী নিতাই বাগ্‌দী একটি আড়াই বৎসরের শিশুপুত্র রাধিয়া বিষ্মটিকা রোগে লোকান্তরিত হইলে নবীন বাগ্‌দী নামক ভিন্ন গ্রামবাসী এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় শিশুটিকে লইয়া নিতাইয়ের মনিব প্রবল জমিদার সুরেন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। শিশুটির অল্প কোন অভিভাবক না থাকায় স্নেহের নিব্বরিণী জমিদার-মাতা বিধবা মহেশ্বরী শুদ্ধাচারিণী হইয়াও এই অস্পৃশ্য শিশুটির লালনপালনের ভার গ্রহণ করিলেন। শিশুটির নাম রাখা হইল কানাইলাল মজুমদার। সুরেন্দ্র পুত্র বলাই ও কন্যা শান্তির সহিত মহেশ্বরীর আদরযত্নে কোন প্রকারে ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচাইয়া কানাইলাল দিন দিন বাড়িতে লাগিল এবং সন্ধ্যা সন্ধ্যা সাহিত্য ব্যাকরণ, ইতিহাস, গীতা, উপনিষদ প্রভৃতি অনেকগুলি পুস্তক পড়িয়া ফেলিল। মহেশ্বরীর সংশিকার প্রভাবে কানাইলালের চরিত্র নানাগুণে পল্লবত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং অত্যধিক স্নেহে বালক একটু অভিমানীও হইল।

কানাইলাল ষোড়শ বর্ষে পদাপর্ণ করিলে মহেশ্বরী সেতুবন্ধ রামেশ্বর দর্শনের জন্ত তারিণী মামাকে লইয়া তীর্থ-যাত্রা করিলেন। কানাই ও বলাই সঙ্গ লইল। হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া কানাই একটি ভদ্রলোকের পীড়িতা স্ত্রীর ঔষধ আনিতে গেল। তখন সকলে টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছে। যাইবার সময় বলিয়া গেল যদি তাহার আসিতে দেরি হয় তাহা হইলে সকলে যেন গাড়ী হইতে নামিয়া পড়ে—পরের গাড়ীতে যাওয়া হইবে। কিন্তু তারিণীমামার চক্রান্তে ষথাসময়ে গাড়ী হইতে নামা হইল না; গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কানাই ফিরিয়া আসিয়া দেখিল গাড়ীখানা চলিয়া গিয়াছে। তখন সে সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল। মহেশ্বরী বা অপর কাহাকেও দেখিতে পাইল না। অভিমানে কানাই দেশে খবর পাঠাইল না, বিপন্ন ভদ্রলোকটির সহিত ঘাঁটালে চলিয়া গেল।

এদিকে মহেশ্বরী তীর্থযাত্রা স্মৃতি রাধিয়া কলিকাতায় বাসায় ফিরিয়া আসিলেন ও কানাইলালের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। কানাই

ঘাঁটালে চাকরি করিয়া পরোপকার, ঔষধ বিতরণ ও শিক্ষার্থী ছেলেদের সাহায্যের জন্ত বিখ্যাত হইয়া উঠিল। একদিন বাজারে আগুন লাগিলে কানাই একটি রমণী ও একটি শিশুকে আগুনের মুখ হইতে রক্ষা করিল। এই সূত্রে একখানি খবরের কাগজের মারফৎ মহেশ্বরী কানাইএর সন্ধান পাইয়া তাহাকে দেশে লইয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে আরও তিনটি বৎসর অতীত হইল কানাই শিষ্ট শাস্ত্র বিনয়ী ও ধর্মপরায়ণ হইয়া উঠিতে লাগিল এবং স্বথেন্দুর বিষয়কর্ম পর্যবেক্ষণের ভার কানাইয়ের উপর পড়িল। কিন্তু জমিদারী সংক্রান্ত একটি মোকদ্দমায় স্বথেন্দু তাহাকে মিথ্যা বলিতে পীড়াপীড়ি করায় কানাই একান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল এবং বিবেকবাণীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্যের দৃষ্টান্ত পীড়িত হইয়া দেহত্যাগ করিল। মহেশ্বরী সেই মৃত্যুমলিন দেহের উপর লুটাইয়া মহানিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িলেন।

এই সাধারণ আখ্যান অবলম্বন করিয়া লেখক একটি অনন্তসাধারণ রমণীমূর্তি অঙ্কিত করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের সম্মুখে একটি মহান সমস্যা উপস্থিত করিয়া তাহার সমাধানের ইঙ্গিত করিয়াছেন।

জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা হিন্দুদের দুঃপন্থ কলঙ্ক-স্বরূপ। সংসারের দুঃখ যেখানে আমাদের ভিতরের মনুষ্য সমবেদনায় কাতর হইয়া সাহায্যের জন্ত হাত বাড়াইতে চায় সেখানে আমাদের সমাজের কঠোর কুসংস্কার সেই হাত টানিয়া ধরে এবং ছোঁয়ালেপা বাঁচাইয়া নির্লিপ্ত থাকিয়া শাস্ত্রানুযায়ী ধর্মাচরণের উপদেশ দেয়। আর যখন দেখিতে পাই মহেশ্বরীর জায় উদার হৃদয়া রমণী— যিনি শুধু মধ্যাদার খাতিরে নিরাশ্রয় আত্মাকে আত্মা থেকে পৃথক করে আপনাকে বৃথা তৃপ্তি ও স্বস্তির মধ্যে

ডুবিয়ে রাখতে অনিচ্ছুক, যিনি বলেন মানুষ যখন অসহায় হ'য়ে পড়ে তখন তার সহায় হ'তে হ'লে বিচার আচার চলে না—তিনিও পূজা শেষ করিবার পর বাগদীর ছেলেকে স্নান করাইয়া পুনরায় নিজে স্নান করিতে চলিয়াছেন তখন বুঝিতে পারি সেই সংস্কারের প্রভাব কতদূর মজ্জাগত। এই মজ্জাগত সংস্কার লইয়াও মহেশ্বরী যেভাবে আপনার নির্দোষ পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়া বাগদীর ছেলেটিকে মানুষ করিয়া তুলিলেন তাহা সত্যই অসাধারণ ও প্রশংসনীয়। এই উদারহৃদয়া রমণীর সংশ্রবে আসিয়া মোক্ষদার জায় একজন শুচিবায়ুশ্রুতা জীলোককেও বলিতে হইল “ধন্য তোমায়! আড়াই বছর থেকে দশ বছরে এনে ফেলেছ, আমরা হ'লে পেরে উঠতাম না।” ইহার প্রভাবে স্বথেন্দুর সংসার একান্ত সংকীর্ণ ভাবাপন্ন হইতে পারে নাই অথচ কিরূপ শিক্ষা পাইয়া মহেশ্বরী এমন মননীয় চরিত্র গঠন করিতে সমর্থ হইলেন তাহার আভাষ গ্রন্থকার কোথাও দেন নাই।

ছোট ছোট ঘটনা অবলম্বন করিয়া লেখক স্থানে স্থানে বেশ pathos সৃষ্টি করিয়াছেন। কানাইলালের বাড়ি ফুঁকের মত শিক্ষা ও বলাইএর মচ্কা বেদনার উপশমের জন্ত সেই মন্ত্রের প্রয়োগ বেশ উপভোগ্য।

পুস্তকখানির বিশেষত্ব এই যে সাধারণ উপন্যাসমূলভ যুবক যুবতীর প্রণয়বিবরণ ইহাতে স্থান পায় নাই, এই জন্ত বইখানি আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলের হস্তেই নির্বিঘ্নে তুলিয়া দেওয়া যায়। এই শ্রেণীর পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

কতকগুলি অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ দেখা গেল, যথা, ডাণ্টা, সরদেওয়াল, খোলাট, চিলতে পানা, আজা মশাই, শাক্ক ইত্যাদি।

শ্রীশরচ্চন্দ্র বসাক

## নিবেদন

কার্ত্তিক হইতে যাঁহারা মাত্র ছয় মাসের চাঁদা দিয়াছেন, কিংবা আদৌ দেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া মনিঅর্ডার যোগে স্ব স্ব দেয় চাঁদা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। অগ্রথায় আষাঢ় সংখ্যা ‘ইঙ্গিত’ ভি পি যোগে তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হবে; আশা করি গ্রাহক গ্রাহিকাগণ ভি পি ফেরৎ দিয়া আমাদের কতিপয় করিবেন না। ইতি

বিনীত—কার্য্যাব্যাহক

# ইন্দিত

সর্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥

১ম বর্ষ

৯ম সংখ্যা

আষাঢ়

১৩৩৯

সাল

## বৈদান্তিকের প্রার্থনা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

হে গরিষ্ঠ মহামহীমান্ !

হৃদয়-নৈশব্দ্য মাঝে উর্দ্ধমুখী উঠিছে কুসুমি'

অমর-ক্ষুণ্ণ তব ধ্যান ।

বিশ্বে রাজো তুমি—শুধু তুমি, .

তবু কেন অমা মোরে ঘেরে হায়,—করে আঁখিহীন ?

সূর্যোজ্জ্বল চিত্তাকাশ ধূমি'—

মেঘ-চমু ছায় অমুদিন ?

বিবর্ণ বিক্ষত হই কেন লক্ষ বাসনার রণে ?—

উদ্ভ্রান্ত, চঞ্চল, লক্ষ্যক্ষীণ ?

রহি' রহি' উছাস-দাহনে

তব শান্তিরাজ্য হ'তে কেন হয় নির্বাসিত প্রাণ ?

প্রতি ঘূর্ণিপাকে ঝড়ে—গনে

তারি দিশা কেন হয় ম্লান ?

পড়ি ধরা আচম্বিতে দুঃখ শকা ফাঁদে কেন প্রভু ?

## The Vedantin's Prayer.

SRI AUROBINDO

Spirit Supreme,

Who musest in the silence of the heart,  
Eternal gleam,

Thou only Art !

Ah, wherefore with this darkness am I veiled,  
My sunlit part

By clouds assailed ?

Why am I thus disfigured by desire,  
Distracted, haled,

Scorched by the fire

Of fitful passions, from thy peace out-thrust  
Into the gyre

Of every gust ?

Betrayed to grief, o'ertaken with dismay,  
Surprised by lust ?

লিপ্সা পায় কেমনে সন্ধান ?  
 যেন মুখ না ফিরায় তবু  
 মহতী করুণা হ'তে তব মোর রক্তাক্ত জীবন—  
 বিলম্ব না সহি যেন কভু ।  
 ওগো সত্য ! নিঃসঙ্গ গহন !  
 তব দীপ্তি-ছদ্মবেশী দেবগণ' নাহি যেন পাবে  
 প্রবঞ্চিত মদির-যৌবন ।

স্বক করো বাহারা ফুকারে,  
 অমৃত-উৎকর্ষ যে গো এ-হৃদয়—না শুনিবে মানা  
 শাস্ত্রত এষণা জানিবারে ।  
 চিরন্তন স্বারে দেয় হানা  
 যেই দীপ্ত মরীচিকা—কর দূর ; তার মায়ালোক  
 না রহক আমার অজানা ।  
 দাও দিব্য দৃষ্টি বীতশোক,  
 দাও স্বচ্ছভাতি হৃদি পুনর্নব,—শুধু মিথ্যাশায়  
 আলেয়ায় দিও না স্বেযোগ ।  
 শব্দ-ভ্রান্ত করে যে সে হায় !  
 যুগের পুঞ্জিত গ্লানি অপসরি'—ফিরিয়ে আনায়  
 দাও সে-হারানো শুভতায় ।  
 হে জ্ঞানের প্রচ্ছন্ন দুয়ার !  
 খোঁগো আজি । হৃদয় সিংহবীৰ্য !  
 আজি জাগো হে আত্মায়,  
 ঐশী প্রেম ! বরাও আসার ।

Let not my grey  
 Blood-clotted past repel thy sovereign ruth,  
 Nor even delay,

O lonely Truth !  
 Nor let the specious gods who ape Thee still  
 Deceive my youth.

These clumours still ;  
 For I would hear the eternal voice and know  
 The eternal will.

This brilliant show  
 Cumbering the threshold of eternity  
 Dispel,-bestow

The undimmed eye,  
 The heart grown young and clear. Rebuke,  
 O Lord,

These hopes that cry

So deafeningly,  
 Remove my sullied centuries, restore  
 My purity.

O hidden door  
 Of Knowledge, open ! Strength, fulfil thyself.  
 Love, outpour !

Sri Aurobindo's comment :—"You have made a very fine and true rendering of the Vedantin's Prayer. Perhaps so high and rocky a person as the Vedantin, who is very much of a converted Titan, would not have thought of such a sweet and luscious word as কুহ্মি' in the midst of his ascent and struggle, but these few alterations do not make any real difference to the spirit. There is a quite sufficient nobility and power in your translations.



# বর্তমান ও গান্ধীবাদের উপযোগিতা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু

বর্তমানের যুগটি আসিয়াছে একটা ওলট্-পালটের উন্মাদনা লইয়া। যেন বাত্যা ও প্লাবনের মত দুর্ধর্ষ আবেগ লইয়া সমস্ত প্রকৃতিটাকেই পাল্টাইয়া গড়িবার নিমিত্ত এক অমোঘ শক্তি কালের অভ্যন্তরে থাকিয়া যুগ-তরলীখানিকে বিচক্রগতিতে পরিচালনা করিতেছে। অতীতে, এমন কি ৫০ বৎসর পূর্বেও ভারতের জীবনধারায় এত অস্বাচ্ছন্দ্য, আয়াস-খিন্ন ভাব ছিল না। যে কোন কারণেই হোক ভারত-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য তখন কালের প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আজিকার দিনে বিশ্বের দরবারে ভারত যেমন তাহার নিজস্ব গৌরবময় যুগকে, তাহার আদর্শ শিক্ষাদীক্ষাকে, তাহার সেই লুপ্ত গরিমার বৈভবকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার পাইতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে—শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ কাল পূর্বেও ভারতের জীবনেতিহাসে বোধ হয় আত্মোন্মেষের এমন আশাপ্রদ অভিব্যক্তি প্রকট হয় নাই। তখন ছিল ভারতাত্মার অন্ত-নিহিত ঐশ্বর্য-খিন্নতার ছন্দহারা পাদবিক্ষেপ—তাহার নিজস্ব আদর্শের, দৃষ্টিনীতির হারাইয়া যাওয়া গতানুগতিকতা—আত্ম-বিশ্বস্তির পরিণামহীন স্তূর্ঘ্য ব্যভিচারের একটা লুক্ক অবস্থা। তাহার মধ্যে না ছিল আত্মসংরক্ষণী বুদ্ধি, নাছিল ভারতের আদর্শের বৈশিষ্ট্য এবং তখনকার অল্পমত জীবনধারার মধ্যে বৈষম্য, অনৈক্য ও গরমিলগুলি ধরিয়া লইবার একটা আত্ম-সংস্থ সক্রিয় চেতনা। ভারতের যুগযুগান্তের রক্ষাকবচ যে অধ্যাত্ম নির্দেশ তাহা প্রতীচি-মরীচির স্বর্ণকরোজ্জল দিশায় পড়িয়া মুহূমান প্রদোষেরই মত নিপ্পভ হইয়া অবসন্নতার কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু এই অন্ধকার ভারতের পক্ষে চির অমানিশার ঐতিহ্য না হইয়া, হইয়াছিল আলোকেই একটা ক্রমবর্ধন প্রক্রিয়া। ভারতের গভীরতম সম্ভাব্য যে স্ব-ভাব জ্যোতির স্মৃতিরেখা ছিল, সাময়িকভাবে মেঘাচ্ছন্ন থাকিলেও তাহারই

বিকিণ্ড দিশা আজও পর্যন্ত ভারতকে hellenic সভ্যতার আলোকে নির্ণীত গ্রীস ও মিশরের মত নিশ্চিহ্ন হওয়ার কথা একটা memphis গড়িবার মত বিজ্ঞানিশিল্পে নিঃশেষিত হইবার হাত হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে; বরং পাশ্চাত্য বিজ্ঞার দৃষ্টান্তে, পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলোয়ার আলোকে তাহার কুফলটা, 'কণিকত্বট', তাহার মধ্যে আমাদের হারাইয়া যাওয়ার পরি-মাণটা কতদূর দাঁড়াইয়াছে তাহার নিখুঁত চিত্রটি আমাদের অভিজ্ঞতার দর্পণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; এবং সেই সঙ্গে মঙ্গল জীবনের ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বতন ঋষিদের দৃষ্টির শিক্ষার কার্যকরী শক্তি কতখানি উপযোগী ও অব্যর্থ ছিল—বিকিকিনির কণ্ঠিপাথরে তাহার আসল মূল্যটা, চিন্তাটা সমদিক গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।

তাই আজ দেখিতে পাই যে ধারকরাসভাতার আরাম-শয্যায় ভারতবাসী একদিন মহানিশ্চিন্ততার ছলনায় স্বপ্নাচ্ছন্ন ছিল তাহা এখন কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কেমন করিয়া এই কণ্টকের আঘাত হইতে দেহটাকে নির্বিকল্প ও স্থস্থ করা যায় সেই চিন্তাই হইয়াছে বর্তমানের বিশেষ বিষয়। বাতাস উঠিয়াছে, জোয়ারও আসিয়া পড়িয়াছে—এখন দাঁড় ধরিয়া পাল কষিয়া তরলীটিকে সদগতি দিবার যাহাদের পালা, মত ও পথের স্বচ্ছতা তাহাদের এখন অনিবার্য।

জাতীয় প্রগতির বর্তমান দিশারী মহাত্মা গান্ধী বলিতেছেন যে, একমাত্র অসহযোগ নীতির পথেই জাতির মুক্তি আসিবে। বিদেশীয়ে চাপে জাতির সভ্যতা, কৃষ্টি, জাতির সহজ আত্মোন্মাদবিনী বুদ্ধি, উত্তম সমস্তই নিশ্লেষ হইয়া পড়িয়াছে। বিজ়েতার কৃত্তির গৌরবগ্রাহিতায় তাহাদের ভাব, ধারা, অভিপ্রায় জাতির মন প্রাণের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সঞ্চারিত হইয়া ভারতবাসীকে একটা সম্পূর্ণ পঙ্গু আদর্শহীন জড়জাতিতে পরিণত করাইয়াছে; এই পতনোন্মুখীনতা হইতে জাতিকে

রক্ষা করিতে রাজনৈতিক মুক্তি একান্তই অপরিহার্য এবং অসহযোগ-পথই তাহার একমাত্র উপায়।

একটা সমস্তার আবির্ভাব হইলে নানাদিক হইতে নানা ভাবের সমাধান আসিয়া পড়ে। যখন যে নির্দেশটি প্রবল হয়, কিম্বা সময় ও অবস্থার খানিকটা অনুকূল হয়—সাধারণে ধীরভাবে পর্যালোচনার অপেক্ষা না রাখিয়া সেই নির্দেশের অনুবর্তী হয়। কিন্তু উদ্দেশ্যকে সত্যে পরিণত (actualise) করিবার নিভুল রীতি উহা নহে।

কোন নীতিকে প্রয়োগ করিবার পূর্বে ধীরভাবে বুঝা উচিত যে, সে-নীতিটির প্রকৃত স্বরূপ কি? তাহার দ্বারা প্রকৃত সাফল্য অর্জিত হয় কিনা এবং তাহা ভারতীয় সাধনপ্রণালীর অনুরূপ কিনা? বৈদেশিক সভ্যতা—যান্ত্রিক সভ্যতা—তদ্ভাব-বশ্তার কবল হইতে ভারতীয় সভ্যতা ও শিক্ষাকে পুনরুদ্ধার করাই হয় যদি অসহযোগনীতি অনুসরণের উদ্দেশ্য, তাহা হইলে তাহা সফল হইবে সেই পরিমাণে, যে-পরিমাণ ভারতীয় সাধন-প্রণালীর সিদ্ধজ্ঞানে সে-নীতি উপযুক্ত। অত্যাচার পাশ্চাত্যভাবাপন্ন কোনও প্রকার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে, পরামর্শ-করণ কোন প্রকার উপযুক্ততার পথে—Bolshevism, Nihilism, অথবা Seinfeln আদর্শের কোনপ্রকার রাজসিক ভাবের প্রচেষ্টায় ভারতের মুক্তি আসিবার নহে।

বিরোধের দ্বারা, ঘেষ হিংসার দ্বারা সাময়িক কার্যসিদ্ধি হইতে পারে একরূপ দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে বিরল নহে। কিন্তু সে রূপ সিদ্ধি ব্যর্থতারই রূপান্তর। তদ্রূপ নীতি জাতীয় জীবনে সাময়িক মুক্তি আনিয়া পরিণামে প্রবলতর বন্ধনদশার জলন্ত অবস্থায় প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে। লেনিনের দেশ, ডি-ভ্যালেরা, মান-ইয়াট-সেনের দেশ আত্মরিক শক্তির পথে যুগযুগব্যাপী সংগ্রাম চালাইয়া উদ্দেশ্য সফল করিয়াছিল; আজ তাহাদের সাফল্যের সেই অতীত জয়মাল্যখানি আত্ম-বিরোধ ও মত সংঘর্ষের তুষাগ্নিতে বিধ্বস্ত হইতেছে।

মুক্তির যে নীতি ও পন্থা কেবলমাত্র প্রয়োগকারীকেই নহে, প্রকারান্তরে দশকে ও দেশকে করে গর্জিত শক্তির উপাসক, যে নীতির অনুশীলনের দ্বারা মানুষকে লইয়া চলে সাক্ষাতভাবে বর্বরতা, নির্ভরতা, হত্যা, ধ্বংস, ঘেষ, বন্দ, বৈষম্যনৈক্যমূলক ভেদধারার পথে, তাহার লক্ষ্য ও দৃষ্টি শুধু

বর্তমানের সার্থকতায় আবদ্ধ, সুবিধাবাদের মানদণ্ডে নির্ধারিত—পৈষা, দৃঢ়তা, প্রেম ও নিকামতা প্রভৃতি আত্মিকগুণের কর্মসাধক নহে—আশুফলপ্রসূ হইলেও সে পথে মুক্তির জন্ম গান্ধীজী প্রস্তুত হন নাই। ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তি তাহার সাধ্য হইতে পারে, কিন্তু ততোধিক লক্ষ্য তাহার উপলব্ধ সত্যের প্রতিষ্ঠায়। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে সেই সত্যের নিরঙ্কুশ অনুসরণে ভারতের তথা জগতের মুক্তি আসিবে। যদি নাই আসে তাহার জন্ম তিনি বিচলিত নহেন। তিনি ভারতীয় সত্যোপাসক, সত্য্যগ্রহী—রাজনীতি বা পাশ্চাত্যের কাপট্যপূর্ণ হৃদয়হীন নীতির দ্বারা অর্জিত স্বরাজ তাহার অনুর্ত্তে নয়।

গান্ধীজী এবং প্রত্যেক অগ্রগামী ভারতীয় সাধক সম্যক-রূপে অবগত আছেন যে, অনর্থক নিগ্রহ ও জবরদস্তির ভিতর দিয়া জীবনাস্পৃহার কোন পরিপন্থী ভাবের, কোন প্রবল রিপূর ও উপসর্গের উচ্ছেদ সাধিত হয় না। বরং তদ্বারা সেই সকল উপদ্রবকর স্পর্শগুলিকে চিন্তার ও আলোচনার বস্তু করিয়া—সেগুলিকে দোষারোপ ও প্রতিকূলতার উপ-যুক্ত (?) পাহ করিয়া বিরোধের সমধিক শক্তিরূপে প্রকট করান হয়। অধিকন্তু তাহার প্রতিফল ক্রমে প্রয়োগকারীর স্বভাবে আসে তাহার সত্যভাবের—মূল দৃষ্টি, পারগতার ব্যভিচার, অভাব—ব্যতিক্রম। মানুষ হইয়া পড়ে সেই হীন এবং ক্ষণফলবিধায়িনী আদর্শের দাস। সত্যের স্বয়ং স্বদৃঢ় অনুগত অবলম্বন ক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইয়া যায়। মানুষ তখন বিজীগিষার অহঙ্কারে, রাজসিক দৃষ্টি বিরুদ্ধশক্তিকে আক্রমণ করিতে যায়। ফলে এই হয় যে, সেইশক্তিকে প্রতিরোধ করিতে গিয়া সে হয় তদ্বারা আক্রান্ত। বিরুদ্ধ শক্তির সফলকাম হইবার যেটা থাকে আদর্শ, পথ—আধারের যে পথ্যায় বা ক্রমে থাকে বিরুদ্ধশক্তির অস্তিত্ব ও সামর্থ্য, অপেক্ষার যতটুকু সহনতায় থাকে বিরোধীভাবের পারগতা—মুক্তিকামীকেও হইতে হয় তাহার অনুরূপ অভিনেতা।

আন্তরসাধনার এইরূপ খাটা অভিজ্ঞতা হইতে গান্ধীজী দৃঢ় অহিংসবাদী। বোধহয় এবিষয়ে তিনি অনেকাংশে টলষ্টয়ের মন্ত্রশিষ্য—“resist uot evil by evil” অধিকন্তু তিনি দেশপ্রেমিক—দেশাত্মার বিভিন্ন স্বার্থপাহারক শক্তি-

সমুহের মধ্যে তিনি দেখিতে পাইয়াছেন একই মহান উদ্দেশ্য বহুত্ব এবং পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীতাও বিরোধের পরিচ্ছদে আসল সত্যকে অধিকতর বলশালী ও খাঁটী করিয়া গাড়িয়া তুলিবার নিমিত্তই আত্মসংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে। ক্ষুদ্র স্বজাতি প্রেমের যুগকাষ্ঠে তাহাদের কোনটীরও দাবী নিহত না করিয়া (সে সম্বলদাবী যতই অত্যাশ্রয়মূলক হোক না কেন) তাহাদের প্রত্যেকটীকেই তিনি প্রেমের অবিচ্ছিন্ন ও একপ্রাণতার বিপুল সার্থকতায় অনুপ্রাণিত করিয়া চলিয়াছেন। জাতীয় মুক্তির এই পথে হয়ত বা তাঁহাকে হইতে হইবে আত্মকলহ, ভুল বুঝাবুঝির সম্মুখীন—তাঁহারই সতীর্থ বিরোধীগণের অপার নির্যাতন, লাঞ্ছনা, বিরুদ্ধতার দুর্ভোগ তাঁহাকে ভুগিতে হইবে; কিন্তু তিনি তাহা সহ্য করিবেন নিরহঙ্কার আত্মিক সামর্থ্যের দ্বারা (soul force) সত্যপ্রাণতার দ্বারা। প্রতিরোধ করিবেন নিরীহের কাতর নিঃসহায়তার দ্বারা নহে—আত্মার নির্ভীক সাবলীল মর্যাদা ও অধিকার বোধের ঐশ্বর্যের দ্বারা (passive resistance) ইহা সেইশক্তি যেশক্তি বিশ্বামিত্র ক্ষাত্র শক্তির দ্বারা বশিষ্ঠকে আক্রমণ করিলে বশিষ্ঠ প্রয়োগ করিলেন, সেই আত্মিক শক্তির অভিব্যক্তি। ফলে শক, ছগ, পল্লবগণ আক্রমণকারীর উপর পতিত হইয়া তাহার প্রতিক্রিয়া দর্শাইল। অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যখন অত্যাগ, প্রপীড়ন নীরবে সহ্য করেন, তরল বুদ্ধির জনসাধারণ তখন সে অবস্থার বিকৃত অর্থ—একটা অন্তত ভবিষ্যতেই নির্দ্ধারণ করেন, কিন্তু চক্ষু-আনের নিকট ফুটিয়া উঠে ভিন্ন অর্থপূর্ণ আলোক। তিনি দেখিতে পান সত্যোৎসর্গীকৃত আত্মা অন্ধভাবে কিছুই করে না তাহার সত্যকর্মের পুরস্কার দেয় প্রকৃতি—তাহার প্রতি অত্যাগ অবিচারের প্রতিক্রিয়া আসে প্রকৃতি হইতে। ধর্মের জন্য শতশত খুঁটভরু আত্মবলিদান দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই সত্যানুগত্যের ফলে কী মিহদীপনের জয় হইয়াছিল? যীশুর সত্যই পাইয়াছিল একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু এই অধ্যাত্মজ্ঞান ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে বিকাশলাভ করিলেও ভারতের জনসাধারণ অতাপি এই জ্ঞানের পথে চলিবার মত উপযুক্ততা কিম্বা ঐ জ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবার মত শক্যতা লাভ করে নাই। ভারতের ব্যবহারিক সম্বা আজও তাহার অধ্যাত্মস্বাধার অনুগামী হইতে পারে নাই।

বর্তমান অবস্থার বিপক্ষে আলাপ, আন্দোলন, বিকোভ যতই প্রচণ্ড দেখা যাউক না কেন, উহা বুদ্ধিনিবেচনার আবেগোৎপন্ন সাময়িক প্রতিক্রিয়ামাত্র—অন্তর্স্বাধার অন্তর্ভুক্ত কর্তব্যবোধের দ্বারা নিয়মিত নহে। ভারতের ব্যবহারিক সম্বা এখনও পর্যন্ত তাহার অনাত্মীয় বহুপ্রকার অভ্য-প্রায়ের স্বার্থ-সাধক। জ্ঞাতে অজ্ঞাতে যান্ত্রিক নিরীহতা, ধোপার গাধার (Scape-goat) মত—উদাসীন নিজস্ব সাংখ্যের পুরুষেরই মত সবরকম অনাত্মীয় আশা আকাঙ্ক্ষার সমর্থন ও পুষ্টিসাধন করিয়াই সে চলিয়াছে। প্রতিদানে যাহা কিছু পাওয়া যাইতেছে তাহাতেই আপনাকে অনুগ্রহীত, কৃতকৃতার্থ ও গৌরবান্বিত মনে করিতেছে; তাদৃশ মনোভাবে অনুগত ও আসক্ত থাকা এখন তাহার স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই স্বভাবের পরিবর্তন আনিতে হইলে অন্তরসাধনার যে নীতি ও প্রণালী ধরিয়া ভারতের অগ্রগামী সাধকগণ কৃতকার্য হইয়াছেন, সেই পন্থা ধরিয়াই চলিতে হইবে। গান্ধীজীও অনেকাংশে রাষ্ট্রীয় মুক্তির সাধনা এই পদ্ধতিতে পরিচালনা করিতেছেন।

গান্ধীজীর যে অসহযোগ-নীতি তাহা নৈতিকতামূলক এবং ব্যাপকার্থে পাতঞ্জল যোগের “প্রত্যাহার”, “অপরিগ্রহের”ই প্রকারান্তর। ব্যষ্টিভাবে না হইয়া উহা প্রযুক্ত হইয়াছে সমষ্টিগত সার্থকতায়। আত্মার শ্রেয়ঃলাভের ক্ষেত্রে অপেক্ষায় রহিয়াছে বহুবিধ অনাত্মীয় ঘটানোর, বহুবিধ অভাবাত্মক (negative) রূপের আকর্ষণ। উহাদের স্পর্শাক্রামক হইতে মূল উদ্দেশ্যকে স্মৃতি ও অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে সাধককে যেমন থাকিতে হইবে বিরোধী বা অকল্যাণকর বস্তুসমূহ অনুপ্রবিষ্ট হওয়া সম্বন্ধে নিরলোভ, দৃঢ় ও সতর্ক—ততোধিক হইতে হইবে তাহাতে সম্পর্কশূন্য ও বিচ্ছিন্ন। অধ্যাত্মসাধনার কথায় উহাকে হয়ত বলিবে, বুদ্ধিতে বা চিন্তায় বিচ্ছিন্ন থাকা বা স্থান না দেওয়া। সাংখ্যও ইহার অনুরূপ ব্যবস্থা করেন। সাংখ্যও বলেন, পুরুষ সমর্থন করে, লায় দেয় বলিয়াই প্রকৃতির ব্যভিচার অবাধে চলিতে থাকে। কিন্তু বুদ্ধি যখন এই ভুল বুঝিতে পারে, পুরুষ তখন প্রকৃতির খেলা হইতে নিজেকে প্রত্যাহার করিয়া লয়।



তাহার ফলে প্রকৃতির কর্তৃত্ব, প্রকৃতির খেলা নিমেষের মধ্যে বন্ধ হইয়া যায়। গান্ধীজীর অসহযোগ-নীতিও সাধনার এই আলোকের অন্তর্ভুক্ত।

অবশ্য ভিতর হইতে চরিত্র যদি মুক্তিমন্ত্রে সজীবিত ও সমৃদ্ধ না হইয়া উঠে, আধার না হইয়া উঠে স্বাধীন স্বরূপের পরিচয়ে—আম্প্ৰহায় উষ্ম তন্ময়, স্থূঁ, একাগ্র ও হৃস্কলিত, তাহা হইলে নিছক প্রত্যাখ্যান, পরিবর্জন কিম্বা অসহযোগ, নীতির দ্বারা অকল্যাণের প্রভাব তিরোহিত হয় না; অথবা তদ্বারা প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, উপযুক্ততা, সামর্থ্যও আসে না—তাহা যোগলব্ধ অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াই মহাত্মাজী অসহযোগ-প্রক্রিয়ার উপর যতটা না জোর দিয়াছেন, ততোধিক জোর দিয়াছেন জাতীয় চরিত্র-গঠনের উপর—দেশাশ্রয় উন্মেষের প্রেরণার—সাধনার উপর। কর্তব্যে অবিচলিত থাকা, সত্যে, নীতিতে অসীম ধৈর্য্যসম্পন্ন ও আত্মাশীল হওয়া, কাণ্ডে অক্ষুর পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্ত তাঁহার দেশবাসীর শ্রুতির চুম্বারে বারম্বার উপনীত হওয়ার যে অশ্রান্ত প্রয়াস তাহা এই দৃষ্টিরই সমর্থন করে। বোধ হয় তাঁহার সঙ্গমতী আশ্রমের শিক্ষাদীক্ষা এই উদ্দেশ্যসাধনের মূর্ত্ত প্রতিষ্ঠান।

ভারতের দর্শনাদিতে আত্মার ভূমাবস্থার যে অপরূপ ঐশ্বর্য্য ও লক্ষণাদির কথা বর্ণিত আছে—“জিত্রাত্মনঃ প্রশান্তন্য পরমাত্মা সমাহিতঃ। শীতোষ্ণ স্নেহঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥”—মহাত্মাজীর কর্ম্মমুখর ব্যক্তিগতজীবনেও সেই নৈবিক্তিক বিভাবের হৃস্কলিত দেখিতে পাওয়া যায়। জীবনের ক্ষেত্রে এত যে হৃদয়, কোলাহল, বিরোধ, অসামঞ্জস্য, নিন্দাস্তুতি—কিছুতেই তাঁহার নিরপেক্ষ কর্ম্মষণা বিচলিত বা শ্রান্ত হয় না। অবাধ তাঁহার স্বধর্ম্মপালনের সঙ্গতি—বাণবিপত্তিতে ব্যাহত না হইয়া সাবলীল আবেগে বহিয়াই চলিয়াছে। সত্যপ্রিয়তা, কর্তব্যনিষ্ঠার সাধনা তাঁহার মধ্যে আত্মবিকাশ করিয়াছে বোধ হয় তাহাদের নীতিধর্ম্মের

পরাকাষ্ঠা; পন্থালাভ করিয়াছে চরম অনাড়ম্বরতা—ইচ্ছা সারল্য এবং উল্লস আন্তরিকতা।

গান্ধীজীর সত্য, লৌকিক সত্য এবং সামাজিক কর্তব্যবুদ্ধিপ্রসূত। দেশকালের অভ্যন্তরে থাকিয়া শান্তি ও সমতালিপ্সু, যে আত্মা সমাজ-দেহের বিভিন্নবিরোধী, অসমর্থকারী বস্তুসমূহের মধ্যে সম্ভাবনার পথে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার দ্বারা আত্মসার্থকতার নিমিত্ত তৎপর রহিয়াছে—গান্ধীজীর পথ তাহারই অনুগামী। সেইজন্য সত্য পথে চলিতে চলিতে তাঁহার জীবনে যে অনতিক্রম্য অপূর্ণতা, ক্রটি, ভ্রান্তি আসিয়াছে, তাহার জন্ত তিনি লজ্জিত, অন্ততপ্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু জগতে যে এক আদর্শজন আলৌকিক পুরুষ আছেন যাহারা মানবীয়স্তরের আশা, আকাঙ্ক্ষা, শক্তিজ্ঞানকে তাঁহাদের বাহ্যকর্ম্মের প্রবর্তক ও পাথর করেন না, অপরিপক্ব, পঙ্ক ও আপাত-ফলপ্রদ মনে করেন—উর্দ্ধহস্তের পরিণত যন্ত্রস্বরূপে অব্যর্থ ইঙ্গিত ও সামর্থ্য হয় যাহাদের কর্ম্মের, কর্তব্যের জ্যোতনা-উৎস—গান্ধীজী তাঁহাদের পর্য্যায়ভুক্ত নহেন। গান্ধীজীর জনকল্যাণ-দৃষ্টি আত্মকর্তব্যের যে দিকটা বড় করিয়া দেখিয়াছে, তাহারই সার্থকতার নিমিত্ত তিনি নীতিসিদ্ধশক্তির সমস্ত নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতার পারগতাকে উৎসর্গ করিয়া চলিয়াছেন। সত্যের জন্ত এইরূপ তিল তিল আত্মদানে, ত্যাগের, নিষ্ঠার এবং সঙ্কল্পের এইরূপ দৃষ্টান্তে, অবদানে আদর্শ—ভারতের উন্ন্যার্গগামী ছন্নছাড়া জীবনে আনিয়া দিবে আত্ম-আদর্শের একটা স্পষ্ট কর্তব্যো-মুখীনতা—তাহা পালনের একটা উত্তম আন্তরিকতা। অনা-দর্শের ধূমাচ্ছন্নতা অথবা ভ্রান্ত আদর্শের মূঢ়-শোষণতা জাতীয় জীবন হইতে নিঃশেষ হইয়া আসিবে। মতের ও পথের স্পষ্ট প্রেরণায় জাতীয় আত্মা স্বচ্ছন্দ ও সান্নিকুল হইয়া উঠিবে।

অদূর ভবিষ্যতে ভারত যে শ্রেষ্ঠতম মানবলোক ও প্রতিভার বিকাশ করিবে, যাহার জন্ত সে গভীর তপস্যাময়—গান্ধীজী তাহারই অগ্রনৃত।



## পল্লী সম্পদ

শ্রীমনোজ বসু

নাগরিক সভ্যতা হইতে বহুদূরে সত্যকার বাংলা এখনো বাঁচিয়া আছে। দরদী হিন্ন তাহার সন্ধান পায় না। সহর অপর দেশের হাবভাব নকল করিতে যায়, কিন্তু মুক্তিলাভ হইতেছে এই পৃথিবীর সকল দেশের মাটি এক নহে। ও-দেশে যে গাছে ফুল ফুটিত, এখানে তাহাতে জন্মিতেছে কাঁটা।

অনেক পণ্ডিতকেই বলিতে শুনিয়াছি, আমাদের দেশে নাচের আদর কোনদিন ছিল না, ইদানীং কেবল নাচের চলন হইতেছে। এই লইয়া প্রাচীনমহলে উম্মার আর অবধি নাই! মজা মন্দ নয়। আত্মবিশ্বাসিত এতদূর ঘটিয়াছে যে চোখ বুঁজিয়া চতুর্দিককে অস্বীকার করিয়া আমরা দিব্য পাণ্ডিত্য দেখাইয়া চলিয়াছি।

অথচ এই গোটা দেশটাকে শ্রীগৌরানন্দ একদা নাচিয়াই মাতাইয়া ফেলিলেন। এখনও গ্রামে গ্রামে সহস্র সহস্র পণ্ডিত-মূর্খ কীর্তনানন্দে নাচিয়া থাকে। পৃথিবীতে বহু ধর্মপ্রচারক আসিয়াছেন। কেহ তত্ত্বকথা শুনাইয়াছেন, কেহ অতিপ্রাকৃত শক্তি দেখাইয়া জনমনকে বিস্মিত ও বশীভূত করিয়াছেন, কেহ বা ধর্ম চালাইয়াছেন আত্মর শক্তিতে—তলোয়ারের জোরে। কিন্তু নৃত্য গীতে মাতাইয়া দেশের লোককে দেবোন্মাদ করিয়া তোলা কেবল বাংলা দেশেই দেখিলাম।

এই জীবন্ত, জাতীয়জীবনের সহিত একান্তভাবে জড়িত অথচ ক্রমবিলীণমান লোকনৃত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়া দিয়াছেন শ্রীযুক্ত গুরু সদয় দত্ত মহাশয়। একথা আমরা কোনদিন অস্বীকার করিব না।

বাংলার লোকনৃত্য নানাধরনের। মোটামুটি তিনটি ভাগ করা যায়। এক রকম অতি পবিত্র ধর্মভাবযুক্ত। যেন নৃত্যযোগে সমস্ত দেহমন দেবতার পায়ে বিলাইয়া দেওয়া। কীর্তন প্রভৃতিকে এই পর্যায়ে ফেলিতে পারি।

আর একধরনের হইতেছে—উদ্দাম রংনৃত্য। একদা বাঙালী যুদ্ধ করিত, দেশ শাসন করিত, বিদেশী আক্রমণকারীর গতিরোধ করিয়া পর্কতের মতো দাঁড়াইত। সেই সব বীরসৈন্য মরিয়া গিয়াছে কিন্তু বংশধরদের শোণিতধারায় গত পুরুষের তাণ্ডবতা ক্ষণে ক্ষণে স্পন্দিত হইয়া ওঠে—রংনৃত্য তাহারই অভিব্যক্তি। পশ্চিমবঙ্গের রাইবিশে, মধ্যবঙ্গের ঢালিনাচ প্রভৃতি এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যায়।

আর এক রকমের আছে—উদা উচ্চাঙ্গের কলাসম্মত মধুর লাস্যনৃত্য। রুমুর প্রভৃতি এই শ্রেণীতে পড়িবে। কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগ আদৌ বিজ্ঞান-সম্মত হইল না। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি লোকনৃত্যের ভিতর নানাবিধ রস অল্লাধিক একরূপ অঙ্গান্ধীভাবে জড়িত আছে যে কোন একটি নির্দিষ্ট কোঠায় ফেলিয়া বিচার করা বৃহত্তর অনুসন্ধিৎসার অপেক্ষা রাখে।

এই পল্লীনৃত্যের সর্বাপেক্ষা বিস্ময় উদ্ঘাটিত হইয়াছে যশোহর জেলায় সম্মানশ্রেণীর মহিলা ও বালিকাদের মধ্যে চলিত ব্রতনৃত্যে। দত্তমহাশয় গত এপ্রিল মাসে উহার আবিষ্কার করিয়া কলিকাতা গলষ্টন পার্কে দেখাইয়াছিলেন। অতঃপর নারীনৃত্যের প্রসঙ্গে গুজরাটের গরুবীর নাম করিয়া আর গর্ভ বোধ করিবার প্রয়োজন নাই, ঘরের আড়িনাতেই মাণিক মিলিয়া গেল।

কিন্তু এই সব নৃত্যের পরিচয় দিতে বর্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা করি নাই। আসল কথাটা বলিয়া ফেলি। এই কয়েক বৎসরে বাংলার বহু অঞ্চলের অনেকগুলি লোকনৃত্য দেখিবার ভাগ্য আমার ঘটিয়াছে। এই সম্পর্কে মনে একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে বঙ্গদেশে একদা এক বৃহৎ সংস্কৃতি (culture) ছিল—নানা অঞ্চলে তাহার বিলুপ্তাবশেষ চিহ্নগুলি নানা মূর্তিতে ছড়াইয়া রহিয়াছে। সমস্তগুলির অহুসন্ধান করিতে পারিলে হয়ত গরম্পরের মধ্যে ষোণ আবিষ্কৃত হইয়া মূল সংস্কৃতির সন্ধান মিলিবে।

কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। দত্তমহাশয় পশ্চিমবঙ্গের নৃত্যগুলি সজীব ও অবিকৃত রাখিবার জন্য প্রাণপাত করিতেছেন। পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি গঠিত হইয়াছে। বর্তমান লেখকেরও ঐ সমিতির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে বলিয়া ইহার মূল্য বুঝিতে পারা সম্ভব হইয়াছে। এইরূপ পল্লীসম্পদ সমিতি বাংলার প্রতি অঞ্চলে গড়িবার আবশ্যক। দত্তমহাশয়ের অধ্যবসায় অপরাধেয় হইলেও এত বড় বৃহৎ অসুসন্ধানে সমগ্র দেশবাসীর যোগ আবশ্যক।

স্মরণ রাখিতে হইবে, দিনের পর দিন বাংলার বিশিষ্ট স্মৃতি হারাইয়া যাইতেছে—একবার হারাইয়া গেলে আর তাহার সন্ধান হইবে না। কেহ হয়ত বলিবেন, রাষ্ট্রিক উন্নতি হউক, অন্নসমস্যার সমাধান হউক, এসব তাহার পরের কথা! কিন্তু এই কথা বলিয়া চুপ করিয়া থাকা উচিত নয়। দেশের দুঃখত্রি চিরকাল থাকিবে না, সূর্য্য একদিন উঠিবেই। দেখিতে হইবে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে দেশটা যেন বিদেশ হইয়া না যায়।

কিরূপ দ্রুতগতিতে দেশের বিশিষ্ট রূপটির বিনাশ ঘটতেছে তাহার সামান্য একটু দৃষ্টান্ত দিয়া প্রসঙ্গ শেষ করিব। ব্রতনৃত্যের সন্ধান করিতে দুর্গম স্বদূর গ্রামের মধ্যে দত্তমহাশয়ের সহযাত্রী হইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। নয়নাভিরাম সেই অপরূপ নৃত্য দেখিয়া বিশ্বয়ের আর অবধি রহিল না, নৃত্যকারিণীদের সূচিস্থিত মুখভাব সংঘত স্নন্দর পদক্ষেপ ও নৃত্যভঙ্গী মনকে এই কামনার জগৎ হইতে এক মুহূর্তে উর্দ্ধলোকে উড়াইয়া লইয়া যায়—পৃথিবীর আবিলতার অনেক উর্দ্ধে, অনন্ত গভীর চিরসুন্দরের ধ্যানে অন্তর ভরিয়া যায়। অথচ শুনিলাম গ্রামে ইংরাজী শিক্ষার চলন হইয়া অভিব্যক্তির কঠোর শাসনে এই নাচ উঠাইয়া দিতে বন্ধপরিষদ হইয়াছেন। আর পাঁচ বৎসর পরে গ্রামে গেলে বোধকরি ব্রতনৃত্যের কোন সন্ধানই মিলিত না।

এই দশা এক আধ জাহ্নগায় নয়—গ্রামে গ্রামে—বাংলার সর্বত্র।

## ভজন

কাজী নজরুল ইসলাম।

তিলক-কামোদ মিশ্র—দাদুয়া।

রাখ রাখ রাঙা পায়

হে শ্যামরায়।

ভুলে গৃহ স্বজন সব সঁপেছি তোমায় ॥

সংসার-মরু ঘোর নাহি তরু-ছায়া

নব নীরদ-শ্যাম আনো মেঘ-মায়া,

আনন্দ নীপ-বনে নন্দ-তুলাল এস

বহাও উজান হরি অক্ষর যমুনায় ॥

একা জীবন মোর গহন বন ঘোর

এস এবনে বমমালী গোপ কিশোর

কুঞ্জ রচেছি দুখ-শোখ তমাল-ছায়,

প্রেম-প্রীতির গোপী চন্দন শুকায়ে যায় ॥

দারা স্মৃত প্রিয়জন, হরি হে নাহি চাই

পদ্মপলাশ-আঁখি দেখিতে যদি পাই,

রাখাল-রাজা এস, এস হে হৃষিকেশ

গোকুলে লহ ডাকি' অকুলে ভাসি হায় ॥

## তৃতীয় শ্রেণীর কবি

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

রাজীবচরণ ভট্টাচার্য্যের আজ মন ভালো নেই। ক্যান-ভাসের জীর্ণ ইজি চেয়ারটায় শুয়ে সে ভাবছিলো—ভাবছিলো। এর একটা প্রতিশোধ, একটা প্রতিশোধ সে নেবেই। কিন্তু কী ক'রে নেবে? বইয়ের সমালোচনার কোনো প্রত্যুত্তর তো কাগজে ছাপা হয় না—সেটা রীতি নয়; 'উচ্ছ্বাস' না হয় না-ই ছাপলো—অন্য কোনো কাগজে লিখলে কেমন হয়? ঠিক 'উচ্ছ্বাস'ের সমালোচনার জবাব হিসেবে নয়—আলাদা প্রবন্ধ ভাবেই যাবে; প্রসঙ্গক্রমে, উচ্ছ্বাসের সমালোচক অশান্ত মস্তিষ্কের অবর্ণনীয় নিরুদ্ভূততা, অতুলনীয় রসবোধহীনতা (কথা দুটো সে মনে মনে টুকে রাখলে) এমন নির্মমভাবে উদ্ঘাটিত করা হ'বে যে যে-কোন পাঠক প'ড়েই নিঃসন্দেহ হ'বে, তা'র, রাজীবচরণের 'শ্রাম-সিদ্ধ'র মত উচ্ছ্বাসের কবিতার বই বাঙলাদেশে হালে ঘেরোয় নি। অশান্ত সমালোচনার মূলে যে ঈর্ষা রয়েছে (ই্যা—তা ছাড়া আর কী? অশান্ত নিজে যে অনেকদিন ধ'রে, তার একটা কবিতার বই বার করবার চেষ্টা—এবং ব্যর্থ চেষ্টা করছে, কে তা না জানে?) পাঠকসাধারণকে তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে হ'বে: শুধু তার নিজের, রাজীবচরণের প্রতিষ্ঠার জন্ত নয়; সাহিত্যজগতের সাধারণ সুবিচার, সত্যতা ও সত্যনিষ্ঠতার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্ত। সাহিত্যক্ষেত্রে যে বিষেষের, ব্যক্তিগত আক্রোশের স্থান নেই, সে বিষয়ে সাধারণের মনকে তীব্ররূপে সচেতন করবার জন্ত। ই্যা, প্রবন্ধ একটা লিখতেই হবে। বাঙলার সাহিত্য জগৎ আজ নানারকম হীন স্বার্থের ঠোকাঠুকিতে পীড়িত; এই সব দূষিত রক্ত বার করে দিয়ে একটা সুস্থ, পরিচ্ছন্ন অবস্থা আনতে না পারলে সাহিত্যের আর মুক্তি নেই। এবং এই বৃহৎ দায়িত্বের ভার, রাজীবচরণ অহতব করলো, পড়েছে তার ওপর। তার প্রবন্ধ যে আন্দোলনের সৃষ্টি করবে... 'আজ আমাদের বড় দুঃসময়। বাণী বনের রক্ত-

কমল যখন ঈর্ষার বিষে নীল হ'য়ে ওঠে—' এই ভাবে লেখাটা আরম্ভ করতে হবে। ই্যা, একটা না লিখলেই চলছে না। এক পয়সা দামের সাপ্তাহিক 'অমিত্র' তার খানিকটা প্রতিপত্তি আছে; সেখানে বললেই লেখাটা ছাপানো যাবে। রুঢ় ভাষার জন্ত 'অমিত্র' বিখ্যাত, কাউকেই রেয়াৎ করে না। সেই কারণে, শিক্ষিত উচ্চ-সমাজে কাগজখানার খুব কাঁচিতি; রাজীবচরণ শুনেছে, অনেক কলেজের অধ্যাপকদের বসবার ঘরে 'অমিত্র' ছাড়া আর কোনো সাময়িক (কি অন্তরূপ) সাহিত্যই আলোচিত হয় না। ই্যা—শিক্ষিত উচ্চসমাজে তার বক্তব্য প্রচার করতে হ'লে 'অমিত্র'র মত মধ্যস্থ আর হয় না। কিন্তু লেখাটা নিজের নামে বার করা কি ঠিক হবে? আর কিছুর জন্ত নয়, লোকে হয় তো তার উদ্দেশ্য ভুল বুঝবে; ভাববে, পরোক্ষে সে নিজের বইয়ের বিজ্ঞাপনের কাজ সেরে নিলে। না সে কথা লোককে ভাবতে দেওয়া কোনো রকমেই সম্ভব হ'বে না। বরং অন্য কেউ যদি লেখে—ই্যা, সেটা নিশ্চয়ই ভালো হয়, অনেক বেশি ভালো হয়। সুরেশকে বললেই সে সানন্দে একুনি লিখে দেয়; সুরেশ প্রায়ই তার বাড়ি আসে, এসে তার নতুন কবিতা শোনে; তার অনেক কবিতা সুরেশের আগাগোড়া মুখস্থ আছে। ছোকরার বয়েস অল্প, কিন্তু কবিতা বোঝে। ই্যা, সুরেশকে বললেই লেখে বটে; কিন্তু ও কি ঠিক মত গুছিয়ে লিখতে পারবে? ওকে সব বুঝিয়ে বলে' দিলে হয় তো...ই্যা, সাহিত্যক্ষেত্রে কোনো কোনো খ্যাতিনামার মত ও একেবারে নিরুদ্ভূত নয়।...বাণী-বনের রক্তকমল যখন ঈর্ষার বিষে নীল হয়ে ওঠে—আরম্ভটা এত ভালো যে এটা কিছুতেই বাদ দেয়া যায় না। আর, 'অবর্ণনীয় নিরুদ্ভূততা, অতুলনীয় রসবোধহীনতা'—এ দুটো কথাও রাখতে হবে। সব চেয়ে ভালো হয় রাজীবচরণ যদি নিজেই একটা খসড়া তৈরি করে

দেয়—সেটা অবলম্বন করে' হুশিয়ার লিখলো, তার পর পাছে কোনো ভুলচুক থাকে সে আবার সেটা দেখে দিলে। লেখাটা একবার বেরুলে পরে অশান্ত—ও কি যত্নপায় ছটফট করবে না? বুঝক ও—মার খেতে কেমন লাগে! উঃ, অশান্ত—দেখতে কী মিষ্টি, কী ভদ্র, কে বুঝতে পেরেছিলো ওর মনে এত বিষ আছে। ওর বাইরের চেহারায় ভুলে বিশ্বাস করে'রাজীব নিজেই—কী বোকামি! কী বোকামি! ওকে বলেছিলো কোথাও তার বইয়ের একটা সমালোচনা লিখতে। ও প্রথমটায় রাজি হয় নি—রাজীবই ওকে বার বার করে' বলে, এমন আস্থা ছিলো তার ওর ওপর। আর সেই সমালোচনা যখন বেরুলো—কী তলহীন প্রবঞ্চনা, কি ভয়ঙ্কর হীনতা! আর কিছু না থাক সাধারণ চমকলজ্ঞাও কি থাকতে নেই? এই অশান্তকেই সে একদিন তার বাড়িতে নেমন্তন্ন করে' চা আর কড়াইবুটির শিঙাড়া খাইয়ে ছিলো—মানুষের মধ্যে একটু কৃতজ্ঞতা থাকে বলে'ও রাজীবের ধারণা ছিলো। এমন কি, সাহিত্যিক মহলের সবাই তো জানে যে অশান্ত তার বন্ধু—বন্ধু!—তিজ্ঞস্বরে রাজীব কথাটা উচ্চারণ করলে; বন্ধুই তো বটে! 'ছন্দের ওপর', অশান্তর সমালোচনার অংশবিশেষ রাজীবের মনে পড়লো, কথাগুলো তার মনের মধ্যে একেবারে বসে' গিয়েছিলো, রাজীববাবুর পরিপূর্ণ দখল আছে, তাঁর শব্দ নির্বাচন সুন্দর; তাঁর কবিতার ধ্বনিসমাবেশ প্রীতিকর। কিন্তু শুধু কানকে তুষ্ট করলেই কবিতা হয় না। তাই, এই সব নিঃসংশয় গুণ সত্ত্বেও—এইবার এইখানে সেই অকথ্য অবিখ্যাত বিশ্বাসঘাতকতা!—'রাজীব বাবুর কবিতায় একটু যেন প্রাণের অভাব; তাঁর কাব্যের রূপ হচ্ছে যেন একটি অনবস্ত মর্ম্মর প্রতিমা'। অনবস্ত—কিন্তু প্রতিমা। প্রতিমা বটে। উদ্ভেজনয়, রাজীব তার নীচের ঠোট কামড়ালে। চালাক ছেলে বটে অশান্ত; খুব কায়দা করে' বলেছে কথাটা, বোধ হয় ভেবেছিলো, সে বুঝতে পারবে না। কিন্তু প্রতিমা, তার মানে নিশ্চয়, মৃত, কে না এ কথা বুঝতে পারে! অস্ত ভাবে বলা হ'লো—কথাটা এমন স্পষ্ট, এমন নিষ্ঠুরভাবে চিত্তা করতেও রাজীব যেন শারীরিক কষ্ট অনুভব করলো—তার কবিতা কিছুই নয়! একটা বিলী কথ্য ঘুরিয়ে

বললেই সেটা আর কিছু কম বিলী লাগে না। উঃ, রাজীব লেখাটা প্রথম পড়ে' ভেবেছিলো, এর পর অশান্ত কী করে' তার কাছে মুখ দেখাবে? কিন্তু—আজ বিকেলে মজুমদার প্রকাশালয়ের আড্ডায় অশান্তর সঙ্গে দৈবাৎ তার দেখা—অশান্ত মুখ দেখাতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করলো বলে' মনে হ'লো না; বরং—উঃ, নিলজ্জ আর কাকে বলে।—একগাল হেসে জিজ্ঞেস করেছিলো 'তোমার বই কেমন বিক্রি হচ্ছে,' রাজীব? নিলজ্জ, বেহায়', মধুমুখো বিষের ভাঁড়! রাজীব কোনো কথা বলে নি, মুখ ফিরিয়ে ছিলো। খানিক পরে আড্ডাচোখে ওাকিয়ে দেখেছিলো, অশান্তর মুখ এতটুকু হ'য়ে গেছে। খুব জব্দ! তবু তো 'অমিত্র'র লেগা এখনো বেরোয়ই নি। অনবস্ত—কিন্তু প্রতিমা...আচ্ছা, দেখা যাবে।

পাশের টেবিল থেকে রাজীব একখানা 'শ্রাম-সিদ্ধ' টেনে নিলে। বইয়ের প্রত্যেকটি কবিতা লেখা হবার সময় থেকে আজ পর্যন্ত সে অন্তত একশো বার পড়েছে; তবু এখনো তার পড়তে ভালো লাগে। তার নিজের কবিতার মত এত ভালো আর কারো কবিতাই তার লাগে না। কেন এমন হয়? সেও তো একজন বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোক; তারো তো একটা রসবোধ রুচিবিচার আছে; এ সব কবিতা যে তার এত ভালো লাগে, তা কি কিছুই প্রমাণ করে না? অথচ অশান্ত বলে কি না প্রাণ নেই! যদি না-ই থাকবে তা হলে কবিতাগুলো পড়ে তার বিরক্তি ধরছে না কেন? বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটা জায়গায় এসে রাজীবের চোখ আটকালো—

রজনীর অন্ধকারে চন্দ্রমার উজ্জ্বল উন্মেষ,  
আলোকের চন্দ্রহার আকাশের কটিতে দোে  
বিরহিনী নিশীথিনী উন্মোচিলো নববধূ বেশ,  
তারকার মণিহারা বিহু রিছে আঁচোল নিচোলে—  
মরি মরি এ কী মূর্তি! মৃদু-সম অপূর্ণ আবেশ!

বাঃ কি সুন্দর! এ বায়গাটা এত যে সুন্দর, তা এর আগে তো তার কখনো খেয়াল হয় নি। অনেক সময় এ রকম হয়—নিজে লিখে নিজেই বোঝা যায় না। রাজীব



দ্বিতীয়বার পড়লে—এবার সশব্দে। এও কি ভালো কবিতা নয়? কেন, বেশ তো শোনাচ্ছে! প্রাণ নেই—প্রাণ থাকলে এর বেশি কী হতো? কোন্ অংশে—ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের, ধরা যাক, ‘মোরে করো সভা-কবি ধ্যানমৌন তোমার সভায়, হে শরীরী, হে অবগুষ্ঠিতা’-র চাইতে তার কবিতা নিকৃষ্ট? কী করে ও-কবিতায় এর চাইতে বেশি প্রাণ আছে? যত সব বাজে কথা! আন্দাজে শুধু নিন্দে করবার জন্মেই একটা কিছু বলে দেয়া। বললে পরে কেউ বোঝাতে পারবে? বাজে কথা, ফাঁকা কথা, ছেঁদো কথা। কোনো মনে হয় না। যেন নাড়ি টিপে বোঝা যায় কবিতার প্রাণ আছে কি নেই! যেন অশাস্তুর নিজের কবিতাতেই প্রাণ একেবারে টগবগ করে ফুটেছে! আর, হাজার হোক অনেক লোকের মধ্যে অশাস্ত একজন বই তো নয়—তার কথাই যে সত্যি হবে, তারি বা কী মানে আছে? একজন যা বলে, কী আসে যায় তাতে? এদিকে স্বরেশ তো বলে—

“বাবা, খেতে যাবে না?”

এখনি খাবার সময় হ’লো! তাই তো—রাজীব টেবিলের ওপর টাইমপিসের দিকে তাকালো—কমও তো বাজে নি। কনককে বসিয়ে রেখে লাভ নেই—সারাদিনের মধ্যে বেচারা একটু ফুরসৎ পায় না। ‘যাচ্ছি।’ বইখানা রেখে সে উঠতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ বললে, ‘এই তিহু, শোন্।’

তিহু তার বাবার কাছে এগিয়ে এলো।

‘এই দ্যাখ’, বইয়ের টাইটল পেজটা রাজীব ছেলের চোখের সামনে খুলে ধরলো, ‘পড়তে পারিস?’

‘পারি বই কি।’ তিহু খুঁকে পড়ে মনে মনে বানান করে করে পড়লো, ‘শাম-সিন্দু।’

‘শাম-সিন্দু নয়, শ্যাম-সিন্দু। বল, শ্যাম-সিন্দু।’

তিহু বলতে চেষ্টা করলো; ঠিক উচ্চারণ হ’লো না।

আচ্ছা বেশ, ওতেই হবে! এইবার রাজীব লাইনটার নীচে আঙুল বুলিয়ে গেলো, ‘এটা পড়তো।’

‘শ্রীরাজীবচরণ,’ একটু পরে তিহু পড়লো, ‘ভট্ট—’ তিহু আটকে গেলো।

‘ভট্টাচার্য। আনিস নে—আমরা ভট্টাচার্য। তুইও ভট্টাচার্য! এইবার পড়তো।’

‘শ্রীরাজীবচরণ ভট্টাচার্য।’

‘কা’র নাম?’

তিহু চুপ করে রইলো।

‘বল না, কা’র।’

হঠাৎ লজ্জিতভাবে তিহু চুপি চুপি বললে, ‘তোমার।’

‘হ’ রাজীব একটা তৃপ্তির শব্দ নির্গত করলে।

‘তোমার নাম ওখানে লিখেছে কেন বাবা?’ কৌতূহলী তিহু প্রশ্ন করলে।

স্বখে রাজীব হাসলো। নেহাৎই ছোট তার এই ছেলে যে এখন পর্যন্ত তার গ্রন্থকারত্ব উপলব্ধি করবার উপযুক্ত হয় নি, এ কথা ভেবে তিহুর প্রতি তার একটু করুণাও হলো। ছেলেটার মাথায় একবার হাত বুলিয়ে বললে, ‘যা, যা, শুয়ে থাকগে এখন, যা। খেয়েছিস?’

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে তিহু বললে, ‘আমার নাম ওখানে লিখে দাও না বাবা।’ তার পর বাবার কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে বললে, ‘না দিলে লিখে—আমি বুঝি আর লিখতে পারিনে! আমার একটা পেন্সিল আছে তাই দিয়ে—’

‘না না, এ বইয়ের ওপর কিছু লিখিস নে কিন্তু—বুঝলি? আমি তোকে ভালো দেখে খাতা কিনে দেবো—’

‘ওগো এসো না খেতে, কনক ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে। তাড়াতাড়ি রাজীব উঠে দাঁড়ালো। বইখানা সাবধানে, সযত্নে যথাস্থানে ফিরিয়ে রেখে বললে, চলো।’

‘কী যে এক বই হয়েছে,’ কনক হেসে বললে, ‘সারাক্ষণ তাই হাতে নিয়েই আছে।’

‘না, না—এইত মাত্র একটু দেখছিলাম। স্বরেশ বলছিলো, কোথায় নাকি একটা ছাপার ভুল আছে।’

‘আচ্ছা, খেতে বসে রাজীব হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, ‘অশাস্তকে তোমার মনে আছে?’

‘কে অশাস্ত?’

‘সেই যে গেল শীতের সময় একবার এসেছিলো, কসাঁ মত—লম্বা, তুমি কড়াইত’টির শিঙাড়া ভেঙ্গে দিয়েছিলে।’

‘কে অভিনয়কার কথা মনে করে রেখেছে বাপু! কত লোকই ত আসছে, কাকেই বা আমি দেখি!’

‘হঁ।’ আত্মবিস্মৃতভাবে রাজীব ভাতের গ্রাস চিবাতে লাগলো।

‘আর একটু ভাল দেবো?’

রাজীব মাথা নাড়লে। মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে খালার দিকে তাকিয়ে, অনেকটা নিজের মনে সে বললে, ‘অশান্ত এক কাণ্ড করেছে।’

যে ব্যক্তিকে সে কখনো দ্যাখে নি, যার সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না, তার কৃত কাণ্ড সম্বন্ধে কনকের মনে কোনো প্রবল কৌতুহল হ’লো না। তবু স্বামীর খাতিরে সে একটু উৎসাহ প্রকাশ করবার চেষ্টা করলে, ‘কী করেছে?’

‘ক করেছে এক কাণ্ড।’ রহস্যের ভাবে রাজীব একটু চুপ করলো। কনক সেই কাকে তার পাতে আর এক টুকরা মাছ দিয়ে ফেললো। ‘অশান্ত আমার বইয়ের এক সমালোচনা লিখেছে।’

‘কী লিখেছে তাতে?’

‘লিখেছে, আমার কবিতায় নাকি প্রাণ নেই।’

‘কী নেই?’

‘প্রাণ।’

শব্দটা বুঝতে পারলেও কনক ব্যাপারটা বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে, ‘আর এক টুকরো নেবু দেবো?’

‘না—আচ্ছা দাও। কী অগায় ভাবো তো! প্রাণ নেই—এ কথার কোনো মানে হয়?’

কনক আন্তরিকভাবে বললে, ‘তাই তো।’

‘বয়ে গেছে,’ রাজীব এক ঢৌক জল খেয়ে নিলে, ‘ও কী বলেছে আর না বলেছে।’ কে-ই বা কান দিচ্ছে ওর কথায়! ভারি তো ও কবিতা বোঝে!’

কনক বললে, ‘তা তো ঠিকই।’

অসম্মতভাবে রাজীব খাওয়া শেষ করে উঠলো। তার পর গোটা দুই পান চিবিয়ে বসলো স্বরেশের অন্ত সেই প্রবন্ধের খসড়া তৈরি করতে। এখন সময় থাকতেই কবিতা সেরে রাখা ভালো; দেরি করলে শুধু দেরিই হতে থাকবে; অনেক জিনিষ হয় তো ভুলেও যাবে। সত্যি

স্বরেশকে একটা খসড়া লিখে দেওয়াই ভালো—মুখে বললেও হয় তো ঠিক সব ধরতে পারবে না। তা ছাড়া, মুখে বলার চাইতে লিখতে সুবিধেও বেশি। কলম নিয়ে সে লিখতে আরম্ভ করলো: ‘আজ আমাদের বড় দুঃসময়। বাণী-বনের রক্তকমল যখন ঈধার বিবে নীল হ’য়ে ওঠে...’ ঘণ্টাদেড়েক পর লেখা শেষ ক’রে সে আগাগোড়া একবার পড়লো। আবার পড়লো। লেখাটা কেমন যেন ঠিক জমলো না। তার কাটা কাটা কথার খোঁচাগুলো যেন ভেসে গেছে। এমন কি, ‘অবর্ণনীয় নির্কৃদ্ধিতা, অতুলনীয় রসবোধহীনতা,— এই দুইটা নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর আঘাতও কী রকম মৃদু শোনাচ্ছে। যেখানটা যে রকম হওয়া উচিত ছিলো, তা না হয়ে অল্প রকম হয়ে গেছে। এ লেখা পড়ে কি অশান্ত—হ্যাঁ করবে বই কি, নিশ্চয়ই যন্ত্রণায় ছটকট করবে, কাৎরাবে। সে নিজে লিখেছে বলে বুঝতে পারছে না; যার উদ্দেশ্যে লেখা, তার গায়ে ঠিক লাগবে। তবু এক একটা জায়গা যেন লাগসৈ হলো না; যেমন, ‘অনবদ্য—কিন্তু প্রতিমা’—একথার উদ্ভ্র হিসেবে সে লিখেছে, ‘শ্রুতিগভীর—কিন্তু অর্থহীন।’ দুটো ঠিক একধরনের কথা হলো কি?...থাক্ গে এখন যা হয়েছে বেশ হয়েছে; কাল সকালে আবার একটু দেখলেই চলবে। স্বরেশ এলে ও-ও হয় তো ত’ একটা কথা জুড়ে দিতে কি বদল করতে পারবে। এমনিও লেখাটার একটা কাপি করতে তো ওকে হবেই।...

আলো নিবিয়ে দিয়ে রাজীব শুতে গেলো। খানিক আগে ঝিকে বিদেয় দিয়ে ভাঁড়ার ঘরে, রান্নাঘরে চাবি লাগিয়ে কনক এসে শুয়েছিলো; সে ঘুমিয়েছে কি না, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তার পাশে শুয়ে রাজীব চুপচাপ খানিক-কণ অপেক্ষা করলো; তার পর তার মাথায় হাত রেখে মৃদুস্বরে ডাকলে, ‘ওগো—’

কনক সাড়া দিলে না।

রাজীব একটু গলা চড়ালো ‘ওগো শুন্ছো?’

‘উঃ’, ক্ষীণ অস্পষ্ট জবাব এলো।

‘শোনো। আচ্ছা, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি; আমার কবিতা তোমার কেমন লাগে?’

‘উঁ.উঁ-উঁ-উঁ,’ বিশ্রামেরও আরামের ঈষৎ ক্ষুদ্র শব্দ ক’রে কনক পাশ ফিরলো। তার দীর্ঘ নিঃশ্বাস থেকে স্পষ্ট বোঝা গেলো যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

অনেককণ পর্যন্ত রাজীবের ঘুম এলো না। এক ভাবে শুয়ে সে স্থির দৃষ্টিতে অন্ধকারে তাকিয়ে রইলো। ঘরের মধ্যে ঘুমের নীরবতা, শুধু মাঝে মাঝে সে খুব নিয়ন্ত্রণে বিড় বিড় করছে: ‘প্রাণ নেই...প্রাণ নেই...’।

## মিলন-বেদন

আহমদ রহমান

মহামিলনের মন্দিরে আজ ছুটে আয় তোরা আয়রে আয় ।  
ত্রিশ-কোটির হৃদয়-অর্ঘ্য অঞ্জলি ভরি দানিব মায় ॥  
যুগ-জনমের পুঞ্জিত গ্লানি, সঞ্চিত শত কালিমা-পাপ,  
অশ্রু-সলিলে ধোত কর অন্তর কর শুদ্ধ সাফ ।  
ভুলে যাও ভাই বিধি ও বিচার, ভুলে যাও জাতি-ধরম-ভেদ ।  
টিকি ও টুপীর বিরোধে ক্ষেপিয়া জাতির ভাগ্যে মেথোনা ক্লেদ ॥

মোরা নহিগো হিন্দু, নহি মুসলিম,—সন্তান মোরা ভারত মা'র ।  
ভায়ের কণ্ঠে এস ভাই আজ পরাই মিলন-বাহুর হার ॥

প্রাণ খুলে আয় করি গলাগলি, বুকে টেনে লই ভায়েরে ভাই ।  
মিলনের রাখী বাঁধি হাতে হাতে মায়েরে ঘেরিয়া আয় দাঁড়াই ॥  
আমরা এ ওর অতি আপনার, আমরা এ ওর প্রাণের প্রাণ ।  
শোণিতে শোণিতে মহাসংযোগ, নাড়ীতে নাড়ীতে ব্যথার টান ॥  
প্রাণে প্রাণ ঢালি, গানে গান ঢালি মহামিলনের করি অভিষেক ।  
সামা-প্রীতি ও প্রেমের বাঁধনে আমরা বিপুল অভেদ এক ॥

মোরা নহিগো হিন্দু, নহি মুসলিম—সন্তান মোরা ভারত মা'র ।  
ভায়ের কণ্ঠে এস ভাই আজ পরাই মিলন-বাহুর হার ॥

কোরাণে পুরাণে ঠোকাঠোকি করি ভেঙ্গেছি কেবল আপন ভাল ।  
ভায়ের বক্ষে ভাই ছোরা হেনে মায়ের বক্ষ করেছি লাল ।  
মসজিদ আর মন্দির-ইঁটে নিজেরি চৌদিকে গড়েছি কারা ।  
আপন-যত্ন-পরিখা আপনি খুঁড়েছি আমরা সর্বহারা ॥  
ধর্ম-জাতির সংগ্রামে মাতি মিছে কর ভাই শোণিতপাত ।  
শৃঙ্খল-পরা চির-গোলামের কিসের ধর্ম কিসের জাত ॥

মোরা নহিগো হিন্দু, নহি মুসলিম.....

## শেষ প্রশ্ন

### শ্রীদিলীপকুমার রায়

ইঙ্গিত সম্পাদক সমীপে:—

আপনি আমাকে বন্ধুর শ্রীকৃষ্ণ সেনের 'শেষ প্রশ্ন' সম্পর্কে চিঠিটির সহক্রে কিছু লিখতে অনুরোধ ক'রেছেন। আমি নানা কারণে বাদবিসম্বাদের (controversy) মধ্যে নামতে অনিচ্ছুক, কিন্তু আপনার এ অনুরোধ ঠেলতে পারলাম না। এই জগতে যে বন্ধুর ক্রীতীশ সেনের পত্রটি আমার ভালো লেগেছে। কেন একটু বলি আগে।

দেশে একটা ধুষ্টো উঠেছে সম্প্রতি—art for art's sake; এই ধুষ্টোটিকে আমি মনেপ্রাণে অশ্রদ্ধা করি—এই ভাবাবেগহীন বক্তব্যহীন প্রেরণাহীন aestheticism-এর ধুষ্টোকে। এ কথাটি বোধ হয় Oscar Wilde সব প্রথম সৃষ্টি করেন—যাঁর সৃষ্টিও হ'য়েছিল তেমনি—চিত্তরঞ্জক কয়েকটি কথা সুন্দর ঠুনকো হৃদয়হীন ভঙ্গীতে বলা। আর্ট কী? না, এই ভঙ্গী। অর্থাৎ কিনা আর্টের কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে না, যেহেতু আর্ট হচ্ছে unmoral, যেহেতু আর্টের কোনো উদ্দেশ্য নেই, যেহেতু আর্টের লক্ষ্য শুধু for art's sake হওয়া। এর মানে কী দাঁড়াচ্ছে তা হ'লে?—না, কোনো সৃষ্টি সত্য হ'য়ে উঠবে যদি সে রূপায়িত হ'য়ে উঠতে পারে, অথচ সে-রূপের পিছনে রূপাতীত কোনো সত্যকে এড়িয়ে চলে প্রাণপণে। এই শ্রেণীর লোকের বড় অপূর্ব সব ধারণা আছে। মানে আর্টের সত্য শুধু তার রূপায়নের সার্থকতায়। অতএব কোনো সার্থকতা থাকলে যেন তার জাত যাবেই।

মানি রূপচয়নে যদি কোনো সৃষ্টি সত্যই সার্থক হয় তবে দার্শনিক দিক দিয়ে সত্য ন হ'লেও তার বাঁচবার দাবী আছে—যদি একবার মানে শুধু এই হয় যে রূপকার রূপের মধ্যে দিয়ে এক শ্রেণীর সত্যকে মূর্ত ক'রে ধরতে পারেন। কিন্তু এ কথা মানা চলতে পারে না যে আর্টে সত্যের যে একটা রূপগত সত্যপ্রতিষ্ঠা আছে সে-রূপ ছাড়া অন্য কোন রূপ তার কাছে বিষবৎ পরিত্যজ্য। অর্থাৎ art-এ কোনো moral

থাকতেই পারে না—কোনো মহনীয় পরিণতির ইঙ্গিত ফুটেই পারে না—কোনো মহৎ সত্য উপলব্ধির আনন্দ আসন পেতেই পারবে না। সত্যের রূপ এক রকম নয়। নাইটিজিলের গানের সত্য ও ধর্মোপলব্ধিগত প্যারাবলের সত্য এক শ্রেণীর নয়। কিন্তু তাই ব'লে বলা যায় না কীটনের নাইটিজিলের ওভ-ই আর্ট, থুটের প্যারাবল আর্ট নয়। শেকসপীয়রের নাটকে চরিত্র চিত্রণের সত্য মহিমময়। কিন্তু তাই ব'লে প্রমাণ হয় না La Fontaine-এর Fables বা প্লোটোর ডায়ালগ বা মহাভারতের অপূর্ব মহৎ সৌন্দর্য আর্ট নয়। রূপায়নে রূপগত সত্য মূখ্য মানি। কিন্তু মহেশ্বর, ককণার, নীতির (ethics) প্রেমের, শ্রীতির, স্বার্থত্যাগের, এদেরও একটা রূপগত সত্য আছে। আর্টে তাদের স্থান হবে না কেন? আর্টে কোনো moral থাকবে না, কোনো বক্তৃতা থাকবে না, কোনো গভীর সত্য উপলব্ধি থাকবে না (আধ্যাত্মিক বা নৈতিক বা সামাজিক)—থাকবে শুধুই রূপায়নের রূপগত আকর্ষণী শক্তিটুকু—এ ভাবে আর্টকে দেখা aesthete-দেরই সাজে—যাদের মধ্যে Oscar Wilde ছিলেন অন্যতম। এমন কি বক্তৃতার মধ্যেও একটা মহৎ আর্ট আছে—যেজন্তে গভীর দার্শনিক এমার্সন Eloquence কে আর্টের পর্য্যায় ফেলে বলছেন "Eloquence is the appropriate organ of the highest personal energy. এর পরিচয় পাওয়া যায় প্লোটোর ডায়ালগে। কী সুন্দর! কী জীবন্ত! কী চিরন্তন! আর্টের moral-এর পরিচয় নিত্যই পাই রামায়ণে, মহাভারতে, ঈশপের গল্পে, পরমহংসদেবের অমূল্য উপমা, টল্টয়ের ছোট গল্পে, Wordsworth-এর Ode to Immortalityতে, Lines written near the Tintern Abbey-তে, গেটের বহু লিরিক কবিতায়, রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরেতে, মল্লিকের ব্যঙ্গ, শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজে—কত বইয়ে। কাব্যে দার্শনিকতা দীপ্ত হ'য়ে অমূল্য কাব্য রচিত হয়েছে ও বহু ললিত সৃষ্টিতে-



উপনিষদের বহু স্লোকে, গীতার বিশ্বরূপ দর্শনে, ডষ্টয়েভস্কির Brother Karamazov এ, ইবসেনের কত নাটকে, শেলির Adonais-এ, গুটের Faust-এ, লরেন্সের Pansies-এ, Aldous Huxley-র Antic Hay তে, রোলান্ড ক্রিস্টকারে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আরও বহু দৃষ্টান্ত দিতে পারতাম। কিন্তু তার বোধহয় আর প্রয়োজন নেই। কারণ আমার মনে হয় আর্টের ইতিহাসের ও অন্যান্য দৃষ্টান্তের দিকে একটু চোখ চেয়ে দেখলেই কেউই বলবেন না যে আর্টের শুধু এক রকম মাত্র রূপ হ'তে পারে—সে হচ্ছে তার unmoral রূপ, unphilosophic রূপ। বস্তুতঃ আমাদের Symbolism-এর দোলা ভারতে এ art for art's sake-এর ধূয়োঁর অঙ্কুর যে রাতারাতি এমন বনস্পতির মতন গগনস্পর্শী হ'য়ে উঠেছে তার শুধু একটি মাত্র কারণ আছে। সে-কারণ এই যে এ-কথার আমদানী হ'য়েছে যুরোপ থেকে। সুতরাং একে আমরা গুরুবৎ লালন করতে বাধ্য।—এমন কি সে-দিনেও যেদিনে যুরোপ এ সেকেন্দ্রে গাছটি তার সব বড় বড় বাগান থেকে উপড়ে ফেলে দিয়েছে। “পত্রাবলী”-তে এই কথাই আমি ব'লেছি বীরবলের কথায় সায় দিয়ে যে যুরোপের “কাল” চিরদিন আমাদের “আজ” হ'য়ে এসেছে। তাই যুরোপের নাস্তিকতা বা agnosticism-তে আমরা মানবাত্মার অনুসন্ধিসার থেকে উত্তর জেনেছি—যখন ওরা ফের অবিনশ্বর তত্ত্বের দিকে ঝুঁকেছে; তাই আমরা বিজ্ঞানকে “সর্ব মঙ্গল্য মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে” ব'লে একমাত্র উপাস্ত ক'রে স্তব জুড়ে দিয়েছি তখন যুরোপের বৈজ্ঞানিকরাই বস্তুতঃ বিজ্ঞানে চরম সত্য মিলতেই পারে না।

কিন্তু বস্তুতঃ আর্টেরও স্তরভেদ আছে—প্রকারভেদ আছে—মাপকাটির ভেদ আছে। এপিককে যে-ভাবে বিচার করি লিরিককে সেভাবে করি না। শৃঙ্গার রসের কবিতাকে যে ভাবে বিচার করি দার্শনিক কবিতাকে সে ভাবে বিচার করি না। Folk music-কে যে কান দিয়ে শুনি রাগালাপকে সে কান দিয়ে শুনি না। রজালয়কে যে ভাবে উপভোগ করি বায়কোপকে সে ভাবে করি না। কোনো মহাত্মার পরম সুন্দর জীবনীকে যে ভাবে

গ্রহণ করি—উপকথাকে সে ভাবে করি না। আর্ট জীবনের নানা দিকের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ, নানা ভাবে রসগ্রাহী করবার রস পরিবেষণ করবার উপায়। পরমহংসদেবের ভাষায়—আর্ট অনেকটা ব্রহ্মের মতন—এক কথায় ওর ইতি করা যায় না। বিশেষ ক'রে বলা বড়ই কঠিন কোন্টা আর্ট, কোন্টা আর্ট নয়।

আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি বলছি না যে বটতলার উপগ্রাস যে আর্ট নয় এ-ও বলা যায় না। কিন্তু ব্যাপারটা যে কি রকম জানেন? একটা উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হবে। বলা যায় ঘাস উদ্ভিদ ও পাখী প্রাণী। সত্য। কিন্তু এমন ধরণের জীব আছে (Sponge জাতীয়) তারা উদ্ভিদ না জীব—জোর ক'রে বলা যায় না। আর্টের কাছাকাছি এসে পড়লে অনেক সময় বলা কঠিন হয় রচনা ঠিক “সৃষ্টি” হ'ল কিনা—মানে রসোত্তীর্ণ হ'ল কিনা। এ বিষয়ে মতভেদ এত বেশি ও বিজ্ঞসমাজেও মতান্তর ও মনান্তরের দৃষ্টান্ত এত প্রচুর যে একটু খবর রাখলে দিশেহারা হ'য়ে পড়তেই হয়। ট্রাটি সাহেবের Books and Characters বইটিতে এ-রকম নানা উল্টা-পাল্টা নজীর আছে—একদল যাকে ব'লেছেন শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর আর্ট আর একদল তাকে ব'লেছেন অতি বাজে। এ বিষয়ে অভিজ্ঞজনেরও ঠিকে ভুলের নজীর আছে। গেটে পামেলার মতন তৃতীয় শ্রেণীর উপগ্রাস প'ড়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়েছিলেন, শেলি ডন জুয়ান প'ড়ে, বক্সিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রের মধ্যে উপগ্রাসিকের দেখা পেয়েছিলেন, ইত্যাদি। সে সব দিয়ে এ ক্ষুদ্র চিঠি ভারাক্রান্ত করতে চাই না। অন্নদাশঙ্করকে আমার বলবার কথা ছিল এই যে যখন আর্ট নিয়ে জোর ক'রে কিছুই বলা যায় না তখন “শেষপ্রহর” মতন উপগ্রাস লেখার জগে (যা আমাদের অনেককেই মুগ্ধ ক'রেছে) অন্ততঃ শরৎবাবুকে গালাগালি করা সাজে না। অন্নদাশঙ্কর যদি বলতেন বইটি তাঁর ভালো লাগে নি ও এই এই কারণে ভালো লাগে নি, আমরা মন দিয়ে শুন্তাম, এবং শিখতামও। কিন্তু যখন তিনি বললেন যে শরৎচন্দ্রের এবার থামা উচিত তখন তাঁর একান্ত নিজের রায়কেই একান্তরূপে প্রামাণ্য ধরে মানীলোকের অসম্মান করায় আমি ব্যথিত হ'য়েছিলাম। বলতে ইচ্ছে হ'য়েছিল (বন্ধুবর গিরিজাপতিক লেখা) :—

সথে ! কঠিন কথা বলা সরল ক'রে,  
নিশ্চয় করা সত্যি দরদ ভরে,  
সমালোচন—নিজের ক্রটি বুঝে,  
সাঁচ্চা মেকির প্রভেদ খুঁজে খুঁজে,  
এর প্রয়োজন হয়ত আজও আছে,—  
তাই রুচিব চাই হে তোমার কাছে ;  
অন্ততঃ হে স্বহৃদ, তোমায় জানি  
তাই তোমারে দরদী বাখানি ।

( শুধু ) একটি কথা কেবল চুপি চুপি  
ফেলব ব'লে ?—( নয় কো গুরুরূপী )  
যতপি নয় একটুও সে নূতন  
সইবে তবু বারেক পুনর্বদন ;  
( পুরোণো চাল—জান্বে—ভাতে বাড়ে,  
না জান্বে হয়, লক্ষ্মী ছাড়েই ছাড়ে )  
রটিয়ে গেছেন যা কালিদাস কবে—  
“ভিন্ন রুচি লোকে হবেই ভবে ।”

( জানো ) তবু ( কিমার্চর্যামতঃপরম্ ? )  
নিজের রুচির রায়গুলিরেই চরম  
সবাই ভাবে ; নয় কি ? বারেক মিতা,  
চিন্তি' দেখ,—সত্য নহে কি তা ?  
লাখ কথারি এক কথা যে কবি  
গেছেন ব'লে—তাই না তিনি 'নবী' !  
সত্যি,—যতই সমালোচন-ধারা  
পড়ছি—ততই হচ্ছি দিশেহারা ।

( ক্রমে ) বিন্দুও হয় সিদ্ধ সমান গুরু  
দিন হয় রাত্তি—বুক যে দুক-দুক !  
না ভাব্লে যা জলের মতন সাক্  
ভাব্লে যেন পাহাড়—সাগে হাঁক !  
কোনো নীতিই রয় না আর অচলা,  
চরণ থেকেও হই যেন অবলা ।  
এ যেন ঘাট বছর শাস্ত্র ধুনে  
সবে-হওয়া মূর্খ শ্রোকের গুণে ।

( বুড়ো ) সেই যে রোগী বিশটি চিকিৎসকে  
দেখিয়েছিলেন রোগটি—( পাছে ঠকে ! )

বিশটি নিদান—আকাশপাতাল তফাৎ  
বিশটি ওষুধ—মিলল—কী জোর বরাৎ !  
তেমনি যদি একটি করি যাচাই  
করতে স্বধাও বিশটি ক্রিটিক বাছাই,—  
ফিরবে যখন—বাক্য যাবে হ'রে,  
হয় বা না হয়—এসো পরখ ক'রে ।

( আরো ) শুধু কি তাই ! ভিন্ন কবির নিতি  
রসজেরো পাচ্ছে নাকি প্রীতি ?  
মিছরি-মুড়ীর এক দর তো কী !  
না করলে এক তাঁরাই বলেন “ছিঃ !”  
বড়ই ছুঃখে বলল কবি : “বাঁচি—  
নিরবধি কালের প্রসাদ বাঁচি ।”  
কঠিন কথার উজান পরমাদে  
পাল তুলে তাই একান্ত আহ্লাদে—  
পরের টুকু উছ দিলাম রেখে,—  
দেখো, যেন গায় নিয়ো না মেখে ।

আমাকে এখানে ভুল বুঝবেন না যেন । এখানে  
কোনো বইতে ভালো না লাগলে ভালো লাগল না  
বলার অধিকার অসিদ্ধ এ আমি বলছি না । ( যদিও  
একথা আমার মনে হয় মস্ত শিল্পীর লেখা সম্বন্ধে  
ভালো না লাগলো বলতে গেলেও একটু বেশি করে সাবধান  
ও সংযত হ'য়ে বলা বাঞ্ছনীয়—যে সাবধানতা সাধারণ  
লেখকদের সম্বন্ধে অবলম্বন না করলেও চলে । আমি  
সাম্যবাদী নই—অমহতের চেয়ে মহৎ আমাদের ডের বেশি  
অর্হনীয় একথা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি । ) কিন্তু আমি  
অন্নদাশঙ্করকে ব'লেছিলাম শরৎবাবুর লেখার দোষগুলি  
নিম্নে সমালোচনা করুন—কিন্তু তার জন্তে শরৎচন্দ্রকে  
মূর্খ বলা অশোভন । বিশেষ ক'রে তাঁর পড়াশোনা যথেষ্ট  
আধুনিক নয় বলার নাম কটুক্তি ;—তা'ছাড়া এ হচ্ছে  
গায়েব জোরে । এবং যেটা এ সম্পর্কে সব চেয়ে বড় কথা  
সেটা এই যে এ ধরনের মত বাহির করার “পূজা পূজা  
ব্যতিক্রম” হয় । আমাকে একটি তরুণ বন্ধু বলেন,  
ইউরোপের অনেক উদ্ধত তরুণ এরকম টোনে প্রচেষ্টা  
মানুষের সম্বন্ধে কথা বলে । মানি ।—কিন্তু আমরা ইউরোপের

অনুকরণ করতে বসি নি। ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ—শ্রদ্ধা, পূজা। সে-সম্পদ আমরা ব্যক্তিবাদের বা যুরোপের চলন বলনের দোহাই দিয়ে হারাতে পারি না। শরৎচন্দ্রের কাছে বাঙালীর ঋণ—দরদীর ঋণ—প্রেমিকের ঋণ—রসানন্দীর ঋণ গভীর। তাঁর বইয়ের বিকল্পে সমালোচনা করা অন্যায় বলি না—কিন্তু শ্রীনিরেন্দ্র রায়, \* বা শ্রীঅন্নদা শঙ্কর রায়ের টোনে না। এঁরা শরৎচন্দ্রের সমালোচনা করেছেন যেন “শেষপ্রশ্ন” লিখে তিনি মহা পাপ করে বসেছেন এবং তিনি অন্য দশজন্য একজন। এই শ্রেণীর ডিমক্রাসী অত্যন্ত অসার। পূজ্য যে পূজা পাবে সে পূজা ধূলিধূসরিত মানুষ পেতে পারে না। কবি আমাদের যে কৃতজ্ঞতা পাবেন, চর্যাকার সে কৃতজ্ঞতা পেতে পারেন না। পরমহংসদেব বলতেন : “ওরে মানীলোকের অসম্মান করতে নেই। ভগবানও করেন না।” সব বড় পাওয়ার গোড়াকার কথা—নত হওয়া। দান গ্রহণের দায়িত্ব গ্রহীতার—দাতার নয়। শরৎবাবুর কাছ থেকে, লরেন্সের কাছ থেকে, আলডুস্ হাক্সলির কাছ থেকে, গলসওয়ার্ডির কাছ থেকে আমরা কতখানি পাব তা নির্ভর করবে এঁদের আমরা কতটা ভালোবাসতে পেরেছি, কতটা শ্রদ্ধা করতে পেরেছি, এঁদের সামনে কতটা নত হতে পেরেছি। বেনেট একটি কথা বলতেন বড় খাঁটি : “There’s no means of understanding a man more than by loving him more”. “শেষপ্রশ্ন” বুঝতে হ’লে শরৎচন্দ্র যে ব্যথা নিয়ে কথা বলেছেন সেটা আগে বুঝতে হবে। তবে বোঝা যাবে কমল কী বলতে চাইছে।

এ চিঠি শেষপ্রশ্নের সমালোচনা নয়। অল্প পরিসরে শেষপ্রশ্নের মতন বইয়ের সমালোচনা সম্ভবও নয়। আমি শুধু এই চিঠিতে অন্নদাশঙ্কর প্রমুখ ক্রিটিকদের আর্ট কর আর্টস্ সেক নীতিবাদের তারতম্যে প্রতিবাদ করছি।

\* শ্রীনিরেন্দ্রনাথ রায় রুখে উঠে লিখলেন যে রূপকার উপকার করতে চোখের-ভঙ্গলান তাঁর হাত থেকে আমাদের রক্ষা করুন। দরদী মানুষ কল্যাণ কামনার অনেক কথা না বল পাবেন না। বক্সিস আনন্দমঠ বা দেবী চৌধুরাণী লিখে আর বাই হোন আমাদের অভিলাপ-ভাজন হন নি।

কারণ ওর চেয়ে অসার নীতি, ইনুকো slogan মানুষের মুখ দিয়ে কমই বেরিয়েছে। আর্ট জীবনের নানা স্বপ্ন নানা ব্যর্থতা নানা প্রেম, নানা দর্শন, নানা শ্রুতি, নানা গভীর সত্য উপলব্ধি, নানা মর্যাদা, নানা অলঙ্কার নানা বিভূতিকেই ফুটিয়ে তুলবে। ওর উদ্দেশ্য শুধু রূপায়ণে পর্যাবসিত হ’তেই পারে না, বা এ-ও সত্য হ’তে পারে না যে আর্টের দিক দিয়েও বুদ্ধের সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রচিত্রণ ও নীরোর সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রচিত্রণ সমান গৌরবময় হ’তে বাধ্য।

আলডুস্ হাক্সলির আর্ট কর আর্টস্ সেক নীতির উপর একটি আক্রমণ সেদিন চোখে পড়ল তাঁর Antic Hay নামক খ্যাতনামা উপন্যাসে। সেটি একটু দীর্ঘ হলেও উদ্ভূত না ক’রে থাকতে পারলাম না। শুধুন। এবং মনে রাখবেন আধুনিকতার দিক দিয়ে, স্বাধীন চিন্তার দিক দিয়ে, পাণ্ডিত্যের দিক দিয়ে, আলডুস্ হাক্সলি আজ ইংলণ্ডের শিরোমণিদের অন্ততম, তাই এঁর কথাকে আর ঘাই করুন না কেন হেসে উড়িয়ে দিতে পারবেন না, শ্রীঅন্নদাশঙ্করও না, শ্রীনিরেন্দ্রনাথও না।

“Life” he said, “life—that’s the great essential thing. You’ve yet to get life into your art, otherwise it’s nothing. And life comes only out of life, out of passion and feeling..... That’s the stupidity of all this chatter about art for art’s sake and the aesthetic emotions and purely formal values and all that. It’s only the formal relations that matter ; one subject is just as good as another—that’s the theory. You’ve only got to look at the pictures of the people who put it into practice to see that it won’t do. Life comes out of life. You must paint with passion and the passion will stimulate your intellect to create the right formal relations. And to paint with passion you must paint things that passionately interest you, moving things, human things. Nobody can seriously be as much interested in napkins, apples and bottles as in his lover’s face, or the resurrection, or the destiny of man..... Could

I have painted that portrait if I hadn't loved you ?”

পরে শেষপ্রশ্নের সমালোচনা করার ইচ্ছা রইল। কিন্তু এ পক্ষে ব'লে রাখি এ-বিষয়ে অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ হয় নি, যদিও তিনি আমার প্রতি যাকে ইংরাজীতে বলে “ঠাণ্ডা” তাই হ’তে আরম্ভ ক’রেছেন—অথচ আশ্চর্য্য এই যে সাহিত্যে স্বাধীন মতামতের অবাধ প্রকাশের তিনি পক্ষপাতী হয়েও তাঁর প্রবন্ধ আমাদের ভালো লাগে নি এ কথায় রাগ ক’রেছেন। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস রাগ তাঁর থাকবে না—এবং তাঁর মতন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান সঙ্গদয় যুবক দুদিন বাদে নিজেই স্বীকার করবেন যে “ও ভাষায়” শরৎচন্দ্রের মতন নমস্ত শিল্পীকে আক্রমণ করা তাঁর অমুচিত হ’য়েছিল—যেমন মাইকেলকে আক্রমণ করার জন্যে রবীন্দ্রনাথকেও পরে অকপটে স্বীকার করতে হ’য়েছিল। এমন্য অন্নদাশঙ্করকে সত্যিই খুব দোষ দেই না, বস্তুতঃ যৌবন একটু হঠকারী হয়েই থাকে। এমন কি ও তার খানিকটা স্বধর্ম্মই বলা যায়। এ আমি তাঁকে patronize করার জন্যে বলছি না—তিনি যেন বিশ্বাস করেন। কারণ আমি নিজেই জানি কতবার এ-ধরনের হঠকারিতা আমি নিজেই ক’রেছি যৌবনের রক্ত গরমের ফলে। সবচেয়ে ভরসার কথা এই যে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর বা শ্রীনীরেঙ্গনাথ sweeping generalisation-এ শরৎচন্দ্রের সিংহাসন বাঙালী হৃদয় থেকে তিলাক্ষণ টল্বে না এবং ক্রিতিশচন্দ্রের সঙ্গে আমি একমত যে কমল বাংলা সাহিত্যে একটি অপূর্ণ সৃষ্টি।

তবে শুধু একটি কথা আমি শরৎবাবুর বিপক্ষে বলব এ-চিঠির সমাপ্তি টানবার আগে। সেটা এই যে কমলের বিপক্ষে তিনি যে-সব বোকা লোকদের দাঁড় করিয়ে তাঁর বিপক্ষ মতকে অপদস্থ করিয়েছেন সেটা fair হয় নি, আর্টের দিক দিয়েও না—সত্যের দিক দিয়েও না। এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে যদি আক্রমণ ক’রে হয় প্রতিপন্ন করাই তাঁর উদ্দেশ্য হয় (এ উদ্দেশ্য তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হ’লে এ প্রতিপাদনের চেষ্টা তাঁর পক্ষে অন্যায় নয়) তাহ’লে সে উদ্দেশ্যও সাধিত হয় নি। কারণ ও-ভাবে

একটা চরিত্রকে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ক’রে তার প্রতিপক্ষকে বোকা বানিয়ে সবই প্রতিপন্ন করা যায়। কমলের বিপক্ষে গোরাকে নামিয়ে যদি শরৎবাবু তর্কে জিততেন তবে বুঝতাম। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অস্বুত। তিনি যখন যে-চরিত্রকে দিয়ে কোনো point of view প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন তখন তাকে দিয়ে সে বিষয়ে চরম কথাটি বলিয়ে ফাস্ত হ’য়েছেন। দৃষ্টান্ত তাঁর পঞ্চভূত, চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে, গোরা। মদীয় পিতৃদেব বহুদিন আগে গোরা প’ড়ে “বাণী” কাগজে লিখেছিলেন :—

“এই উপন্যাসে বহুল পরিমাণে তর্ক বিতর্ক আছে, কিন্তু তাহাতে পাঠকের বিতৃষ্ণা হয় না, বরং সেইগুলি বোধহয় যেন মাণিক্যের মত পুষ্পকমন্ডো বিকশিত আছে। এ-তর্ক-গুলির মজা এই যে, যখন যে-উক্তিটি যে-পক্ষে উক্ত হইয়াছে তখনই সে-উক্তি সেই পক্ষের চরম যুক্তি বলিয়া বোধহয়, এবং বিপক্ষ পক্ষ তাহার উত্তরে কি বলিবে তাহা জানিবার কৌতুহল বাড়ে।”

এই-ই হওয়া উচিত। দ্রষ্টব্য গল্‌সওয়ার্ডির নানা চরিত্র ও point of view চিত্রণেও তাঁর এই ধরনের কৃতিত্ব যুগ্মকর। তাঁর বিখ্যাত নাটক Strife এর জলন্ত দৃষ্টান্ত। একদিকে হৃদয়হীন Capitalist সচিব অ্যান্টনি, অন্যদিকে হৃদয়বান শ্রমিক নেতা রবার্ট কিন্তু গ্রন্থকার আশ্চর্য্য কোশলে দু’জনেরই প্রতি সমবেদনা জাগিয়ে তুলেছেন—দু’জনেরই সঙ্গম ও গৌরব বজায় রেখে। একজনকে মরা তৈরী ক’রে তার ওপর খাঁড়ার বা চালিয়ে জয়ী হ’তে চান নি—যা কমলের পদ্ধতি পদে পদে। শেষপ্রশ্নে কমল যেখানে সেখানে যাকে তাকে তুলো ধুনে ছেড়ে দিচ্ছে—কেন না she never met her match. অথচ এ-শ্রেণীর খাটে এই জুড়ির সৃষ্টিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিষ। তাই জগ্রে আমার মনে হয় শেষপ্রশ্নের সব চেয়ে বড় ত্রুটি এইখানে। বেশ বোঝা যায় গ্রন্থকার above the battle-field ন’ন। কমলকে তিনি আঁকতে গিয়ে যে তার মধ্যে নিজের মতামতের আসন পেতেছেন—তাতে দোষ নেই (শিল্পীর প্রিয় চরিত্রের মধ্যে তাঁর নিজের ছায়া পড়বেই)—কিন্তু কমলকেই কোটানোর জগ্রে তার প্রতিপক্ষদেরকেও কোটানো উচিত ছিল। ইংরাজীতে



বলতে হ'লে বলতে হয় Kamal's convincing logic has in the end defeated itself.

কিন্তু তার স্বপক্ষেও কিছু বলবার কিছুই যে নেই তা বলি না। ধর্মের নামে এত অধর্ম আমাদের দেশের বুককে ঝাঁঝেরা করে রেখে গেছে যে এ-পীড়িত দেশে শরৎচন্দ্রের মতন দয়ালু পক্ষে স্বাধীন দেশবাসী গল্‌স্‌ওয়ার্দির মতন “যুদ্ধের উর্দ্ধে” থাকা সম্ভবপর হয় নি। তিনি তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্ব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন অসহায় কমলের দিকে। কিন্তু আবার মুন্সিঙ্গ এই যে কমলকে কোথাও অসহায় মনে হয় না—মনে হয় বরং যে ওর প্রতিপক্ষেরাই দল বেঁধে অসহায় একা ওর বিরুদ্ধে। এরকম তেজস্বিতার চিত্রণ দুর্লভ—যে-কোনো সাহিত্যেই, মানি। কিন্তু তাতে ক'রে কমলের “বক্তব্যগুলি” সর্বত্র জোর পায় নি এই-ই আমার বলবার কথা। কমল অপূর্ণ হ'য়ে শতদলের মতনই ফুটেছে—কিন্তু তার আক্রমণগুলো লক্ষ্যভেদ করে নি।

আর একটা কথা অবশ্য মনে হয়ই এ সম্পর্কে যা রোল' ব'লেছিলেন টল্টয়ের সম্বন্ধে যখন টল্টয় ব'লেছিলেন যে ওয়াগনারের সঙ্গীত বিশেষ কিছু নয়। রোল' ব'লেছিলেন যে তাঁর দুঃখ এই যে টল্টয় সঙ্গীত সম্বন্ধে রায় দিতে গিয়ে এমন সব কথা ব'লেছেন যাতে সঙ্গীতাভিজ্ঞের ভেতর মনে দুঃখ হয়ই এই ভেবে কেন সঙ্গীত সম্বন্ধে একটু ভালো ক'রে

না জেনে এ-রকম সব কথা বলতে গেলেন? শরৎচন্দ্র যখন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে আক্রমণ করেছেন আমার বার-বারই মনে জেগেছে এই আক্ষেপ। মনে হয়েছে কেন তিনি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে কোমর বাঁধার আগে তার স্বরূপ সম্বন্ধে একটু অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন না? তা'ছাড়া—যেটা এসম্পর্কে সব চেয়ে বাজে—শুধু শোনাকথার উপর ভিত্তি ক'রে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোতে শরৎবাবু নিজেরাও খানিকটা পূজ্যপূজ্য ব্যতিক্রম করেন নি কি—যে-আধ্যাত্মিকতার ঐতিহ্যে ভারত বুদ্ধ, কবীর, নানক, শঙ্কর, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ মহামানবের জন্মদান ক'রেছে? পুনরায় মনে হয় Bennet এর কথা—কোনো কিছুকে সত্য বোঝা যায় কি—প্রেমের আলোয় ছাড়া?

ইতি ভবদীয়

শ্রীদিলীপ কুমার রায়।

পুঃ। এ প্রবন্ধ কিন্তু শেষপ্রান্তের সমালোচনা নয়। এর নাম হওয়া উচিত বোধ হয় “আর্ট ফর আর্টস্‌ সেক”, না? চিঠি ব'লে দু'টো অবাস্তব কথা বললাম। সে সবই দয়া ক'রে ছাপাবেন—এ পুনশ্চটুকু সমেত।

## উদয়-তারার

( পূর্বানুস্মৃতি )

শ্রীশ্রীশ্রী কুমার ধর

জগন্নাথ লাশে, আভাষ ও ইজিতে তাহাকে লুক করিয়া একেবারে কাছে টানিয়া আনিয়া যে নারী, সতী সাজিয়া তেজ দেখাইবার অভিনয় করিতে পারে, প্রকাশের ইচ্ছা হইল, দুই হাতে গলা টিপিয়া চিরকালের জন্ত তাহার কঠরোধ করিয়া দেয়। কিন্তু প্রকাশ একটি কথা পর্যন্ত বলিতে পারিল না।

তাহার সর্বাঙ্গ যেন অবশ, অসাড় হইয়া গেছে। কথাগুলো বলা শেষ করিয়াই বরুণার মনে হইল এত দিষ্টর ভাবে না বলিলেও চলিত কিন্তু প্রকাশের চেয়ে তাহার ভয় বেশী, নিশ্চি-রাতের দুজনের এই বাধাহীন অবস্থাকে। এ অবস্থায় যে নিজেকে বিশ্বাস করা চলে না, তাই চিরন্তন

দুর্বলতাকে কশাঘাত করিবার জন্যে এইটুকুর একান্ত প্রয়োজন ছিল! তা ছাড়া আজিকার রাত্রিই যে তাহার জীবনের শেষ রাত্রি নয় একথা বরুণা কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই!

প্রকাশ তখনও বরুণার মুখের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে, তাহার সারা মুখের উপর পড়িয়াছে একটা কালো ছায়া—কিন্তু বরুণার চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে—এবং এমনভাবে একটি কথাও না বলিয়া পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া প্রায় পাঁচ মিনিট কাটিল। কিন্তু প্রকাশকে ক্রমশঃ বেশী গভীর হইতে দেখিয়া বরুণা আর না হাসিয়া পারিল না এবং এখন বরুণার গুষ্ঠপ্রান্তের ক্ষীণ হাসি-রেখাটির দিকে তাকাইলে বিশ্বাসই হয় না, এই মেয়েটি একটু পূর্বে পাশের ঐ ছেলেটির হাত হইতে নিজের সম্মান রক্ষার জন্যে শিকল টানিয়া ট্রেনের গতিরোধ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়িতেও পারিত। বরুণাকে হাসিতে দেখিয়া প্রকাশ বরুণার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া গাড়ীর বাহিরে তাকাইল। তাহার রুঢ় ব্যবহারে প্রকাশ যে অত্যন্ত আহত হইয়াছে এবং রাগিয়াছে একথা বরুণা যে বোঝে নাই এমন নয় কিন্তু প্রকাশ যে কেবল রাগের বশেই মুখ ফিরাইয়া লইল না একথা বুঝিয়া জোরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল—তোমার এ অভিমানের কোন মানে হয় না, প্রকাশ—

বরুণা আজ প্রথম তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিল এবং এই ছোট ডাকের মধ্যে এমন একটা মাধুর্য্য ছিল যে, প্রকাশ কণেকের জন্যে বরুণার মুখের দিকে না তাকাইয়া পারিল না।

বরুণা বলিল—আমার এ দেহটার পূর্ব ইতিহাস শুন্লে আমাকে ছুঁতেও তোমার ঘেন্না কোরবে—

এবং কথা শেষ না করিয়াই একেবারে প্রকাশের গা ঘেঁষিয়া বসিয়া বরুণা বলিল—দেহটা বাদ দিলে মানুষের কিছুই থাকে না জানি, কিন্তু কেবল দেহটাই মানুষের সব নয়.....

বরুণার স্পর্শ হইতে নিজের দেহকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া লইয়া প্রকাশ একটু রাগের স্বরে বলিল—দেহ আর

মনের analysis করবার মত অবস্থা, অন্ততঃ আমার মনে নেই, কমা করো—

প্রকাশের একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া বরুণা বলিল—রাগ করো না লক্ষ্মীটি! দিন কতকের জন্যে আমাদের পরস্পরকে ছেড়ে দাবার যখন উপায় নেই তখন একটা মীমাংসা হওয়া দরকার। একটা তুল ধারণা নিয়ে আমি তোমার দূরে দূরে থাকুব যা তুমি একটা মিথ্যে লজ্জার ভয়ে আমার কাছে আসবে না, সে বড়ো বিত্তী—

প্রকাশের মনের অবস্থা এমন হইয়াছে যে, সে কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছে না, কোন বরুণা সত্য। যে বরুণা এখন তাহার হাত ধরিয়া ছোট বোনটির মত মিনতি জানাইতেছে—না, যে বরুণা উপযাচক হইয়া তাহার বধু সাজিয়াছে—অথচ দূরে থাকিতে চায়! প্রেমের কবিতার দেহাই দিয়া প্রথম যৌবনে কবি প্রকাশ যে সব নারীর বন্ধুত্বও সজলাভ করিয়াছিল তাহার ঠিক বসন্তের প্রজাপতির মত, তাহাদের দেহে-মনে রঙের প্রাচুর্য্য কিন্তু বেশীদিন তাহাদের মনে থাকে না। তাহার পর যাহারা আসিয়াছে—তাহাদের অনেককে আজও মনে পড়িলেও এই মেয়েটির মত কেহ তাহাকে উদ্ভ্রান্ত করে নাই!

প্রকাশ বলিল—পুরুষকে লুক করবার ক্ষমতার স্বপ্নে নিয়ে আজ পর্যন্ত আমার মত অনেকের ঘাড়ে তুমি চেপে বসেছ, কিন্তু কি যে তুমি চাও—আর কী তোমার উদ্দেশ্য তা আজও বোঝা গেল না। অমরেশকে তুমি যা বললেছিলে তা যদি সত্য হয় অর্থাৎ পুরুষকে নিয়ে ঘর বান্ধার নেশা তোমার নেই তা হ'লে তোমার এ অভিনয় কেন? আর এ অভিনয়েরই বা কারণ কি? মুখ ফিরিয়ে নিলে হবে না, বরুণা, তোমাকে বোলতেই হবে কি তোমার উদ্দেশ্য.....

মিনিট দুই তিন মুখ নীচু করিয়া রাখিবার পর বরুণা যখন প্রকাশের মুখের দিকে তাকাইল তখন তাহার সারা মুখে একটা অপূর্ব আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ও যেন কোন পাপই জানে না!

বরুণা বলিল—নারী তোমাদের পথের বাধা এই কথাই

তোমরা শুনে ও জেনে এসেছে কিন্তু সব নারীই যে চোখের জল ও আকৃতি নিয়ে পথরোধ কোরো দাঁড়ায় না—সে যে প্রয়োজন হ'লে সাধী হ'তে পারে, তার প্রিয়তমের সঙ্গে পাশা-পাশি ব'সে দেশের জন্ত প্রাণ দিতে পারে এই কথা প্রচার করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য—

বাধা দিয়া প্রকাশ বলিল—বড়ো নাটুকে হ'য়ে যাচ্ছে, বরুণা, আমি একথা শুন্তে চাই নি। এ রকম অনেক কথা প্রতিদিন কাগজে দেখতে পাই—

বরুণা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তবে ?

অপরূপ বরুণার এই হাসিটুকু !

প্রকাশ বলিল—কথাটাকে এড়িয়ে গেলে চ'লবে না বরুণা। তুমি বলো আমাকে নিয়ে তুমি কি করতে চাও ?

বরুণার হাসি এখনও থামে নাই, বলিল—আপাততঃ তোমাকে সঙ্গে কোরে পাটনায় যেতে চাই,—

গম্ভীরভাবে প্রকাশ বলিল—কিন্তু আগের ষ্টেশনেই আমি নেমে যাচ্ছি—

বরুণা পুনরায় প্রকাশের হাতখানি নিজের হাতের উপর লইয়া বলিল—ইস, যাও দেখি তুমি কেমন কোরে যাবে—

প্রকাশ হাত ছাড়াইয়া লইয়া বেশ একটু রাগের স্বরে বলিল—তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না বরুণা, এতই যদি সোহাগ তবে এত ভনিতাই বা কেন ?

বরুণার মুখ আবার কঠিন হইয়া উঠিল, দাঁত দিয়া দুই মুহূর্তের জন্তে ঠোট চাপিয়া ধরিয়া বলিল—দুটো মিষ্টি কথা বা একটুখানি নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার পেলেই মনে করো মেয়েরা তোমাদের প্রেমে প'ড়েছে—আর এই মনোভাব নিয়েই তোমরা চাও মেয়েদের স্বাধীনতা দিতে !! ছিঃ, পুরুষ ও নারীর সব চেয়ে বড় সমস্যা কি কেবল দেহকেই ঘিরে ?

প্রকাশ বসিয়াছিল, এইবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—এখন তুমি এমন ভাবে কথা বোলুছ, বরুণা—যেন তোমাকে একলা পেয়ে আমি তোমার সঙ্গে কত অগ্নায় ব্যবহারই না করিছি—কিন্তু আজকের সকালের ঘটনাগুলো কি এরই মধ্যে ভুলে গেলে ?

বরুণা ঠিক পূর্বের মতই শান্তভাবে বসিয়া রহিল, শুধু একটু চকল দেখা গেল না। প্রকাশ পুনরায়

নিজের জায়গায় বসিবার পর বরুণা বীরে বীরে বলিল—না হয় মুখেই বলিছি, কিন্তু এ বিশ্বাস তোমার কেমন কোরে হোল যে, আমার সীঁথির সিঁদুর তোমারই উদ্দেশ্যে ?

—এ তোমার, কেবল মুখের কথা ! কিন্তু ও বাড়ীর মেয়েদের যদি কোর্টে হাজির করা হয়, তাহ'লে—

বাধা দিয়া বরুণা বলিল—তাহ'লে তোমার জেলও হ'তে পারে—

প্রকাশ কোন জবাব দিল না, বরুণাই বলিল—আমার স্বামী আছেন এবং সত্যিকারের বিয়ে হ'য়েছিল—

বরুণা মনে করিয়াছিল প্রকাশ হয়ত একথা শুনিয়া লাফাইয়া উঠিবে কিন্তু প্রকাশের কোন ভাবান্তর দেখা গেল না, সে যেমন ভাবে বসিয়াছিল ঠিক তেমনিভাবে বসিয়া রহিল। বরুণাই প্রকাশকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—বিশ্বাস হোল না ?

বেশ শান্তভাবে প্রকাশ বলিল—গোড়াগুড়ি থেকে তোমাকে বিশ্বাস না করলেই ভাল ছিল, বরুণা, এখন এমন হয়েছে যে কি কোরব বুঝতে পারছি নে ! কিন্তু তুমি যে বিবাহিতা, তোমার স্বামী আজও বেঁচে আছেন, একথা ও বাড়ীর মেয়েরা জানে ?

—কেবল সাহানা জানে। একদিন দুপুর বেলায় খুব মেঘ কোরে বৃষ্টি এসেছে, হাতে কোন কাজ ছিল না, হঠাৎ খেয়াল গেল একখানা চিঠি লিখি। এমনি অনেক চিঠি আমি লিখেছি এবং লেখা শেষ কোরে দু তিন বার নিজে নিজে পড়ে ছিঁড়ে ফেলেছি—সেদিন কোন্ সময় যে সাহানা আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে তা বুঝতেই পারি নি হঠাৎ একটা নিশ্বাসের শব্দ কাণে আগতেই চমকে তাকিয়ে দেখি, ও দাঁড়িয়ে আছে এবং ওর দুটি চোখ জলে ভ'রে গেছে। কিন্তু ও জানে না যাকে আমি চিঠি লিখছিলাম তিনিই আমার স্বামী—তবে বুঝেছিল ঐ ছেলেটিকে আমি এখনও ভুলতে পারি নি—

বরুণার কথা শেষ হইবার পূর্বেই ট্রেন আসিয়া একটি ষ্টেশনে থামিল এবং কলরবে সচকিত হইয়া উঠিয়া বরুণা বলিল—থাক, এসব কথা। তোমাকে এমন কোরে কাছে টেনেছি কেবল তোমাদের কাজের দ্বারা জানবার জন্তে কিন্তু

দেখলাম কাজের চেয়ে নিজেকে নিয়েই তোমরা বেশী ব্যস্ত এবং এই জন্যেই তোমাকে নিয়ে আমার এই খেলা ! আমার কথা শুনে তোমার হৃদয় রাগ হ'চ্ছ কিন্তু আমার দুঃখ যে তুমি আমাকে একদিনের জন্যেও বুঝতে চেষ্টা করো নি—প্রথম দিন থেকেই আমাকে দেখে তুমি আত্মহারা হ'য়েছ—

বরুণা চুপ করিলে কিছুক্ষণের জন্তে দুইজনের কেহই কোন কথা কহিল না। এই টেশন হইতে দুইজন পুরুষ যাত্রী এ কামরায় উঠিয়া কলরব শুরু করিয়াছে, সামনে আর একটি মাত্র টেশন, তাহার পরই পাটনা। কথায় কথায় রাত্রি যে কত হইয়াছে তাহা কাহারই খেয়াল ছিল না। দ্বিতীয়ার চাঁদ বহু পূর্বেই অস্ত গিয়াছে—তাহার পর ইতিমধ্যেই কুয়াশা নামিয়াছে বলিয়া বাহিরের কিছুই আর নজরে আসে না। এমনভাবে আরও কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিবার পর প্রকাশ বলিল—তৈরী হ'য়ে নেও বরুণা, —আর একটা টেশন পরেই আমাদের নামতে হবে—

—নামতে ত' হবে, প্রকাশ, কিন্তু আমার জীবনের আসল কথাটা না বোলে কেমন কোরে যে সাতদিন—সাতরাত্রি তোমার পাশে পাশে থাকুব, এই হ'য়েছে আমার ভাবনা—

দুই মুহূর্তের জন্যে বরুণার মুখের দিকে তাকাইয়া প্রকাশ বলিল—তোমার সঙ্গে আমার এতদিনের ব্যবহার কেবল তোমার জন্তেই, বরুণা, তুমি আমাকে লোভ দেখিয়েছিলে আমি তোমায় কাছে টেনেছি, কিন্তু এ কথা যদি সত্যি হয়, কোন একটা বড় আঘাতের বেদনায় তুমি পথে বেরিয়ে এসেছ—অথচ তুমি নিজেকে আজও ভুলতে পার নি—আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, বরুণা—

প্রকাশকে বাধা দিয়া বরুণা বলিল—কথা দেওয়ার আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, প্রকাশ, আমি যদি পাটনার লোকের কাছে নিজেকে তোমার স্ত্রী ব'লে পরিচয় দিই ?

প্রকাশের মুখ যেন মুহূর্তের জন্ত কালো হইয়া উঠিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল—কোন রাজ্যে তুমি যদি নিজে গেচে এসে আমার শয্যার অংশ চাও, আমি তোমাকে সমস্ত শয্যা ছেড়ে দিয়ে বাহিরে চ'লে যাব—

বরুণা ব্যগ্রভাবে প্রকাশের দুখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে ডাকিল—প্রকাশ—

প্রকাশ ডাকিল—বরুণা—

\* \* \*

সভা ভাঙ্গার পর হইতে সহরের চারিদিকে গুজব চলিয়াছে—হয় আজ রাত্রি-ভোরে কিম্বা কাল দুপহরে প্রকাশ ও বরুণা কলিকাতাগামী ট্রেনে উঠিয়া বসিলে, পুলিশ তাহাদের গ্রেপ্তার করিবে।

প্রকাশ একথা শুনিয়া বলিল—একথা যদি সত্যি হয়, বরুণা, তা হ'লে আমি অকৃতঃ রক্ষে পাই—

প্রকাশের ঠোঁটের উপর হাত চাপিয়া ধরিয়া বরুণা বলিল—ফের, এখনও তোমার সেই পাগলামী গেল না—

গোল ঘরের ছাদের উপর প্রকাশ ও বরুণা দুইজনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের মাথার উপর মেঘ-হীন উদার আকাশ—নীচের সম্ভ্রামণের আলোর খানিকটা আভা আসিয়া তাহাদের মুখে পড়িয়াছে, ডানদিকে শীতের আঁকা-বাঁকা গঙ্গা দেখা যায়—তাহার মাঝখানের সরু চড়াটিতে বোধহয় কোন মাঝি আগুন জ্বালাইয়াছে—এ পাশে আলোর মালায় সজ্জিতা রূপসী নগরী !

দুইজনে পরস্পরের এত নিকটে দাঁড়াইয়া আছে যে বরুণার নিঃশ্বাসের উষ্ণ স্পর্শ প্রকাশের মুখে আসিয়া লাগি-তেছে এবং তাহাদের দাঁড়াইয়া থাকিবার ভঙ্গী দেখিয়া স্বামী-স্ত্রী বলিয়া ধারণা হওয়া অন্তের কাছে একটুও বিচিত্র নয়—কিন্তু প্রকাশ ও বরুণা জানে যে, তাহাদের কাহারও নিকট অপদের মনোভাব অজানা না থাকিলেও এমন একটা অজ্ঞাত বাধা তাহাদের মাঝখানে পথ-রোধ করিয়া আছে, যাহাকে অতিক্রম করা তাহাদের কাহারও পক্ষে সম্ভব নয় !

অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর প্রকাশ বলিল—চলো, ক্যাম্পে যাই, বরুণা—নরেনের আসার কথা আছে—

বরুণা বলিল—অদ্ভুত এই নরেন বাবু ! কিন্তু ঠিক একেবারে তোমার উল্টো, নারীর স্ববগানে তুমি মুগ্ধ—আর উনি—



বরুণাকে বাধা দিয়া প্রকাশ বলিল—এরি মধ্যে তুমি বুঝে গেছ বরুণা, যে আমার বন্ধুটি একটি ‘প্রকাশ’ নারী-বিষেবী—

—এ কথা জিজ্ঞাসা কোরে জানতে হয় না, ওর সঙ্গে মাত্র মিনিট পনেরো আলাপ কোরেই আমি তা বুঝিছি এবং তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে প্রকাশ, তোমার সঙ্গে আমাকে দেখে উনি একটুও সন্তুষ্ট হন নি—এমন কি উনি তোমার আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন—

—আমিও যদি নরেনের সঙ্গে তোমার মত একটি মেয়ে দেখতাম, তা হ’লে ওরই মত অসন্তুষ্ট হতাম—

—মানে ?

—আমাদের কাছে মৃত্যু ছাড়া এর আর কোন মানে নেই ! কিন্তু এ সব আলোচনা পরে হ’লেও চ’লবে—প্রায় দুবছর পরে ওর সঙ্গে দেখা—অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে । তা ছাড়া আমাদের আর একটি বন্ধুর কোন খবর জানে কিনা—

বরুণা কোন ব্যস্ততা না দেখাইয়া বলিল—এত তাড়াতাড়ি কেন, প্রকাশ, আর একটুখানি দাঁড়াও না ! তুমি একটা কবিতা আবৃত্তি করো না, প্রকাশ !

দুই মুহূর্তের জন্যে বরুণার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া প্রকাশ বলিল—আজ আমি তোমার অবাধ্য হব না বরুণা, কি জানি—

কথা শেষ না করিয়া প্রকাশকে নীবব হইতে দেখিয়া বরুণা বিস্মিত হইয়া প্রকাশের মুখের দিকে অভিভূতের মত তাকাইল ।

প্রকাশ অবৃত্তি করিতে লাগিল—

জীবনে য’াদের মিল জোটে নি ক’—

যা’রা বাতিল,

আমি কবি আজ তা’দের জীবনে

জোগাই মিল ।

এই কলঙ্কী ধরার আমি যে

চারণ-কবি—

যে ধরায় শুধু বেদনা, বিকার,

ব্যাধির ছবি !

তবু জানি, আজ যে-ই হৃদয়

ফিরিয়া গেছে,

একদা আবার ফিরিয়া আসিবে

আপনি ঘেঁচে ;

পাঁকে নেমে আজ নব পঙ্কজ

যা’রা ফোটার ;—

বিধাতা আসিয়া প্রণাম করিবে

তাদেরি পায় ।

নতুন ভোরের গান গেয়ে চলি

তিমির-তীরে,

সে-গান শুনাই ধূলি-মাখা জন-

গানের ভীড়ে ॥ +

প্রকাশের আবৃত্তি শেষ হইয়া গেলে বরুণা আর একটি কথাও না কহিয়া ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে লাগিল, প্রকাশ সেখানেই স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল—বরুণাকে অনুসরণ করিল না, তাহাকে বারণও করিল না । প্রকাশ যেন আজ হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে—এ পৃথিবীতে মানুষের মত এত অসহায় আর কেহ নাই ! এতদিন খেলার ছলে সে ছন্দ লইয়া খেলাই করিয়াছে—কিন্তু আজ এই নীতের ঘান-জ্যোৎস্না-স্নাত রাত্রে মানুষের চিরন্তনী কামনাময়ীর ছদ্মবেশ ছাড়িয়া যে নারী তাহার সাম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সর্কাজ ধেরিয়া কি দৈন্ত ! পরণে বসন নাই, কককেশা—শীর্ণা—দুই চোখে তাহার অশ্রু ঝরিতেছে !

আট দশটা সিঁড়ি নামিয়া আসিয়া বরুণা একান্ত অবসন্নের মত কিছুক্ষণ দেয়াল হেলান দিয়া দাঁড়াইল তাহার পর সেইখানেই বসিয়া পড়িল । একবার ইচ্ছা হইল পুনরায় ফিরিয়া গিয়া প্রকাশের পাশে দাঁড়াইয়া—সকল সঙ্কোচ ভুলিয়া বলে—তোমাকে অনেক দুঃখ দিইছি, আমাকে ক্ষমা করো—

কিন্তু হঠাৎ তাহার মনে হইল এ অবস্থায় যদি প্রকাশ

তাহাকে দেখে তাহা হইলে সে আর তাহার সামনে যুগ তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না ! অকারণ লজ্জায় সে আপনিই একবার শিরিয়া উঠিল—তাহার পর তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল ।

গোলঘরের নীচে শিশুগাছের ছায়া পড়িয়াছে—প্রকাশ দেখিল সেই ছায়ার আড়াল দিয়া বরুণা জন্তপদে ক্যাম্পের দিকে চলিয়াছে—

\* \* \*

পাশাপাশি দুইটি ক্যাম্প । প্রতিরাতে বরুণার ক্যাম্পে একজন না একজন মহিলা স্বচ্ছাসেবিকা উপস্থিত থাকেন, কিন্তু সত্য হোক আর মিথ্যা হোক প্রকাশ ও বরুণার গ্রেপ্তারের ওজব সহরে রাষ্ট্র হইয়া যাইবার পর আর একটি মহিলাও তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন নাই । আজ যে তাহার ক্যাম্পে কেহ নাই এর জন্যে বরুণার যেন লজ্জার আর সীমা নাই ! কেহ যদি বলে—আজ যে তোমার ক্যাম্পে একটি মেয়েও নেই বরুণা, এর একমাত্র কারণ মেয়েরা স্বাধীনতার চেয়ে নিজেদের সুনাম ও সচ্ছন্দ্যকে বড় কোরে দেখে—এবং যদি বলে, যাদের মন এত ঠুনকো—দেহের জন্যে যাদের এত ভয়, তাদের, এই মরণ নিয়ে খেলা করা'র ছল কেন ? বরুণার চোখে কিছুতেই আর ঘুম নামিতে চায় না—তাহার ইচ্ছা হইল এই নিশীত রাত্রে সকলের অলক্ষ্যে ক্যাম্প হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া পথ বাহিয়া চলিতে আরম্ভ করে—এ রাত্রি যেন আর প্রভাত না হয়—

পাশের ক্যাম্পে প্রকাশ ও নরেনের ভিতর কথা হইতেছে ।

নরেনের কথার স্বরে মনে হইল সে উদ্বেজিত হইয়া উঠিয়াছে । নরেন বলিল—সামান্য একটা মেয়ের মুখের আড়ালে কি তোমার প্রতিজ্ঞা, বন্ধুত্ব, বিশ্বাস—তোমার দেশ সব ঢাকা পড়ে গেল ! নারীর দেহই হোল তোমার কাছে সব চেয়ে বড়ো কামনার জিনিষ । আমাদের হল ভেঙ্গে গেছে সত্যি, কিন্তু সকলকে বঞ্চিত কোরে তুমি যে নিজেকে পরিপূর্ণ কোরে তুলবে এ অন্ততঃ আমার লক্ষ হবে না—

যুহু হাসিয়া প্রকাশ বলিল—তুমি উদ্বেজিত হ'য়ে উঠেছ, নরেন, আমার ভয় হ'চ্ছে তুমিও হয়ত—

প্রকাশের কথা শেষ হইবার পূর্বেই বাধা দিয়া নরেন বলিল—ও সব বাজে কথা থাক । আমি বলছি তোমায়, এই বরুণাকে ত্যাগ কোরতে হবে—

এই সময় মনে হইল কে একজন যেন ক্যাম্পের পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পদধ্বনি লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ বলিল—ঝগড়া রাখ, নরেন, আমার পরওয়ানা এসেছে.....

প্রকাশের কথার সুরে নরেন স্তব্ধ হইয়া গেল এবং আর একটি কথাও বলিতে পারিল না !

এমনিভাবে মিনিট কয়েক কাটিবার পর প্রকাশ বলিল—বরুণাকে পাওয়া সম্ভব হ'লে, দেশের চেয়ে ও আমার কাছে অনেক বড়ো হ'য়ে উঠত—কিন্তু তুমি মনে কোর না, নরেন, যে, ওকে পেলাম না বন্যেই ওকে বড়ো করছি—

ক্রমশঃ



## জার্মান মন্ত্রী ক্যাপরিভি \*

শ্রীবিনোদ বিহারী চক্রবর্তী

যখন আমি রাজত্ব গ্রহণ করি তখন জেনারল ফন ক্যাপরিভি ছিলেন নৌ-বিভাগের কর্তা। আমি অবিলম্বে সরকারী নৌ-বিভাগের সংস্কার ও উন্নতির জন্য মন-প্রাণ ঢালিয়া দিলাম। এই সংস্কার ও উন্নতির আকাঙ্ক্ষা আমার প্রাণে জাগিয়াছিল, ইংলণ্ডের ও জার্মানির নৌ-বিভাগের তুলনা করিয়া। কিন্তু আমার এই কৰ্ম ক্যাপরিভির মোটেই পছন্দসই ছিল না। তাঁহার কৰ্মক্ষমতা ছিল যথেষ্টই, কিন্তু তাহার সঙ্গে কতকটা একগুঁয়েমি আর খানিকটা হামবড়া-ভাব মিশিয়া, দোষই হোক আর গুণই হোক, তাঁহাকে চালাইয়া লইয়া যাইতেছিল।

সৈন্ত-সমাবেশে, সামরিক অফিসারদের উন্নতিতে এবং ট্রপিজো-বোটের গড়ন-শৃঙ্খলা ও ব্যবহারে—এক কথায় অরুগেনিজেশনের দিক দিয়া—তিনি জার্মানির যথেষ্ট সেবা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নূতন জগতে চলিবার জন্য তিনি জার্মানিকে কোনো নূতন চিন্তা দিতে পারেন নাই। পুরাতন জার্মানির চিন্তাধারা যখন নূতনের কাছে চিরবিদার লইতেছিল, তখনো বৃদ্ধা ক্যাপরিভি ও তাঁহার বন্ধুবর্গ পুরাতনকে টানিয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে-ছিলেন। তিনি নৌ-বিভাগের উন্নতির চিন্তা করিতেই পারেন নাই, সকল সময় কেবল সৈন্যদলের ভাবনাই ভাবিতেন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল যে, সৈন্যদলই অতীতে দেশরক্ষা করিয়াছে, ভবিষ্যতে এই সৈন্যদলই দেশরক্ষা করিবে। কাজেই নৌ-বিভাগের ভাগ্যে ক্যাপরিভির নিকট মামূলি ‘বরাদ্দের’ বেশি আর কিছুই লাভ হয় নাই। তিনি সরকারী বাজেটে নৌ-বিভাগের টাকার কথা না তুলিয়া সৈন্যদলের টাকা হইতেই নৌ-বিভাগে খরচ করিয়া বসিতেন। ইহাতে নৌ-বিভাগের কাজতো কিছু হইতই না, অধিকন্তু সৈন্যদলেরও দুর্বস্থা হইত যথেষ্ট। সৈন্যদলের জন্য তিনি

টাকা মঞ্জুর করাইয়াছেন সত্য, কিন্তু তার এক দামড়িও তার ভোগে লাগে নাই। সেটা কেবল খাতাপত্রেই ছিল।

ক্যাপরিভির সঙ্গে কোনো মনোমালিন্য আমার ঘটিল না বটে, কিন্তু নানা রকম অসুবিধা দেখিয়া তিনি নিজের হইতেই অবসর গ্রহণ করিতে চাহিলেন। আমি তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করিয়া তাঁহাকে এক সৈন্যদলের সেনাপতির পদে নিয়োগ করিলাম। নৌ-বিভাগের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন য্যাড্‌গিরাল্ কাউন্ট মোন্স্।

ইহাৎ এক অপ্রত্যাশিত খবর পাইলাম প্রিন্স্ বিস্মার্কের পদত্যাগ সম্বন্ধে। তাঁহার মতো উপযুক্ত লোক কোনো কালে জার্মানির কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব হয় নাই। এই একমেবাদ্বিতীয়ং লোকটার মতো প্রতিভা যেমন কাহারো ছিল না, জার্মানির আত্মসম্মান, জার্মানির উচ্চ আশা, আর জার্মানিই জীবনের যা কিছু সব এই অল্পময় ভাবুকতাও আর কোনো ব্যক্তিতে তেমন ফুটিতে দেখি নাই। কাজেই তাঁহার এই পদত্যাগের খবর পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত এবং বিষম ভাবিত হইয়া পড়িলাম। কারণ এই শূন্যপদ যে কেহই পূরণ করিবে, একমাত্র পদ-গৌরবটাই হইবে তাঁহার কাছে বড় বস্তু। এই পদের দোহাই দিয়া নিজের অযোগ্যতাটাকে যোগ্য করিয়া তুলিতে চাহিবে। নানাদিক্ হইতে সমালোচনা, সমালোচনা, কেবল সমালোচনাই হইবে তাঁহার দৈনিক খোরাব। পূর্বে বহুলোক দলবদ্ধ হইয়াও বিস্মার্কের বিরুদ্ধে যেকালে একটা কথাও বলিতে সাহস করে নাই, এখন সেই তাহারাই জনে জনে মূর্তিমান ধনুর্ধর হইয়া দাঁড়াইবে।

নানা দিক দিয়া চিন্তা করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত ক্যাপরিভিকেই এই চ্যান্সালার পদের জন্য মনোনীত করিলাম। কারণ একে তিনি বিস্মার্কের যুগের লোক, বিস্মার্কের গুণমুগ্ধ, বহু বহু লড়াইয়ে খ্যাতিমান, তার উপর

বিস্মার্কের অধীনে সরকারী কাজেও বহাল ছিলেন। তাঁহার বয়সটাও পদের পক্ষে মানানসই হইয়াছিল।

ক্যাপ্‌রিভির মন্ত্রী গ্রহণের কিছু পরেই রুশীয়া-সমস্তা দেখা দিল—রুশিয়ার সঙ্গে আমাদের মিতালীর মেয়াদ বাড়ানো লইয়া। ক্যাপ্‌রিভি বলিলেন, “অষ্ট্রিয়ার রুশভীতি যথেষ্টই রহিয়াছে, এমন অবস্থায় আমরা রুশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব গাঢ় করিয়া তুলিলে, জার্মানি ও অষ্ট্রিয়ার ভিতরে যে শত্রুতার স্রষ্ট হইবে তাহার ফল বড় ভালো হইবে না।” কাজেই, রুশ-জার্মান সন্ধি বাতিল হইয়া গেল, আর উহার স্থানে কারেম হইল অষ্ট্রো-জার্মান সন্ধি। রুশ-মন্ত্রীরা এই সন্ধিটা মোটেই পছন্দ করিতেছিলেন না।

এই সময়ে রক্ষণশীল জোত্‌দাররা এক ধূয়া ধরিয়া ক্যাপ্‌রিভির বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। ক্যাপ্‌রিভির বিষয়-সম্পত্তি কিছুই নাই, ইহাই হইল বিরোধিতার কারণ। ক্রমে ক্রমে এই আশুন ব্যবসাদার মহলেও ছড়াইয়া পড়িল। এই গণ্ডগোলের মূলে ছিলেন বিস্মার্ক স্বয়ং। আমার যে কোনো চিন্তা যে কোনো কার্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্ত সেদিন বিস্মার্ক চব্বিশ ঘণ্টা সজাগ ছিলেন। তিনি পেছনে থাকিয়া কোমর বাধিয়া—লিখিয়া, পড়িয়া, বক্তৃতা দিয়া, বুদ্ধি দিয়া, দল পাকাইয়া, নানারকম বচন উদ্ভূত করিয়া—সকল রকমে তাঁহার জন্মভূমির বিরুদ্ধে, রাজ্য হইতে দরিদ্র শ্রমিক পর্যন্ত দেশবাসীর বিরুদ্ধে শত্রুতার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। যে বিস্মার্কের প্রতিভা একদিন সমুদয় ইংরেজোপক্ষে নাকে দড়ি দিয়া টানিয়া বেড়াইয়াছিল, ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় সেদিন তাঁহার সেই প্রতিভা মলকীটের প্রদৃষ্টি লইয়া দেখা দিয়াছিল। কিছুকাল পর এই বিস্মার্ককে জনসাধারণ দেশের শত্রু বিবেচনা করিত। অতঃপর হেলিগোলান্ড্ হস্তকরার সময় বিস্মার্কের নিজের এবং বিস্মার্কপুত্রী খবরের কাগজ ও লোকদের এই শত্রুতা আরো ভালোরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

হেলিগোলান্ড্ দখল করিয়া ইংরেজ এক ডুবে অনেক স্রবিধা লাভ করিয়া বসিয়াছিল। জার্মানি হইতে বাহির হইবার পথে হেলিগোলান্ড্ ইংরেজের বাণী তো বটেই, অধিকন্তু হামবুর্গ্ ও ব্রেমেনের বাণিজ্য-বন্দরের পক্ষেও

উহা এক ভয়ের বস্তু ছিল। যতদিন হেলিগোলান্ড্ ইংরেজের হাতে থাকিবে ততদিন জার্মানির জাহাজ নির্মাণ করা, এমন কি তাহার চিন্তাটা পর্যন্ত জার্মানির পক্ষে একটা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় নাই। কাজেই হেলিগোলান্ড্ দখল আমার সাধনার বস্তু হইয়া উঠিল।

রাজনীতির দাড়িপাল্লায় একদিকে জার্মান উপনিবেশ—পূর্ব-আফ্রিকার জাম্বিয়ার ও স্মিটু দ্বীপকে—এবং আর একদিকে অফ্রিকার লালমাটির পাহাড় হেলিগোলান্ড্‌কে তুলিয়া ধরিতেই প্রধান মন্ত্রী লর্ড সলিসবেরী খুসি হইয়া গেলেন। পূর্ব-আফ্রিকার বাণিজ্য-বিবরণ ও ব্যবসার ভাবগতিক দেখিয়া এবং জার্মান-পূর্ব-আফ্রিকার উপকূলবাহী জার্মান ক্রুজার ও গান্‌বোটের কমান্ডারগণের বিবরণ শুনিয়া বুঝিয়া-ছিলাম, টাঙ্গা এবং দাব্-এল-সালাম্ প্রভৃতির সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাম্বিয়ার ও স্মিটু অতীত গোরবের স্মৃতিটুকু বৃকে লইয়া এক মহাশ্মশান হইয়া পড়িয়া থাকিবে।

আমি এষ্ট ভাবে আর একটা দিকও বাঁচাইয়া চকিতে চাহিয়াছিলাম। উপনিবেশ ছাড়িয়া দিয়া ইংরেজের সহিত বাণিজ্যিক সংঘর্ষ দূর করা এবং কাজে কাজেই ইংলণ্ডের বন্ধুতা অর্জন করা। আমার এই প্রস্তাবে ক্যাপ্‌রিভি রাজি হইলেন। ইংলণ্ডের সঙ্গে রেখা-পড়া হইয়া যাইবার পর এই বিষয় আমি সাধারণকে জানাইয়াছিলাম। হান্সার এবং উত্তর জার্মানির অধিবাসী ব্যবসাদারেরা বহুদিন যাবৎ নৌবহরের সাহায্য চাহিয়া আসিতেছিলেন, হেলিগোলান্ড্ দখল করিয়া আমি তাহাদের সেই বাসনা পূর্ণ করিবার প্রথম ধাপে পা দিয়াছিলাম। এইভাবে বিনা রক্তপাতে নীরবে জার্মানির জন্ত আমার বহুদিনের একটা প্রবল ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া গেল।

যদি হেলিগোলান্ড্ বিস্মার্কের আগলে জার্মানির হাতে আসিত তাহা হইলে সকলেই মনে করিত একটা বড় রকমের দাও মারা হইয়াছে। বিস্মার্কের তাত্ত্বিক করিত। কিন্তু ক্যাপ্‌রিভির আমলে ব্যাপারটা ঘটায় চারিদিক হইতে ছেলে-বুড়া, মেয়ে-পুরুষ সকলেই সমালোচনা করিতে লাগিল। যথা, বিস্মার্কের আগলে বসিয়া ক্যাপ্‌রিভির মাথা ঘোলাইয়া গিয়াছে, ক্যাপ্‌রিভির আঙ্গুল ফুলিয়া



কলাগাছ হইয়াছে, দায়িত্বজ্ঞানহীন, অকৃতজ্ঞ, খামখেয়ালী ছোকরা মনিষ পাইয়া ক্যাপ্‌রিভি বা খুসি তাই করিতেছেন, বিস্মার্ক যদি উচিত মনে করিতেন তাহা হইলে বহুপূর্বেই তিনি হেলিগোলান্ড হাত করিতে পারিতেন, আজ শুধু একটা খামখেয়ালীতে উপনিবেশগুলি হাতছাড়া হইয়া গেল, ইত্যাদি ইত্যাদি। হান্সার ব্যবসাদারদের কান্নার সঙ্গে সুর মিলাইয়া বিস্মার্কের দলের খববের কাগজগুলি গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে শুরু করিল।

একদিন যখন বিস্মার্ক ছিলেন মন্ত্রী আর আমি ছিলাম তাঁহার অধীনে পররাষ্ট্র বিভাগের একজন শিক্ষানবীশ এবং কর্মচারী, তখন এই সকল কাগজওয়ালারাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিত, বিস্মার্ক শুধু রাজনৈতিক ব্যাপারে ইংলণ্ডের সঙ্গে পাল্লা দিবার জগুই উপনিবেশের প্রয়োজন স্বীকার করেন। কিন্তু এই ব্যাপার ঘটিবার পর তাহারা উল্টা সুর গাহিতে লাগিল। তাঁহার উত্তরাধিকারী এখন সেই ধারণা হইতেই বোধ হয় এমন একটা কাজ করিয়া বসিলেন! যাহা হোক, দীর্ঘকাল আমরা এই সমালোচনার পর সমালোচনার ঝঞ্ঝা ও শিলাবৃষ্টির ভিতর দিয়া আপন মনে চলিতে লাগিলাম। তারপর, মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর আমার নিম্নক এবং সমালোচকরাই প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিয়াছিল, হেলি-

গোলান্ড-গ্রহণ জার্মানপরাষ্ট্রনীতির অতি দূরদৃষ্টি এবং উঁচুদরের রাজনীতির পরিচায়ক। তখন এই তাহারাই বলিয়াছে, যদি হেলিগোলান্ড জার্মানির না হইত তাহা হইলে অভাবিত বিপদের কল্পনা করা আজ যেমন অসম্ভব, হেলিগোলান্ড পাইয়া আজ কতখানি লাভ হইয়াছে তাহার হিসাব করিয়া আনন্দ করাও তেমনি অসম্ভব।

এই জগুই সমুদয় জার্মান জাতির ক্যাপ্‌রিভির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানানো উচিত। জার্মান নৌবহরের সৃষ্টি ও বিকাশ আর মহাযুদ্ধের কালে স্বাগার-রাকে জার্মানির অভূতপূর্ব বিজয়লাভ তাঁহারই দূরদৃষ্টির ফল, অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ক্যাপ্‌রিভি চ্যান্সালের হওয়ার পর বিস্মার্কের এত নিন্দা এবং সমালোচনা সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া তাঁহার আসনের মধ্যাদ। বজায় রাখিয়া চলিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন। বিভিন্ন রাজ-নৈতিকদলও সেদিন তাঁহার বিরোধিতা করিতে কসুর করে নাই। তথাপি তিনি কাজের লোককে তাঁহার সঙ্গে রাখিতে কখনো আপত্তি করেন নাই। শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক দলাদলির মাত্রা যখন বাড়িয়া উঠিল তখন তিনি কাজে ইস্তফা দিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল এক নিষ্কর্ন স্থানে কাটাইবার জগু চলিয়া গেলেন।

## বুদ্ধের সঙ্কল্প

ইহাসনে শুশ্রূতু যে শরীরম্  
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।  
অপ্রাপ্য বোধিঃ বহুকল্প-হুল্লভাম্  
নৈবাসনাং কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥

ললিত-বিস্তর।

এইখানে শুক হোক শরীর আমার,  
ত্বকু অস্থি মাংস হোক ধ্বংস সমুদয়,  
বহুকল্প-সুহৃৎ ভ বোধি বিনা আর,  
এ আসন হ'তে কায়া টলিবার নয়।

শ্রীঅনির্বরণ রায়।

## তাঁতিরাম \*

শ্রী আশালতা দেবী

চৌধুরী বাবুদের সাতমহলা ত্রিতল ভবনটির বিরাট ছায়ায় একখানি অতি জীর্ণ গোলপাতার কুঁড়ে শিখাতিলকধারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের পাশে অস্পৃশ্য চণ্ডালেরই মত সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়াছিল। কুঁড়েঘরখানার ঐ শুষ্ক পঙ্করখানার নীচে যদি প্রাণ থাকিত তবে সে বেচারীকে নিশ্চয়ই সারাক্ষণ ভয়ে দুক দুক কাঁপিতে হইত।

কিন্তু এত যে সঙ্কোচ কুঁড়েখানার আপাদমস্তক ছাইয়া থাকিত তাহা পাড়ার লোকের চোখে পড়িত না। তাহারা বলিত “নিরু মা পক্ষতের আড়ালে বাস করিতেছে।” পক্ষতের মালিক বড়কর্তা আজ ক’দিন আবার বায়না ধরিয়াছেন যে বিধবার ঐ ভিটেখানি না হইলে তাঁহার খোকার টেনিসকোর্ট তৈয়ারী হইতেছে না; তাই সহসা তিনি অনাধিনীর দুঃখে গলিয়া গিয়া আজ সকালে নিরুকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, “হ্যারে নিরু, রোগে, হিমে কচি ছেলে ছটোকে নিয়ে তোর মা নিউমোনিয়ায় মর্কে তবু ঐ পড়া কুঁড়েখানা আঁকড়ে পড়ে থাকবে? তোরা ত আর আমার পর ন’স মা; তা কোন আমারই একটা নীচের ঘরে রইলি! আচ্ছা আজ যদি নোর বাপ বেঁচে থাকতেন তাহলে কি আমার কথা সে ফেলতে পারতো! হরি হে তোমারই ইচ্ছা, তোমারই ইচ্ছা!!” পনেরো বছরের নিরু নিতান্ত শিশু ছিল না; জ্যেষ্ঠা মশাইএর শনির দৃষ্টি যে কোথায় পড়িয়াছে তাহাও সে মার কাছে শুনিয়াছিল। তাই প্রত্যুষেই এই অশ্রুচিত ক্রপাবাহুল্যে সে সশব্দ হইয়া শুক কণ্ঠে উহর করিল, “মা যে বলেন মরে গেলেও তিনি তাঁর শবুদের ভিটে ছাড়তে পারবেন না।” বলিতে বলিতে সে আঁচল ছুলাইয়া চলিয়া গেল। কৰ্ত্তা তখন একান্তে বসিয়া জপের মালায় জিলাপীর প্যাচ আঁটিতে লাগিলেন।

ক’জন মাস, এখনও শীতের প্রকোপ যথেষ্ট আছে।

দিবসানে মৃদু মন্দ ঝড় উঠিল। সন্ধ্যায় ঘনীভূত আঁধার খানি আঠে পৃষ্ঠে জড়াইয়া মৌন পল্লীখানি ঝড়ের দৌরাওয়া হইতে আত্মরক্ষা করিতেছিল। নিরুর মার শত জীর্ণ কুটিরখানি হেলিয়া ছুলিয়া আবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল। গৃহমধ্যে একখানি মাদুরের উপরে বসিয়া নিরু অতি সাবধানে কিসে একটা তালি লাগাইবার চেষ্টা করিতেছিল। রুগ্মা মাতা গৃহের অপর প্রান্তে শয্যায় শুইয়া ছিন্ন কন্যাখানি আঁকড়াইয়া শীত নিবারণের বিফল প্রয়াস পাইতেছিলেন। শিশুপুত্র দুইটি দিদির পার্শ্বে বসিয়া চারিটি বাসি মুড়ি চিবাইতেছিল। এমন সময়ে উপযু্যপরি কয়টি বাপটা আসিয়া কম্পমান স্বরতৈল প্রদীপটিকে সকল দৃশ্য হইতে নিষ্কৃতি দিল। বাহিরে বাতাসের শোঁশোঁ শব্দ ও ভিতরের জমাট অন্ধকার। শিশু দুইটি অতিমাত্র ভীত হইয়া বালিকাকে প্রাণপণে জড়াইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল। দু’টি ভাইকে দুই কক্ষ চাপিয়া ধরিয়া বালিকা তাহাদের সাঙ্ঘনা দিতেছে। ঝড়ের বেগও মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে এমন সময়ে পার্শ্ববর্তী ধনী গৃহের দ্বিতলের প্রকোষ্ঠ হইতে মধুবর্ণ হইল, “হ্যারে নিরী, সাঁঝেরবেলা এমন মরুকায় জুড়ে’ কাণ ঝালাপালা কচ্ছি সু কেন লা? তোর মা কি আর গরবার সময় পেলেন না? তাই আমার বাছাদের অকল্যাণ করতে এমন ভর সন্ধ্যাবেলায়—” শেষ কথা কয়টি আর শোনা গেল না। চোখেরজল মুছিতে মুছিতে নিরু ভাই দু’টির মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিল এবং দিয়াশলাই ঠুকিয়া প্রদীপটি জালিল। ইতিমধ্যে রুগ্মা উঠিয়া বসিয়াছেন, তিনি ক্রীণকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, “কি হয়েছে মা? তোর জেঠাই মা কি বলছেন?”

“ভূমি শোও না মা ও কিছু না; এত গোলমাল কিসের তাই জেঠাই মা জিজ্ঞেস করছিলেন।”

আজ কয়দিন রোগে ভুগিয়া পথ্যভাবে বিধবার দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি ক্ষীণ হইয়াছিল।

মাতা পুত্রী ও শিশু দুইটির গৃহস্থালীর এই করুণ ছবির কোনও সাক্ষী মিলিল না বটে কিন্তু যিনি সর্বসাক্ষী তিনি বুঝি অলক্ষ্যে দু'ফোঁটা চোখের জল মুছিলেন।

প্রাঙ্গণ হইতে স্নেহাঙ্গু কণ্ঠে কে ডাকিল “নিরু দিদি!” আশায় উৎকণ্ঠায় বিধবার সারাটা বক্ষ তোলপাড় করিয়া উঠিল। তিনি টলিতে টলিতে উঠিয়া বসিলেন। ক্ষীণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে বাবা তাঁতিরাম এলি?” মাতার উত্তেজনায় কণ্ঠা উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিল। সে আশ্বে আশ্বে রোগিণীর মস্তক উপাধানে রাখিয়া দরজা খুলিয়া দিল। আগন্তুক ততক্ষণ প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া দাওয়ায় উঠিয়াছে। তাহার ঋজু দেহ সন্মুখে ঈষৎ নম্র, বর্ণ ঘোর রক্ত, নাসিকা উন্নত, ললাট প্রশস্ত, চক্ষু দুটির বড় কমনীয় ভঙ্গী। বয়স পঞ্চাশ হইবে। গুরু শ্রাবণবিশীন মুখখানি যেন কি এক সব পাওয়ার তৃপ্তিতে সর্বদা হাসিতেছে। কপালের তিলকচিহ্ন ঘামে ধুইয়া গিয়াছে, আবক্ষ একছড়া রুদ্রাঙ্গের মালা।

বালিকা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া একখানি চাটাই পাতিয়া দিয়া সন্ধিভাবে প্রোঁচের শুক মুখ ও কোটরগত চক্ষু হইতে ধূলিধূসরিত পা দুখানিপৰ্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়া ব্যথিত তিরস্কারের স্বরে বলিল, “আজও বুঝি উপোস গ্যাছে? আচ্ছা লোক যা হোক! রোজই যদি এমনি কোরে না খেয়ে না দেয়ে দি'খিজয় ক'রে বেড়াবে তোমার ও হাড় কখানা ক'দিন টিকবে বলোত দেখি? না, কাল থেকে আমি আর তোমায় কোথাও যেতে দেবো না তা বলে দিয়ে রাখলুম কিন্তু!” শুক মুখখানিতে স্নিগ্ধ হাসি মাখাইয়া তাঁতিরাম বলিল, “তা ভাই রাগ করিস কেন? তোর জন্মেইত এসব বোন! তাও যদি সে বজ্জাতটাকে পাকড়াও করা যেতো! এত দিক জয় ক'ছি, শুধু তার দিকটাই যে ফাঁক রয়ে যাচ্ছে বোন!”

বালিকার গণ্ড দুটি ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিতেছিল; চোখ দুটিও যেন কেমন অবাধ্য হইয়া উঠিতেছিল। বাঙ্গালীর মেয়ে এতটুকু বয়সেই আত্মগোপনে অভ্যস্তা; সে তাড়াতাড়ি অশ্রু কথা পাড়িয়া বলিল, “না বাপু, ঘরের মধ্যে ত বনের

মোষ তাড়িয়ে এলে। এখন কি খেতেটেতে হবে বল শুনি। আর কিইবা আছে ঘরে যে তোমায় দেবো।” বলিতে বলিতে বালিকার কণ্ঠ রক্ত হইয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস উঠিল।

প্রোঁচা এবার আর কণ্ঠার নিষেধ না মানিয়া ধীরে ধীরে খাট হইতে নাগিয়া স্থলিতচরণে নীচে মাদুরে আসিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ হাঁফাইয়া শ্বাসকষ্টের উপশম হইলে জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, “ই্যা বাবা দেখা পেলি নে?”

“কই আর পেলুম মা! চাঁদপুরের বাবুদের বাড়ী যেয়ে শুনি যে তাদের দল পরশু রাত্তিরেই কোথায় বায়না পেয়ে সেখান থেকে চলে গ্যাছে। পথে আসতে শুনলুম শুক্রবার ও শনিবারে রত্নলপুরের হাটে তারা দু'পালা গান গাইবে। আবার আমায় ছোঁড়াটা সে পর্য্যন্ত নাকে দড়ি দিয়ে না টেনে ছাড়বে না দেখছি। কিন্তু যাই বলো মা, —ও নিরু শুনছি সু বোন!—তোমার জামাইয়ের যা প্রশংসা শুনে এলুম! রামচন্দ্র সেজে অমন নাকি হাজারো ছেলে বুড়োর চোখে বাণ ডাকিয়েছে! ই্যারে, ঘরে যে তোর সোণার সীতে ধুলোয় লুটছে তা কি একবার ফিরে চাইলি? কি বলবো মা তোমার এই ছেলেটি ছোট জাত, নইলে একবার তাকে পেলো আমি তার কাণ ধরে এনে আমার দিদির পায়ে নাকে খং দেয়াতুম না?” বলিতে বলিতে উৎসাহ আতিশয্যে তাঁতিরাম উঠিয়া দাঁড়াইল। কাপড় গামছা গোছাইয়া কোমরে বাঁধিল। রুগ্মা শঙ্কিত হইয়া বিষন্ন হাস্তে বলিলেন, “সে কাল তখন বাসু বাবা! আজ সারাদিন খামুনি। এখন এই ঝড় বাদলে আর তোমার বীরত্ব কাজ নেই।” তার পর আরও ধীরে ধীরে বলিলেন—“হঁ ছোটলোক বটে, এমন ছোটলোক যদি এ পাড়ারগায়ে সবাই হ'ত!”

কার্যাস্তরে যাইয়া নিরু তাহার উচ্ছ্বসিত কান্না চাপিতে গিয়া দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া আসিল। ঝড়ের মত আসিয়া ধপাৎ করিয়া একঘটি জল ও রেকাবিতে চারিখানি বাতাসা রাখিয়া কণ্ঠে যথাসম্ভব উগ্রতা মিশাইয়া বলিল, “মাগো, ধন্তি তোমাদের! সারাদিন উপোসের পারণটা বুঝি গল্প গিলেই সারবে? আর এই বকে বকে যদি অশ্লুধ বেড়ে ওঠে—না, যা বোঝো কর তোমরা; চ' ভাই দাস্ত

রাহু সেই গল্পটা শেষ করে ফেলি।' বালকহয় মায়ের পাশে নিঃশব্দে বসিয়াছিল। তাহারা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। দু'জনে নাচিতে নাচিতে দিদির হাত ধরিয়া চলিল।

বিধবা অপরাধের স্বরে বলিলেন, “সত্যিই ত মা! রামের কিছু খাওয়া দাওয়া হয় নি! তা আমারও এমনি পোড়া মন যে নিজের কথা নিয়েই মরে আছি। যা'ত মা উত্তনটা জেলে ফ্যাল।”

যাইতে যাইতে খামিয়া নিকু অতি দীর্ঘে উত্তর দিল— “কি রাঁ—খ—বো মা?” বালিকার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিয়া ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিধবার বক্ষ মণ্ডিত করিয়া দীর্ঘশ্বাস উঠিল।

মাতাপুত্রীর মূক ব্যথা তাঁতিরামের স্ত্রীকৃষ্ণ দৃষ্টি এড়াইল না। অভয় হাস্তে সকল মেঘ উড়াইয়া সে বলিয়া উঠিল “ওই যা: মন বাদরটা কি ভুলোই হয়েছে দেখতো দিদি। হাটের পথে আসতে দেখলুম থাসা থাসা কচি আম উঠেছে। কোন্ দিন মরে যাবো, তাই ভাবলুম নিকুদিদির হাতের ঝোলটা খেয়ে নি। তা বোন দে না বুড়োকে একটু ঝোল রেঁধে আজ। এসব কি পুরুষ মানুষের সাজে? তাইত বাড়ী না গিয়ে সোজা হেথায় এলুম।” বলিতে বলিতে বৃদ্ধ পুঁটলি খুলিয়া শুধু কচি আম নহে তার সঙ্গে চাল, ডাল, আলু, আরো কত কি বাহির করিল।

এক চোখে হাসি ও আর এক চোখে কান্না মাখাইয়া নিকু কষ্টে বলিল, “ই্যা দাদা কচি আগের ঝোলে চাল ডালও লগে নাকি?”

তাঁতিরাম সহজ কণ্ঠে বলিল, “না তা লাগে না বটে! তা ওগুলো বাড়ীতেই নিয়ে যাচ্ছিলুম। জানোইত দিদি আমার লক্ষ্মীর ভাগুরে ইঁচুরের দানাটিও জমা থাকে না।” হো হো করিয়া ইঁসিয়া তাঁতিরাম নিজের রসিকতায় নিজের মাতিয়া উঠিল।

“তা এত রাহুরে এ হাতীর খোরাক আর কোথায় পাবি বোন। ঐ গুলোই পাকিয়ে ফ্যাল। আর দেখ আগের ঝোলটা একটু বেশী কোরে রাঁধিস বোন কাল সকালে আবার খেয়ে বেরতে হবে কি না।”

“ই্যা, কাল আমি তোমায় খেতে দিলে ত?”

“আর একটি দিন দিসু ভাই—তা'হলেই এবার ছোঁড়া-টাকে এনে তোর আগের ঝোল খাইয়ে দি। দেখি ভায়া কেমন আমার দড়ি ছিঁড়তে শিখেছেন।”

নিকু ভাবিয়াছিল কাদিবে না। কিন্তু তাহার সকল সংকল্প জীবনী সম্মুখে ঐরাবতের মত ভাসিয়া গেল। রান্না ঘরে গিয়া রন্ধনের উপকরণগুলি মাটিতে ফেলিয়া সে কাদিতে বসিল। যতই শাসনে আঁটিতে যায় ততই তার শব্দাঘ্য চোখ দুইটি দিয়া অশ্রুবন্তা ছুটিয়া চলে। কান্নার কি তার একটা কারণ? নিকুদেশ, ভবঘুরে কুসংসর্গরত স্বামীর উদ্দেশে তার যত উৎকর্ষা, মরণাপন্ন মায়ের জন্য তার দ্বিগুণ উৎকর্ষা; কন্যার চিন্তায় যে তাঁর মরণেও শাস্তি নাই তাহা বালিকা বঝিত। এত ব্যথা বুকে পুষিয়া বালিকা এই দুঃখের সংসারটি পালিয়া আসিতেছিল। আজ নিঃসম্পর্কীয় নীচ জাতীয় বৃদ্ধের স্নেহস্পর্শে তাহার মনের সকল রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া গেল। সে বসিয়া বসিয়া বড় কাদিল। একটু হাল্কা হইয়া রন্ধনে মনঃসংযোগ করিল।

চোখে মুখে তৃপ্তি বর্ষণ করিয়া তাঁতিরাম আহায়ে বসিয়াছে। অন্নপূর্ণারই মত দু'শো বার “এটা দেই! ওটা দেই!” করিয়া নিকু ভাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। কথা প্রসঙ্গে নিকু কহিল, “আচ্ছা দাদা, তোমার ত আপনার জন কেউ নেই। পরের জন্য এত মাথাব্যথা কেন আমায় বলে ত দেখি। লোকে কতবার বে'থা কোরো সংসারী হয়। আর তোমার যত সব অনাহুটি।”

“ই্যা বোন, আমার আপনার জন নেই একথা তুই কোথায় শিখলি? তোদের মধ্যেই যে আমি আমার সব হারানো জিনিষ ফিরে পেয়েছি দিদি! নৈলে কি আর বাচতুম্বে এতদিন? তোদের দশ্টাকে চিন্বে বলেই ত গোবিন্দ আমায় পথের মানুষ কোরে ছাড়লেন। বড় হ' গিন্নী হ', ছেলের মা হ', তখন বুঝি। পেয়ে হারিয়েছি বলেই ত এত আপনার কোরে তোদের পেয়েছি দিদি!” বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়ে ছেথিয়া নিকু তাড়াতাড়ি বৃদ্ধের পাতে আর এক হাতা আগের ঝোল ঢালিল। বৃদ্ধ ইঁ ইঁ



করিয়া উঠিল বটে, কিন্তু তেমন অকুচিও দেখা গেল না। কান্না উঠিল। গলায় বস্ত্র দিয়া সে তাঁতিরামের উদ্দেশে  
 “যা রেঁধেছিঁসু দিদি, এ যেন দেবতাদের অমৃত। এখন বার বার মাথা নোয়াইল। আর একজনকে লক্ষ্য  
 অম্বরটাকে এনে বাঁধতে পারি তবে না হয়।” করিয়া মনে মনে বলি “ওগো, একবারটি এসো, মা’র মুখে  
 তাঁতিরাম আহারান্তে বিদায় লইল। ভাই দুটিকে খাওয়াইয়া একটু হাসি ফুটুক। দুটো দিন তাঁকে সুখী কোরে যাও।  
 রুগ্নাকে ঔষধ পথ্য দিয়া নিরু নাম মাত্র চারিটা ভাত তারপর সব শেষ হ’লে না হয় চলে যেয়ো আবার!”  
 লইয়া বসিল। সে স্নাত্তিতে নিরুর চোখে কি ঘুম আসিতে কাদিতে কাদিতে ভাই দুটিকে বুকে লইয়া রজনী শেষে শ্রান্ত  
 চায়? শয্যায় অসিয়া আবার তাহার বুক ফাটিয়া বালি।। ঘুমাইল।

ক্রমশঃ

## গান

শ্রীমতী আরতি দেবী।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে আষাঢ়

যেই হোল আজ সুর ;

সকাল থেকেই নাম্নো বাদল

সুর, সুর, সুর ;

নব-নীপের গন্ধ সহ

বইলো ভিজা গন্ধ-বহ,

ডাকলো আকাশ অহরহ

গুরু, গুরু, গুরু ;

পুচ্ছ তুলি ময়ূর গুলি

সেই মাদলের তালে,

উঠলো নাচি মউয়া, পিয়াল,

তমাল তরুর ডালে ;

কেয়া কাঁটায় দেখি যত

মৌমাছদের হৃদয়-ক্ষত

আমার হিয়াও অবিরত

কাঁপলো হুরু, হুরু !!

# বর্তমান বাঙ্গালা গান ও তাহার প্রগতি

( শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ )

সম্প্রতি পাশ্চাত্য কৃতবিদ্য বঙ্গ-যুবক-যুবতী মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা গান সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন, সেগুলি পাঠ করিয়া মনে কতকগুলি সংশয়ের উদয় হওয়ায় তাহা পাঠক-বর্গের নিকট নিবেদন করিতেছি। আশা করি বিষয়টির সম্যক আলোচনা হইলে বাঙ্গালা গানের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথা পরিষ্কার হইতে পারে।

প্রথমেই ভাষা ও রচনাভঙ্গী সম্বন্ধে আমার অনুযোগ আছে। তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় জটিল ও সূক্ষ্মানুভূতি সাপেক্ষ। পুরাকালে যখন বিদ্বজ্জনের ভাষাসংস্কৃত ছিল, তখনও সাধারণ কথোপকথনের ভাষা অল্প প্রকার ছিল—তাহাকে প্রাকৃত ভাষা বলিত। মধ্যে প্রবন্ধাদি লিখিবার ভাষা এবং সাধারণ ভাষায় প্রভেদ ছিল; যথা, ভারতচন্দ্রের, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের, বঙ্কিম চন্দ্রের, নবীন চন্দ্রের, হেমচন্দ্রাদির ভাষা; উপরন্তু মেয়েলি ভাষাও ছিল। ইহাদের ভাব গভীর হইলেও ভাষার সরলতা ও ভাব্যবগ্নকতা থাকায় ভাব গ্রহণ করিতে শিরঃ পীড়া হইত না।

সঙ্গীত বিষয়ের প্রবন্ধাদি জটিল ও সূক্ষ্মানুভূতি-সাপেক্ষ। অতএব সরল ও নিরলঙ্কার ভাষাই তাহা ব্যক্ত করিবার উপযোগী; অথচ কোন কোন নবীন লেখক সঙ্গীত সম্বন্ধে এমন শ্লেষ বক্রোক্তি পূর্ণ চটকদার ও রংদার ভাষা ব্যবহার করেন যে অনেক স্থলেই তাঁহাদের প্রকৃত বক্তব্য যে কি তাহা ধরা কঠিন হয়। “চিন্তার ছন্দ” “সঙ্গীত সাগরের চলোঙ্গির নাদ ত্রস্তের ভেলায়” “সংস্কৃত গ্রন্থাদি থেকে শ্লোকের পর শ্লোক উদ্ধৃত করে সঙ্গীত শিক্ষার্থীর হৃৎস্পন্দন রুদ্ধ করে দেওয়া” “শ্রুতির বিভীষিকায় স্তম্ভিত করা” প্রভৃতি শ্লেষোক্তির দ্বারা একশ্রেণীর প্রবন্ধকার আমাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকেন। আবার একশ্রেণীর লেখক-লেখিকা আছেন, তাঁহারা পাশ্চাত্য দেশীয় বড় বা হারমনি আমাদের সঙ্গীতে প্রবেশ চেষ্টায় যত্নপরিকর। এবিষয়ে প্রতিবাদ করিলে প্রত্যুত্তর দিতে অপারগ হইলেও পুনরুক্তি করিতে লজ্জা বোধ করেন না।

প্রথম সংস্কৃত শ্লোকের কথা ধরুন। আর্ঘ্য সঙ্গীত প্রাচীন ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। যাহারা এ সঙ্গীতের আবিষ্কারকর্তা, তাঁহারা এসম্বন্ধে যে চিন্তা বা আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সংস্কৃত শ্লোকেই নিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান কালের সঙ্গীতরসিকের পক্ষে সেই প্রাচীন চিন্তা-ধারার সহিত পরিচয় রক্ষা করাও কি অপরাধ? তারপর শ্রুতির কথা অনেকেই জানেন, আর্ঘ্য সঙ্গীতের স্বর-পদ্ধতির মূল ভিত্তিই হইল স্বরের শ্রুতি-বিভাগ। আজকাল হারমোনি-য়মের যুগে অনেকে তাহা স্বীকার করেন না। স্বরের সূক্ষ্ম শ্রুতিবিভাগ এখন ক্রমশঃ কল্পনার বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমাদের সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর গঠন ও অঙ্গবিজ্ঞাস, বাদী সঙ্গাদীর সম্বন্ধ বিচার—সমস্তই এই শ্রুতিতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে সঙ্গীতে শ্রুতির খেলা নাই সে সঙ্গীত এদেশের সঙ্গীতবিদের নিকট প্রাণহীন ও মাধুর্যহীন বলিয়া বোধ হয়। অবশ্য যে কোন কলাবিজ্ঞার রসবস্তু বিশ্লেষণ করিয়া মূল উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলেই নীরস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। নীরস তত্ত্বাংশ একবার আয়ত্ত হইয়া গেলে তাহা রসবোধের বিষ স্বরূপ না হইয়া সহায়তাই করিয়া থাকে, শিল্পরসিক যাত্রাই তাহা স্বীকার করিবেন। ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও ছন্দ শাস্ত্র কাব্যসৌন্দর্যের সম্যক উপলব্ধি পক্ষে সহায়তাই করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নয়, শিল্পীর পক্ষে, শিল্প সমালোচকের পক্ষে এই তত্ত্বাংশের সম্যক জ্ঞান অপরিহার্য। নব-শিল্প সমালোচক সম্প্রদায় কি সত্যই মনে করেন যে ভারতীয় সঙ্গীতের এই অক্ষর জ্ঞান না হইলেও সঙ্গীত সমালোচক বা সঙ্গীত সংস্কারক হওয়া চলে?

অধুনা নব্যদলের এই ধারণা যে ওস্তাদগণের অধিকাংশই আজকের দিনে সঙ্গীতের দুরবস্থার জন্ত কম বেশী দায়ী একথা আংশিক ভাবে সত্য হইতেও পারে। কিন্তু ইহাও কি সত্য নহে যে এই সঙ্গীত যে এতদিন টিকিয়া আছে তাহাও এই ওস্তাদগণের একনিষ্ঠ সাধনার গুণে? যতই

দুরবস্থা হউক এখনও প্রাচীন ভারত সঙ্গীত ভারতবসীকে যে অপূর্ণ মাধুর্যস উপভোগ করাইতেছে তাহার তুলনা অধুনা সৃষ্ট অন্ত কোন শিল্পের মধ্যে নাই। এ সঙ্গীতের ভিত্তি জাতীয় আত্মার গভীরতম স্তরে নিহিতখান্ প্রভৃতি সিনেমা থিয়েটার-রসিক তরুণ বন্ধ তাহা অস্বীকার করিতে পারে, কারণ তাহার অন্তরাঙ্গার দ্বার আজ সকল প্রকার গভীর রস বোধের পক্ষে নিরুদ্ধ। কিন্তু দ্বার একদিন খুলিবেই এবং তখন ঐ ওস্তাদদিগের নিকটে তাহাকে অঞ্জলি পাতিয়া দাঁড়াইতে হইবে। তরুণ সঙ্গীত সংস্কারকগণ যে তরুণ সমাজকে লক্ষ্য করিয়া প্রবন্ধ লিখেন সেই তরুণদের ধারণা ওস্তাদি সঙ্গীত একটি কিছুত কিমাকার হাস্যাম্পদ পদার্থ। এই ভ্রম ধারণা অবস্থা বিশেষের। সাধক-প্রবর রাম প্রসাদ গান করিয়াছেন :—

মন, গরীবের কি দোষ আছে ?

বাজীকরের মেয়ে শ্যামা যেমন নাচায় তেমনি নাচে।

আর একটি কথা' প্রায় শুনিতে পাই যে ঋপদেব যুগ গত হইয়াছে। ভারতীয় সঙ্গীতের গজল, ঠুংরী, টপ্পাই নাকি বর্তমান যুগধর্মের উপযোগী। তবে নিরবচ্ছিন্ন গজল, টপ্পা, ঠুংরী এত বেয়ে হইতে পারে, তাই ঋপদ ও খেয়াল অন্ততঃ মিউজিয়মে তুলিয়া রাখিবার মত বজায় রাখার চেষ্টা করিতে হইবে। এ কথার উত্তর রাম প্রসাদের গানে পাইয়াছেন। ঋপদ, খেয়াল গভীর ও স্থায়ী রসের সৃষ্টি করে; গজল, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতি অপেক্ষা ঋপদ খেয়ালের স্থান যে বহু উর্ধ্বে তাহা কৃষ্ণের জীব বুঝিতে পারেন না, কিন্তু জীবতত্ত্বদর্শী রসিক গাত্রেই তাহা অনুভব করেন। আজিকার চঞ্চল জীবন যাত্রায় সেই গভীর রসের অনুভূতির অবকাশ স্বল্প, অধিকাংশ লোকই এখন চঞ্চলচিত্ত। কিন্তু রসতত্ত্ব চিরন্তন। যুগভেদে সমাজে রসবোধের প্রসার বা সঙ্কোচ হইতে পারে, কিন্তু এই আবর্তনের মধ্যে যে স্বল্প সংখ্যক গুণী ও রসজ্ঞ ব্যক্তি উচ্চতম শিল্পের চিরন্তন রসভাণ্ডার রক্ষা করিয়া যান তাঁহারাই জাতীয় সভ্যতার ও মানব সভ্যতার প্রকৃত ভাণ্ডারী। যাহা নিত্য কালের সম্পত্তি তাহার উপর কনিক যুগধর্মের দাবী খাটে না। এই স্থানে বলিয়া রাখি, যুগধর্ম বা কালধর্ম বলিয়া যে কিছু আছে তাহা আমার মনে হয় না। প্রচলিত ধর্মহীন,

কর্মহীন; অর্থকরী শিল্পার কলস্বরূপ এই বর্তমান যুগধর্ম।

অনেকের ধারণা "বাঙ্গলা গানে হবহ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ঢং আমদানী করিতে গেলে সে চেষ্টা সার্থক হইবে না। বাঙ্গলা গানের মধ্যে একটু বাঙ্গালীত্ব থাকা চাই। প্রধানতঃ এই মতের প্রচারক শ্রীমান দিলীপ কুমার। তিনি বলিতে চান যে তাঁহার পিতা স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্র লালে গানে হিন্দুস্থানী স্বরবৈচিত্র্যের সহিত বাঙ্গলা কাব্যের দরদের অনেক সমন্বয় ও সামঞ্জস্য হইয়াছে। অতুল প্রসাদের ঠুংরী অঙ্গগান ও কাজী নজরুলের গজল অঙ্গের গান সম্বন্ধেও তিনি ঐ কথাই বলিতে চান। বোধহয় তাঁহার বক্তব্য এই যে বাঙ্গলা গানে এই সকল আদর্শ অনুসরণ করা উচিত। কিন্তু উল্লিখিত গান-সমূহে কি ভাবে এই সমন্বয় সাধিত হইয়াছে, তাহা তিনি বুঝাইয়া বলেন নাই। বুঝাইবার কিছু থাকিলে বুঝাইয়া বলিতেন।

বাঙ্গলা গানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগ-রাগিনীর গুহ স্বর প্রয়োগ চেষ্টা বহুকাল পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছে! জয়দেব মহাপ্রভুর গানে রাগ ও তালের উল্লেখ আছে। তাঁহার কাব্য জগতে অদ্বিতীয়। গৌরানন্দদেবের সময়ে যখন ধর্মভাবের রোল ছুটিয়াছিল, তখন প্রচার কার্যের জন্ত কীর্তনাদি গান পুনরায় প্রচলিত হইল। ইহাতে বাঙ্গলা কাব্যের দরদ রক্ষা করিয়া রাগ-রাগিনীর দিকে বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া পুবাদমে বাঙ্গালীত্ব রক্ষা হইয়াছে।

সমসাময়িক বাবা হরিদাস শ্যামা নিজ শিষ্যদের দ্বারা রাগ-রাগিনীর বিগুহতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ইহার ফলে কীর্তন গানের কিছু পরিবর্তন হইয়া রাগ-রাগিনীর সম্পূর্ণ সম্পর্ক না রাখিয়া কয়েক প্রকার গানের উদ্ভব হইয়াছে। যথা, ঢপ্, বাউল, রামপ্রসাদী গান। এই সকল গানের মধ্যে এক এক প্রকার বিশেষ রসের উদ্বোধন হইয়াছে। বাঙ্গালী হৃদয়ের অন্তঃস্তর হইতেই উহাদের উদ্ভব। কিন্তু ইহাদের মধ্যে স্বর মুখ্যতঃ কাব্য রসের বাহন হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সঙ্গীত কলা তাহার নানা বিচিত্র উপাদান ও অলঙ্কার লইয়া স্বকীয় পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যে অধিষ্ঠান লাভ করে নাই, করিল স্বর্গীয় দেওয়ান মহাশয়ের গানে, আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রথমাবস্থার বহু ধর্ম সঙ্গীতে,

নিধুবাবুর টপ্পায়, গোপাল উড়ের যাত্রায়, দাশরথি রায়ের পাঁচালিতে, গোবিন্দ অধিকারীর প্রেমময় আত্ম-নিবেদনে।

ইতি পূর্বে আদর্শ স্বরূপ যে তিনটি সঙ্গীত রচয়িতার মায় উল্লেখ হইয়াছে, তাহাদের গায় নব্য বঙ্গের অধিকাংশ সঙ্গীত রচয়িতাদের গানে একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যায়— তাহাদের গানে কথার এত অধিক্য যে তাহার মধ্যে স্বরের স্বচ্ছন্দ লীলা পদে পদে ব্যাহত হয়। সঙ্গীতের যে বিশিষ্ট সৌন্দর্য তাহা স্বর বিজ্ঞাসের দ্বারাই ফুটিয়া উঠে। “বাগর্থ” বিজ্ঞাসের দ্বারা নহে। গান যদি রাগ—পদবাচ্য হয়, তাহা হইলে তাহাকে সৃষ্টির জন্ত মুখ্যতঃ মীড়গমক-মূর্ছনাঙ্গী স্বরের কারুকাণ্ডের উপর নির্ভর করিতে হইবে। স্বরের সৌন্দর্য প্রকাশের পক্ষে গানের বাক্যাংশের উপাদান স্বর-ব্যাঞ্জনাদি বর্ণের প্রত্যেকের এক একটা বিশেষ উপযোগিতা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বরবর্ণের মধ্যে আ এ এবং ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ধ, ল, হ প্রভৃতি বর্ণ গমক প্রকাশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। হিন্দুস্থানী গান প্রায়ই সঙ্গীত কলাবিদের রচিত, সেইজন্য তাহাদের গানে স্বরের স্বচ্ছন্দ বিকাশের অবকাশ দিয়া বাক্যাংশকে যোজনা করা হয় এবং যে স্থানে যে অলঙ্কার প্রয়োগ করিতে হইবে সে স্থানে তদুপযোগী বর্ণ ব্যবহার করা হয়। সে গানে বাক্যাংশ এলোমেলো ভিড় করিয়া স্বরকে চাপিয়া মারে না এবং প্রচুর অবকাশ দিয়া স্বরকে স্বচ্ছন্দে খেলিতে দেয়, আবশ্যক মত স্বরের সহকারী হইয়া রাগের বিশিষ্ট সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিবার সহায়তা করে। উপরন্তু প্রকৃত রাগ-রচয়িতাকে রাগ, তাল, লয়, ছন্দ, রূপ, রসের বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

এই সকলের বিশেষ বিবৃতি লিখিতে হইলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যায় এবং পাঠকেরও বিরক্তির সম্ভাবনা, সেই কারণে সংক্ষেপে বলি। ঋগ্বেদ অঙ্গের তালের মধ্যে সাধারণতঃ আট দশটি তালের ব্যবহার দেখা যায়।—চৌতাল, ধামার, সুর ফাঁক-জাল, বাঁপতাল ইত্যাদি। ইহাদের প্রত্যেকের ছন্দ ও গতি-প্রবণতা পৃথক। চৌতালের জন্ত যে গান রচিত তাহা অন্য কেনি তালে গীত হওয়া অসম্ভব। সেইরূপ ধামার বা অন্য তালের গান ঋগ্বেদ অঙ্গের তালে, কিম্বা ঋগ্বেদ অঙ্গের গান, টপ্পা, ঠুংরী ধরণের তালে গীত হইতে পারে না। এই হইল

তাল, লয়, ছন্দ বিষয়ের কথা। রাগ, রূপ ও রসের বহু ব্যাপার! রাগ বিশেষের রস ও ভাব বিশেষের কথা শাস্ত্রে আছে। আমি এক্ষণে তরুণদের রুচির বশবর্তী হইয়া আদিরসের (অমুরাগ) ব্যাপার লইয়া রাগ, রূপ ও রসের ব্যাপার একটু “তা না না না” করিয়া সঙ্গীতচর্চাগণের গান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। উপনিষৎ বলিলেন ব্রহ্ম ও তাহার শক্তি অভেদ; যেমন সূর্য ও তাহার জ্যোতিঃ বা হীরক আর তাহার দীপ্তি। গুণঃ কোভ হইলে বিকাশ বা সৃষ্টি হয়। পুনরায় গুণত্রয় (সত্য, রজঃ, তম) কে সংযত করিয়া শক্তির বিকাশ রহিত করাই অদ্বৈতবাদ। বেদান্ত এই সিদ্ধান্তকে ব্রহ্মই একমাত্র সৎ আর সব অসৎ, মায়া বা অজ্ঞান বলিয়াছেন। এই মায়া অর্থাৎ ভ্রম ত্যাগ করিয়া অদ্বৈতে উপনীত হইতে হইবে। এই মূল ধরিয়া সাংখ্যকার তাহাকেই পুরুষ প্রকৃতি সংজ্ঞা দিয়া সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইলেন। এই পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বে আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহার ফলে বৈষ্ণবেরা নেড়ানেড়ী আর আমরা সাহেব মেমের পরিণত হইয়াছি। এখন ডাইভোস ব্রতাবলম্বন করিলেই আমরা সহজে অদ্বৈত হইয়া সর্বত্যাগী হইতে পারিব। বেদান্ত আমলের গান, যথা :—

রাগ—ভৈরব, তাল—চৌতাল।

আদি রমা জ্যোতিকে। যো জানে জানে অন্তর্যামী।  
পাবে ঘৈ সে যোগীধ্যায়ে তাহে দেত অচল স্মরণ ॥”

সাংখ্যযোগ কারিকা ভাবের গান যথা :—

রাগ—পুরীন্দ্রা, তাল—চৌতাল।

আজু কেতকী মে কেশোরায় গুলাব মে গোপাল লাল,  
যোগরে মে মদন মোহন, পিয়ারি ছব দেত।

দাওদী মে দামোদর, শীলা মে শ্রীজগদনাথ

পারলে মে অপার ব্রহ্ম, সেউতী মে সীতারাম সবরস—পিয়ে ॥

শ্রীকৃষ্ণ লীলার গান বিষয়ে বলিবার পূর্বে আমার কিছু বলিবার আছে। সাহিত্য সম্রাট অমর বক্শিমচন্দ্র তাহার “কৃষ্ণচরিত” গ্রন্থে বলিয়াছেন,—বাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পূর্বব্রহ্ম সনাতন ~~স্বাক্ষর~~ তাহাদের জন্ত তিনি ‘কৃষ্ণচরিত’ লিখেন নাই। আমাদের মত ভাবাপন্ন লোকের জন্তই লিখিয়াছেন।



দেওতা তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ মানব ধরিয়াছেন। আমিও এখানে তাঁহারই পদ স্মরণ করিলাম। বাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পূজিত ভাবে তাঁহাদের গান :—

রাগ—ইমনকল্যাণ, তাল—চৌতাল।

১। “পরব্রহ্ম পরমেশ্বর অলুপ্ত নিরঞ্জন অব্যক্ত অবিনাশী  
নরকর নরায়ণ নরোত্তম।” ইত্যাদি

এবং বাঁহারা তাঁহাকে আদর্শমানব ভাবে তাঁহাদের গান :—

রাগ—মুলতান, তাল—ধামার।

২। “মৈনে দেখি আলোখি হোরিরে

মনমোহন কি কুঞ্জগলিন মে অতুপম সোর মচোরি।  
মমতা কেশর ভর পিচকারী মারতুই বরজোরী ;  
জ্ঞান গুলাল উড়ে অতি ভারী, উড়ে ভব বোরী।”

প্রেমভাবের গান যথা—

রাগ—খাযাজ, তাল—ঝাঁপতাল।

৩। “এ সখি শ্যামরো রূপ ঘোবন মন ললচায়ে,  
অধর ধর মধুরী মধুরী মুরলী বজায়ে।  
সপ্ত সুর তিন গ্রাম গায়ে শুনায়ে, মনমে মনমে নিরত  
কর ভাব বতায়ে।”

প্রতীকা ভাবের গান যথা—

রাগ—আশাবরী, তাল—চৌতাল।

৪। “সোগনহো আজুতোর আলী, ভূজফরকত  
মোরি পিয়া মিলনকো। মনমে উমগ ভই,  
পিয়াকে আবন লাগী ঘরি পলন গিলন কো।”

বিবাহভাবের গান যথা,—

রাগ—মার্ককোষ ; তাল—সুরফাক তাল।

আওন কহগয়ে অজহন আয়ে, সবনিশ বীতি,  
মোহে গিনবত তারা। দীপ জ্যোতি মলিন হোত  
চলি আয়ে, কেহা করি এ সখী নিত ভর মায়ে।”

অভিমান ভাবের গান যথা :—

রাগ—কামোদ, তাল—ধামার।

৫। “মতবারো ঠাটো বাট মাঝ, মতবারো কঠিন  
ভয়োধর ধায়েরী,  
সজনী জিয়া কাঁপত, জহ জহ পড়ত সাঁঝ।” ইত্যাদি

বিবাদভাবের গান যথা,—

রাগ—শরুরা বেহাগ, তাল—ধামার।

৬। “হারে নিরদয়ীরে লুংগর মোহন মোহলই।  
জবসে প্রবন শান বাঁশরী, অধ বৃধবিসর গই। ইত্যাদি

গোপবালকদের বিরক্তির গান যথা,—

রাগ—আলোয়া, তাল—ঝাঁপতাসা।

৭। “ইয়ালে তোরি লাকরি কামরিলে,  
গোয়ে চরাওন নজাউরী মায়ী।  
সজকে গোয়াল বলভদ্র কিউনি মোকলো  
বনমে অকলো ন জাউরী মায়ী।”

সখা ভাবের গান যথা, ( গোপিনীর )—

রাগ—মুদ্রাকি কানাড়া, তাল রূপক।

৮। “কনৈহা যানে দেহো বমনা জল ভরন,  
আপন দান লে কানাছি।  
হমারে সজ কি ছুর নিকস গয়ী  
পরিহো তোরি পইখা।”

ভাবের লঘু গুরু ও ঘে সময়ে গীত হইবে সেই সেই  
অনুযায়ী রাগ গ্রহণ করিতে হইবে। এবং তাল নির্বাচনও  
সেই অনুসারে করিলে রাগ ও ভাব স্বন্দররূপে স্ফুটিয়া  
উঠিবে; এতদ্বির অল্প পক্ষ গ্রহণে রসের কিছু অভাবই  
পরিলক্ষিত হইবে। উক্ত গান কয়টির কেবল স্বাদী এবং  
অন্তর্যামাত্র দেওয়া হইরাছে। সকারী এবং আভোগাংশ  
বাহ্য্য ভয়ে দিই নাই। এত অল্প কথায় উক্ত হইতে উচ্চতম  
ভাব বাঙ্গলাগানে সম্ভব হইলেও সচরাচর দেখিতে পাই না।  
কথার বাহ্য্য থাকায় বাঙ্গলাগানে রাগের বিকাশ পূর্ণমাত্রায়  
হয় না। বাঙ্গলাগান বাঁহারা রচনা করেন, তাঁহারা অনেক

স্থানে সঙ্গীত শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ঔপপত্তিকও নন, ক্রিয়াসিদ্ধও নন। গানের স্বর ও তাল বিভিন্ন লোকের দ্বারা বসাইয়া লন। সে স্থলেও অসঙ্গতি অনিবার্য। সে গানের মধ্যে সঙ্গীত রসিক কোন রস পান না। ষাঁহারা পান তাঁহারা কাব্য রস মাত্র উপভোগ করেন। স্বর সেখানে কথার বাহন মাত্র। তাহা সঙ্গীত নহে, স্বর সহযোগে কথার আবৃত্তি মাত্র। তাঁহারা ভারতীয় সঙ্গীতের ষথার্থ মাধুর্য রস উপভোগ করিতে একেবারে অসমর্থ। সেই মাধুর্যরসের সহিত পরিচয় সাধন করানই এখন সংস্কারকের প্রধান কর্তব্য, প্রাচীন গুণীগণের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন করা নহে। যতদিন এই প্রকৃত রসবোধ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে জাগ্রত না হইবে, ততদিন তাঁহাদের প্রেরণায় কোন সংস্কারের প্রত্যাশা

বাতুলতা মাত্র। ভারতীয় সঙ্গীতের মূলধারা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেই বৈচিত্র্য ও গুণিগাত করিয়াছিল, এখন কিছু আছে। বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্থান পায় নাই তাহা কেবল গানের জোরেই বলা চলে। নূতন চেষ্টার কথা শুনিলেই ভয় হয়—পাছে ভারতীয় সঙ্গীতের মূলধারার সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া বাঙ্গলা সঙ্গীতকে এমন একটা পারম্পর্যহীন স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত করা হয়, যে প্রবাহ নূতন নূতন যথেষ্টাচারে আবর্তিত হইতে থাকিবে। এ আশঙ্কা যে আমার একবারে অমূলক তাহা নহে; বর্তমান তরুণ বাঙ্গলার বৈঠকে ও রঙ্গমঞ্চে এই উন্নয়ন সঙ্গীতের আত্ম ঘোষণা প্রকট হইয়া উঠিতেছে। আমরা যদি বাঙ্গলাগানের মধ্যে সঙ্গীতকলার বিকাশ দেখিতে চাই তাহা হইলে এই পন্থা পরিহার করিতে হইবে। \*

## চৈল পাহাড়ে দু'রাত্রি

শ্রীমুখীন্দ্র কৃষ্ণ বসু

কালকা থেকে সিম্ভার মধ্যপথে কাণ্ডাঘাট রেলস্টেশন। চৈল পাহাড়ে পৌছিতে হ'লে এখান থেকে ১৮ মাইল পথ মোটার রোডে বা পাকদণ্ডের রাস্তায় যেতে হয়। চৈল সহর মহারাজা পাতিয়ালায় গ্রীষ্মাবাস। মহারাজা যখন এখানে থাকেন তখন তাঁর অহুমতি ভিন্ন বা তাঁর অতিথি ছাড়া সাধারণের এখানে প্রবেশ নিষেধ। চৈলের উচ্চতা সিম্ভার চেয়ে বেশি। এই পাহাড়ের সর্বোচ্চ স্থান হইতে পারিপার্শ্বিক হিমালয় পর্বতমালার দৃশ্য অপূর্ণ। একদিকে চিরতুষারাবৃত হিমালয় পর্বতশ্রেণী ক্রোড়স্থ নাতি-উচ্চ পর্বতবৃন্দের সহিত মিলিত হ'য়ে, এক মহান ভাবের বিকাশ করেছে। অপর দিকে সমতলভূমি তাহার বৃক্ষ, নদী, বনানী ইত্যাদির শোভা বিতরণ ক'রে নিজের বিরীচকের মহিমা প্রকাশ করেছে।

চৈল পাহাড় দেখবার আমার ও কয়েকজন বন্ধুর বহুদিন

স্বাবসাস ছিল। কিন্তু সাধারণের ভ্রমণের উপযোগী নদী বলে, যোগাযোগ হওয়া সম্ভব হ'চ্ছিল না।

অবশেষে আমরা কয়েক বন্ধু মিলে, মহারাজার মিলিটারি সেক্রেটারির কাছে দেশভ্রমণের সংকল্পে কয়েকদিনের জন্ত ছাড়পত্র চেয়ে আবেদন করলাম। উত্তর পাওয়া গেল যে চৈল পাহাড়ে সাধারণের বাসোপযোগী ডাকবাংলা বা হোটেল নেই। ইহা মহারাজার গ্রীষ্মাবাস এবং সাধারণের ভ্রমণের জন্য নয়। সুতরাং নিরাশ হ'য়ে তখনকার মত আমাদের নিরস্ত হ'তে হ'ল। তারপর শীতকালে একবন্ধু খবর দিলেন যে যখন মহারাজা থাকেন না, তখন বিনা ছাড়পত্রে চৈলে গেলে কোন আপত্তির কারণ হয় না। তখন বন্ধুর চেষ্টায় আমরা সেখানকার এক মহাজনের নামে চিঠি নিয়ে বাজার উদ্যোগ করলাম। আমাদের দলে তিন

বন্ধু ছিলেন। তখন ডিসেম্বর মাসের শেষ। সিমলাতেই বরফ পড়বার উত্তোপ হচ্ছিল, স্ততরাং শীত প্রচণ্ড। সেখানে সিমলার চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা হবে এবং এই দুঃসাহসিক অহুষ্ঠানে কষ্টের শেষ থাকবে না—এসব যুক্তি দিয়ে বন্ধুরা আমাদের নিরস্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আমরা কিন্তু মনস্থির করেছিলাম, এবং যাত্রারস্তের স্বযোগের অপেক্ষায় রইলাম। বড়দিনের ছুটি আরম্ভ হওয়ায় আমরা বাসকা মেলে সিমলা থেকে রওনা হলাম। সঙ্গে একজন চাকর, বিছানায় বড় বড় দুটি মোট, চার দিনের উপযুক্ত চাল, ডাল, ঘি, মসুরা, নুন, আলু, ডিম ও তার ওপর কাঁচা রসুন, চায়ের সরঞ্জাম, বাসন, ষ্টোভ ইত্যাদি পূর্ণ টিফিন বাক্স ও প্রয়োজনীয় জামাকাপড়ের স্টকেস। বেলা ২০টা আন্দাজ কাণ্ডাঘাটে নামলাম। প্রথমে ষ্টেশনের টি রুমে, চা টোষ্ট ইত্যাদি খেয়ে, সেখান থেকে আবার যাত্রা-পার্কের উত্তোপ করা গেল। এ সময় লোকজন না থাকায় মটর (ট্যাক্সি) চলাচল করে না, স্ততরাং পাওয়া গেল না। তখন আমরা পায়ে হেঁটে এবং খচ্চরে (mule) চড়ে মালপত্র নিয়ে যাবার জন্ত খচ্চরের চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু কেউ যেতে রাজি হ'ল না, ফেরত পথে তাদের ত আর ভাড়া জুটবে না।

আমাদের চাকরটা পাহাড়ী ছিল। তারই চেষ্টায় ও বিশৃণ পারিশ্রমিক দিতে রাজি হওয়ার ফলে অতিকষ্টে তিন জন কুলি পাওয়া গেল। এসব বন্দোবস্ত করতে বিফল হ'য়ে গেছলো। কুলিরা তখন রওনা হ'তে নিষেধ করে, পরদিন প্রাতে যাবার জন্ত অহুরোধ করল। আমরা তাদের কথায় কাণ না দিয়ে তখনই রওনা হলাম।

প্রথমে মোটার রোড ধরে পাহাড়ের উৎরাই দিয়ে যেতে লাগলাম। প্রায় তিন মাইল থেকে চার মাইল যাবার পর আঙ্গি নদীর তীরে পৌঁছলাম। আঙ্গি নামে নদী হ'লেও কয়েকটি বড় বরফার সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। এ সময় সন্ধ্যার একটু গরম বোধ হ'তে লাগলো, তখন কোট খুলে শুষ্ক মোটরটায় কোট পরে চলতে লাগলাম। তখন শীতকাল হ'লে রাস্তায় ছপাশের গাছ সব পাতাহীন। ঘাস ও অপর ছোট ছোট গাছ সব শুকিয়ে গেছে। অপর পাহাড়ে বরফ পড়ার ও শীতের আধিক্য সে বরফ গলতে না পারায় নদীর

জল ধারা ক্রীণতর হয়েছে। আঙ্গিতে এসে যখন আমরা ছা ক'রে থেলাম, তখন প্রায় সূর্যাস্তের সময়। ক্রীণ সূর্য রশ্মি পার্কত্যা নদীর ক্রীণ জল রেখার উপর প'ড়ে দিনান্তের শেষ বিদায়ের বাণী শুকনো গাছপালা ও নদীর বরফের কল্লোলের মধ্যে দিয়ে ধ্বনিত হচ্ছিল। নির্জনতার অন্তরে এই ধ্বনি স্বভাবের সামঞ্জস্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণে এক নব শিহরণ এনে দিলে। বেশীক্ষণ এ অহুভূতি স্থায়ী হ'ল না। কুলিদের তাড়নায় আবার যাত্রার উত্তোপ করতে হ'ল। তাদের পরামর্শে, আমাদের ওভারকোট বিছানার মোট থেকে বার করলাম। পূর্বেই কোট গায়ে দিতে হ'য়েছিল। তবু একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বোধ হ'চ্ছিল।

এইবার আমাদের উঠবার পালা, সব রাস্তাটাই চড়াই। কুলিরা বললে যদি মোটার রোডে যাই তো চড়াইয়ের রাস্তা কম হবে, আর যদি পাকদণ্ডির রাস্তা দিয়ে উঠি তো চড়াই বুকভোর হবে, কিন্তু দূরত্ব কম হবে। আমরা পাকদণ্ডির রাস্তাই ধরলাম। প্রায় হাজার ফুট উপরে উঠবার পর বেশ অন্ধকার হ'য়ে এল। শীতের প্রকোপও বেশ অনুভব করাতে ওভারকোট গায়ে দিয়ে চলতে আরম্ভ করলাম।

ক্রমাগত চড়াই ওঠার দরুণ হাঁফ লাগছিল। খানিকটা করে চলে একটু করে দাঁড়াতে হচ্ছিল, বিশ্রামের জন্ত কুলিরা এখন থেকে পেছিয়ে পড়তে লাগল। আমরা কেউ রাস্তা না জানাতে বেশি দূর অগ্রসর হ'তে পারছিলাম না। তাদের জন্ত অপেক্ষা করে চলে চলে যখন পাহাড়ের অহুমান প্রায় অন্ধেকটা উঠেছি, তখন প্রায় রাত্রি ৭টা বেজেছে। চারিদিকে কেবল চিড়, কেলু ও ওপর পার্কত্যা গাছের জঙ্গল। সন্ধ্যা সমীরণ চিড় ও কেলু গাছের মধ্যে প্রবাহিত হ'য়ে সমুদ্র কল্লোলের মত ধ্বনিত হচ্ছিল। 'বি' 'বি' পোকের কলরব তার সঙ্গে মিলিত হ'য়ে সন্ধ্যার নিস্তরতা ভঙ্গ করবার চেষ্টা করছিল। পাকদণ্ডির পথ অতি অগ্রশস্ত। পথ চ'লে রাস্তা হয়েছে, কেউ কখনও রাস্তা তৈরী করে নি বা ঠিক রাখবার জন্ত যত্ন করে না। একজন লোক মাত্র সে পথে যেতে পারে চিড় ও কেলুগাছের মন্থণ শুকনো পাতা, সেই পত্রের সবটাই অধিকার করে আছে। রাস্তার অন্ধকার, মাঝে মাঝে জোনাফির আলোতে তা' আরও গাঢ় হচ্ছিল। পথ

চলতে চলতে প্রায়ই পদাঙ্কন হ'চ্ছিল। আমাদের কেউ কেউ বার কয়েক পড়েও গেল।

লাঠিতে ভর দিয়ে কখনও কখনও গাছের ডাল ধ'রে, সেই অঙ্ককার পথে চড়াই উঠতে লাগলাম। নিজেদের মনে তখন কুলিদের কথা না শুনে রওনা হবার জ্ঞান অল্পশোচনা আসছিল। একে রাত্রির অঙ্ককার, অজানা অপ্রশস্ত পথ, তার উপর এইবার বৃষ্টি নামলো।

আমরা যখন উপরে উঠতে আরম্ভ করি, তখনই মেঘ জমতে শুরু হয়েছিল। গাছতলায় আশ্রয় নেওয়া গেল। ছাতি সঙ্গে নেওয়া হয়নি, সেজন্ত টুপি ও ওভারকোট সব ভিজে গেল। পথে জনমানব নেই, কাছাকাছি কোন গ্রাম বা মন্দিরের বাস আছে ব'লে অনুমান হ'ল না। আমাদের মন তখন ক্লান্তি ও নিরাশায় ভরে গেছে, ভয়ও যে পাশ নি এমন নয়। জলে ভিজে পথ চলতে বিশেষ কষ্ট বোধ হতে লাগলো। নিজেদেরই দেহের ভার নইতে যখন আমাদের এই কষ্ট, তখন কুলিদের ভিজা মোট নিয়ে উঠার কষ্টের কথা বেশ অনুমান করতে পারলাম। বক্সিসের কথা ব'লে তাদের উৎসাহিত করা গেল। এ ভাবে অনেক পথ চলার পর আমরা দূর সিম্লা পাহাড়ের আলোর ঝিকিমিকি দেখতে পেলাম। তখন আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হ'য়ে এসেছে, সাদা পাতলা-মেঘ, মাঝে মাঝে পূর্বের অধিকার অন্ধুর রাখবার চেষ্টা করছিল। চৈল পাহাড় থেকে সিম্লা পাহাড়

এত দূর যে, সিম্লার বিজ্জি আলোর রশ্মির উজ্জলতার প্রখরতা কিছুই ছিল না। আকাশের তারা ও পাহাড়ের গায়ের তারার মত ঝিকিমিকি হয়ে গিলে এক অপূর্ণ রূপের সৃষ্টি করেছিল। সিম্লার আলোকমালার দৃষ্টে আমরা অনেকটা আশস্ত হ'লাম। চলার পতি সঙ্গে সঙ্গে বাড়লো, কারণ অনেকটা উপরে উঠেছি অনুমান করতে পারলাম। এইবারে রাস্তার পাশে এক চাবীর ক্ষেত ও কুটার দেখতে পেলাম, তখন রাত্রি ৯টা। এই দেখে আমাদের উৎসাহ ও আনন্দ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আমরা সেই কুটার-দ্বারে গিয়ে অনেক ডাকাডাকির পরে এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এল। তার কাছে অনুসন্ধান ক'রে জানতে পারলাম যে, আরও এক মাইল দেড় মাইল পথ আমাদের চলতে হবে। এইবার চড়াইয়ের উচ্চতা কমতে লাগলো। ক্রমে চৈলের ঘর বাড়ীর এলাকার মধ্যে এসেছি বুঝতে পারলাম শেয়ালের ডাক শুনা গেল ও পথের মাঝে গৃহত্যাগ আবর্জনার স্তুপের দৃশ্য চোখে পড়লো। আবার ধানিক পথ চলবার পর, আমরা চৈলের বাজারে পৌঁছলাম। তখন সব নিস্তব্ধ। অনেক খোঁজা খুঁজির পর আমরা যখন বে মহাজনের নামে চিঠি এনেছিলাম—তার দোকানও বাড়ীর কাছে পৌঁছলাম, তখন রাত দশটার কাছাকাছি হবে।

( ক্রমশঃ )

## দেশের কথা

### শ্রীসরোজরঞ্জন মিত্র

ইউনিয়ন বোর্ডের নাম আজ কাহারো অপরিচিত নাই। পল্লীর রাস্তাঘাট সংস্কার, পানীয় জলের অভাব দূরীকরণ, পল্লীবালাকদের প্রাথমিক শিক্ষার উপায় নির্ধারণ ও পল্লীবাসীদের ছোট খোট গৃহবিবাদের মীমাংসাদি এই বোর্ডের কাব্য। এক কথায় বলিতে গেলে পল্লীবাসীর মোটামুটি স্বথ স্ববিধা করিয়া দেওয়ার সকল ভারই এই বোর্ডের উপর; ইহা এক প্রকার গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন।

এই সকল কার্য ব্যয়-সাপেক্ষ; এই ব্যয় আসিবে কোথা হইতে? স্থির হইল যে দরিদ্র পল্লীবাসীদের উপর কর আরোপিত করিয়াই এই ব্যয় সংস্থান হইবে। ট্যাক্সের নূতন কোন নামকরণ হইল না, চৌকিদারী ট্যাক্সের নামেই বাহার যে ট্যাক্স নির্ধারিত ছিল তাহার দ্বিগুণ হইতে দশগুণ পর্যন্ত ট্যাক্স বসিল। দরিদ্র প্রজা প্রমাদ গণিল।

যাহা হউক গ্রীষ্মকালে বাটী কাটিয়া শেয়াল-পচা ফোলা



জল আর পান করিতে হইবে না ত ? বর্ষাকালে হাটে যাইতে গেলে ত আর একবুক জল ও একটুকু কাদা ভাজিতে হইবে না ? অদূর ভবিষ্যতেই ইউনিয়ন বোর্ড তাহাদের রাস্তা তৈয়ার ও পানীয় জলের কূপ পুষ্করিনী খনন করাইয়া দিতেছে, এই আশায় তাহারা পেটে না খাইয়া বোর্ডের কর যোগাইল ।

বলা বাহুল্য বোর্ডের নূতন নিয়মে যখন গ্রাম্য চৌকিদারগণ ইহার অধীনে আসিল তাহারাও মনে করিল সপ্তাহে সপ্তাহে যখন থানায় হাজিরা দেওয়ার পরিবর্তে বোর্ডে হাজিরা দিলেই চলিবে, তখন বোর্ডের কর্তারা তাহাদের দেশের লোক হইয়া তাহাদের আপদে বিপদে কি একটু স্নেহের চক্ষে চাহিবেন না ? বাবুরা ত আর সরকারের চাকর নহেন ? আর মাহিয়ানাটা ত তাহারা নিয়মিত পাইবেই—তাহাদের আনন্দের দিন !

অতএব বোর্ডের নির্ধারিত টাকা আদায়ে তাহাদের উৎসাহের অন্ত রহিল না—একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া বর্তমানে টাকাটা দিয়া দিলে অদূর ভবিষ্যতে যে কত প্রকার সুখ সুবিধা হইবে, ইহা তাহারা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতে কাহাকেও ক্রটি করিল না । সরল গ্রামবাসী সরল মনেই তাহাদের শ্রমের কড়িদিতে থাকিল । বিপুল উৎসাহে টাকা আদায় চলিল । জনহিতকর কার্যের জন্য সপ্তাহে সপ্তাহে বোর্ডের হাকিম (President) নির্দিষ্ট স্থানে সদলবলে মিলিত হইয়া সভা করিতে লাগিলেন ।

দেখিতে দেখিতে বৎসর ঘুরিল । গ্রামবাসিগণ এক বৎসরের মধ্যে কোথাও রাস্তা বা জলাশয়ের চিহ্নমাত্র না দেখিয়া হতাশ হইল । দলে দলে আসিয়া তাহারা বোর্ডের কর্তাদের নিকট দাঁড়াইল, এবং রাস্তা ঘাটের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ইহাই জানিয়া গৃহে ফিরিল যে প্রথম বর্ষ গিয়াছে টাকা আদায় পূর্ব শেষ হইতে, কাধ্য আরম্ভ হইবে দ্বিতীয় বৎসর হইতে ।

কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর গত হইল, এবং দ্বিতীয় ছাড়িয়া তৃতীয় বৎসরও ঘুরিয়া গেল, পল্লীবাসীরা কোথাও রাস্তা বা জলাশয়ের সন্ধান পাইল না । তবে কি রাস্তা ঘাট একেবারেই কোথাও তৈয়ার হয় নাই ? না, কিছু কিছু হইয়াছে বই

কি, তবে সেটা স্থান কাল পাত্রাভ্যাসী । হয়তো কোন প্রধান হাকিম (President) ব্যবসাদার, বর্ষাকালে তাঁহার ব্যবসায়ের গদিতে যাতায়াতের অত্যন্ত অসুবিধা ; তাঁহার গৃহস্থার হইতে আড়ত পর্যন্ত একটি সুন্দর রাস্তা নির্মিত হইল ; হয়তো কোন হাকিম চিকিৎসক, অতএব তাঁহার গৃহ হইতে ঔষধালয় (Dispensary) পর্যন্ত একটি রাস্তার একান্ত অভাব তিনি অত্যন্ত বোধ করেন, অতএব সে অভাব পূরণ হইতে বাকী রহিল না । এইরূপে কাহারো বহিঃপ্রাঙ্গণে একটি নলকূপ বসিল, কোন সভ্যের (Member) সদর বাটীতে একটি ইঁদারা খনিত হইল ; এসব ত জনহিতকর কাধ্য এবং ব্যয়সাপেক্ষ নিশ্চয়ই । অতএব কাজ কিছু কিছু হইয়াছে বৈ কি ? আদৌ কিছু হয় নাই বা এসকল কার্যে অর্থব্যয় হয় নাই বলিলে হয়ত মিথ্যাই বলা হইবে । \*

ট্যাক্সের টাকা আদায়কল্পে যত প্রকার কলকৌশল বুদ্ধি পরামর্শ প্রয়োগ করা সম্ভব তাহার কোন প্রকার ক্রটি না করিয়া এবং পরিশেষে দরিদ্রের ঘটি গাড়ু ক্রোক বিক্রয় করিয়া যে টাকা আদায় করা হইল, তাহাতে চৌকিদারের মাহিয়ানা দেওয়া হইল কি প্রকারে তাহা একটু উল্লেখ না করিলে ব্যাপারটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় ।

প্রথম প্রথম তাহাদিগকে কিছু কিছু দেওয়া হইল বটে, পরে তাহাদের হাতে একটি পয়সাও না দিয়া কাহারো দ্বারা ৬ মাসের শোধ রসিদ লেখাইয়া নেওয়া হইল, কাহাকেও তিন মাসের এবং কাহাকেও বা সারাবৎসরের টাকা পাইয়াছে বলিয়া রসিদ দিতে বাধ্য করান হইল ।

হাকিম বা মেম্বরগণের মধ্যে কেহ হয়তো তাহাদের মনিব, কেহ মহাজন এবং কেহ হয়তো সম্মানাহঁ মৌলবী । অতএব তাহারা ভয়ে হোক, লজ্জায় হোক কথা বলিতে পারিল না—কথা তারা ত বলিতে শিখে নাই, তারা শিখিয়াছে শুধু নীরবে অশ্রুবিগর্জন করিয়া সর্বাস্বধ্যামীকেই তাহাদের হৃদয় বেদনা জানাইতে ।

+ কোথাও বা কোন ইউনিয়নে যে স্বার্থ জনহিতকর কিছু কিছু কাধ্য হয় নাই, আমরা তাহা বলিতেছি না । সাধারণতঃ অধিকাংশ স্থলে বেকরপ ঘটনা ঘটিয়াছে, এবং জনসাধারণের মনের উপর তাহার কল বেকরপ হইয়াছে, তাহারই একটি ছবি সাধারণের নিকট দাঁড় করান এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । কাহাকেও বিশেষ করিয়া বলা ইহার উদ্দেশ্য নহে ।

এই ত গেল ইউনিয়ন বোর্ডের গঠন ও রাজস্ব বিভাগ। এখন বিচার বিভাগের বিষয় হুচার কথা বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করি।

বোর্ডে বিচারপ্রার্থীদের মধ্যে বাহারা হাকিমদের দর্শনী পার্কিনীসহ হুবেলা কঠা হুজুর বলিয়া তৈলমর্দন করিতে পারিলেন, তাঁহারা হয়তো কিছু সফল পাইলেন। (সেটা ন্যায্যই হোক আর অন্যায়ই হোক) ; কিন্তু বাহারা অতদূর পারিয়া উঠিলেন না, তাঁহাদের আর্জি পড়িয়া দেখিবার অবসরই হয়তো হইয়া উঠিল না!

সাধারণতঃ পল্লীগ্রামের ভদ্রসন্তানগণ দরিদ্র হইলেও আত্মসম্মানজ্ঞানশূন্য নহেন। সামান্য গ্রাম্য বিবাদভঞ্জনর জন্য বোর্ডে বিচারপ্রার্থী হইলে, বোর্ডকর্তৃপক্ষগণ যদি তাহা কাণে না তুলেন, তবে তাহা লইয়া মেম্বারদের দ্বারে দ্বারে হাত কচলাইয়া বেড়ান তাঁহাদের আত্মসম্মানে বাধে। বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মহাশয় তাঁহার সহকারী সভ্যবৃন্দসহ এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়া, বাদী বিবাদীকে ডাকিয়া পাঠাইলে বা স্থবিচার করিবার জন্য সংবাদ দিলে তাঁহারা উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের মোকদ্দমার উপযুক্ত তথ্য করিতে পারেন—কিন্তু মোকদ্দমা যেখানে আদৌ হাকিমের এজলাসে উঠে না সেখানে তথ্য তদারকের চিন্তা নিপ্রয়োজন।

সকল কথা বলিয়া বোর্ডের নির্বাচন-বিভ্রাট সম্বন্ধে কিছু না বলিলে অস্বহানি হয়। সকল স্থানেই প্রথমে নির্বাচনের মেয়াদ অর্থাৎ তিন বৎসর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় নির্বাচন কোথাও হইয়া গিয়াছে ও কোথাও এখনও চলিতেছে। এই দ্বিতীয় নির্বাচন সময়ে মেম্বারদিগের মধ্যে প্রেসিডেন্ট পদলাভের জন্য ভদ্রনামধেয় পল্লীজননারকগণ বেক্স মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন ও দিতেছেন তাহাতে সত্যই গভীর দুঃখ হয়।

এই ইউনিয়ন বোর্ড যখন প্রথম পাশ হয় সে ১৯০৪ সালের কথা। তখন আমাদের দেশের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনিষীগণ এই বোর্ড ভবিষ্যতে আমাদের গৃহবিবাদের যন্ত্রস্বরূপ হইবে বলিয়া কদর্শ করিলেও, সরকার বাহাদুর আমাদের এইরূপ বলিয়া বুঝাইলেন—আমরা যে স্বায়ত্বশাসন প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্যতীত প্রকাশ করিতেছি; ইহা তাহারই একটা অভিনব

সংস্করণ—স্বায়ত্বশাসনেরই একটা পরীক্ষামূলক (Experimental) ব্যবস্থা। অতএব আমরা এই ক্ষুদ্র গভীর্বিষিষ্ট গ্রাম্য স্বায়ত্বশাসন কার্যে দক্ষতালাভ করিলে ও কৃতিত্বের সহিত ইহার পরিচালনা করিয়া উপযুক্ততা অর্জন করিলে, আমাদেরকে ক্রমে দেশশাসনভার অর্পণ করা হইবে। সেই হইতে এই ইউনিয়ন বোর্ড স্বায়ত্বশাসনের মানদণ্ডস্বরূপ বিবেচিত হইয়া আসিতেছে এবং গত তিন চারি বৎসর পূর্বে ইহাকে কার্যকরী করিয়া তোলা হইয়াছে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই ইউনিয়ন বোর্ডের পরিচালন লইয়া আমরা যে জঘন্য মনোভাবের, অহুপযুক্ততা ও স্বার্থপরতার পরিচয় দিতেছি, তাহাতে স্বার্থগতশূন্য স্বদেশ-সেবার কার্যে আমরা কতদূর কৃতকার্য হইতে পারিব তাহা সহজেই অহুমেয়।

আজ আমরা পরাধীন দুর্দশাগ্রস্ত জাতি, এই কারণে আমাদের এই হীনতার কাহিনী সাধারণের নিকট প্রকাশ করার মধ্যে আত্মপরাধের লজ্জা আছে। কিন্তু আবার নিজেদের মধ্যে আমাদের এই নৈতিক চরিত্রের গলদ সম্বন্ধে আলোচনারও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমাদের পূর্ব পুরুষগণ এই বাংলার মাটিতে জন্মিয়াই, রাজসরকার হইতে হাকিমীর জন্য বাহালী পরোয়ানা (appointment of presidentship) না পাইয়াও, নিজেদের স্বধৃঃ, অডার অভিযোগ নিজেরাই বুঝিতেন ও যথাসাধ্য মিটাইবার চেষ্টা করিতেন। জলহীন পল্লীতে পুকুরিণী খনন, রাস্তাহীন স্থানে রাস্তা নির্মাণকরণ ও ছোট খাট বাদ বিসম্বাদ নিজেরাই মেটান তাঁহাদের নিত্যকর্তব্য ছিল। তাঁহারা এই পদ্ধতি প্রচার (System of appointing village president) সৃষ্টিকারক। অথচ তাঁহারা যে বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন তাহা নহে; স্বাভাবিক নৈতিক বুদ্ধি ও কুটিলতাশূন্য সরল প্রাণই তাঁহাদের যাবতীয় সংকল্পের উৎস ছিল।

এখন আমরা নিজেদের শিক্ষিত বলিয়া মনে করি। কিন্তু স্ব-পল্লীর প্রতি, স্ব-সমাজের প্রতি, স্ব-জাতির প্রতি সে দয়দ কই? বাহাতে তাহাদের সকল দুঃখ দুর্দশা আমাদের হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হয়, এরূপ মন আমাদের কোথায় বাহাতে ঘটাই বলিতে ইচ্ছা হয়—

“এই সব মুচ মুক রান মুখে দিতে হবে ভাষা

এই সব শ্রান্ত শুক ভগ্ন বুকে ধনিয়া তুলিতে হবে আশা।”

উপসংহারে বলিতে চাই, ইউনিয়ন বোর্ড যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা যথার্থভাবে অনুষ্ঠিত এবং কার্যকরী হইলে দরিদ্র গ্রামবাসীগণের আর কিছু না হউক স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং রাস্তা ঘাট, পানীয় জলের অভাব দূরীভূত হইতে পারিত; সামান্য সামান্য কারণে মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি হইয়া ব্যয়সাপেক্ষ আদালতের আশ্রয়ও লইতে হইত না। কিন্তু তাহা না হইয়া এই প্রতিষ্ঠানের সমুদয় লক্ষ্য, অভিসন্ধি, সামর্থ্য, অর্থ যদি ব্যয়িত হয় ব্যক্তি বিশেষের তেজস্বর্তী মহাজনী অথবা দালান ইমারত গড়িয়া

তুলিবার সার্থকতায়—তাহা হইলে এইরূপ ব্যাপারে গ্রামবাসীগণের কর্তব্য কি তাহা তাঁহাদের বিচার্য।

নিজেদের অধিকার, নিজেদের সুযোগ সুবিধা, সামর্থ্য পারগতাকে সন্মুখ করিবার আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন, ভবিষ্যতকে জয়মণ্ডিত ও উজ্জলতর করিয়া তুলিবার চৈতন্য ও দার্ঢ্য আজও যদি দেশবাসীর না আসিয়া থাকে তাহা হইলে বলিবার কিছু নাই। ঘরে বসিয়াই নিজেদের শুধু দুর্ভাগ্যগ্রস্ত ও অভিশপ্ত ঠাওরাইলে আর হা অর জো অর করিয়া দিন কাটাইলে পল্লীবাসীর সুদিন বোধ হয় নিকটতর হইয়া আসিবে !!

## পুস্তক পরিচয়

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর সামন্ত-রায়

শ্রীগোবর্দ্ধন কৃত “বৃহৎ সাহিত্যকারিকা” শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার-এডভোকেট কলিকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক সংকলিত ও সংগৃহীত। প্রকাশক শ্রীশঙ্করনাথ সরকার, ৩১ নং এলগীন রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

এই বৃহৎ সাহিত্যকারিকা একখানি প্রাচীন, প্রামাণিক, দুস্ত্রাপ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এই কারিকা বহু প্রাচীন গোবর্দ্ধনাচার্যের দ্বারা সংগৃহীত ও রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। সার উইলিয়াম হান্টার, সার হাবার্ট রিজলী, ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ এবং অধ্যাপক কোলব্রুক শেরিং আদি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁহাদের পুস্তকে এই প্রাচীন কারিকার উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু বহু চেষ্টায় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। প্রকাশবাবু বহু কষ্টে, অর্থব্যয়ে ও প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কারিকাখানি সংগ্রহ ও সংকলন করিয়া সাধারণের বিশেষতঃ সামাজিক ইতিহাস-আলোচনাকারীদের বিশেষ ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। প্রকাশবাবু ইহা কোচিন,

গঞ্জাম ও সম্বলপুরবাসী ব্রাহ্মণদের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথম মূল পুঁথিটি মাস্তাজ বৈদিক ধর্মপ্রচারিণী সভার সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী পার্শ্বসারথী আয়েজার মহাশয় প্রদান করিয়াছিলেন। ইতিহাসের দিক ইহতে ইহা একখানি প্রাচীন মূল্যবান গ্রন্থ। ইহা হইতে দেশের বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক ও সামাজিক তথ্য অবগত হওয়া যায়। - প্রায় চারিশত শ্লোকে রচিত মূলকারিকা ও তাহার সটিক বঙ্গভূবাদ জাতিতত্ত্বের নানা তথ্যপূর্ণ শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক গবেষণাযুক্ত আলোচনা এবং গ্রন্থকারের সৃষ্টিভিত্তিক মন্তব্যাদিতে প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তকখানি পূর্ণ হইয়াছে। ইহা সাহিত্যকারিকা এবং প্রত্যেক সাহিত্যের অবশ্য পাঠ্য হইলেও জাতিতত্ত্বালোচনার সহায়ের একখানি অতি প্রয়োজনীয় তথ্যপূর্ণ পুস্তক। লেখকের সুদক্ষ লেখনীতে জাতীয় ও সামাজিক সকল বিষয় মিরপেকভাবে আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকখানির স্থানে স্থানে আভিযা পুনরুক্তি ও বানান দোষ দৃষ্ট না হইলে সর্বোৎকৃষ্ট হইত।

## শোকসংবাদ

বাংলার সাহিত্যাকাশ থেকে আর একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসে পড়লো স্বর্ণকুমারী দেবীর লোকান্তর-প্রাপ্তিতে। এই মহীয়সী মহিলা প্রায় ৬০ বৎসর ধরিয়৷ বঙ্গবাণীর বেদীমূলে কি নিষ্ঠার সহিতই না পূজারতা ছিলেন। শুনিয়া বিস্মিত হইতে হয় মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও তিনি সাহিত্য সেবায় মগ্ন ছিলেন। লিখিবার সামর্থ্যই কেবল ছিলো না, কিন্তু তাঁর অন্তর বুঝি বা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সক্রিয় সচেতন ছিল।

দেহের জরা ঝাঁদের ভাবধ্বংস অন্তরের নাগাল পায় না—তাঁদের সংখ্যা অতি বিরল ও অসাধারণ—স্বর্ণকুমারী ছিলেন সেই অসাধারণদের একজন। মহর্ষির কণ্ঠা, রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা, শ্রদ্ধেয়া সরলা দেবীর মাতা—শুধু এই পরিচয়ের জোরেই স্বর্ণকুমারীর আসন উচ্ছেদ নয়—বঙ্গবাণীর আমদরবারে তাঁহার ছিল একটি স্বতন্ত্র স্থান ও স্থর। অধুনা-লুপ্ত কিন্তু মাসিক-সাহিত্যে তথা বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর-সূচয়িত্রী ভারতীর সম্পাদিকা হিসাবে স্বর্ণকুমারী বাঙ্গালী নরনারীর নমস্কা। ভারতীর বুকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কৈশোর ইতিহাস রচিত হ'য়েছিল। ঝাঁরা সেই ইতিহাসের রচনা কর্ত্তেন একে একে অনেকেই অকালমরণের কোলে ঢলে পড়েছেন।

ভারতীর প্রথম সম্পাদিকার প্রতি আমাদের শোকাক্ত মনের প্রণাম জানাই।—

এই বিয়োগ আমাদের বেশী ক'রে বেজেছে। মাত্র কয়েকদিন আগে সত্যেন্দ্রস্মৃতিবাসর উপলক্ষে সাহিত্য-সেবকসমিতির একটি অধিবেশনে আমরা উপস্থিত থাকবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সভানেত্রী ছিলেন শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সরলা দেবী। প্রবীণ সম্পাদক জলধর সেন মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে স্বর্ণকুমারীর সম্মানে জয়ন্তী-অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন। তাঁহার আবেগকম্পিত ভাষায় যে আশাবাদ ধ্বনিত হ'য়েছিলো তাহা যে এত শীঘ্র বাস্তবে পরিণত হবে তা আমরা ভাবি নি।



## মোহনতোষ ব্রাদার্স ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

অভিজ্ঞ ভূতপূর্ব ক্রীড়াশিক্ষক দ্বারা পরিচালিত—  
রাজা মহারাজা, কর্পোরেশন, কলেজ ও স্কুল  
শিক্ষক দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত স্কলভে টেকসই  
ও মনোরম জিনিষাদি সরবরাহ  
আমাদের বিশেষত্ব।

### ফুটবল ও ক্যারমবোর্ড

পত্র লিখিয়া আমাদের বিভিন্ন জিনিষের বিভিন্ন  
ক্যাটালগ গ্রহণ করুন—

ব্যডমিণ্টন ফুটবল বারবেল স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় ও  
টেনিস ডাঙ্কেল ইণ্ডিয়া ডাঙ্কেল স্বাস্থ্যোন্নতির  
ক্রিকেট ডেভোলেপার পুলিওয়েট ও অগ্ন্যাগ্নি যাবতীয়  
হকি ক্যারম ব্যায়ামের উপকরণ পুস্তকাদি

ব্রাঞ্চ—৩৮ ক, আশুতোষ মুখার্জী রোড, ভবাণীপুর  
কলিকাতা।

### বনমর্ষন

শ্রীমনোজ বসু—

উষা-মনোময়ের মধুরতম রোমান্স—লীলা-উমা-প্রভা  
কিরণের উত্তরঙ্গ নদীশ্রোতের মত অভিমান-বিস্মৃক ভালবাসা  
—কমক-চাপার গন্ধ-আতুর শতাব্দী পারের মালতীমালা!  
নির্জন গভীর রাতে অরণ্য-আত্মা কথা কহিয়া ওঠে.....  
যত্ন-দানব মাহুঘের ঘরে ঘরে হানা দিয়া বেড়ায়.....চরকার  
জীবন ধারার কূলে কূলে ছায়াঘন গ্রামান্তরাল হাতছানি দিয়া  
ডাকে.....

বাংলা সাহিত্য যে মহিমময় আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে  
চলিয়াছে এ বই তাহার পরিচয় দিবে।

বহুরঙের প্রচ্ছদ পট। অভিনব বাঁধাই।

উপহারের চমৎকার উপযোগী।

দাম—১৫০ আনা।

প্রবাসী কার্যালয়

১২০/২ অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা।

## মহাপুরুষের অদ্ভুত চিকিৎসা—

হতাশার আশা সঞ্চার—

### বহুরোগী নিরাময়

কলিকাতার ১৬০ নং ক্রশ ষ্ট্রিটে সেন্সি কোংএ এক  
মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি সেই স্থানে প্রত্যহ  
বৈকালে ১টা হইতে ৬টা পর্যন্ত এবং তাঁহার আশ্রম  
চন্দননগর যুগান্তর কুটীরে সকাল ৭টা হইতে ১২টা পর্যন্ত  
রোগী দেখিতেছেন। তাঁহার অলৌকিক চিকিৎসায় বহু প্রকার  
রোগী নিরাময় হইয়াছে। একবার সাক্ষাৎ করিলে নিশ্চয়ই  
আশ্চর্য হইবেন। ডাক টিকিটসহ চিঠি লিখিলে ব্যবস্থাপত্র  
বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

তিনি আবার এমনভাবে হাত দেখিয়া ভূত ভবিষ্যত ও  
বর্তমান বলিয়া দেন যে তাহা স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার  
আশ্চর্য শক্তি না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। সহস্র সহস্র  
কঠিন ব্যাধি তিনি বিনাব্যায়ে আরাম করিতেছেন। ভেষজ  
চিকিৎসাই তাঁহার পছন্দনীয়।

## EVER READY STORE

88/1, Harrison Road, Calcutta.

Previous House for Pen Repairing



Moffosils order promptly executed.

The Pen is worth for its name.

Regular No 12—Rs 2-8as. Self-filling No 52  
—Rs 3-8as. Safety No 32—Rs 3-8—5.

Parker Model:—Senior Rs 12, Junior Rs 8.

Special concession for Dealers.

# মিলন সমিতি

( সেবা বিভাগ )

ফোন—বি, বি—১৫৫৯।

প্রায় দুই বৎসর হইল সর্বসাধারণের হিতকরে এই সেবা প্রতিষ্ঠান খোলা হইয়াছে। বিনা পারিশ্রমিকে ছঃস্থ, অসহায়, পীড়িত ও আহত নবনারীর পরিচর্য্যাই এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এষ্ট জন্ত নিঃস্বার্থ কর্ম্মিরূপে সর্বদাই প্রস্তুত থাকেন। সংবাদ পাইলেই তাঁহারা স্থান-কাল-পাত্র-নির্বিশেষে সেবাই ছঃস্থ, পীড়িত বা আহত ব্যক্তির শুশ্রূষা ভার সাদরে গ্রহণ করেন।

কর্ম্মিগণকে শুশ্রূষা বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্ত নিয়মিত ব্যবস্থা আছে। এই সেবা কার্য্যে ত্রুটি হইতে ইচ্ছুক এইরূপ সকল ব্যক্তিকেই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক সাদরে আহ্বান করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত বাঁহারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে সাহায্য করিবেন, তাঁহাদের দান কৃতজ্ঞতা সহকারে গৃহীত হইবে।

পৃষ্ঠপোষকগণ—

ডাঃ সুনন্দরীমোহন দাস

শ্রীযুক্ত সতীনাথ রায় এডভোকেট, হাইকোর্ট।

” হৃদয়কর ঘোষ

কাউন্সিলার, কলিকাতা করপোরেশন।

” জগদীশচন্দ্র মৈত্র এম, আই, ই, ই, ( লণ্ডন )

” এম্, ওয়াজেদ আলী

৩য় প্রেসিডেন্ট ম্যাগিষ্ট্রেট।

বিনীত

মুরলীমোহন বসু এম্, বি সম্পাদক।

৩১২ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা।

আবশ্যকবোধে নিম্নলিখিত ঠিকানায়ও অঙ্গসন্ধান  
করিতে পারেন।

বয়েজ এসোসিয়েশন।

৩৭ শাখারীটোলা ইষ্ট লেন,

টেলিফোন নং ২১৭১ কলিকাতা।

## প্রাপ্তি স্বীকার

“প্রবাহ”—১৩৩২ সালেব আষাঢ় মাসেই এই পত্রিকাখনি নূতন আলোক লাভ করিল। ইহার সম্পাদক ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী—৯ নং নবীন কুণ্ডুর লেনে ইহার অফিস।

এখানি বিংশ শতাব্দীর তরুণের মুখপত্র। তবে ভয় হয়, পত্রিকাখনি তরুণদের অতি-ভারল্যের আত্মকুঁড় না হইয়া উঠে। তারুণ্যের নামে যে কদাকার মনোবৃত্তি আজকাল অনেক ক্ষেত্রে নর-নারীর দৈহিক কামনার মধ্যে আত্ম-ক্ষার্মকতা খুঁজিতেছে, এই তরুণ-সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্য না হয় যেন তাব ভাষার মধ্য দিয়া তাহারই সংক্রামক বিষ ছড়াইয়া দেওয়া। প্রথম সংখ্যাতেই শ্রীহৃৎকুমার সরকারের “সুরা”-জুতি ও শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের পঞ্চ-চলতি উড্ডোপ্রেমের গল্প “উষ্ম” পড়িলেই এইরূপ একটা আশঙ্কা আমাদের স্বভাবত আসিয়া পড়ে।

প্রাচীর-পত্রে যেন দেখিয়াছিলাম সুপরিচিত সাহিত্যিক শ্রীজগৎ মিত্র হইবেন এই “প্রবাহের” কর্ণধার। কিন্তু তাঁহার ন্যূন বা পরিচয় প্রথম সংখ্যায় না দেখিয়া আমরা একটু হতাশ হইয়াছি। আমরা এই নূতন সহযোগীর শুভ কামনা করি।

“পূর্বদৃশ্য”—মাসিক পত্র। সম্পাদক শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, কান্দরপাড়, কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত।

পত্রিকাখনি মফঃস্বলের—কুমিল্লার District magazine বলিলেও দোষ হয় না। জাতীয় প্রগতিতে, আধুনিক শিক্ষা দীক্ষায় কুমিল্লা যে কতখানি অগ্রসর তাহা এই কাগজখানির পাতায় পাতায় দেখা মিলিবে। ইহার সাহিত্যিক স্বরং বেশ উচ্চাঙ্গের বিশেষভাবে “দূর্বাসার” নির্ভীক উক্তি অনেকখানি বৃদ্ধি ও উদ্দেশ্যপূর্ণ—তবে তাহার বলিবার ভঙ্গীটি আরও একটু সংযত ও উদার নিপেক হইলে ভাল হয়।

পত্রিকাখনি সবেগাত্ত তৃতীয় মাসে পদার্পণ করিল। আমরা এই শিশু সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

শ্রীঅতুল প্রসাদ সেন ও শ্রীহরেশ চক্রবর্তী সম্পাদিত

## উত্তরা

প্রবাসী বাঙ্গালীর মুখপত্র

৪৬, ডেলুপুরা, বেনারস সিটি।

শ্রীমরোজরঞ্জন মিত্র কর্তৃক ৩০নং হার্ডিকি বাগাম লেন, কালিকা প্রিটিং ওয়ার্কস, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত,  
ও মেহেরপুর, গোপসেনা পোঃ, জেলা যশোহর হইতে প্রকাশিত।

৩৫৫

# ইন্দি

সর্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥

১ম বর্ষ

১০ম সংখ্যা

শ্রাবণ

১৩৩৯

সাল

প্রফুল্ল জয়ন্তীতে অভিনন্দন

শ্রীমানকুমারী বহু

দেব !

শক্তি বৃকে মুক্তা যথা খনি মাঝে মণি,  
তেমতি আসিলে তুমি এ আঁধার দেশে !  
দেবকী সাধনা সাধি, কংস কারাগারে,  
পাইলা পুরুষোত্তম পুত্র নীলমণি !  
তেমতি মা বঙ্গলক্ষ্মী তপঃ আচরিয়া,  
লভিলা দেবের বরে প্রফুল্ল-রতনে !  
জনম সে পল্লি-কোলে বিহগ কুজিত  
স্নিগ্ধ শ্যামা, ফুলময়ী পবিত্রা সরলা !  
বিধি দিলা পুণ্যকৰ্ম্ম, ললাটে লিখিয়া—  
উদাসী শঙ্কর সম রাজ-রাজেশ্বর  
কুবের ভাগ্যরী যার, তবু সে ভিখারী,  
সে শুধু পিশাচ ভূতে দেয় নব প্রাণ !

ষোড়শ মাতৃকা দিলা শত আশীর্বাদ,  
 অক্ষয় কবচ দিলা অলঙ্কা শিরসে ।  
 অর্পিত দেবর্ষিদল তপোবল যত ।  
 কহিলা বিজ্ঞান-বাণী “বরপুত্র মম !  
 আপনা সঁপিও বাছা, নিখিল-কল্যাণে ।”  
 সপ্ততি বর্ষের তাই শুভ অনুষ্ঠান,  
 প্রফুল্ল-জয়ন্তী আজি বঙ্গ মা'র কোলে ।  
 বিশ্বের মঙ্গল কাম্য, আত্মত্যাগী যোগী,  
 কি দিব তোমারে মোরা, কিবা পারি দিতে ?  
 আজ যে ফুটেছে ফুল কানন উজলি,  
 তোমারে পূজিতে দেব ! তোমারে পূজিতে !  
 আজি যে অনিল বহে মধুর হিল্লোলে,  
 তব গুণ গাহি দেব ! তব গুণ গাহি !  
 আজি যে গাহিছে পাখী মধুর কাকলি,  
 তোমারি মহিমা গীতি দিগন্তে ছড়ায় !  
 আজিকার রবিশশী যশোরশি তব,  
 ঢালিছে, নিকাম কাম্য ! ভাস্বর কিরণে ।  
 দিন্ শুভময় বিধি আমাদের তরে,  
 তোমারে আরোগ্য, আয়ু, মহতী শক্তি ।  
 আকাশে নিনাদে শঙ্খ অমর নিচয়,  
 প্রফুল্ল জয়ন্তী আজি প্রফুল্লের জয় ।  
 অনুরক্ত ভক্ত আমি প্রণামি চরণে  
 এ হুদিন স্মরি যেন—বাকী যা' জীবনে ।



## আচার্যের পায়ে

সে আজ বাইশ বছরের কথা—প্রায় দুই যুগ। সবে ঝল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছি। নিছক পাড়ারগৈয়ে না হ'লেও সহরে ছেলের মতো Smartness ও বিজ্ঞতার বড়াই রাখতুম না; একটা সশ্রদ্ধ বিষয় ও নিষ্ঠার ভাব নিয়ে গিয়ে ছিন্লাম আচার্যের দর্শনে। একে অত বড়ো লোক তায় আবার অপরিচয়ের আশঙ্কা, রাঙ্গোর Shyness এসে বৃকের ভেতর ঢেঁকির নৃত্য জুড়ে দিলো। কিন্তু সকল সংকোচের মাঝে একটা মধুর অমুভূতির কম্পন অনুভব করেছিলুম—একথা বেশ মনে পড়ে। আচার্য রায়কে Close quarters-এ খুব কমই দেখেছি, অনেক সময়ে কাছে যাবার ব্যর্থ চেষ্টায় ব্যথিত হ'য়েছি, দোরগোড়া থেকে দেখাই পেয়েছি, কথা কইবার সুযোগ না পেয়ে ক্ষুণ্ণমনে ফিরে এসেছি—কিন্তু আজ এই বাইশ বছর ধরে যতবার তাঁকে স্মরণ করেছি, প্রথম সাক্ষাতের সেই মধুর অমুভূতি জেগে উঠেছে। মনের তলায় ডুব দিখে কিন্তু সে অমুভূতির মূলে তাঁর গরিমার চাইতে স্নিগ্ধতারই সন্ধান বেশী করে পেয়েছি। প্রফুল্লচন্দ্র রাসায়নিক, পণ্ডিত, গবেষক, হস্তত ব্যাবসা-কুশলও, কিন্তু সে কথা মনে হবার আগে মনে পড়ে তাঁর শিশুর সরলতা আর সরস হৃদয়। ঐ শুকশীর্ণ পঞ্জরের নীচে প্রেমের কি গভীর ফস্তু-ধারাই না বয়ে চলেছে!

আচার্য সম্বন্ধে নিতান্ত দুটো নিজের কথাই বলবো এই সংকল্প নিয়ে কলম ধরেছিলুম, কিন্তু কথায় কথায় কলমের ওপর একটু বেদখল হ'য়ে পড়েছি। ই্যা, প্রথম দর্শনের কথাই বলি আবার। একানব্বই নম্বর আপার সাকুলার রোড—যেখানে এখন মোহান্দী আফিস আছে এবং কিছু দিন আগে প্রবাসী আফিস ছিলো—সেই নাতিক্ষুদ্র বাড়ীটির দোতলায় একটি স্বল্পপরিসর কক্ষে পেলাম তাঁর দেখ। সগয়টা ঠিক মনে নেই—বিকেলের দিকেই হবে। শরীরটা সেদিন ওর একটু অসুস্থ ছিলো। কয়েকটি তরুণ ছাত্র তাঁকে ঘিরে বসে আছে, আমারই মতো তাদের অনেকের বয়স। কেউ পা টিপছে, কেউ মাথা টিপছে, চুল টানছে।

কি কথাবার্তা হ'য়েছিলো আজ আর সে সব কিছুই মনে নেই, শুধু মনে আছে অপর ছেলেদের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হ'য়ে মনটা আমার অনেকক্ষণ ধরে লুক ভুজের মত আচার্যের পা' দুখানার আশে পাশে ঘুরে ফিরছিলো। শেষটা হাত দু'খানিও যে কখন মনের অনুসরণ করে একেবারে তাঁর পায়ে ঘেঁষে পৌঁছেচে তা জানতেও পারি নি। পায়ের সেই ছোঁয়াটুকুই আজ মনে ও হাতে লেগে আছে—চন্দন লেপের মতো। আর সব ভুলে গেছি।

মাস দুই আগে 'ইজিতের' অর্ঘ্য নিয়ে সুদীর্ঘ বাইশ বছর পরে আবার তাঁর নিকটে গিয়েছিলাম। ষোল বছরের সেই ভীকু বিস্মিত বালক আজ আমার জীবনে মৃত, স্মরণ পথের পথিক—মনে যত, চুলেও তত পাক ধরে এসেছে—কিন্তু আচার্যদেবকে দেখলাম তেমনই চিরশিশু ভোলানাথ, মুখে হাঁসি, বৃকে অতলস্পর্শ স্নেহ আর অকুতোভয় শক্তি, চোখে প্রতিভার স্থির দ্যুতি! পরিবর্তন যা কিছু দেখলাম আমারই এই স্ববির জরাগ্রস্ত দেহে ও মনে। আজও দেখি সর্দিকানী মাথার যন্ত্রণায় কাতর, আলো সহিতে পারেন না, তাই চোখে ক্রমাল বেঁধে বিছানায় শুয়ে আছেন, আশে পাশে ছাত্রদল ঘিরে বসে। লোভ হ'ল তেমনি করে আবার পা টিপে দিয়ে আসি—কিন্তু পারলুম না! প্রথম সাক্ষাতের দিনেও এমনি সংকোচ হয়েছিলো, তফাৎ এই যে সেদিনকার সংকোচ জয় কর্তে পেরেছিলুম। আজ কেন পারলুম না—ক'দিন ধরে শুধু তাই ভেবেছি।

আর এক দিন তাঁকে কাছে পেয়েছিলাম—আমার গ্রামে, সাগরদাঁড়ীতে; কপোতাক্ষীর তীরে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ আচার্য স্বর্গীয় সমাজপতি মহাশয়কে পরিহাস ছলে বললেন “সেই নদী তেমনই বইছে, কিন্তু মধুসূদন যে কলঙ্কনি শুনে ছিলেন আমরা তা শুনি কই?”

গ্রামের একটি বলিষ্ঠ যুবককে দেখে আচার্যের সে কী উল্লাস! যুবকটির পিঠে গোটাকয়েক ঘুষি মেরে চিমটি কেটে তবে সে উল্লাসের উপশম হয়।

আপন দেহের শীর্ণতার দৈন্য তাঁকে অহরহ দেশের ও জাতির কায়িক, মানসিক, আর্থিক সকল অসম্পূর্ণতার বিষয়ে সদাজাগ্রত ক'রে রেখেছে। তাই বৃদ্ধি বাংলার শ্মশানে তাঁর এ অক্লান্ত শবসাধনা। এ সাধনা বিফল হবার নয়। জীর্ণপঞ্জরের নীচে দধীচির অমিত তেজ নিয়ে তিনি শতায়ু সহস্রায়ু হোন, তাঁকে শত প্রণাম।

## প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীঅবনীনাথ রায়

তখন আমি দৌলতপুর কলেজে পড়ি। যে আদর্শবাদ থাকলে ঐ বয়সে জগৎটা স্বপ্নময় হ'য়ে দেখা দেয় বলা বাহুল্য তা আমার ছিল। বড় আদর্শকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতুম। অতএব আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শ যে মনের মধ্যে পূজা পেত এ কথা স্বীকার করা বাহুল্য মাত্র। এমন সময় একদিন শুন্লুম প্রফুল্লচন্দ্র আসছেন। তাঁর কক্ষ নিংড়ে দানের সহজে নানান গল্প শুনে আসছিলাম কিন্তু তাঁকে চোখে দেখতে পাব, একেবারে আমাদের মধ্যে এসে তিনি গল্পগুজব করবেন, এতটা সৌভাগ্য কল্পনা করতে পারি নি। কিন্তু তাই হ'ল। একদিন বেলা দশটার ট্রেণে তিনি এসে নামলেন। কীণ অপরিচর চেহারা কিন্তু প্রশান্ত মুখশ্রীর মধ্যে চোখ দুটি অপরিসীম ব্যথায় ভরা—জগতের সমস্ত করুণা যেন সেখানে নীড় বেঁধেছে। ষ্টেশন থেকে মিছিল ক'রে তাঁকে কলেজে নিয়ে আসা হ'ল। কিন্তু এসব পৃথক আদর আপ্যায়ন তাঁকে স্পর্শই করলো না। তিনি কারুর কাঁধে চড়লেন, কাউকে আদর করলেন, কাউকে বকুনি দিলেন, আমাদের সঙ্গে স্নান করলেন, নদীর ধারে দৌড়া-দৌড়ি করলেন—এক মুহূর্তেই আমরা ভুলে গেলুম যে এক জন বিখ্যাত রাসায়নিকের সঙ্গে আমরা কারবার করছি, এ যেন আমাদের পুরাণে কোন বন্ধু বিদেশে ছিলেন হঠাৎ অনেকদিন পরে আমাদের মধ্যে এসে আমাদের মেতেছেন। কেবল খাওয়া দাওয়ার সময় তিনি আমাদের সঙ্গে ভাল রাখে পারলেন না—সামান্য পেঁপে আর এক আধটুকুরো ফল খেলেন।

তার পর তাঁকে দেখলুম মীরাটে—১৫ বৎসর পরে। সেই প্রশান্ত মুখশ্রী, ব্যথায় ভরা দুটি চোখ, পরদুঃখকাতর চিত্ত। এই দীর্ঘকালের ব্যবধান যেন তাঁর দেহে এবং মনে কোন ছাপই দিতে পারে নি। জরা তাঁর কাছে হার মেনেছে। এসেছিলেন প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিত্ব করতে কিন্তু কোন অভিভাষণই লিখে আনেন নি। অভিভাষণ মুখেই বলে গেলেন, আমরা লিখে নিলুম,

চিরকাল বিজ্ঞানের সেবা করে আসছেন কিন্তু সাহিত্য সম্বন্ধেও কি প্রগাঢ় অনুরাগ! বাংলা ভাষার ইতিহাস এবং ক্রমবিবর্তন মুখে মুখেই বলে গেলেন। যে কয়দিন ওখানে ছিলেন মীরাটের প্রবাসী বাঙালীদের আনন্দের সীমা ছিল না।

প্রফুল্লচন্দ্র সম্বন্ধে একটা কথা আমার বার বার মনে হয়েছে—সেটি হচ্ছে এই যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মানুষের কোন জাতিবিভাগ বা শ্রেণী বিভাগ নেই। তিনি সর্ববাদীসম্মত রূপে পূজ্য। কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি বাঙালী, কি মাদ্রাজী, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি জৈন সকলেই তাঁকে সমভাবে শ্রদ্ধা করে। এত সহজে এবং এত সমান ভাবে সকলের শ্রদ্ধা যে তিনি আকর্ষণ করতে পেরে-চেন এর মূল কোথায়? এর এক মাত্র কারণ হচ্ছে তাঁর নিঃস্বার্থ দান এবং নিরহঙ্কার অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা। চিরকাল তিনি পরের জন্ত যথাসর্ব্বশেষ দিয়েই গেলেন, নিজে কিছুই ভোগ করলেন না কিম্বা কারুর কাছে হাত পাতলেন না। ছাত্রজগৎ তাঁর কাছে ঋণী, তিনি কারুর কাছে ঋণী নন। জাগতিক সুখভোগ বলতে যা বোঝায় তাতে কোন দিনই তাঁর অভিকুচি হল না—এমন এক আদর্শবাদ জীবনের অবলম্বন ব'লে গ্রহণ করেছেন যার কাছে বস্তু জগৎ তার শত সহস্র প্রলোভন নিয়ে তুচ্ছ হ'য়ে গেল। তালি দেওয়া পোষাকের চেয়ে ভদ্র পরিচ্ছদ তাঁর অঙ্গে কোন দিন উঠলো না। আহ্বারের তালিকা যে কত সংক্ষিপ্ত তা পূর্বেই বলেছি। নিজে কিছুই নিলেন না কিন্তু পরকে কি ক'রে দেওয়া যায় এই চিন্তাই হ'ল তাঁর জীবনের ব্রত। রসায়ণ শাস্ত্রের জ্ঞান লোক হিতার্থে নিয়োজিত করলেন—বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্ম হ'ল। এক কথায় বলা যায়, তিনি আমাদের দেশ-মাতৃকার সেবারূপ, কল্যাণরূপ। তিনি লোকের চোখ ধাঁধিয়ে দেন নি, বড় বড় প্ল্যাটফর্মে বস্তুতা দিয়ে নিজের ঢাক নিজে পেটান নি, রাজনৈতিক নেতা সাজেন নি, এমন কি সমাজ সংস্কারের দুর্ভাগ পণও তাঁর নেই—তিনি দীর্ঘকাল ধরে অত্যন্ত নিভূতে এবং অত্যন্ত নীরবে মানব জাতির সেবা ক'রে চলেছেন। তিনি সর্ব্বত্যাগী মহেশ্বর—তাঁরই মত নিষ্পৃহ, তাঁরই মত আত্মভোলা। ভারতবর্ষের তিনিই আদর্শ।

## প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীশুকুমার সরকার

হৃদয়ের ধ্যানপন্থ পূর্ণ করি সুন্দরের প্রেমে  
 আলোর পুলিন হ'তে কে এসেছ ধরনীতে নেমে !  
 সংযম-কঠোর তব সাধনার রুদ্রবহ্নি তেজে  
 শক্তির দুন্দুভিখানি উঠিয়াছে দিশি দিশি বেজে ।  
 ত্যাগের মহান স্পর্শে সোনা হোলো সারা হিয়া তব ।  
 বন্দিনী মায়ের মুখ আলোকিত হোলো অভিনব  
 তোমারি আলোক রাগে ; অর্থহীন কল্পনার লোকে  
 গাঁথনি ভাবের মালা ; বিলাসের স্বপ্নালোক চোখে  
 কাটেনি জীবন তব বাসনার রূপমুগ্ধ ক্ষণে ।  
 তুমি আসিয়াছ, বন্ধু ! বাস্তবের কঠিন প্রাপ্তি ;  
 নন্দনের মূর্ত্ত প্রীতি কতদিন কত পলে পল  
 দেখেছি দুচোখে তব বেদনার মৌন অশ্রুজল,  
 ব্যথিত আত্মের লাগি । ফিরিতেছে আজো অগোচরে  
 যে ক্ষুধার্ত্ত নারায়ণ দুঃখদগ্ধ প্রতি ঘরে ঘরে,  
 জীর্ণ বাস শীর্ণ দেহ যে দেবতা ধূলি-রুদ্ধ দেহে  
 লক্ষ নর নারী মাঝে পথ চলে, তারে তব স্নেহে  
 করিয়াছ সঞ্জীবিত ; অস্পৃশ্যের অখ্যাতির দেশে  
 কতবার দেখিলাম চলিয়াছ সপ্রেম আবেশে  
 সেবার দেবতা তুমি ; বক্ষিতের বিরাট সাস্তুনা !  
 বক্ষে তব প্রেম-সোম, চক্ষে তব অমৃতের কণা  
 উঠেছে উদ্বেল হয়ে ; আনিয়াছ ভরি করতল  
 বিপুল বিশ্বাস ভরা জীবনের আকাঙ্ক্ষা উজ্জ্বল  
 দিকে দিকে, মরণাক্ষ এ জাতির প্রদোষ তিমিরে  
 তুমি সূর্য্য শতাব্দীর ; রহিয়াছ জননীয়ে ঘিরে  
 বিচিত্র বর্ষ্মতে তব ; জ্ঞান হতে বড় তব প্রাণ  
 হে নবীন ত্যাগ-ভীষ্ম ! হে বীর তোমারি আত্মদান

হানিয়াছে মৃত্যুশর প্লাবনের দুর্ভিক্ষ দানবে !  
 মোর কণ্ঠ বাক্যহীন ; অশ্রুধারা আনন্দের রবে  
 তোমারে প্রণাম করি ; মুগ্ধ প্রাণ রুদ্ধ বাক্য কবি  
 অন্তরের স্বপ্ন-লোকে হেরিতেছে তব সৌম্য ছবি  
 অপরূপ করুণার ; মানুষেরে ভালোবাসো বলে  
 আমি মানুষের কবি, মোর প্রাণে তরঙ্গ উছলে ।  
 হে গণ-দেবতা, তব প্রাণময় অন্তরের প্রেমে  
 দেবতা বন্ধুর রূপে তোমারি মাঝারে এলো নেমে ।

## প্রফুল্লচন্দ্র

বেদপন্থী

তুষার মৌলি নীল হিমাদ্রির ধবল বক্ষে পুঞ্জ পুঞ্জ  
 বরফ জমে আছে, তাই থেকে ছিটে ফোটা চুঁইয়ে গলে যা  
 বেরোয় তাতেই দেশের প্রাণ বাঁচে ।

কিন্তু যদি ঐ পুঞ্জীভূত তুষার সগর্বে পতনোন্মুখ উচ্চতায়  
 আপন অস্তিত্ব নিয়ে কেবল দাঁড়িয়ে থাকতো তাহলে সে  
 হতো একটা অভাবনীয় আতঙ্কের মতো । প্রাকৃতিক  
 নিয়মে হিমাচলকে অনাবশ্যক ভার বহিতে হয় না, পার্বত্য  
 আনন্দ সহস্র নিরীক্ষকের বেজে ওঠে, তুষাতুর ভূমির  
 আত্মানে পুণাতোয়া নামতে থাকে—সঙ্গীতে নর্তনে দুইকূল  
 কঁপে ওঠে । তারপর সে ধারা ছোট্ট নীচের দিকে—  
 এই মাটির বুকে—হীনতার দীনতায় নয়—আনন্দে, মহৎ  
 চরিতার্থতা লাভের জন্তে—সমুদ্রাভিমুখে ।

সমুদ্রের জোয়ার নদীর টানকে আবিষ্ট আড়ষ্ট অতিষ্ট  
 করে রাখবার চেষ্টা করে, প্রলোভন দেখায়, ক্রকুটি করে  
 কিন্তু ধরিজীর তাপহারী নদী আপন আবেগে আনন্দে সমুদ্র-  
 মুখে ছোট্টে—থামে না । এই তার প্রকৃতি—এই তার  
 প্রবৃত্তি—এই তার পরিণাম ।

পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রকাণ্ড চাপ স্তরে স্তরে আজো জমে  
 আছে, গলে নেমে দেশের কর্মভূমিকে উর্ধ্বরা করেনি ।  
 কিন্তু তারই দু একটা ধারা যা নেমেছে, তাত তুচ্ছ নয় ।

প্রাচ্য পাশ্চাত্য কোনো শিকাই খাটো নয় যদি মানুষে শিক্ষা  
 পায় এবং সেই শিক্ষাকে কাজে খাটাতে পারে । শিক্ষার  
 মাপকাঠি সুখ নয়, সুবিধা নয়, সৌখিনতা নয়—শিক্ষার  
 পরিমাপ আচারে—ব্যবহারে—সৌজন্মে ।

অন্যদেশে যা একান্ত সত্য, অন্তঃসারশূন্য এ দেশে ঠিক  
 তার উল্টো । এখানে প্রতিভার পূজা নেই, পবিত্র  
 চরিত্রে কলঙ্ককালিমা নিশ্চিত হস্তে কেমন ক'রে  
 লাগাতে হয় আমরা তাই জানি । এখন যেটুকুও হয় বা  
 হচ্ছে তা হয় দায়ে প'ড়ে নয় বিদায়ে !

ঐ যে বনম্পতি-সদৃশ উন্নত ঋজু মানুষটি ক্ষীণ দেহ্যষ্টি  
 নিয়ে দিনের পর দিন কি ভাবে কত দিকে চোখ রেখে  
 কর্মজীবন ও জ্ঞানযোগের তপস্যায় দেহপাত ক'রছেন—উনিই  
 সার পি সি রায়, আচার্য্য রায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়—একাধারে  
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর । আদর্শ কুলীন চরিত্র, আকুশার সাধক,  
 ব্যবহারে অমায়িক, বেশভূষায় অনাড়ম্বর পরিচ্ছন্ন, ভোগে  
 জিতেন্দ্রিয়, ত্যাগে মহিমাম্বিত, সততায় গরীয়ান—একটা  
 কিসের আনন্দে চিন্তাক্রিষ্ট জরাজীর্ণ মুখখানি স্নিগ্ধ উজ্জল ।  
 প্রফুল্লচন্দ্র দেহে-মনে আস্ত বাঙ্গালী । তিনি বিজ্ঞানের  
 মধ্যে কতটা অজ্ঞান তাড়াতে পেরেছেন সে সংবাদ ওস্তাদেরা  
 বলতে পারবেন কিন্তু তাঁর একপানি ছোট্ট প্রাণের কাছে



যে সারাটা বাংলা—না, সারা ভারত কেনা—এ কথা কে না জানে ? যশোরের কই মাছের প্রসিদ্ধি আছে। মাথাটি শরীর অপেক্ষা যথেষ্ট বড়। কেবল মাথাটার বাড়াবাড়ি আজ জগতে কি ছড়োছড়ি এনে দিয়েছে ঘাড়ের উপর যার একটা ঐ বালাই আছে সে অস্বীকার করবে না, কিন্তু প্রাণ কৈ ?

প্রফুল্লচন্দ্রের হৃদয়ের অগ্নিশিখা শুকজ্ঞানকে গলিয়ে সুন্দর

সরস করেছে, সেই অগ্নি সাহায্যে যে তেজ, যে তপস্যা, যে সাহস তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তা বাইরের বৈরাগ্যে নয়, অন্তরের অভিসন্ধিতে নয়—একটা চাকুতা রম্যতা এমনি ফুটে উঠেছে যা করুণার মতো প্রবল আর পবিত্র।

ওদেশ এদেশে প্রফুল্লচন্দ্র সুপরিচিত। তিনি পরের হাত থেকে যা নিয়েছেন, নিজের হাত দিয়ে তার চেয়ে ঢের বেশী দান করেছেন।

## প্রফুল্লচন্দ্র

কুমার শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ রায়

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সপ্ততি বৎসর বয়স পূর্ণ হোলো। আজ এই শুভদিনে সমস্ত বাঙালীজাতি তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করে তাঁকে হৃদয়ের অভিনন্দন জ্ঞাপন কচ্ছে। প্রফুল্লচন্দ্রের সমগ্র জীবনের সাধনা আজ সিদ্ধির গোরবে মগ্নিত হ'য়েছে। আজকের দিনে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার কথা নূতন করে বলবার কিছুই নেই। তাঁর প্রতিভা আজ সমস্ত পৃথিবী স্বীকার কচ্ছে। রসায়নশাস্ত্রে তাঁর মৌলিক গবেষণা তাঁর খ্যাতিকে চির উজ্জল করে রাখবে। বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রফুল্লচন্দ্রের আসন আজ কোথায় তা নিয়ে আর কার মতবৈধ নেই। স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিক গবেষণার গোরবে যারা বিদেশে বাঙালীজাতির সম্মান বৃদ্ধি ক'রচেন, তাঁদের মধ্যে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের দানই সব চেয়ে বৃহৎ এ একরকম অবিসম্বাদিত সত্য। প্রফুল্লচন্দ্রের বেঙ্গল কেমিক্যাল ও খাদিপ্রতিষ্ঠান এই দুইটি কীর্তিস্তম্ভের কথা জানে না এমন বাঙালী নেই বললেই চলে।

“বাণিজ্যে বসতে লক্ষী” এ কথার যথার্থ্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর নিজের জীবনেই প্রমাণ করেন। মাত্র আটশো টাকা মূলধন নিয়ে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের পত্তন করেছিলেন আজ সেই আটশো, পঁচিশ লক্ষ টাকায় দাঁড়ি-

য়েছে। বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্মকালে তার এই বিপুল সম্ভাবনার কথা কে কল্পনা কর্তে পেরেছিলো ? প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর অসামান্য প্রতিভাকে এই নূতন দিকে চালিত করে চাকুরিগত প্রাণ ক্ষীণজীবী বাঙালীদের সম্মুখে যে উন্নত আদর্শ স্থাপন করে গেলেন তার যথাযথ মূল্য যেন আমরা দিতে পারি। এর চেয়ে বড়ো কামনা আজকের দিনে আমাদের আর কিছুই নেই। নিজে অত বড়ো বৈজ্ঞানিক হ'লেও প্রফুল্লচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভাও বড়ো কম নয়। তাঁর রাসায়নিক পরীক্ষাগারে টেষ্টটিউবের পাশাপাশি তিনি সাহিত্য-কলালক্ষ্মীকেও স্থান দিতে ভোলেন নি। বিজ্ঞান চর্চার চেয়ে সাহিত্যরসচর্চায় আনন্দ তাঁর কিছুমাত্র কম নয়।

সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি অমুরাগ তাঁর প্রকৃতিগত। এই দুটি বিভাগেই তাঁর পাণ্ডিত্য ও অমুরাগ যে কত গভীর তাঁর নানা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি একটু মন দিয়ে পড়লেই একথা সম্যক উপলব্ধি কর্তে পারা যাবে। যে কোনো নীরস বিষয়ের অবতারণা ক'রেই তিনি লেখনী চালনা করুন না কেন, তাঁর সরস বর্ণনা-চাতুর্য্যে অনায়াসেই জিনিষটা literary হ'য়ে ওঠে। লেখেন তিনি প্রচুর এবং পড়েনও

তিনি অসাধারণ ; ইংরেজীতে যাকে বলে a voracious reader তিনি তাই। গোটা শরৎচন্দ্রটাই তাঁর একরকম মুখস্থ এ কথা তিনি প্রায়ই ব'লে থাকেন। এ বড়ো কম শক্তির পরিচয় নয়। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভা ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয়ই প্রফুল্লচন্দ্রের সম্বন্ধে শেষ পরিচয় নয়।

বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র, পণ্ডিত মনীষী প্রফুল্লচন্দ্রের চেয়ে মানুষ প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের কাছে কম বিস্ময়ের বস্তু নন। একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে প্রফুল্লচন্দ্রের যে পরিচয়, দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে সেই তাঁর যথার্থ পরিচয়। তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা যে কতো বড়ো একথা বিশ্লেষণ ক'রে বোঝাবার মতো ক্ষমতা আমার আয়তের মধ্যে নেই। তার জন্তে যোগ্যতর লোক তাঁর বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক শিষ্যদের মধ্যে ঢের পাওয়া যাবে। তাঁর সমগ্র জীবনের বিপুল সঞ্চয় তিনি খদ্দর প্রচারকলে ব্যয় করেছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল ও অগ্ন্যাণু কোম্পানীর প্রায় ৫৬০০০ টাকার অংশ তিনি খাদি প্রতিষ্ঠানের জন্তে দান ক'রে গেলেন। খাদি প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব দান করেছেন বলে একটুও অত্যাক্তি হয় না। এতো বড়ো ত্যাগ সমগ্র ভারতবর্ষে আর কটা লোক কর্তে পেরেছেন জানিনে। যেখানেই বন্যাপীড়িত দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদের আর্তনাদ শোনা গেছে তৎক্ষণাৎ প্রফুল্লচন্দ্র মূর্তিমান দাক্ষিণ্যের মতো তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। খুলনার দুর্ভিক্ষে ও উত্তর বঙ্গ প্রাবনের সময় লক্ষ লক্ষ টাকা ভিক্ষা ক'রে তিনি যেমন অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে দুর্গতদের বাঁচিয়েছিলেন, বাংলা দেশের লোক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে চিরদিন এ কথা মনে রাখবে। “আর্তের ছাত্তের বন্ধু” প্রফুল্লচন্দ্রের বিরাট হৃদয়ের কথা, অসাধারণ ত্যাগের কথা চিন্তা কলে অশ্রুসিক্ত আমাদের মস্তক আপনি হয়ে পড়ে। শুধু গহং চরিত্রের গৌরবে সমগ্র জাতির অশ্রু প্রীতি আকর্ষণ এক মহাত্মা গান্ধী ছাড়া আর কেউ কর্তে পেরেছেন ব'লে আমার জানা নেই। কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়, চারিদিক্কার ঢকানিনাদের মধ্যে আগরা প্রফুল্লচন্দ্রের পুণ্যকথা প্রায় বিস্মৃত হ'তে বসেছি। তাঁর সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা আমাদের দেশে হয়নি। এর

একমাত্র কারণই হচ্ছে এই যে, তিনি লোকলোচনের অন্তরাল থেকে কাজ কর্তেই ভালোবাসেন! যশ ও সম্মানের জন কাড়াকাড়ি করা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। নেতা ও দেশপ্রেমির আমাদের দেশে অনেক আছেন ও হবেন কিন্তু এই তথাকথিত দেশহিতৈষীদের সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের গরমিল হোলো এইখানে যে, খ্যাতির সস্তা প্রলোভন তাঁকে কোনোদিন বিচলিত কতে পারে না। শুধু ‘নাম্কা ওয়াস্তে’ বক্তৃতার তোড়ে platform কাঁপিয়ে তোলা, এ তাঁর দ্বারা কোন দিনই হ'য়ে উঠল না। অথচ প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে যোগ নেই এমন একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এই টেই হচ্ছে প্রফুল্লচন্দ্রের বিশেষত্ব। আমাদের এই অভিশপ্ত সমাজের বিধি ব্যবস্থায় যেখানে যত গলদ আছে সেইখানেই তিনি নির্মমভাবে আঘাত করেছেন। যেখানেই যত ভুল আচারের মরুগালুরাশি বিচারের স্রোতপথ গ্রাস ক'রে ফেলতে চায় সেইখানেই তাঁর সত্যবাক্য “ঝলি উঠে থর থড়া সম,” আমাদের ইউনিভার্সিটি শিক্ষার শোচনীয় ব্যর্থতার কথা ব'লে তিনি বার বার আমাদের সাবধানবাণী শুনিয়েছেন। শিক্ষিতের মুখোস্থারী ডিগ্রিদারীদের হাতে শিক্ষার শোচনীয় অপব্যবহার দেখে তাদের ওপর নির্মম তিরস্কার তিনি বর্ণন করেছেন এবং এই মেকী শিক্ষাব্যবস্থার মূলে তিনি কুঠারঘাত কর্তে চেয়েছেন। গভীর দুঃখের সঙ্গে তিনি ব'লে থাকেন “There does not exist a more miserable creature than the average graduate of the Calcutta University. আমাদের সামাজিক পণপ্রথাকে শ্লেষ ক'রে তিনি ব'লে থাকেন Every unmarried youngman is a prospective assassin of Snehelata. তিনি হিন্দুমুসলমানের মিলনকাণ্ডী। তিনি বলেন, Scratch a Bengali Mussalman and you will find him a Hindu অতএব হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে কি ক'রে ভেদবুদ্ধি আসতে পারে তা তিনি বুঝে উঠতে পারেন না। আমাদের সনাতন জাতিভেদ প্রথাকে তিনি আমাদের মুক্তিলাভের সবচেয়ে প্রধান প্রতিপন্থী ব'লে মনে করেন। এই দুর্ভাগ্য-বন্ধন ছিন্ন করবার জন্য কী নির্মমভাবেই না তিনি আমাদের বার বার কষাঘাত করে-

চেন ; “স্বীকার কর্তেই হবে যে জাতিভেদ প্রথার ভীষণ বন্ধনে আমরা আড়ষ্ট হ’য়ে আছি, অধঃপাতে গেছি। এতই অধঃপাতে গেছি যে ধর্মের অভূহাতে, আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়ে আমরা এই প্রথাকে বিশেষতঃ এই ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটাকে বিধিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত ব’লে প্রমাণ না ক’রে আর ছাড়ছি না।” তাঁর ধর্মমত অত্যন্ত উদার। তিনি বলেন, “আমি কোনো সমাজভুক্ত নই। আমি হিন্দুর হিন্দুত্ব, মুসলমানের মুসলমানত্ব, ব্রাত্য-কৃত্রিয়ের ব্রাত্যকৃত্রিয়ত্ব গ্রহণ করি। আমি রাসায়নিক, আমি নিক্তির ওজনে সকলের ভালমন্দ বিচার কর্তে চাই; আমাদের সামাজিক ব্যাধি দূর কর্তে হ’লে আগে diagnosis কর্তে হবে,” ইত্যাদি ইত্যাদি। আজকের এই জাতীয় জাগরণের দিনে, যখন আমাদের দুর্বলতা, ভীকতা, অশিক্ষা ও দারিদ্র্য, যতকিছু দোষ আছে সব নন্দঘোষরূপী বিদেশী গভর্ণমেণ্টের ওপর চাপিয়ে দিয়া স্বরাজের স্তম্ভস্বপ্নে বিভোর হ’য়ে আছি, তখন প্রফুল্লচন্দ্রের বাণী আমাদের ক্ষণে-ক্ষণে বিচলিত ক’রে তুলে—“ভারতবাসী ‘স্বখাদ-মলিলে’ ডুবে মরছে; আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারছে। কোথায় তার অভাব, কোথায় তার দোষ, সমাজের নিষ্ঠুর মুষ্টি কোথায় তার গলা টিপে ধরে তার স্বাসরোধ ক’রে দিচ্ছে,—এসকল কথা বিচার ক’রে বুঝে আপনার পথ আপনিই নির্ধারণ কর্তে হবে। অন্তরের দেবতা না জাগলে শুধু উত্তেজনার জালায় এ দীর্ঘপথ অতিক্রম কর্তে পারা যাবে কি? ছটফটানির একটা গতি আছে কিন্তু তার দৌড় বেশীদূর নয়। মাহুষের উন্নতির পথে যে বাধা তা হয় ভিতরের, নয় বাহিরের। কিন্তু অন্তর যার বাধানির্মুক্ত তার কাছে বাহিরের বাধা কখনও সাংঘাতিক হয় না। অন্তরে সত্যের আলোকে যা গ’ড়ে ওঠে, বাহিরে তার প্রতিষ্ঠা হবেই,—সে কোনো বাধা মানবেনা। অন্তরে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হ’লে বাহিরের অধীনতা ঘুচেবেই। ভারত আজ দুঃখের

অতলস্পর্শ সাগরে ডুবে আছে, উঠতে পারচে না। আমি রাজনৈতিক আন্দোলনের সপক্ষে বা বিপক্ষে কোনো কথা বলবারই উদ্যোগ করছি না; নরম বা গরম কোন দলেরই আমি নই, আবার নরমই হোক আর গরমই হোক যা কিছু আমার দেশকে যথার্থ উন্নতির পথে অগ্রসর ক’রে দেয় তাই আমি পরম পবিত্র বস্তু ব’লে মনে করি।” আজো যদি প্রফুল্লচন্দ্রের এই বাণী আমাদের হৃদয়ঙ্গম না হ’য়ে থাকে তবে আমাদের মুক্তির উপায় স্বয়ং বিধাতাপুরুষেরও বোধ হয় নির্দেশ ক’রে দেবার ক্ষমতা নেই। আজকের দিনে এতোবড়ো সত্যকথা, এতো বড়ো আশার কথা বাঙালীজাতিকে খুব কমলোকেই শোনাতে পেরেচেন ব’লে মনে হয়।

বছরকয়েকের কথা। প্রফুল্লচন্দ্র রংপুরে এসেছিলেন। কলেজ-হোষ্টেলে আমার দোতলার ঘরটিতেও তাঁর পায়ের ধূলো পড়েছিল। বেশ মনে পড়ে তাঁর গালাগাল শোনবার ভয়ে আমার চায়ের সরঞ্জাম অগ্রত্ব লুকিয়ে রেখে এসেছিলুম। কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর বেরোবার সময় আমার পৃষ্ঠদেশে একটি বজ্রমুষ্টি দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। অবিশ্যি আশীর্বাদটা সেদিন একটু তীব্রভাবেই আমাকে উপলব্ধি কর্তে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সরল মনটিকে যেন মুহূর্তের মধ্যে চিন্তে পেরেছিলুম। এই অক্লান্তকর্মী চিরকুমার বৈজ্ঞানিক আরো দীর্ঘকাল বেঁচে থেকে আমাদের প্রাণে উৎসাহ, কর্মে উদ্দীপনা ও মনে বিশ্বাস জাগিয়ে রাখুন—শ্রদ্ধাবনত চিন্তে আজ আমার শুধু এই একটিমাত্র প্রার্থনাই জেগে উঠে।

সদাই তরুণ সাধক কুমার;  
বিরাট হৃদয় আসন ভূমার,  
যুবীর স্বপ্ন শুভের জনক,  
নবীন ভারত সংস্কারক

প্রফুল্লচন্দ্রের পায়ে আজ এই শুভ জন্মদিনে এই অজ্ঞাত সেবকের নমস্কার গিয়ে পৌঁছুবে কি?

## বঙ্গসাহিত্যে প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত বি, এ

বঙ্গীয় কবি ও লেখকগণ যখন কল্পনার উন্মুক্ত আকাশে বিচরণশীল, তখন প্রফুল্লচন্দ্র কঠিন মাটির শক্ত ঢেলার উপর পরিভ্রমণ করিয়া জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত নিজীব বঙ্গবাসীকে আশা ও উৎসাহের বাণী শুনাইয়াছেন। স্বাধীন-কর্মকুঠ, চাকুরী-গতগ্রাণ বাঙ্গালী তাঁহার অমৃতময়ী আশার বাণী শ্রবণ করিরা আজ কর্মক্ষেত্রে নিরলস ও অধ্যবসায়ী হইয়া উঠিয়াছে।

প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানের প্রয়োগ-শালায় তিনি ধ্যান-নিরত তপস্বীর ন্যায় সর্বদা গবেষণায় নিমগ্ন। এমতাবস্থায় বাঙ্গালীর দুঃখময় দৈনন্দিন জীবনের সংবাদ লইবার ও সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ ও সুবিধা তাঁহার অতি অল্পই ছিল। কিন্তু তাঁহার অসামান্য উদার হৃদয়ের স্বাভাবিক স্বদেশ-হিতৈষণা তাঁহাকে সংসার-কোলাহল বিহীন বিজ্ঞানাগার হইতে গ্রাসাচ্ছাদনের ভয় কাতর কোলাহল মুখর কঠোর বাস্তব জগতে টানিয়া আনিয়াছে। সেখানে ব্যথিতের বিষম বেদনায় হৃদয়ের রক্ত-কমল তাঁহার শতধা বিদীর্ণ হইয়াছে। তাই, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আজি সারস্বত-সাধনায় আপনার অগ্নান আসনখানি রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যে দিক দিয়ে বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর পতনের সূত্রপাত হইয়াছে সেই জাতিভেদ, পাতিত্য-সমস্যা, অমানুষিক অস্পৃশ্যতা, অন্ন-বস্ত্র সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে প্রফুল্লচন্দ্র লেখনী চালনা করিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে বঙ্গসাহিত্যে “বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার,” “নব্য রসায়নীবিজ্ঞা ও তাহার তাৎপর্য,” “অন্ন সমস্যা,” “সমাজ-সংস্কার সমস্যা,” “অধ্যয়ন ও সাধনা,” “জাতিভেদ” ইত্যাদি অভিনব সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। বাঙ্গালীর ও ভারতবাসীর মর্মহৃদয় কল্পণ কাহিনী বঙ্গসাহিত্যকে রক্তিম-রেখায় অমরজ্বিত করিল। প্রবন্ধ-সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ়

চিন্তা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া বঙ্গীয় পাঠকগণ বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইল। এই সমস্ত প্রবন্ধ-পুস্তিকার ক্ষীণায়তনের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও বিবিধ তথ্যের যে তেজস্বিনী আলোচনা আছে তাহা প্রকৃতপক্ষেই বঙ্গীয় সাহিত্যভাণ্ডারের অপূর্ণ সামগ্রী।

“বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার” যখন প্রথম প্রকাশিত হইল তখন বাস্তবিকই বঙ্গসাহিত্যে গভীর আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই পুস্তকখানি তথাকথিত অভিজাত্য সম্প্রদায়ের অনেকের ক্রটিবিশিষ্ট না হওয়ায় তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা তেমন আকর্ষণ করিতে পারে নাই। অথচ গ্রন্থকারের সাহিত্য-প্রতিভা ও শিল্পের মর্যাদা কেহই উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র অঙ্গগিতে বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে বরণীয় হইয়া উঠিলেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রফুল্লচন্দ্র নিতান্তই বিপ্লবপন্থী। নিফল পাণ্ডিত্য যখন হিন্দুসমাজের অধঃপতনের কারণস্বরূপ হইয়াছে তখন প্রফুল্লচন্দ্র তাহাকে নিশ্চয়ভাবে কষাঘাত করিয়াছেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্রকে সর্বদা অশ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। বৈজ্ঞানিকের স্পষ্ট ও দৃঢ় যুক্তিময় বিচারের দ্বারা হিন্দুদিগের জাতীয় অবনতির কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রে ইহাও আছে যে, যুক্তিহীন বিচারের দ্বারা ধর্মহানি হয়, প্রফুল্লচন্দ্র তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। যুক্তিহীন শাস্ত্রের অনুশাসন যে সর্বদা মানিয়া লইতে হইবে প্রফুল্লচন্দ্র একথা কখনও স্বীকার করেন নাই। শাস্ত্রে আছে—

“কেবলং শাস্ত্রমাত্রিত্য ন কর্তব্য-বিনির্ঘয়ঃ।

যুক্তিহীনে বিচারেতু ধর্মহানি প্রজায়তে ॥”

প্রফুল্লচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস এই অমূল্য উপদেশ অনুসারে চলিবার ইচ্ছা ও সাহসের অভাবে সমাজ গতানুগতিক ভাবগুরু হইয়া স্বাধীন চিন্তা ও বিচারকে নির্বাসন করিয়া



অধঃপতিত হইয়াছে। ইহার ফলে কুসংস্কার, কুপ্রথা ও অমানবোচিত আচার ব্যবহার সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গলিত আবর্জনার গায় পরিবেষ্টন করিয়া আছে। প্রফুল্ল-সাহিত্য এই সমস্ত শোচনীয় দুঃখের পসরাই বহন করিয়া আনিয়াছে।

“বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহারে” হিন্দু সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও অবনতির যে তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে ইহাতে প্রফুল্লচন্দ্রকে সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক বলিয়াই ধারণা হয়। বস্তুতঃ তাঁহার উক্ত পুস্তকখানিতে হিন্দু সভ্যতার একখানি উজ্জল চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুস্তকখানির ভাষাও নিতান্ত প্রাঞ্জল ও অনায়াস। ভাষার এমন তেজস্বিনী দ্রুতগতি বঙ্গসাহিত্যে দুই চার জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরই লেখনীমুখে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

আইন-নিগড়াবদ্ধ বাঙ্গালীর উর্ধ্বমস্তিষ্কের অপব্যবহারের ফলে মানুষের সহিত মানুষের ভেদনীতিই সৃষ্টি করিয়াছে। অধ্যবসায়ে অগ্নিশক্তিসম্পন্ন জগতের শিল্পকুশল জাতির সহিত শক্তি-পরীক্ষায় তাহারা প্রতি পদে পরাজিত হইয়া বিশ্বের নিকট হেয় ও অবজ্ঞাত হইয়াছে। কিন্তু ইউরোপ প্রভৃতি দেশে আইন-নিগড়ের নাগপাশ মুক্ত হওয়ায় প্রতিভাদেবী বিভিন্ন মূর্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। “বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার” গ্রন্থের একস্থানে ফ্রান্স দেশকে লক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন—

“তাই ফরাসীজাতি যখন বিলাস ও রাজকীয় অত্যাচারের পক্ষে পড়িয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল, তখন রুশোর সাহিত্যিক প্রতিভা তাহাদের মধ্যে নবভাবের প্রচার পূর্বক ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব সৃষ্টি করিয়া স্বজাতিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছিল। আবার যখন বৈপ্লবিক সৈন্যগণ রাজপক্ষীয়গণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ পর্যুদস্ত হইতেছিল, তখন ইঞ্জিনিয়ার কার্ণো তাঁহার নব ব্যূহ রচনা-প্রণালী আবিষ্কার করিয়া বিপক্ষের প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। আবার যখন বিপক্ষগণ ফ্রান্সের বারুদ প্রস্তুত বন্ধ করিবার জন্য বিদেশ হইতে সোয়ার আমদানী বন্ধ করিল, তখন বৈজ্ঞানিক গোবর গোমূত্র প্রভৃতি জীব দেহাবশেষ হইতে সোরা প্রস্তুত করিয়া ফ্রান্সকে রক্ষা করিলেন।”

এইরূপে ইউরোপের বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সাধনা সমগ্র জাতির দুর্ভিক্ষপাকে মুক্তির পথ আবিষ্কার করিতে নিয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষের পক্ষে সাহিত্যসাধনা অধিকাংশ সময়ে মানুষের ভগবানকে উপেক্ষা ও ঘৃণা করিয়াছে। এইজন্য রঘুনন্দন ও কুঙ্কুম ভট্টের অপূর্ণ মনীষা প্রফুল্লচন্দ্রের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে নাই। বাঙ্গালীর প্রতিভাশ্রোত বহুযুগ ধরিয়া তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথে প্রবহমান হইয়া বাঙ্গলার মহা মনস্বীগণ শুধু ছোঁয়া খাওয়ার মীমাংসাতেই স্বীয় প্রতিভা ব্যয়িত করিয়াছেন। তাই বাঙ্গালীকে স্বাধীন চিন্তাক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করাইবার জন্য প্রফুল্লচন্দ্র জীবনব্যাপিনী সাধনায় শরীর ক্ষয় করিতেছেন। ইংলণ্ডে প্রবাসকালে জাপানী ছাত্রদের সারগর্ভ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে লণ্ডন ও বার্লিনের বৈজ্ঞানিক পত্রগুলি পূর্ণ হইতে দেখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াই তিনি বিজ্ঞানের গভীর গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে বিজ্ঞানের বৃত্তি প্রজ্জ্বলিত করিতে তাঁহার প্রাণান্ত সাধনা কথঞ্চিৎ সফল হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত, যতীন্দ্রনাথ সেন, হেগেন্দ্রকুমার সেন, নীলরতন ধর, রসিকলাল দত্ত, বিমান বিহারী দে, জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী, মেঘনাথ সাহা প্রভৃতি তাঁহার কৃতী ছাত্রগণ মৌলিক প্রবন্ধে ইউরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক পত্রগুলির স্তম্ভ পরিপূর্ণ করিয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের শ্রদ্ধা ও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। প্রফুল্লচন্দ্র এবং ইহাদের অনেকে বাঙ্গলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়া বাঙ্গালীর বিজ্ঞান-সাধনা সাধারণের দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন। সুতরাং প্রফুল্লচন্দ্রের অক্লান্ত অধ্যবসায়ে বঙ্গসাহিত্যের একটা অবয়ব আজ সমুজ্জল ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার রচিত “নব্যরসায়নী বিজ্ঞা ও তাহার তাৎপৰ্য্য” ও “History of the Hindu Chemistry” সাহিত্যক্ষেত্রে অমূল্য সম্পদ।

তাঁহার “অন্ন সমস্যা” বাঙ্গালীর চাকুরী জীবনের শোচনীয় কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যে আমাদেরকে নিতান্ত মেরুদণ্ড বিহীন ও অকর্মণ্য করিয়া তুলিতেছে প্রফুল্লচন্দ্র তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে

পারিয়াছেন। এইরূপ স্ফুটিত ও সারগর্ভ প্রবন্ধ বঙ্গ-সাহিত্যে প্রকৃতপক্ষেই বিরল। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বাঙ্গালীর শিক্ষা দীক্ষার ও অন্ন সমস্যার প্রকৃত কারণ নির্ণীত হইয়াছে। ষাহারা বি. এ, এম. এ. পাশ করিয়াও সংসারের তপ্ত সৈকতে অন্নবস্ত্রের অভাবে হাহাকার করিতেছিলেন এই পুস্তকখানি সেই সকল পথভ্রষ্ট পথিকের একমাত্র আশ্রয়-স্থল। পুস্তকখানি প্রচারিত হইবার পর বিষয় বেকার অবস্থায় পতিত অনেক শিক্ষিত যুবক ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছেন। এবং অনেকের চেষ্টা সাফল্যে মণ্ডিত হইয়াছে। অনেক নিরক্ষর ও অল্প শিক্ষিতব্যক্তি মাড়োয়ারী, ভাটিয়া ও দিল্লীওয়াল প্রভৃতি ব্যবসায় বুদ্ধিধারা অনুপ্রাণিত হইয়া দারিদ্র্য-নিবারণের নূতন পথ আবিষ্কার করিতেছেন।

“অন্নসমস্যা,” “জাতিভেদ,” “সাধনা ও সিদ্ধি,” “অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ” প্রভৃতি পুস্তিকাগুলি যেন বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারের এক একটি উজ্জল রত্ন। পুস্তিকাগুলির বিষয়-বস্তু এমন নৈমিত্তিক অথচ সারবান্ যে পাঠক যাত্রেরই কল্পনা-প্রবৃত্তিকে সজোরে বাস্তব জগতের সম্মুখে টানিয়া আনে। পাঠক যখন সাহিত্যের ভাবজগতের বস্তু বিহীন রাজ্যের পথিক, যখন তাঁহার সবল সংস্থানের জন্য

আঁকড়াইয়া ধরিবার কিছুই থাকে না—তখনই প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধ মুক্তাবলী তাঁহাকে এই দৃশ্যজগতে—এই মাটির পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হয়। এখানে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দুঃখময় নিরাশার অন্ধকারে যখন নিমজ্জিত হন তখন প্রফুল্লচন্দ্রের অভিনব বাস্তব চিন্তাধারাগুলি তাহার ব্যাকুলচক্ষে শান্তির অমূল্য প্রদান করে—তাঁহাকে শ্রেয়ের স্নিগ্ধ পথ নির্দেশ করিয়া দিতে পারে। এইজন্য বঙ্গসাহিত্যের পূর্ণ প্রগতির ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে।

প্রফুল্লচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টি সকল স্থানে শিল্প-সৌন্দর্যকে যেন তেমন আগল দিতে চায় নাই। তাঁহার সাহিত্য-সাধনা প্রয়োজনকে লইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য শূন্যশিল্পকলা সেখানে তেমন জমাট না বাঁধিলেও অন্নবস্ত্র সমস্যা-সমাকুল, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা-দোষ-দীন বিরাট হিন্দু জাতির মুক্তির বাণী তাহাতে উদ্ঘোষিত হইয়াছে। সেখানে মুচী মেথর কোল ভীল সাঁওতাল, ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়—অস্পৃশ্য ও অনাদৃত. মুক ও বধির, দীন ও দরিদ্র মহান নহুয়ালাভ করিয়া জগতের ধূলিধূসর প্রসর কর্মক্ষেত্রে জয়যুক্ত হইবার আশ্বাস ও অভয়মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে !

## আচার্য্য প্রশস্তি

শ্রীহরিগোপাল সরকার.

হে চির-কুমার হে চিরতরুণ হে সুধী সাধক তাপসরাজ,  
শুভ সপ্ততি বর্ষে তোমার মস্তকেপর' বিজয় তাজ।  
শত সাধনায় তুমি যে সাধক হিয়া জয়ী তুমি দীনের ত্রাণ  
শত সমস্যা আধারে অন্ধ বাঙালীকে কর চক্ষুস্থান।  
বিজ্ঞানবিৎ পতিতের ত্রাতা, স্বদেশ প্রেমিক, পূজারী তুমি,  
ঈক্ষণাগারে, ক্ষুধিতের ঘরে, দীন যেথা তব কর্মভূমি।

নব রসায়ন ডেকেছিল তোমা জ্বালিতে জ্ঞানের দিব্য ভাতি,  
 গুরু ড্যালটন মোণ্ডলিফের উর্দ্ধে উচ্চ আসন পাতি ।  
 রহিতে পারিতে বিজ্ঞানাকাশে জ্ঞানের জ্যোতিষ্ক জ্যোতির্ময়,  
 জ্ঞানীগুণিগণ যুগে যুগে তব মুক্ত কণ্ঠে গাহিত জয় ।  
 বিজ্ঞান চেয়ে বড় যে সত্য মরামানুষেরে মানুষ করা,  
 মোহের আঁধার নাশিতে জীবের জীবনের দীপ জালিয়া ধরা ;—  
 তাই সে সবারে হেলায় ত্যজেছ তুচ্ছ করেছ কীর্ত্তিমান,  
 কাঙালিনী মার নয়ন সলিলে গলিল তোমার মহান প্রাণ ।  
 জীবন্মূর্ত্তেরে প্রাণদান ছাড়া তাই তব কোন কামনা নাই,  
 অন্নবস্ত্র স্বাস্থ্য শক্তি দিতে পারে হেন সাধনা চাই ।  
 হে শব-সাধক এ শব-সাধনা স্বেচ্ছায় তাই নিয়েছ তুলি,  
 আপনারে তুমি দিলে বলিদান আপন নামের গরিমা ভুলি ।  
 আপনারে ভুলি ভোলানাথ সে যে চিরকল্যাণ শম্ভু শিব,  
 আপনায় ভুলি তোমারও সাধনা বাঁচাইতে শত লক্ষ জীব ।  
 রসায়নে তুমি জ্বালিতে যে আলো তার বাড়া আলো করেছ দান,  
 তথ্যপূর্ণ তোমায় সত্যে লভেছি আমরা নবীন প্রাণ ।  
 জ্ঞান শলাকায় খুলেছ হে গুরো মোদের অন্ধ নয়ন পাত  
 নব প্রেরণায় জাগিছে বাঙালী আজি বাঙলায় সুপ্রভাত ।  
 ঐ “বাঙলার কেমিক্যালখানা” বঙ্গলক্ষ্মী যন্ত্রালয়,  
 অন্নবস্ত্র স্বাস্থ্য বিতরি গাহিছে তোমারই জ্ঞানের জয় ।  
 তব আদর্শে লভিব আবার অন্নবস্ত্র স্বাস্থ্য সুখ,  
 জগতের মাঝে দাঁড়াব আমরা গর্বোজ্জ্বল হাস্য মুখ ।  
 ওগো জ্ঞান-গুরো ঋষি ঋত্বিক যুগ-যজ্ঞের যোগ্য হোতা !  
 তোমার মুখের অমৃত মস্ত্রে বাঁচিবে হাজার হাজার শ্রোতা ।  
 আজি শুভদিনে দিতে ও চরণে নাহিক যোগ্য অর্থভার,  
 দীন কবি আমি, শ্রদ্ধা আনত হৃদয়ে জানাই নমস্কার ।

## বীর-পূজা

শ্রীসখানাথ দাশ

ভারতবর্ষ ত্যাগ-প্রধান দেশ। পশ্চিম যখন ভোগবিলাসের প্রচুর আড়ম্বরের মধ্যে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়া সার্থকতার পরিপূর্ণ স্বপ্ন দেখে, ভারতবর্ষ তখন বৈরাগ্যের কমনীয় জ্যোতির মধ্যে নিজের সম্ভা সম্পূর্ণ প্রতিফলিত দেখিতে পায়। তাই দেখিতে পাই দেশের মহাদুর্দিনে যে সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মভূমির লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করতঃ তাহার জয়পতাকা উর্দ্ধে তুলিয়া নিন্দুকের চিত্তে বিশ্বয়ের চমক লাগাইয়াছেন তাঁহাদের জীবনের মধ্যে মূর্তি হইয়া উঠিয়াছে এই ত্যাগ-সাধনা—তাই দেখি সবরমতীর মহাঋষি কটিবস্ত্র হইয়া ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতেছেন, যুগাবতার চৈতন্য গেরুয়া পরিয়া বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সার্বজনীনতার মন্ত্র বিলাইয়াছেন, অর্দ্ধজীবন ভোগবাসনার মধ্যে নিজেকে ভাসাইয়া দিয়াও শেষজীবনে দেশবন্ধু দেশসেবায় আপনাকে বিলাইয়া দিলেন। ভারতবর্ষে এই ত্যাগেরই জয় জয়কার। ভোগে ও সংযমে, আসক্তি ও বৈরাগ্যে এক অপরূপ মিশ্রণই ভারতবর্ষের ত্যাগকে একটি স্বতন্ত্র মূর্তি দিয়াছে। ভারতবর্ষ শিখাইয়াছে—‘সংসার রাগিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।’

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বেলায় তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ভারত তাহার চিরদিনের স্বপ্নকে আর একবার প্রফুল্লচন্দ্রের মধ্যে সত্য বলিয়া দেখিয়াছে, তাঁহাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইয়াছে।

স্বেচ্ছাবৃত্ত দারিদ্র্য ইহার মাথায় গৌরবের মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। সংসারের ভোগবাসনার মায়ায় ইহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই, যৌবনের সবুজ স্বপ্ন ইহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই, ত্যাগ নিরাসক্তি বৈরাগ্যকেই ইনি বরমাল্যরূপে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন। ‘কর্মের উচ্ছল উর্ধ্ব’ ইহার রক্তে রক্তে যে দোলা লাগাইয়াছে, সেই দোলায় ইনি সারাজীবন ধরিয়া ঢুলিতেছেন। জীবনের কোন শুভমুহুর্তে

দেশের আর্তনাদে তিনি চমকাইয়া উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়াছিলেন—

“ওই যে দাঁড়িয়ে নতশির

মূক সবে স্নান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর  
বেদনার করুণ কাহিনী, স্বপ্নে যত চাপে ভার  
বহি চলে মূহু গতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার।

\* \* \* \*

শুধু দুটি অন্ন খুটি’ কোনমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ  
রেখে দেয় বাঁচাইয়া; সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে  
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে  
দরিদ্রের ভগ্নানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে  
মরে সে নীরবে।”

এই দরিদ্র নিরন্ন নিঃসহায় দেশবাসীর পরিত্রাণের উপায় তখন রবীন্দ্রনাথের মতোই তাঁহার বক্ষে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল—

অন্ন চাই প্রাণ চাই আলো চাই চাই মুক্ত বায়ু,  
চাই বল চাই স্বাস্থ্য আনন্দ-উজ্জল পরমাণু  
সাহস-বিস্তৃত বন্ধ-পট।”

এই আর্ত ব্যথিতদের ত্রাণ করাই তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। যে কোন উপায়ে তিনি দেশবাসীর পরিত্রাণলাভের পরিপোষক বলিয়া জানিয়াছেন তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন দেশকে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইলে স্বাবলম্বী হইতে হইবে, তাহার নিজের শিল্পবাণিজ্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে, নিজের কারখানাজাত দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে, সাগরপারে বস্তা বস্তা টাকা নির্কাসিত করিলে চলিবে না, তাই চরকার প্রচলন ও খদ্দেরের প্রচার ও কুটির-শিল্প প্রবর্তনই তাঁহার আমরণ সাধনা। “স্বদেশী” তাঁহার সাধনার মন্ত্র। এজ্ঞা তিনি তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য অকাতরে বিলাইয়া



দিয়াছেন, কাঙ্গাল সাঙ্গিয়াছেন, কিন্তু বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হন নাই। তিনি জানেন বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বর্তমান জগতের জাতিসমূহকে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে হইলে বিজ্ঞানকে অস্ত্র করিয়া ব্যবহার করিতে হইবে। তাই বিজ্ঞানচর্চা তাঁহার তপস্যা, বিজ্ঞানে তিনি নিজের অনেকখানি বিলাইয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন। রসায়ন শাস্ত্রে বিবিধ কৃতিত্বপূর্ণ আবিষ্কার তাঁহাকে রসায়ন জগতে যুগান্তর আনয়নকারী বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। নিজের ক্রেশোপার্জিত হাজার হাজার টাকা তিনি অনায়াসে হাস্যমুখে বিজ্ঞান কলেজে বিজ্ঞানের উন্নতিমানসে বিলাইয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার জীবনের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গেলে আমরা বলিব দেশোপকার ও বিজ্ঞানানুশীলন। পরোপকারকে তিনি জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কত নিরন্ন অভাবগ্রস্ত, নিঃসহায় যে তাঁহার নিকট হইতে নিজের ভবিষ্যৎ মঙ্গলপন্থা খুঁজিয়া পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা স্বকঠিন। এই মঙ্গলালোকোদ্ভাসিত সদানন্দ মুখখানির দিকে চাহিলে, অতি নীচাশয়েরও মুখমণ্ডল ত্যাগ-গরিমায় অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। যে তাঁহার সঙ্গলাভ ক্ষণকালের জন্তও করিয়াছে তাহারই মানস-পটে এই ত্যাগ-দীপ্ত পুণ্যচরিতের স্পর্শ চিরদিনের জন্ত মুদ্রিত হইবে। প্রফুল্লচন্দ্রের কথা মনে করিতে গেলেই Rupert Brooke এর সেই অগর কবিতাটি মনে আসে। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে আত্মদানকারী সৈনিকদের সম্মানে Brooke লিখিয়াছেন—

These laid the world away, poured out  
the red—  
Sweet wine of youth ; gave up the years  
to be.....unhoped Scene,  
That men call age ; and those who would  
have been  
Their sons, they gave, their immortality.”

একটু মানে ঘুরাইয়া দিলেই প্রফুল্লচন্দ্রের বেলায়ও এই উক্তির সার্থকতা দেখিতে পাই। তিনি বিশ্বাসপূর্ণ শান্তিময় বার্ককোর মোহ পরিত্যাগ করিয়া আজও যুবকের মতো পরি-

শ্রম করিতেছেন। সম্মানের কাছে ‘মৃত’ হইবার লোভ তাঁহার দেশসেবার আগ্রহের নিকট পরাক্রম মানিয়া লইয়াছে। তিনি চিরকুমার, ত্যাগে, দৃঢ়-সঙ্কল্পে, চরিত্রবলে দ্বিতীয় ভীষ্ম। সংসারের সুখ সম্ভোগ তাঁহার জীবনে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, যৌবনে স্মৃষ্টি মত্তের মতো রক্তের প্রতিবিন্দু তিনি দেশসেবায় নিঃশেষ করিয়াছেন

প্রফুল্লচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে তাঁহার জায় দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে, তাঁহার জায়—‘আমার দেশ, আমার জাতি, আমি আমার দেশের মুক্তি চাই, কল্যাণ চাই’ ভাবিতে হইবে।

ভীষ্ম, শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধ, অশোক হরিশ্চন্দ্র ইহার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। ইহার তুলনায় আমরা এত নগণ্য যে ইহার নাম করিবার পর্যন্ত অধিকার আমাদের নাই। আমাদের সম্মুখে আজ তিনি যে আদর্শ ধরিয়াছেন, তাহাকে একান্ত আপনার বলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিতে হইবে। ইহার অনুসৃত পথ লক্ষ্য করে, আমাদের সম্মুখে অগ্রসর হইতে হইবে।

প্রফুল্লচন্দ্র দেশের লুপ্ত গৌরব, লুপ্ত আদর্শ পুনরুদ্ধারের মহান প্রয়াস পাইয়াছেন, পশ্চিমের গায়াপাশ হইতে ভারতের ভাববিলাসী প্রাণকে ফিরাইয়া আনিয়া নিজ আদর্শের উপর তাহাকে শ্রুত করিয়াছেন। ভারত আবার তাহার হারানো পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে, নিজের গৈরিকপতাকা উর্দ্ধে উজ্জীযমান করিয়া ভোগদৃষ্ট পশ্চিমের সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাড়াইয়াছে। Brooke এর আরো কয়েকটি লাইন এখানে তুলিয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছে।

“He has brought us, for our dearth,  
Holiness lacked so long and Love and Pain,  
Honour has come back, as a king to earth,  
And paid his subjects with a royal wage ;  
And Nobleness walks in our ways again ;  
And we have come into our heritage.”

আজ তাঁহার সপ্ততি বৎসর পূর্ণ হইল। এই শুভদিনে তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের বিশ্বাস-শ্রদ্ধা-মুগ্ধতা-বিমিশ্রিত নমস্কার জানাই।

## নমস্কার

শ্রীকুমুদ ভট্টাচার্য্য

১

ছাত্র যারা ভক্ত তোমার তোমায় করে অর্ঘ্য নিবেদন,  
জ্ঞানের গুরু, বিদ্যালয়-বিশ্বে তোমার শিষ্য অগণন।  
দেশের 'পরে দৃষ্টি তোমার খাদি এবং চরকা তোমার ব্রত,  
হাজার সেবক, হে দেশপ্রাণ, তোমার পায়ে করুছে মাথা নত।  
মসীজীবী বাঙালীয়ে বৈশ্য হওয়ার মন্ত্র দিলে কাণে,  
দলে দলে তরুণরা আজ তাইতে ছোট্ট ব্যবসায়ের পানে।  
শুদ্ধচেতা ব্রহ্মচারী বুদ্ধ সম সিদ্ধ আপন-ভোলা,  
গৃহবাসী হে সন্ন্যাসী, তোমার তরে সবার দুয়ার খোলা।  
আজো তোমার শীর্ণ দেহে কর্ম-যোগের প্রতীক তুমি খাঁটি,  
তোমায় পেয়ে ধন্য হ'লো নতুন ক'রে বাংলা দেশের মাটি।

২

আমি তোমার ছাত্র নহি—ধার ধারিনে বৈজ্ঞানিকতার,  
রসের কদর বুঝবো তোমার, রাসায়নিক, নেই সে রসধার।  
খাদি আমার নয় পরিধান, চরকা আমার হয়নি করগত,  
তোমার হাজার চেলার পাশে দৃষ্টি আমার লজ্জা অবনত।  
ব্যবসায়ের ফন্দী ফিকির মগজে মোর একটু নাহি মেলে,  
আজো ব'সে আপিস গৃহে চলুছি কেবল কলম ঠেলে ঠেলে।  
ব্রহ্মচারী চাইনি হ'তে—এই বয়সেই হোলেম কৃতদার,  
যোগ্য তোমার শিষ্য হবার কোনই আমার নেইকো অধিকার।  
কর্ম আমার নেই কো কিছু—কেবল আমার আপন কর্ম বিনে  
তুচ্ছ চায়ের মায়া—তা'রেও ছাড়িনি কো তোমার নিষেধ চিনে।

৩

তবু আমি ভক্ত তোমার ঠাই দিয়েছি তোমায় মনের তীরে,  
পরাণ দিয়ে ভালোবাসি তোমার প্রাণের চপল শিশুটিরে।  
শিশুর মতোই সহজ তুমি, সবার প্রতি তেমনি তোমার টান,  
তেমনি সরল, তেমনি উদার, শিশুর মতোই তেমনি খোলা প্রাণ।  
শিশুর মতোই শুভ্রশুচি, বেশে ভূষায় তেমনি অবিলাসী,  
বন্ধে প্রেমের ঝরণা তোমার, ওষ্ঠে তোমার নিত্য মধুর হাসি।  
আজকে তোমার জয়ন্তীতে শিষ্য সেবক তোমার যেথা যত,  
তোমায় তা'রা জানায় পূজা—কীর্তিগাথা গাইছে তোমার শত।  
অযোগ্য এ ভক্ত তোমার লজ্জা মানে গাইতে সে-সব গীতি,  
অখ্যাত এই প্রেমিক জনার গ্রহণ কর, মুগ্ধ প্রাণের প্রীতি।

## দুই দিন

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বোধ হয় ১৯১৪ সালের কথা।

নতুন কলিকাতায় এসেছি, খুব কম লোককেই চিনি। একদিন হঠাৎ খেয়াল গেল ডাক্তার রায়ের সহিত আলাপ করা চাই। তাঁর কথা আমি স্কুলে থাকবার সময় শুনতুম খগেন দার কাছে—খগেনদা (এখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক) আমার বছর তিনেক আগে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় এসেছিলেন, ফিরে গিয়ে এখানকার নানা উল্লেখ যোগ্য অবশ্য-দ্রষ্টব্য বস্তুর তালিকার সঙ্গে ডাক্তার রায়ের নামও করেন। বোধ হয় সেই থেকেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছাটা মনের মধ্যে প্রস্তুত ছিল।

সন্ধান নিয়ে জানলুম ডাঃ রায় বেঙ্গল কেমিক্যালের বাড়ীতে থাকেন—তখন বেঙ্গল কেমিক্যালের আপিস ছিল আজকাল যেখানে ‘মোহাম্মদী’র আপিস ওই বাড়ীটাতে।

গ্রীষ্মাবকাশের ঠিক আগে, কলকাতায় খুব গরম। অত বড় লোকের সঙ্গে দেখা কর্তে যাচ্ছি, ভয়ে ভয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে গেলুম উঠে। ছোট্ট একটা ঘরে একটা ছোট্ট খাটে কে একজন শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলেন, পায়ের শব্দ শুনে শয্যাশায়ী লোকটি মুখের সামনের থেকে বইখানা সরিয়ে ফেলে আমার দিকে চেয়ে বলেন—কিরে, তুই আবার কে রে? আয়, আয়—

মনে হোল এ সম্ভাষণ অদ্ভুত। এর মধ্যে যে প্রাণখোলা আন্তরিকতা আছে, তা পাড়ারগায়ে স্নেহময় খুড়া জ্যাঠার নিকট থেকে হয়তো লাভ করা সম্ভব ছিল কিন্তু কলকাতা সহরের প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন নামজাদা অধ্যাপক ও বৈজ্ঞানিকের মুখে এ ধরণের আদরের ডাক অদ্ভুত বলেই মনে হোল। তার পর গিয়ে কাছে বসলুম।

নিকটতম আত্মীয়ের মত ডাঃ রায় কত কি প্রশ্ন করলেন একটু পরে ডাক দিলেন—বৃন্দাবন—বৃন্দাবন—

বৃন্দাবন তাঁর সে আমলের চাকর ছিল। বৃন্দাবন ঘরে ঢুকলে ডাঃ রায় তাকে বলেন এই বাবুকে এক গ্রাস সরবৎ করে দাও।

এ কথাটাও আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকলো। সবে পাড়াগাঁ থেকে এসেছি আমার নিজের সম্বন্ধে বাবু বলতে কখনও কাউকে শুনিনি, তা আবার সার পি সি রায়ের মুখ থেকে এ ভাবে শুন্বো কে স্বপ্নেও এ কথা ভেবেছিল? আমাদের দেশের স্কুলের খার্ড পণ্ডিত মশায়ও চাকরের সামনে আমাকে এতটা সম্মানিত কর্তেন না যে!

আসবার সময় ডাঃ রায় বলেন—রবিবারে তোর এখানে নেমস্তন্ন রৈল, দুপুরে খাবি।

করপোরেশন স্ট্রীটে কাকার মেসে এসে উঠেছিলাম। সেখানে আমায় সমবয়সী দু তিনটি ছেলে থাকতো—কেউ পড়তো, কেউ চাকরী করতো—আর সব কেরাণী বাবুর দল, তাঁদের বয়স বেশী। আমি ছেলেদের দলে কথাটা সগর্বে প্রচার করে বেড়ালুম। কেউ বিশ্বাস করল, কেউ করল না। রবিবারে বেলা এগারোটার সময় ডাঃ রায়ের ওখানে গেলুম। সেদিন গিয়ে দেখি খুব ভিড় ঘরটাতে। এক ভদ্রলোক (নাম মনে নেই) জার্মানি থেকে (তখন যুদ্ধ বাধে নি, সামনের আগষ্ট মাসে বাধল) চামড়ার কাজ শিখে এখানকার কোন্ ট্যানারিতে বড় চাকরী পেয়েছিলেন—তিনি তাঁর জার্মানির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন, আমি সসম্মানে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ তাঁর গল্প শুনলুম।

তিনি বলছিলেন—অনেক সময় যখন বুঝতে পারিনে চামড়াটা ঠিক তৈরী হয়েছে কি না, তখন একটুকরো মুখে ফেলে দেখি—

আমার ভারী খারাপ লাগলো কথাটা। মুখে আবার চামড়া ফেলে দ্যায় কি কোরে! নতুন তখন দেশ থেকে এসেছি কি না!

অনেক বেলায় খেতে বসলুম। ডাক্তার রায় একটা ছোট মার্কেলের টেবিলে, আমি মেজের ওপর। কিন্তু খাবার খালা দেখে নিরাশ হলুম। একটু আলু ভাতে, তার ওপর বৃন্দাবন সামান্য একটু মাখন দিয়ে গেল। নিরামিষ তরকারী, ভাল ও মাছের ঝোল। এত বড় একজন নামজাদা লোকের বাড়ী নিমন্ত্রণে অনেক উপাদেয় দ্রব্য খেতে পাওয়া যাবে আশা করেছিলুম, বিশেষ তখন বয়স অল্প, কিন্তু এ আবার কি নিমন্ত্রণ খাওয়া? আমাদের গ্রামে একজন গরীব লোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণেও এর চেয়ে ভাল খাওয়ায়।

ডাক্তার রায় বলেন—মাখন আর আলুভাতে, ওঃ, there is nothing like this under the heeaven—বেশ করে মেখে নে, মেখে নে।

মনে মনে ভাবলুম আহা ভারী তো, এ আমি অনেক খেয়েছি বাড়ীতে—বাড়ীর সরের টাটকা ঘি ও আলুভাতে এর চেয়েও ভাল লাগে।

আচার্য্যদেবের আহারীয় তালিকা সেদিন যে এক

লোভী নির্বোধ পল্লীবালকের রসনা পরিতৃপ্ত করতে পারে নি একথা আজও মনে হলে হাসি পায়।

বিকলে গড়ের মাঠে বেড়াতে গেলুম ডাঃ রায়ের সঙ্গে। গাড়ীতে আর কেউ ছিল না। শুধু তিনি আর আমি। তিনি বড় বড় বাড়ী দেখিয়ে বলতে লাগলেন—এই দ্যাখ এটা গ্রাণ্ড হোটেল, ওটা হোয়াইটওয়াশ লেডল'র দোকান, ওটা অমুক—আমি তার আগে সে সবই চিনি। নেজ মামার সঙ্গে আরও দু'তিন বার কলকাতায় এসেছি ও সব দেখে শুনে গিয়েছি। তবুও চূপ করে শুনে গেলুম। ডাক্তার রায়কে অত্যন্ত আপনার লোক বলে মনে হোল—সেবার মেজ মামাও এত আগ্রহের সঙ্গে কলকাতার দ্রষ্টব্য স্থান আমায় দেখান নি তো?

ইডেন গার্ডেনে একটা গাছতলায় অয়েলক্লথ পেতে আমরা বসলুম। সন্ধ্যার পরে ডাক্তার রায় আমার মেসের সামনে আমায় নাগিয়ে দিয়ে গেলেন। গাড়ী থেকে নামবার সময় এদিক ওদিক চেয়ে দেখলুম আহা, মেসের একটা লোকও বারান্দার দাঁড়িয়ে নেই, কেউ দেখলে না যে আমি সার পি সি রায়ের গাড়ী থেকে নামছি!

## প্রগতি

শ্রীফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জগত দেখেছে তোমা বৈজ্ঞানিকরূপে  
হে আচার্য্য! দেখিয়াছে তারা তব জ্ঞান  
গবেষণা, গৌরব মুকুটে তারা তাই  
মণ্ডিয়াছে ভাল তব—জড়ের পূজারী!  
দীন আমি পল্লীবাসী; বিজ্ঞান আগার  
তব দেখি নাই; বুঝি না ক রসায়নে  
আছে কিবা রস। তোমার অসীম জ্ঞান  
কোন রেখাপাত মোর করেনি হৃদয়ে  
অজ্ঞান তামসভূমি। যেদিন হেরেছি  
তোমা মুক মুখে তুলি দিতে ভাষা,  
হৃর্ডিক বস্ত্রার মাঝে দেবদূত সম  
বরাভয় বিলাইতে, হেরিয়াছি যবে  
অজুলি হেলনে ত্রস্ত অপসারি' দূরে  
সরে যায় আর্তি হুঃখ হাহাকার রব

সভয়ে প্রণমি তোমা, জেগে উঠে প্রাণে,  
মনে ময়নের কোণে আশার আশ্বাস—  
সেইদিন হতে শুধু গুরু বলি দেব  
লয়েছি মানিয়া। হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য  
ঢালি দিতে চরণে তোমার প্রাণ মন,  
দেহ একান্ত হইয়া গেছে।

হে ষাঙ্কিক,  
বিশ্বজিৎ ব্রতে ব্রতী প্রীতিভরে লহ  
আজি দীনের প্রণাম। পল্লীর দেবতা,  
দেশহিত ব্রত তুমি; পল্লীবাসী তব  
দীর্ঘায়ু কামনা করে। ওগো সন্ন্যাসী,  
মনুষ্যত্ব ধর্ম্মে পূত ওগো কর্ম্মবীর,  
চিরজীবী হয়ে রও মাতৃঅঙ্ক জুড়ি'  
ছিদা দম্ব মাঝে তব শ্রেষ্ঠ অবদান  
অলুক দেশের বুকে চির অনির্ব্বাণ।



## আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

“সেই ধন্য নরকুলে,      লোকে যারে নাহি ভুলে,  
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন।”

রসায়ন বিজ্ঞানে উচ্চস্তরের মৌলিক গবেষণায় বিজ্ঞান জগতে যে ইঁহার নাম কতটা সুপ্রতিষ্ঠিত সেকথা বলা অনাবশ্যক। শিক্ষিত স্বেচ্ছাজনমাত্রেরই অবগত আছেন। আমি এঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কথাই কিছু বলব।

ব্যক্তিগত জীবনের দুই একটি সত্য যখন নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠে তখনই সে লোকসমাজে সমাদৃত হয়। কিন্তু এ দেশের লোকে খাটি চোখ হারিয়ে যেন কাঁচের চোখ পরেছে। বাইরে থেকে দেখা যায় বেশ জলন্ত—নিজে কিন্তু কিছুই সে দেখতে পায় না। অথচ কাণা চোখে দেখার অত্যাচার পূর্ণগাত্রায় সে করে। যে বরেন্য নয়—তাকে করে তুলতে চায় চিরস্মরণীয়! যে চিরস্মরণীয় তাকে বলে, —হুঁট যাও। এই রকমে বাড়িয়ে কমিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে। ফলে আসল সত্যকে মাটি করে দেয়। মহাত্মা গান্ধীর আদি ও মধ্যজীবনে অনেকে তাঁকে এই রকমই ঘুরপাক খাইয়ে ছেড়ে দিলে। শুধু মহাত্মাজী নয়—বিশ্ববরেন্য মহাপুরুষদের অনেকের জীবনকে লোকে এই রকম বিড়ম্বিত করে তুলে বোকামী করে। শক্তিবৈগম্য পুরুষ নিজের বেগে সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে যখন শেষ সীমায় এসে দাঁড়ায় তখন সকল দিক্কার সকল কলরব থেমে শান্তি আসে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনেও এরূপ অত্যাচার কম হয় নাই।

প্রফুল্লচন্দ্র যখন বিলেত থেকে দেশে ফিরলেন—তখন দেশবাসী বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের লোক অনেকটা কুসংস্কারাপন্ন। একদল লোক ক্ষেপে উঠল,—যায় যায়—জাতিধর্ম যায়। আচার্য্য হাসলেন। ধর্মের মধ্যে পূর্ণতা নেই—প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। তিনি ধর্ম দিলেন না। গিটেশ্বরে ভেঁকে বললেন,—তোমরা ভাল থাকো—আমি তোমাদের

ছোঁব না—ভয় কেন?—তিনি দেশ থেকে সরে এলেন। সত্যই কি সরে এলেন? সমাজের কুশাশঙ্কর আবহাওয়ার মধ্যে ধরা পড়ল না—কতটা তিনি থেকে গেলেন।

দেশ ও সমাজ যার কাছে গভীরতর প্রয়োজনের উপর প্রতিষ্ঠিত অন্তরের বিপুল বেদনা তাঁকে গলার হার করিতে হয়। সকল ভাবের শ্রেষ্ঠ ভাব যেমন ঈশ্বরের সহিত প্রণয়ীর মধুর ব্যাকুল সম্বন্ধ—দেশের সহিত দেশপ্রেমিকেরও ঠিক সেইরূপ মধুর সম্বন্ধ। কত আঘাত—কত মান অভিমান অপমান আসে যায় এই সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে—তবু সে ভাঙে না। আচার্য্যদেবেরও দেশের প্রতি সে সম্বন্ধের টান ছিঁড়ল না। তিনি প্রতিবৎসর একবার করে এসে দেশের ছয়াতে হাজির হতে লাগলেন। ঠিক যেন—

“প্যারে দরশন দীজ্যো আয়

তুম বিনা রহে ন জায়।

জল বিনা কমল চন্দ বিন রজনী।

ঐ সে তুম দেখা বিন সজনী ॥

ম্যাকুল ব্যাকুল ফিরু রৈন দিন

বিরহ কলেজা খায় ॥

প্রিয় হে, দেখা দাও। তোমা বিনা যে থাকিতে পারি না। জল বিনা কমল, চাঁদ বিনা রজনী, সেইরূপ তোমা বিনা আমি আকুল ব্যাকুল হইয়া দিন রাত ফিরিয়া বেড়াই। বিরহ আমার কলিজা খাইয়া ফেলিল।

ঠিক এইরূপ টানেই দেশের দ্বারে এসে হাজির হতেন। দ্বারে দ্বারে শুনাতেন,—আমি এসেছি—কেমন আছ দেখতে এসেছি—হাসিমুখখানা দেখতে এসেছি।

হাসিমুখ বড় দেখতে পেতেন না—হাসিমুখ করিয়ে দিয়ে যাওয়াই আসার উদ্দেশ্য হত। ফলে দীন দুঃখী, কণ্ঠাদায়গ্রস্ত অন্ধ আতুরে—আর রাস্তা ঘাট, স্থল পাঠশালা, টোল মক্তবে অজস্র টাকা ঢেলে দিয়ে ফিরে চলে যেতেন। ক্রমে এটা

তাঁর কর্মপন্থার একটা অবজ্ঞনীয় অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠমাসে সকল কাজ ত্যাগ করে' দেশে এসে দেশবাসীর সুখ দুঃখের রঙে রঙিয়ে যাওয়া চাই।

মৈ বিরহিন বৈঠি জাগু

জগত সব সৌবে রে আলী।

সখিরে আমি বিরহিনী—বসিয়া বসিয়া জাগিতেছি; আর জগতের সকলেই ঘুমাইতেছে। সে তারিখটি এমনই স্থনির্দিষ্ট—যাত্রাটি এমই আবেগাকুল যেন এই জ্যৈষ্ঠমাসের অপেক্ষায় গত এগারটি মাস তাঁর চোপে ঘুম ছিল না।

স্বভাবটি আবার যেমন সুস্থ সবল মানুষের স্বভাব—তেমনি বালকেরও। আশ্বিনমাসের শিশুরা যেমন মা আনন্দময়ীর অপেক্ষায় বসে থাকে। দেশের শিশু ও যুবকেরাও তেমনি জ্যৈষ্ঠমাসের প্রতীক্ষায় দিন গণে। এই একটি মাস তাদের সঙ্গে শিশু মন লয়ে খেলা করে চলে যান। ছেলেদের সঙ্গে জাম খেতে গিয়ে নিজেই নীচের ডালে চড়ে বসেন। তারা বলে,—

“আপনি কেন গাছে চড়লেন?”

তিনি হেসে বলেন, “আমি বোকা নইরে। খোবার রসাল জামটা তোরা কখনই আমাকে দিবি—গালে পুরবি।”

খুলনা জেলার রাড়ুলী গ্রামে কপোতাক্ষী নদীর তীরে ইঁহার পৈত্রিক বাসভবন। গৃহের সন্নিহতেই নদী। অনেক জেলের বাসও এই নদীর ধারে। প্রতিদিন বিকালে এই সময় ছেলেদের লয়ে বাইচ খেলার প্রতিযোগীতা হয়। তা' ছাড়া কুস্তী খেলা—পাঠাশালার ছেলেদের মিষ্টান্ন বিতরণ প্রভৃতি নানারূপ আনন্দ দিয়ে তাদের মাতিয়ে রেখে আসেন।

ইনি শুধু নীরস শুক বিজ্ঞানার্চ্য নহেন। রসজ্ঞও বটেন। সঙ্গীতে ইঁহার প্রবল অনুরাগ দেখা যায়। সুগায়ক শ্রীমান অনাথনাথ বসুর বাড়ীও এই কপোতাক্ষী তীরে নদীর অপর পারে। সে সময় ইনি দেশে থাকলে সর্বদা তাঁকে নিজের কাছে এনে রাখেন। বিকালে কপোতাক্ষীর কালো জলের উপর দিয়ে এঁদের

নৌকা নেচে যায়। শ্রীমান অনাথ বসুসহযোগে গান করেন। সে সুর বাতাসে ধ্বনিত হয়ে দুই তীরের গ্রামবাসীর কর্ণে মধু ঢালে ও আচার্য্যদেবের শুভাগমন ঘোষণা করে।

একদিন সকালে আচার্য্য নিজের হাতে কোদাল ধরে জমী কোপাচ্ছিলেন। কিছু দূরে একটি বালক বার খেলছিল। সে খেলা ছেড়ে এসে বললে,

“আপনি কোপাচ্ছেন?”

আচার্য্য হেসে বললেন “তুই কি করছিলি?”

“বার খেলছিলাম।”

“তবে তুই আমার বন্ধু। আমিও শরীর-চর্চা করছি। কিন্তু তুই ঠকে গেলি।”

“কেন?”

“আমার একসঙ্গে দুটো কাজ হল—তোরা একটা।”

“কি রকম?”

আচার্য্য হেসে বললেন, “শরীর-চর্চাও হল—জমীটারও চাষ হল। এখন এতে পোঁপে, শশা, তরমুজ, ফুটি এই সকল লাগাব। জমী কুপিয়ে বাড়ী যেয়ে সেই সকল ফল কেটে কেটে খাব—কারও মুখ তাকাব না—আর তুই বার খেলে বাড়ী যেয়ে বলবি,—মা ক্ষিদে পেয়েছে, খেতে দাও।”

আজকাল স্বদেশীর হৃজুগে দেশের জন্ত গলাবাজী করে অনেকে—রঙ ধরে না। নিজের জীবনের প্রকাশের মধ্য দিয়ে অপরের জীবন উদ্ঘাটিত করা সহজ হয়।

“মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়

মাথায় তুলে নেরে ভাই।”

নিমাইএর হরিনাম বিলানর মত তিনখানা হাড় লয়ে ভেল্কি খেলে দেশে দেশে এমনটি আর ক'জন! বিলিয়ে বেড়াতে পেরেছেন? ‘চরকা-বায়ুগ্রস্ত’ এ খেতাব বা মহাত্মাজী ছাড়া আর ক'জন! অর্জন করতে পেরেছেন?

“তাঁতি কর্মকার

করে হাহাকার,

সুতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার।”

পথে ঘাটে পার্কে ময়দানে এই সঙ্গীত শুনি। কিন্তু তাঁতির ঘরে কামারের কর্মশালায় এঁকেই যেতে দেখি।

স্বতা জাঁতা ধরে পাঠশালার গুরুমশায়ের মত হাতে ধরে ‘ক’  
‘খ’ শেখাতে এঁকেই দেখি।

নদনদী ত আজকাল মাতাল—কাকেও বড একটা  
আমলের মধ্যে আনে না। বছর বছর বাণ ডেকে কত শত  
শত লোককে উদরের মধ্যে পুরলে—ইয়ত্তা নেই। কিন্তু  
এই জীর্ণ শীর্ণ অস্ত্র দিগন্তের দিকে হেলে-পড়া সত্তর বছরের  
বৃদ্ধ-যুবকটিকে দেখলেই ভয়ে তারা আঁতকে ওঠে।  
তালপাতার সেপাইটিকে তারা ডরায়।

দেশের ছেলেরা সিদ্ধির নেশায় আলস্য ও তন্দ্রার ঘোরে  
সময়ের অপব্যয় করছিল—তাদের শক্তি শৌর্য ও কৌশলের  
খবর হয়ত অনেকে দিয়েছেন। কিন্তু—

“নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে  
পর দাস-খতে সমুদয় দিলে।”

দৈববাণীর মত এ বাণী তাঁর মুখে যেমন ছেলেরা শুনে,  
আর কার মুখে এমনটি শুনেছে? লোভ বিসর্জন দিয়ে  
বীণাপাণির পাদমূলে তাদের কল্যাণে অর্ঘ্য ঢেলে দিতে  
পেরেছিলেন বলেই না এই লাভ আজ তাঁর হল।

আচার্য্যদেব কোন দলে ভিড়েন নি। নিজের বিবেক  
বুদ্ধিকে সহায় করে দেশের মুক্তির পথ পরিষ্কার করতে  
আত্ম-নিয়োগ করেছেন। কিন্তু এঁর সমস্ত চরিত্রটা বিশ্লেষণ  
করলে ইনি কতটা যে মহাত্মাজীর অনুরাগী ও অনুগামী—তা’  
বেশ বোঝা যায়।

## বাঙালী প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্তী

বৎসর পঁচিশেক আগে বাংলার আশ্‌মান-ভূমীন যখন  
স্বদেশের মহিমা-গানে আর স্বদেশী-প্রচারে গুল্‌জার, তখন  
বাংলার এক দূর পল্লীতে আমরা প্রথম শুনিয়াছিলাম বাংলার  
অগ্রতম একনিষ্ঠ ভক্তকর্মী বাঙালী প্রফুল্লচন্দ্রের নাম।

তিনি সেদিন দেখা দিয়াছিলেন এক নূতনরূপে—বাংলার  
স্বদেশী-যজ্ঞের অগ্রতম ঋত্বিকরূপে নয়া বাংলার বুকের উপর  
বিজ্ঞানের গোড়া পত্তন করিয়া স্বদেশীর মান রক্ষা করিতে,  
শিশু বাংলার প্রাণে বুকভরা আশা জাগাইয়া দিতে, আর  
স্বদেশীর কর্মকাণ্ডের অগ্রতম আচার্য্যরূপে বাঙালীকে-  
আত্মনির্ভরশীল স্বাধীন মানুষ গড়িয়া তুলিতে।

আজ স্বদেশীভাবে তাজা বাঙালী যে সকল বৈজ্ঞানিক  
কর্মক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিয়া বাংলার স্বদেশীকে সার্থক করিয়া  
তুলিতেছেন, তাঁহাদের সে ভাবের জন্মদাতা বৈজ্ঞানিক প্রফুল্ল-  
চন্দ্র। শিশুবাংলার ছাত্রসমাজ সেদিন প্রফুল্লচন্দ্রের দিকে  
অনেক আশা লইয়া তাকাইয়াছিল। নয়া বাংলার বুকের

উপর দিয়া বিজ্ঞানের স্রোত বহাইয়া দিয়া তিনি বাঙালীর  
নিকট প্রকলাভ করিয়াছিলেন এক নূতন ভগীরথরূপে।

হিন্দু-রসায়ন যেখানে স্রোত হারাইয়া ফেলিয়াছিল,  
বিজ্ঞানের চাষীরূপে প্রফুল্লচন্দ্র উহা হইতে খাল কাটিবার  
জ্ঞাত সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন কোদালী হস্তে।  
আত্মবিশ্বাসহীন বাঙালীকে ভরসা লইয়া তাঁহার পেছনে  
পেছনে চলিবার জ্ঞাত তিনি তাহাদের সামনে “হিন্দুরসায়ন”—এ  
একে একে ধরিলেন চির-উজ্জল হিন্দু রাসায়নিকদের বিরাট  
গম্ভীর মূর্তি। বাঙালী পরম বিশ্বাসে বিশ্বাস করিল—তাঁহার  
অতীত উজ্জল, ভবিষ্যৎও উজ্জল—প্রফুল্লচন্দ্রের সিদ্ধি  
নিশ্চিত।

তারপর প্রফুল্লচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইলাম, “বাঙালীর মস্তিষ্ক  
ও তাঁহার অপব্যবহার”—এর প্রচারক এক ভীষণ বিপ্লবীরূপে।  
সেদিন বাঙালীর নিন্দায় প্রাণে দারুণ বেদনা পাইয়াছিলাম  
সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার প্রাণের সে বেদনাকে মাপিবার

শক্তি আগার সেদিন যেমন হয় নাই, আজও ঠিক তেমনি রহিয়াছে। আগার বিশ্বাস প্রফুল্লচন্দ্রের সে বেদনা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে।

বিজ্ঞানের সাধনার ভিতর বাংলার চিন্তা আসিয়া উঁকি মারিতেই বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানশালা ছাড়িয়া বড়বাজার, কলুটোলা আর মৃগীহাটায় বাঙালীর আর্থিকজীবন বুঝিবার জন্ত বাহির হইলেন। দিনের পর দিন সেখানে ঘুরিয়াছেন আর ঘরে ফিরিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন। তারপর পশ্চিমের জিলায় জিলায় ঘুরিয়া বাঙালীর শক্তি কি ভাবে উজান বহিয়া চলিয়াছে তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়াছেন, আর বাঙালীর বর্তমান-ভবিষ্যতের জমা-খরচ কষিয়া কষিয়া দিনের পর দিন অশ্রু ফেলিতেছেন।

বাংলার জন্ত উন্মাদ প্রফুল্লচন্দ্র যে সকল আর্থিক কেন্দ্রে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন সেই সব স্থানে বাঙালীকে দেখিতে পান নাই, পাইয়াছেন যাহাদিগকে তাহারা অ-বাঙালী। কিন্তু তাই বলিয়া প্রফুল্লচন্দ্র অবাঙালী-বিদ্বেষী নন। বিদেশীর সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় ভারতবাসীকে না দাঁড়াইলেই যেমন চলিবে না, অবাঙালীর সঙ্গে বাঙালীকেও বাঁচিবার জন্ত ঠিক সেই রকম টক্করই দিতে হইবে। বাঙালীর আর্থিকজীবন সম্বন্ধে ইহাই প্রফুল্লচন্দ্রের মত বলিয়া মনে হয়।

সাধক প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন নানা দিক দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, কখনো কোনো স্থানে আবদ্ধ হয় নাই। স্বদেশ-কল্যাণের মানস-সরোবর হইতে যে স্রোত দিকে দিকে তালে তালে গর্জন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন-ধারা তাহাদের অন্ততম। তার বেগ, তার গর্জন দিনের পর দিন শক্তি সংগ্রহ করিতে করিতে ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। সে স্রোতের কণায়-কণায় আশা-ভরসা ও বিশ্বাসের সন্ধান পাওয়া যায়।

যুবককে যুবকের মতো, মানুষকে মানুষের মতো দেখিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধের অন্তরে চিরজাগ্রত। সেই জন্তই বুদ্ধসাধকরূপে তিনি কখনো জ্ঞানের তপস্যায় মগ্ন, আবার কখনো যুবককর্মীরূপে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে কর্মে পাগল। স্বদেশের প্রয়োজনে ছোট বড় যে কোনো কর্মক্ষেত্রে হাতিমার হাতে যোদ্ধার জয়ের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা লইয়া প্রফুল্লচন্দ্র

চিরদিন দণ্ডায়মান। তাঁহার সকল সাধনা সকল কর্ম একটি দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাঁহার জীবন চিরদিন অর্থ্য দিয়া আসিতেছে, “শুধু একটা ভাবের পা-য়”। তাঁহার সাধনা যেমন তাঁহার দেশবাসীর জন্ত, তাঁহার জীবন এবং ধনও তেমনি তাঁহার দেশবাসীর সম্পত্তি। যেদিন তিনি নূতন ভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই দিন হইতেই তাঁহার যথাসর্বস্ব তাঁহার দেশবাসীর দৌলত হইয়া রহিয়াছে।

যেখানে কোনো বাঙালী হাতপায়ের জোরে দাঁড়াইবার চেষ্টা করে, প্রফুল্লচন্দ্র তাহার কাছে নিজে হইতেই আগাইয়া যান। সেই জন্তই গরীব বাঙালীর লক্ষ্মীপূজার পুরোহিতরূপে বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাতা প্রফুল্লচন্দ্রকে কখনো ঘি-মিঠাইয়ের দোকানে, কখনো বা কাপড়ের দোকানে দেখিতে পাই। প্রফুল্লচন্দ্রের চরিত্রবল ব্যবসাদার বাঙালীর পেছনে নানা ক্ষেত্রে আজ একটা প্রবল শক্তিরূপে কাজ করিতেছে দেখিতে পাই। যে কোনো ভাবেই হউক, বাঙালী বাঁচিয়া উঠুক, বাঁচিয়া মানুষ হউক, মানুষের মতো কাজ করুক; অস্থিপঙ্করসার বাঙালী তাজা মানুষের মতো দেহে-মনে, স্বাস্থ্যে-সৌন্দর্যে, হৃদয়ে-মস্তিষ্কে তাজা হইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হয়, এই কামনাই তাঁহার সকল কর্মের মূলে চিরদিন রস যোগাইয়া আসিতেছে।

প্রফুল্লচন্দ্র বাংলাকে এমন একটা রূপে দেখিতে চাহেন, যাহা আগে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাগনে, তারপর জগতের সামনে একটা নূতন রূপ লইয়া দেখা দিবে। প্রফুল্লচন্দ্রের পূর্ববর্তী মনীষিগণ ভাবী বাংলার যে স্বন্দররূপ কল্পনা করিয়া উহাকে মূর্তি গড়িয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহাদের উত্তরাধিকারীরূপে আজ যাহারা সেই মূর্তিকে নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া, নানা গুণে ভূষিত করিয়া তুলিবার জন্ত প্রাণপণ সাধনায় রত বাঙালী প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহাদের অন্ততম।

জ্ঞানবুদ্ধ অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র; নয়া বাংলার বিজ্ঞান-রাজ্যের নিত্যানন্দ প্রফুল্লচন্দ্র; বাংলার গৌরবে গর্বিত, অপমানে অবনত, দুঃখে ক্ষুণ্ণ প্রফুল্লচন্দ্র; বাংলার স্বদেশী প্রচারক প্রফুল্লচন্দ্র; মানুষের দুঃখে বিগলিতচিত্ত প্রফুল্লচন্দ্র; কর্মী এবং নেতা প্রফুল্লচন্দ্র দীর্ঘজীবন লাভ করুন। কখনো জলপ্রাবিত বাংলায় সাত্তার কাটিয়া বিপন্নকে রক্ষা করিবার



জন্ম, কখনো ভিক্ষার ঝুলি হস্তে মানুষকে বাঁচাইবার জন্ম আর্ন্তের অভাব মোচনের জন্ম, এখনো তাঁহার দীর্ঘকাল প্রয়োজন হইবে।

যাঁহাদের গৌরবে বাংলাদেশ চির-উজ্জ্বল, বাংলার গভীর অন্ধকারে, শীতে-গ্রীষ্মে, বর্ষা-বাদলে, ঝড়-ঝাপ্টার, ভিতর

নিম্নিকারভাবে লাইট হাউসের মতো দাঁড়াইয়া থাকিয়া যাঁহারা দিক্‌ভ্রান্ত নিরাশ বাঙালীকে পথ চলিবার সুযোগ দিয়া আসিতেছেন, প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহাদের একজন। আজ প্রফুল্লচন্দ্রের সপ্ততিবর্ষ জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাঙালীজাতির সেই মনীষিগণকেও প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

— ০ —

## প্রফুল্লচন্দ্রের কর্মধারা

শ্রী প্রসন্নকুমার রায় বি, এ

এই বিরাট মানবের সম্বন্ধনার জন্ম দিকে দিকে যে বিস্তৃত জয়ন্তী উৎসবের প্রচেষ্টা চলিতেছে ইঙ্গিতের জয়ন্তী সংখ্যা তাঁহারই এক ক্ষুদ্র অংশ এবং আচার্য্যদেবের উদ্দেশ্যে ভক্তগণের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের ক্ষীণ প্রতীকস্বরূপ। এই অনুষ্ঠানে ক্ষুদ্র সামর্থ্য লইয়া যোগদানের সুযোগ পাইয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।

চিন্তা ও কার্যের সমষ্টিই মানবের প্রকৃত জীবন এবং এই চিন্তা ও কর্মের ইতিহাসই মানবের প্রকৃত জীবনী। প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তা ও কর্ম অসাধারণ এবং অনন্ত। অল্প পরিসরের মধ্যে তাঁহা প্রকাশ করা অসম্ভব। তাঁহার কর্মধারা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিবার চেষ্টা করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আমাদের ভক্তির অতি দীন অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

আচার্য্যদেব এ পর্য্যন্ত দেশের ও দশের জন্ম বাঁচা করিয়া আসিতেছেন তাঁহা এক অনন্ত আত্মার অখণ্ড অভিব্যক্তি হইলেও, তাঁহার কার্য্যকে আমরা প্রধানতঃ কয়েকটি দিক হইতে ভাবিতে পারি। তাঁহার কর্ম সাধারণতঃ তাঁহার শিক্ষাজীবন ও গবেষণামণ্ডলীর সৃষ্টি, নিজ আবিষ্কার, হিন্দুরসায়নের ইতিহাস, শিল্প বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা, এবং জনসেবার আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। দুর্বল দেহ্যষ্টি দিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি এত কাজ

কি করিয়া করেন তাঁহা অনেকের নিকট প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হয়। তিনি নিজেই বলিয়াছেন “He believes in doing one thing at a time and that done well”—তিনি এক সময়ে একটা মাত্র কাজ করিতে ভালবাসেন এবং সেইটা সুসম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কাজে হাত দেন না। Jack of all trade, but master of none একথা তাঁহার বেলায় খাটে না।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে কতক পৈত্রিক দেনার ভার গ্রহণ করিতে হয়। যতদিন সে দেনা পরিশোধ করিতে পারেন নাই, ততদিন অন্য কোন আস্থানে সাড়া দেন নাই। বহু খেয়াল তাঁহার মাথায় খেলিতেছিল; তিনি তাহাদিগকে রাশ টানিয়া সংযত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ডি-এস-সি ডিগ্রী প্রাপ্তির পর বিলাতের বিজ্ঞানাগারে স্বীয় আরম্ভ গবেষণা পরিসমাপ্ত করিয়া ‘প্রফুল্লচন্দ্র ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন এবং বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের অধীন প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগে মাত্র ২৫০ টাকা মাসিক বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। এই সামান্য বেতনের বিরুদ্ধে তিনি আপত্তি উত্থাপন করিলে শিক্ষাবিভাগের তদানীন্তন ডিরেক্টর সুপ্রসিদ্ধ Croft সাহেব স্পষ্ট করিয়া শুনাইয়া দেন “জীবনে অনেক করণীয় আছে, কে তাঁহাকে চাকুরী লইয়া সাধাসাধি করিতেছে।”

ডিরেক্টর সাহেবের এই স্লেষোক্তিতে প্রফুল্লচন্দ্রের আত্ম-ভিমানের অত্যন্ত আঘাত লাগে এবং তাঁহার চাকুরী করিবার সাধ একেবারে চলিয়া যায় ; কিন্তু তাঁহাকে দায়ে ঠেকিয়া কর্মগ্রহণ করিতে হয়। তিনি বিলাত হইতে উচ্চ রসায়নবিজ্ঞান আদ্যন্ত করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। অল্প পথে যাওয়া সুবিধাজনক নহে। বিশেষতঃ মৌলিক গবেষণা দ্বারা নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার স্বপ্ন তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজ ভিন্ন অন্য কোন কলেজে নিযুক্ত হইলেও তাঁহার এই বাসনা ফলবতী হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং একরূপ বাধ্য হইয়াই “রোগী যেন নিম্ন খায় মুদিয়া নয়ন” গতিকে তাঁহাকে এই কর্ম করিতে হয়।

ঈঙ্গিত জ্ঞানানুশীলনের পথে এইরূপে নানা বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হওয়ায় প্রফুল্লচন্দ্রের জ্ঞানপিপাসু চিত্ত সহজেই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তিনি শিক্ষাবিভাগের এই সকল নীরব অত্যাচার মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু পরাধীনতার একটা মানি আসিয়া বৃশ্চিকদংশনের ন্যায় তাঁহার সর্বশরীরে এমন একটা জ্বালা উৎপাদন করিল যে তাহারই ফলে তাঁহার সমগ্র জীবন ভবিষ্যৎশীঘ্রের মুক্তির সন্ধানে উৎসৃষ্ট হইয়াছে।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালের পর কলেজ খুলিলেই প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞানাগারে প্রবেশ করিয়া সেই যে test tubeকে সাদরে বরণ করিয়া লইলেন, তাঁহার জীবনের এই সপ্ততিতম বর্ষেও তিনি তাহার সহিত সশব্দ অঙ্গুল রাখিয়াছেন। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন টেবু টিউব হাতে করিলেই তাঁহার কর্মশক্তি জাগিয়া উঠে, তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা তৃপ্ত হয় ; তাঁহার কোন বাহ্য আকাজক্ষা থাকে না। বিজ্ঞানাগারে টেবু টিউবের সহিত আলাপে তিনি তাঁহার বার্কক্য ভুলিয়া যান। বাস্তবিক এইরূপ একনিষ্ট সাধন ভঙ্গনের ফলে তিনি টেবু টিউবের ভিতর দিয়া যে ভাষা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার উদ্গাদনায় ভারত ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে ; যে কর্মশক্তি তিনি উদ্ভূত করিয়াছেন তাহার প্রেরণায় বাঙ্গালীর জড়ত্ব দূরে ভাসিয়া বাইতেছে, তাহার অনুপ্রেরণায় দেশের আবিলতা মুছিয়া যাইতেছে।

স্বীয় কর্মে আত্মপ্রতিষ্ঠা হইয়া তিনি বিজ্ঞান অরণ্যে পথহারা পথিকের ন্যায় স্বীয় গবেষণার পথে সঙ্গীর অন্ত্রেষণে ব্যতিবস্ত হইয়া উঠিলেন। অনেকে আসিল গেল, কেহ স্থায়ীভাবে গবেষণায় মনোনিবেশ করিল না। তাঁহার প্রচেষ্টায় গবেষকবৃত্তি স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু গবেষণায় তৃষ্ণা জাগিল কি ? ছাত্রেরা সুবিধা পাইলে বড় বড় চাকুরী লইয়া প্রস্থান করিতে লাগিল। ছাত্রদিগের এই ব্যবহারে প্রফুল্লচন্দ্রের সরল চিত্ত ক্ষোভে উদ্বেল হইয়া উঠিল। একদিন তিনি সংবাদপত্রে দেখিলেন যে তাঁহারই এক প্রিয় ছাত্র যিনি গবেষণার জন্য সরকারী বৃত্তি লইয়া তাঁহার সহিত একযোগে কাজ করিতেছিলেন, আইনপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রফুল্লচন্দ্র ক্ষোভে ও বিষয়ে আত্মহারা হইয়া কেবলই বলিতে লাগিলেন “This is illegal This is illegal ! He should not have done it—while receiving a research scholarship he should not have attended law class. All my labour of twenty years is gone for nothing in making Lawyers and Deputy-magistrates.”

প্রফুল্লচন্দ্র নীরবে তাঁহার গবেষণার পথে অগ্রসর ; শ্রান্তি নাই, বিশ্রাম নাই, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, সমভাবে নীরবকর্মী পথ বাহিয়া চলিয়াছেন আর কেবলই সঙ্গীর আশায় প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি কাতরভাবে সর্বদাই ভগবানকে অন্তরের বেদনা জানাইয়াছেন,—“আমি মরি হে মুরারি দুখ নাই অন্তরে গো। কিন্তু কে আমার এই আরক্ত কর্মের শ্রোত বহমান রাখিবে ?” তাঁহার কাতর প্রার্থনায় ভগবানের আসন টলিল। ১৯০৬ সালে শ্রোতের গতি ফিরিতে আরম্ভ হইল। ক্রমে ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত, হেমেন্দ্রকুমার সেন, নীলরতন ধর, রসিকলাল দত্ত, বিমানবিহারী দে, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কৃতী ছাত্র আসিয়া স্বীয় স্বীয় গবেষণায় আচার্যদেবের মুখোজ্জল করিলেন এবং ইহাদের শক্তিতে ভারতীয় রাসায়নিক সঙ্ঘের সৃষ্টি হইল। বাঙ্গালীর গৌরবের দুইটা বাহিনী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভারতবর্ষ জয় করিয়াছে বলিতে পারা যায়। প্রফুল্লচন্দ্রের শিষ্যগণ ভারতের প্রধান প্রধান রাসায়নিক কেন্দ্র আয়ত্ত করিয়া স্বীয়

স্বীয় গবেষণার প্রভাবে ভারতের ও বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। অন্যদিকে অবনীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত বহু বাঙ্গালী শিল্পী স্বীয় স্বীয় প্রতিভায় ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি অধিকার করিয়া ফেলিয়াছেন। ১৯১৭ সালে প্রফুল্লচন্দ্র সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের রাসায়নিক বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমানে বিনা বেতনেই তিনি উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থকৃচ্ছ্র তা নিবারণে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের মজ্জাগত ইতিহাসপ্রিয়তা স্বদেশাতুরাগের প্রেরণায় রসায়নশাস্ত্রের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। হিন্দুরসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসকে অনেকে তাঁহার তৃতীয় কীর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, যদি একমাত্র ইতিহাস প্রণয়নই তাঁহার জীবনের মুখ্যকাৰ্য্য হইত, তাহা হইলে এই ইতিহাসই তাঁহাকে চির-অমরত্ব প্রদান করিতে পারিত। সৃষ্টীভেদে অন্ধকারময় পর্কতগুহার ভিতর হইতে তিনি যে পল্লরাগ গণির আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে ভারতবাসীর নিকট চিরবরেন্য করিয়া রাখিতে পারিত। ভারতবাসী রসায়ন বিজ্ঞানে আরব ও যুরোপীয়গণের পশ্চাদ্বেশ—এই ধারণাই যুরোপে বহুমূল হইয়াছিল। আচার্য্যদেবের ইতিহাস-প্রকাশের ফলে এই ধারণা পরিবর্তিত হইয়া রসায়ন-বিজ্ঞানে ভারতীয়-গণের প্রাচীনত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

নব্যবঙ্গে শিল্প ও বৈজ্ঞানিক কারখানা স্থাপনে প্রফুল্লচন্দ্রের কার্য্য তুলনাহীন। বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি বাঙ্গালীর ব্যবসায়-জীবনে নূতন উজ্জ্বলের সঞ্চার করিয়াছেন। হিন্দুরসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া প্রফুল্লচন্দ্র জগতের সমক্ষে প্রমাণ করিয়াছেন যে, জগতের বিভিন্ন প্রদেশে সভ্যতা বিস্তারের বহু পূর্বে ভারতীয় মনীষিগণ স্বীয় স্বীয় গবেষণা দ্বারা বিজ্ঞানের, বিশেষতঃ রসায়নশাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। হিন্দুসভ্যতা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভা ও জ্ঞানাত্মসঙ্কীর্ণতা ক্রমে ক্রমে অজ্ঞতার ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে এবং কালক্রমে ভারতবাসী বিশেষতঃ বাঙ্গালীজাতি পৃথিবীর

সর্বত্র স্বাধীনচিন্তা-বিবজ্জিত, অকর্মণ্য ও জড় বলিয়া উপহসিত লাক্ষিত ও অবজ্ঞাত হইতে থাকে। ব্যবসায় বাণিজ্যে, বিশেষতঃ শিল্প প্রতিষ্ঠায়, বাঙ্গালী যে অকর্মণ্য তাহা পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই 'রায়' দিয়াছিল। বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠা ও কার্য্যাবলী এই রায়ের বিরুদ্ধে কেবল আপীল। প্রফুল্লচন্দ্র এই কারখানা করিয়া সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতে বাঙ্গালীজাতির যে সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন, তজ্জন্ত বঙ্গবাসী ভক্তিভরে তাঁহাকে চিরকাল স্মরণ রাখিয়া পাণ্ডাঅর্থ্য দিয়া পূজা করিবে। স্বীয় আবিষ্কার হিন্দুরসায়নের ইতিহাস প্রণয়ন, গবেষকমণ্ডলীর সৃষ্টি ও বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠা দ্বারা প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার অধীত বিজ্ঞাকে জগতের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়া বিজ্ঞার সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। আচার্য্যদেবের এই সকল কাৰ্য্যের অন্তরালে কত উদ্বেগ, কত বিনিদ্র রজনী, কত গোপন সাধনা কত স্বার্থত্যাগ নিহিত আছে, তাহা তাঁহার অন্তরতম বন্ধু ভিন্ন অন্যো উপলব্ধি করিতে পারিবে না। হে নাম যশের অতীত আচার্য্যদেব, আমরা তোমাকে বলি তুমি চিরকাল

কাজ ক'রে যাও গোপনে গোপনে।

প্রফুল্লচন্দ্রের জনসেবা ভারতের দুঃস্থ পীড়িত, বৃহৎ নরনারীর সম্মুখে জগন্মাতার ন্যায় নানা অভয় যুক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি করুণাসাগর বিজ্ঞাসাগরের দয়াধর্ম্মে দীক্ষা লইয়া বিবেকানন্দ প্রদর্শিত নরনারায়ণের সেবায় বার্ষিক্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস

জগত জুড়িয়া এক জাতি আছে

• • •

সে জাতির নাম মানুষ জাতি।

তাঁহার জনসেবায় ইতর ভদ্র নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই, সম্পৃক্ত অসম্পৃক্ত নাই। দুঃস্থ মানবমাত্রেই তাঁহার করুণার পাত্র।

কত সমস্যাসমাধানে তাঁহার চিন্তা ও কার্য্য পর্য্যবসিত তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। পতিতের পতিতসমস্যা, অন্নহীনের অন্নসমস্যা, বিজ্ঞাহীনের শিক্ষাসমস্যা, গরীবের উৎপীড়নসমস্যা, দুর্ব্বলের স্বাস্থ্যসমস্যা,—বহু সমস্যা-সমাধানে তিনি জীবন-সাম্রাজ্যে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি

মহাত্মাজীকে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, “প্রত্যেকেই স্বরাজ্যলাভের প্রশস্ত পন্থার আশ্রয় লইতে চাহেন। কেহই কণ্টকাধীন আয়াসসাধ্য পথের অনুসরণ করিতে চাহে না।” উক্তবাক্য প্রাবনে, খুলনা দুভিক্ষে তাঁহার কাণ্ড তাঁহাকে অগর করিয়া রাখিবে। দরিদ্র নারায়ণের সঙ্কট মোচনের জন্ত তাঁহার সঙ্কটজ্ঞান সমিতির সৃষ্টি। খদ্দর সম্বন্ধে তিনি প্রথমে অমুকুল মত পোষণ করিতেন না। কিন্তু বিশেষ প্রণিধানপূর্বক যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন ততই বুঝিতে পারিলেন যে ভারতের অর্থকষ্টের মুক্তি চরকায় নিহিত। যেই ধারণা অমনি কার্যতৎপরতা। মহাত্মাজীর পরই আচার্যদেবের স্থান। অর্থজগতে ভারতের অগ্রাগ্র জাতি বাঙ্গালীকে সর্বত্র কোণঠেসা করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালী বাস্তবিকই নিজ বাসভূমে পরগামী’ বাস করিতেছে। বাঙ্গালী অত্যধিক আতিথেয়তার লজ্জায় কাহাকেও কিছু বলিতে পারে না। আচার্যদেব এই ভুল ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালীকে সজাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর বাজারে দোকানদার মাড়োয়ারী, মোটবাহী উড়িয়া, নোকার মাঝি পশ্চিমা, গাড়োয়ান হিন্দুস্থানী, মোটব চালক পাঞ্জাবী, মিস্ত্রী চীনা, ফেরীওয়াল অবাঙ্গালী, মহাজন কাবুলীওয়াল। এই চক্রবাহ ভেদ করিয়া বাঙ্গালীর কুতাপি প্রবেশের অবিকার নাই। আচার্যদেবের প্রচারের ফলে দিকে দিকে এই চক্ষুজ্জ্বল আবরণ উন্মোচন করার চেষ্টা চলিতেছে। অচিরে বাঙ্গালী আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবে।

আচার্যদেব স্বপ্নপ্রবণ ভাবুক মাত্র নহেন। ভাবুকতার

সহিত সাংসারিক জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় মিলিত হইয়া তাঁহাকে একদিকে যেমন আদর্শবাদী করিয়াছে, অন্যদিকে তাঁহাকে খাটি কর্মী করিয়া তুলিয়াছে। অনেক বচনবাগীশ শুধু বক্তৃতার জাল বুনিয়া দেশোদ্ধার করিয়া যায়। আচার্যদেব সকল কাণ্ড অনাড়ম্বরে করিয়া যাইতেছেন। নিজের মনের দিকে কখনও দৃষ্টিপাত করেন নাই। সর্বদা “Plain living high thinking”এর দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া রহিয়াছেন। এসম্বন্ধে তাঁহার একমাত্র জুড়ি তাঁহার সহাধ্যায়ী বন্ধু মনীষী শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয়। দুই বন্ধু বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের Conference হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাদিগের সঙ্কল্পনাসভায় প্রাতঃস্মরণীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় যে সঙ্গীত রচনা করিয়া তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন তাহাতে ছিল,

বাড়াতে আপন মান চাহনাক কেহ কখন,

তাই তোমাদের গুণ গাহিবারে চাহে মন।

আচার্যদেব একজন আদর্শ গৃহস্থ; চিরকুমার, কিন্তু সাংসারিক জ্ঞানে তিনি বেশ পটু। যাকে বলে “True to the kindred points of heaven and home.” এমন আদর্শ পৃথিবীতে বিরল। তাই প্রার্থনা “যাহাও মঙ্গলময় স্বরূপ এই অনন্ত বিশ্বমণ্ডলের প্রত্যেক পরমাণু মধ্যে নিত্য দেদীপ্যমান, সেই “অণোরনীয়ান্ মহতে মহীয়ান্” সদাশিব ভূমি—সেই প্রাণময় কৃপাসিন্ধু ঈশ্বর আচার্যদেবকে সর্বদা রক্ষা করুন ও তাঁহাকে দীর্ঘজীবন দান করুন।

## আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর সামন্ত রায় সাহিত্য-সরস্বতী

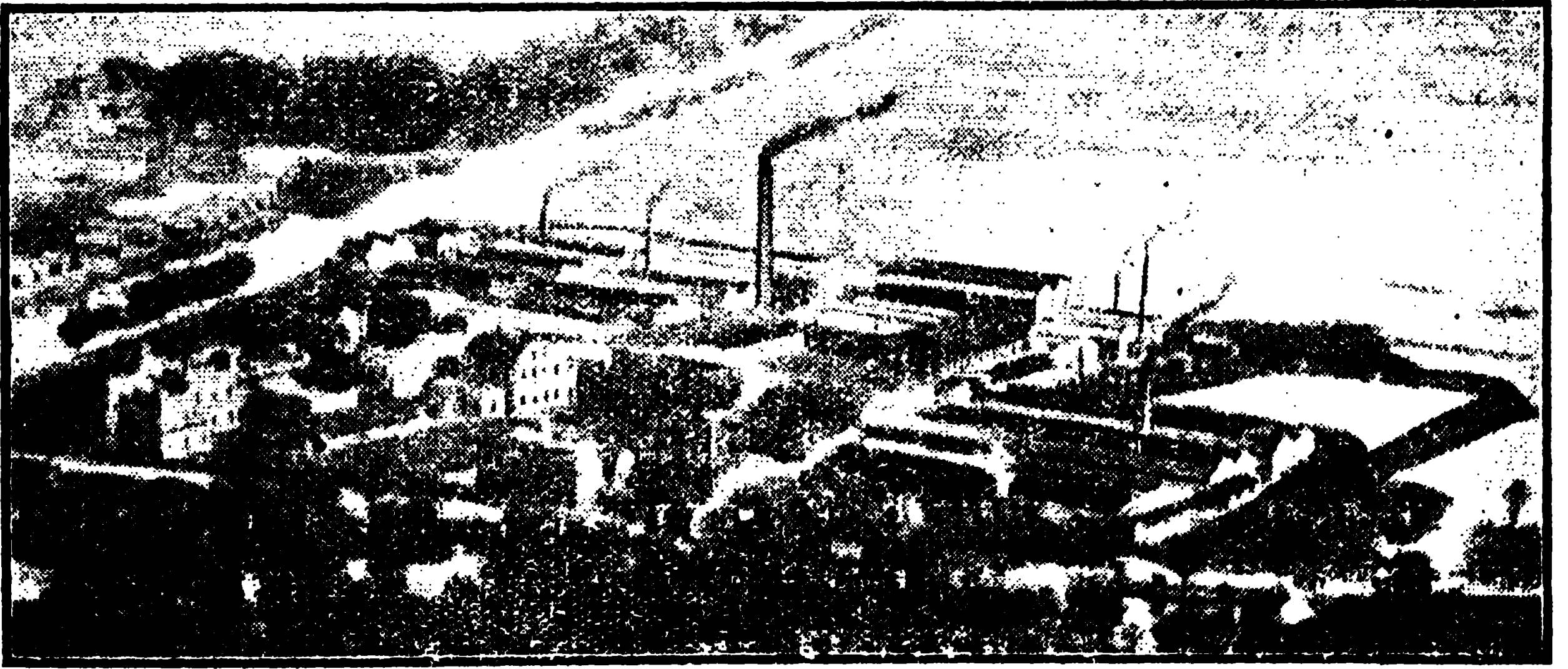
খুলনা জেলার অন্তর্গত সুবিখ্যাত কপোতাক্ষী তীরে বারুলী কাটিপাড়া নামক একটি গওগ্রামে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম হয়। হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁহার পিতা। তিনি পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সাদী ও

হাফিজে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। হরিশ্চন্দ্র সেকালের লোক হইলেও প্রাচীন কুসংস্কারের গভীর মধ্যে তিনি আবদ্ধ ছিলেন না। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। খুলনা জেলায় ইংরাজী শিক্ষার



বিশ্বারে তিনি একজন অগ্রদূত ছিলেন। তিনি স্বীয় বাসভবনে একটি আদর্শ মধ্যইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ বিদ্যালয়টি পরে আদর্শ উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। এবং ঐ বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহার্থে আচার্য্য রায়কে বাৎসরিক ষথেষ্ট টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে। তখনকার যুগে তিনি স্বীয় বাসভবনে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া সকলকে জ্ঞান-শিক্ষায় উৎসাহিত করিবার জন্য স্বীয় পত্নী ও ভগিনীকে উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র British Indian Association নামক জমিদার সভার একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি মনীষিগণের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। আচার্য্যদেবের জননী

মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপন করিলে পর পিতা হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে হেয়ার স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস্‌চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্কাদিকারী আচার্য্যরায়ের সহপাঠী ছিলেন। আহাৰও পাঠসম্বন্ধে পূর্বে তাঁহার কোন বাঁধা ধরা নিয়ম ছিল না। অসংখ্য প্রফুল্লচন্দ্র নিজের খোয়ালে বাহা পাইতেন তাহাই ভক্ষণ করিতেন এবং যতবার খুসি আহাৰ করিতেন। পাঠের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। শরীরের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচারের ফলে কিছুদিন পরে কঠিন আশ্রয় রোগে আক্রান্ত হইয়া দুইবৎসর যাবৎ ভুগিতে থাকেন। পাঠে ও ভোজন ব্যাপারে তাঁহার যে সংযম আজ সর্কসাধারণের আদর্শ ও অনুকরণীয় হইয়াছে তাহা তাঁহার বাল্যজীবনের ঠেকিয়া শেগা রোগমুক্ত হওয়ার পর



উড়োজাহাজ হইতে বেলুন কেমিক্যাল কারখানা

ভুবনমোহিনী দেবী অনামায়া রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন। তাঁহার নধুর প্রকৃতি ও কোমল হৃদয় নিতান্ত পরকেও আপন করিয়া লইত। উপযুক্ত মাতা পিতার নিকট দীক্ষিত হইয়াই আচার্য্যদেব সর্বস্ব দান করিয়া পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। মাতা পিতার সদৃশ আচার্য্যরায়ের অগ্রাণু চারি ভ্রাতার হৃদয়েও অল্পবিস্তর প্রতিফলিত হইয়াছে। ইনি পিতার ওয় পুত্র।

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র অগ্রাণু ভ্রাতার সহিত পিতার প্রতিষ্ঠিত

তাঁহাকে কলিকাতা এলবার্ট স্কুলে ভর্তি করা হয়। সেখানে ইংরাজী ভাষার অন্যতম লক্ষপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়ের সাহায্যে ও শিক্ষার গুণে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রতি ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্রের প্রগাঢ় আসক্তি জন্মে। দেশনায়ক স্ববক্তা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অধ্যয়নের সুযোগ লাভের আশায় ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান (বিদ্যাসাগর) কলেজে এক এ পড়িবার জন্য ভর্তি হন। এই কলেজে অধ্যয়নকালে ডাঃ

প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হইয়া সুবিখ্যাত অধ্যাপক সারজন এলিয়ট ও সার আলেকজান্ডার পেড্‌লার সাহেবের নিকট যথাক্রমে পদার্থ-বিজ্ঞান (Physics) ও রসায়ন শাস্ত্র (Chemistry) অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। আচার্য্যরায় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হরিশ্চন্দ্রের ইচ্ছা ছিল পুত্রকে বিলাত পাঠাইয়া সেখানে উচ্চশিক্ষা দিবেন কিন্তু সাংসারিক অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আচার্য্যরায় পিতার মনোভাব পূর্ণ হইতে অবগত ছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে Gilchrist বৃত্তিলাভ করেন ও বি, এ, পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বে বিলাত যাত্রা করেন। বাল্যকাল হইতে ইতিহাস ও ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরক্তি থাকিলেও বিজ্ঞানচর্চার উপর ভারতের স্থায়ী উন্নতি নির্ভর করিতেছে ভাবিয়া তিনি এডিনবরায় গিয়া রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি অতি শীঘ্র সেখানে একজন বিজ্ঞানানুরক্ত মেধাবী ছাত্র বলিয়া বিখ্যাত হইয়া পড়েন। Prof. James Walker F. R. S. যিনি এডিনবরার রসায়ন শাস্ত্রের সর্বোচ্চ স্থান (Chair of Chemistry) অধিকার করিয়াছেন এবং স্বর্গীয় Prof. Hugh Marshall F. R. S. যিনি ডাঙি ইউনিভার্সিটি কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহারা ইহার সহপাঠী ছিলেন। আচার্য্যরায় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তথায় বি, এস সি ও ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ডি, এস সি ডিগ্রিলাভ করেন। তিনি তথায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা মৌলিক গবেষণাপূর্ণ ছিল। ঐ প্রবন্ধ সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় তিনি পঞ্চাশ পাউণ্ড মূল্যের Hope prize নামক সম্মানজনক পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ডি, এস সি উপাধি প্রাপ্তির পর ভারতীয় শিক্ষাবিভাগে (Indian Education Service) কর্মপ্রাপ্তির জন্য তদানীন্তন ভারতসচিবের নিকট চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কি কারণে তাঁহার ন্যায় সুযোগ্য ব্যক্তি ইহাতে প্রবেশাধিকার পাইলেন না তাহা ভারতসচিবই জানেন। যাহা হউক ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগে (Provincial Education

Service) প্রবেশ করেন ও ২৫০৮ টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নশাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি গভীর মনোযোগের সহিত কলেজের Chemical Laboratoryতে কয়েক বৎসর যাবৎ গবেষণা করেন। গবেষণার ফল প্রকাশিত হইলে তিনি একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিচিত হন এবং বাঙ্গলার গবর্ণমেন্ট ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ইউরোপের প্রসিদ্ধ কেমিকেল লেবোরেটরীসমূহ পরিদর্শন জন্য প্রেরণ করেন। ইউরোপের সর্বত্র তিনি বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞানাগারে প্রবেশ করিয়া test tubeকে আদরে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন,—“বিজ্ঞানাগারই আমার শাস্তি ও কর্মের স্থল; সেখানে ষ্ট্রেট টিউবের সহিত আলাপে আমি আমার বার্ককা ভুলিয়া যাই। এক শতাব্দীর এক তৃতীয়াংশকাল বিজ্ঞানাগারের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া বাহ্য জগতের সহিত সকল সম্বন্ধচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি।” ইহারই নাম সাধনা—এবং এই সাধনায় তাঁহার সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছে। এই আজীবন সাধনার ফলে তাঁহার বিশ্ব-বিখ্যাত আবিষ্কৃত্য বেক্সল কেমিক্যাল ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠা ও হিন্দু-রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস সঙ্কলন সম্ভব হইয়াছে।

কলেজের ছাত্রগণ রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন বটে, কিন্তু হাতে কলমে (practical) কোন কাজ কেহ করিতেন না। পরীক্ষা পাশের সাহায্য জন্য যতটুকু করা প্রয়োজন তাহার অধিক কিছুই করিতেন না। অদম্য অধ্যবসায়ের সহিত ছাত্রগণকে উৎসাহিত করিলেও মৌলিক গবেষণার জন্ত কেহ আগ্রহর হইত না। চাকুরীর মোহ সকলকে দূরে সরাইয়া আনিয়াছিল। কিন্তু আচার্য্যের নিকংসাহ নাই—প্রাণ্তি নাই—বিশ্রাম নাই—দুর্গম গিরি যকু কান্তার বাহিয়া চলিয়াছেন। ২০ বৎসরের সাধনা ও অধ্যবসায়ের ফলে জিতেজনাথ রক্ষিত, হেমেন্দ্রকুমার সেন, নীলরতন ধর, মেঘনাদ সাহা, যতীন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি কৃতী ছাত্র আসিয়া লেবোরেটরীর নির্জনতা ভঙ্গ করিয়া দিলেন। তাঁহাদের মৌলিক গবেষণায় নূতন নূতন আবিষ্কৃত্য বাঙ্গালীর মুখরুপ করিল। আচার্য্যদেবের ও তাঁহার শিষ্যবর্গের গবেষণার

কথা পৃথিবীময় রাষ্ট্র হইয়া বৈজ্ঞানিকদিগের বিশ্বয় উৎপাদন করিয়াছে। আচার্য্যদেব ইউরোপীয় বিদ্যামণ্ডলীর নিকট সম্মানিত এবং হিন্দুরসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস প্রণেতা বলিয়া তাঁহার যশ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। মিঃ পেড্‌লার (পরে সার পেড্‌লার) মিঃ টেপলটন, মিঃ কানিংহামের জায় বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ প্রেসিডেন্সি কলেজের রাসায়নিক বিভাগের প্রধান অধ্যাপকপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কানিংহামের পরে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র এই বিভাগের প্রধান অধ্যাপকপদে উন্নীত হন এবং অবসর গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সহরে যে নিখিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় মহাসম্মেলন হয় তাহাতে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ও ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া লণ্ডন গমনপূর্ব্বক বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেন। এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের যোগ্যতা দর্শনে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্রকে ডি, এস্‌ সি ও ডাঃ সর্বাধিকারীকে এল, এল ডি উপাধিভূষণে ভূষিত করেন। গবর্ণমেন্টও এই সময়ে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্রকে সি, আই, ই উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। ইহার অব্যবহিত পরে দানবীর সার টি পালিত ও সার রাসবিহারী ঘোষ বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে ২৫ লক্ষ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে প্রদান করেন। এই অর্থ সাহায্যে বর্তমান বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্রকে অধ্যাপকের ভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ডাঃ রায় কার্য্যগ্রহণে সম্মতি প্রদান করিলে বাঙ্গালা সরকারের অনুমতি লইয়া ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়। আচার্য্যরায় এখনও ঐ পদে নিযুক্ত আছেন এবং নিজের বেতনের সমস্ত টাকা ঐ বিজ্ঞান কলেজের উন্নতিকল্পে দ্যায় জ্ঞাত কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। বিজ্ঞান কলেজে নিযুক্ত হইবার পর তাঁহার গবেষণার পুরস্কারস্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি এস্‌ সি উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যে বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় সন্তুষ্ট ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার সাহিত্যচর্চাও উল্লেখযোগ্য।

প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্ব প্রাদেশিক সাহিত্যসম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া “সাহিত্যে বিজ্ঞানের স্থান” নামক যে সূচিস্থিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার সাহিত্যানুরাগের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালীন সুবিখ্যাত Indian World নামক বিখ্যাত পত্রিকায় আচার্য্যদেবের গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রায়ই স্থান পাইত। এতদ্ব্যতীত অগ্রান্ত পত্রিকায় পূর্ব্ব এবং এখনও মধ্যো মধ্যো তাঁহার যে দুই চারিটি সূচিস্থিত প্রবন্ধ বাহির হইত ও হয় তাহার তুলনা হয় না। বিজ্ঞানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেও ইংরাজী সাহিত্য ও অর্থনীতি ইতিহাস আলোচনা বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ অল্প ছিল না। লাতিন ও ফরাসী ভাষায় তিনি যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এস্‌ সি পরীক্ষা প্রদানের পরেই “India before and after the Mutiny” নামক যে সূচিস্থিত নানাতথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার গভীর স্বদেশানুরাগ, ভারতের ইতিহাস এবং সাধারণ রাজনীতিমূলক বিষয়গুলির দ্বারা গভীর জ্ঞানের ও ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত মূল্যবান তথ্য অগ্রান্ত বড় একটা পাওয়া যায় না।

History of Hindu Chemistry ( হিন্দুরসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস ) তাঁহার অমর কীর্ত্তিস্বস্ত। প্রাচীন ভারতের রসায়নশাস্ত্রের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল তাহা তিনি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে সংগ্রহপূর্ব্বক বর্তমান জগতের সমক্ষে সুন্দররূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগ ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ২য় সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাস বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন হিন্দুরসায়নী বিদ্যা সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই বক্তৃতা অত্যন্ত সুনয়গ্রাহী হইয়াছিল। আচার্য্য রায় তাঁহার বহুমুখী প্রতিভাবলে সমাজ, শিল্প, জাতীয় উন্নতি, জাতিগঠন ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা ও প্রবন্ধের দ্বারা যে ভাবধারা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা দেশের ভবিষ্যৎ



যুবকসম্প্রদায়ের পক্ষে পথপ্রদর্শক হইয়াছে। ‘বাকালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার,’ ‘অন্নসমস্যা,’ ‘পাতিভ্য-সমস্যা,’ ‘সমাজ-সংস্কার সমস্যা’ ‘অর্থনৈতিক সমস্যা’ প্রভৃতি প্রবন্ধ বাঙালী ভাষায় যথেষ্ট পুষ্টিসাধন করিয়াছে। তাঁহাব বক্তৃতার বিশেষত্ব এই যে, একই কথা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইলেও নবীনত্বের বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তাহাব স্বভাবসুলভ সরল কথায় শ্রোতৃবর্গ মুগ্ধ হইয়া যায়। বালের আবেশনে দেশনেতাদের চিন্তার ধারা পবিত্রিত হয় কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্বে যে চিন্তার ধারা ও আদর্শ লইয়া আচায্যদেব বাঙালীর ভবিষ্যৎ যুবকবর্গের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, আজিও সেই চিন্তার ধারা ও সেই আদর্শের কোন পরিবর্তন হয় নাই। কি ভাবে বাঙালীর ধন অবাঙালীর গ্রাস হইতে রক্ষা করা যায় ইহাই তাঁহাব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত অবিভ্রান্ত গতিতে সমানভাবে চলিয়াছেন।

আচায্যদেব একজন প্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক। বাঙালী জাতি যে হীন অবস্থায় পতিত হইয়া পুরাতনের প্রতি একটা অযথা অতিরিক্ত শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়াছে ও আত্মশক্তির উপর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসহীন হইয়া পড়িয়াছে তাহা তিনি প্রাণের আবেগের সহিত পুনঃ পুনঃ বাঙালী জাতির নিকট জানাইয়াছেন। ‘অনন্ত পরিবর্তনশীল জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কত সামাজিক প্রথা ও ব্যবস্থা পরিবর্তিত হইতেছে। কালের চঞ্চল স্রোতে পার্থক্য জগতে যেমন যুগযুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, মনোজগতেও যে তাদৃশ বিপ্লব স্বাভাবিক, ইহা অন্ধবিশ্বাস-চালিত হইয়া এ জাতি বুঝিতে পারে না।’ কুল্লুক ভট্ট ও রঘুনন্দনের অপূর্ণ পাণ্ডিত্যের প্রশংসা শুনিয়াই যাহাবা দেশে সেই প্রাচীন টোলের শিক্ষা-প্রণালী সংস্থাপন করিতে চাহেন নূতনকে একেবারে তাড়াইয়া পুরাতনকে তাহার স্থানে আনিতে চাহেন, তাহাদিগের সহিত তিনি কখনও একমত হইতে পারেন নাই। তাঁর ইচ্ছা নূতন ভারতবর্ষীয় বা বাঙালী জাতি নূতন ও পুরাতন উভয়ের সম্মেলনে গঠিত হউক। প্রকৃতপক্ষে অন্ধবিশ্বাস জাতীয়

উন্নতির মূল হইতে পারে না। রঘুনন্দন ও কুল্লুক ভট্টের টীকা টীপনী প্রাঘার বিষয় জান করিয়া যদি উহারই আদেশ অশ্রান্ত সত্য মানিয়া সেই অতীতপ্রায় কুট শিক্ষায় মনোনিবেশ আমাদের গোরবের বিষয় বলিয়া অনুমিত হয়, আব বর্তমানের নূতন আশা, নূতন উদ্দীপনা ঠেলিয়া ফেলিয়া প্রাচীনের প্রচলন স্থির, ধীর ধর্ম বলিয়া আদৃত হয় তাহা হইলে এ মৃতপ্রায় জাতি আর কতদিন বাঁচিতে সমর্থ হইবে বলিয়া তিনি পুনঃ পুনঃ আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, “আমরা যে এখনও নীচে পড়িয়া আছি তাহার একটা কারণ, আত্ম-প্রবঞ্চনা ও ব্যবসাদারী। আমাদের বিধা বিভক্ত জীবনের বাহিরের দৃশ্য যেমন সুন্দর ভিতরের দৃশ্য তেমনি কুৎসিত। বাহিরে—দেশোদ্ধার, সমাজ-সংস্কার, বিধবা-বিবাহ, জাতিভেদরহিত, ছুঁৎমার্গ পরিহার, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রভৃতির আদর্শ লইয়া বক্তৃতা করিতে করিতে আকাশ বাতাস কম্পিত করি,—আব ভিতরে—উত্তররাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ, কাণ্যপ, শাণ্ডিল্য, ২৬ পয়ায়, গঙ্গামানের পুণাফল, একাদশীতে নিরম্ব উপবাস ইত্যাদি অযৌক্তিক কপটাচারের প্রদর্শন দিই।” বাস্তবিকপক্ষে আমরা পূর্বে সমাজসংস্কার বিষয়ে যে অবহেলা করিয়াছি এখন তাহার বিষময় ফলভোগ করিতেছি। ইহার জন্য রাজনৈতিক উন্নতির পথে আমরা বাধা পাইতেছি। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ বড় দুঃখে বলিয়াছেন,—আমরা সমাজে যে অন্যায়কে আটে ঘাটে, বিধি বিধানে বেঁধে চিরস্থায়ী ক’রে রেখেছি সেই অন্যায় যখন পলিটিক্সের ক্ষেত্রে অন্যেব হাত দিয়ে আমাদের উপর ফিরে আসে তখন সেটা সম্বন্ধে সর্বতোভাবে আপত্তি করার জোর আমাদের কোথায়?” নিজেদের মধ্যে অনৈক্য থাকিলে আমাদের পতন অনিবার্য। নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও আমাদের ভাই, তাহাদের বর্তমান হীন অবস্থা হইতে উন্নতির পথে তুলিয়া লইবার জন্য প্রত্যেক দেশহিতৈষীরই আন্তরিক চেষ্টা করা উচিত। দেশের প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক নারীর সমান মনুষ্যত্ব অস্বীকার আমাদের হীনতার একটি প্রধান কারণ।

( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য )





১ম বর্ষ  
১১শ সংখ্যা

ভাদ্র

১৩৩৯

## যোগাসনে অরবিন্দ

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

উত্তর মেরু রাঙা করিয়া উদিত হইয়াছে প্রলয়র অগ্নিপুচ্ছ ধূমকেতু। চারিদিকের জলরাশি তোলপাড় করিয়া ফেনাইয়া উঠিয়াছে, সপ্তসিন্ধুর তরঙ্গরাজি, মাঝখানে শুক্ল আশঙ্কায় মুক হইয়া রহিয়াছে এই সর্কংসহা মাটি। না জানি কি অঘটন ঘটবে, এত দিনের ভাগ্যচক্র বুঝি বিপরীত দিকে পালটিয়া যাইবে, পূর্বের সূর্য্য তার প্রোজ্জ্বল রথগতি ফিরাইয়া পশ্চিমে উদিবে, সার্ক তিন হস্ত বামনরূপী মাহুষ বুঝি নিদ্রাতুর বিধাতার সৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়াইবে।

পুরাতনের জগদল পাথর টলিয়াছে, স্বর্গমর্ত্য দশ দিক কাঁপাইয়া এত দিনের তুষার-জাঙাল ভাঙিয়াছে, এখন আসিবে বন্যা—এখন বহিবে হিমগিরি বিগলিত রক্ততত্ত্ব নব অলকনন্দা। তাহারই কাল বৈশাখীর ঘনঘটা, তাহারই এ ভূমিকম্প, সেই নবযুগের পিণাকীরই এই সৃষ্টিকাঁপানো প্রলয় নৃত্য। তাই বুঝি দুঃখ আসিয়াছে স্থখ বৃকে, মৃত্যু আসিয়াছে অমৃতের সাজে, পরাজয় আসিয়াছে সিদ্ধির আশীষ লইয়া।

এই ধূমকেতু-আলোকিত তরঙ্গমথিত শঙ্কাস্তরু ধরিত্রীর মাঝখানে কে তুমি মৌন পুরুষ? শান্ত নীল আকাশের মত জগতের সকল ত্রিতাপ দুঃখ জুড়াইয়া কে তুমি আশার অতীত? মাথার কেশে তোমার কোন্ নবতানুর স্বর্ণজ্যোতি,

ধ্যাননিমগ্নিত নয়নে তোমার ত্রিকালভেদী দৃষ্টি, অবিচলিত আসন ঘিরিয়া তোমার জগতের বিশ্বয়মুগ্ধ জনশ্রোত!

সব টলিয়াছে, তুমি টলো নাই; সব কিছু ভাঙিয়া চুরমার হইয়াছে, তুমি কর্মচ্যুত হও নাই; ইহাদের মুখর অবান্তর কলকোলাহলের মাঝে তুমিই শুধু নীরব রহিতে জানো; কামনার ঘূর্মান কুলালচক্রের মাঝে নেমৌদণ্ড হইয়া তুমিই শুধু শিথিয়াছ সে গতিকে অনিবার্য উদ্ভ্রান্তি হইতে ধরিয়া রাখিতে। তুমিই লালসা-বিতাড়িত মাহুষকে দেখাইয়াছ বাস্তবকীর ফণার বহুধরা-ধারণ শক্তি, কোটি সৌরজগৎ গ্রাসকারী আতত দিবির মহিমা। তোমাকে আজ নমস্কার।

পাশ্চাত্যের পক্ষিল প্রমত্ত কর্মশ্রোত আর প্রাচ্যের তামস মৃত্যুর মাঝে স্বর্ণসেতু হইয়া এ দুইকে তুমিই বাঁধিয়াছ এক নূতন ছন্দে; অমরবিজিত স্বর্গ ও মোহ উদ্ভ্রান্ত মর্ত্যের মাঝে তুমিই রচিয়াছ আশার তারকাখচিত জ্যোতির্বিজ্ঞান। তুমিই সাধিয়া ও জীবনে ফলাইয়া দেখাইতেছ কোথায় দাঁড়াইয়া ক্ষুদ্র হয় বিরাট, দীন হয় মহান, বিভ্রান্ত হয় স্থির, সম্ভ্রান্ত হয় স্থখী। তুমি যে অচলের ও তুরীয়ে প্রতীক, সে আছে বলিয়াই নয়া প্রকৃতির শ্মশান-নৃত্যে জগৎ ভাঙিয়া পড়িতেছে না। তোমাকে আজ নমস্কার।

## Sri Aurobindo

Mahakali is of another nature. Not wideness but height, not wisdom but force and strength are her peculiar power. There is in her an overwhelming intensity, a mighty passion of force to achieve, a divine violence rushing to shatter every limit and obstacle. All her divinity leaps out in a splendour of tempestuous action ; she is there for swiftiness, for the immediately effective process, the rapid and direct stroke, the frontal assault that carries everything before it. Terrible is her face to the Asura, dangerous and ruthless her mood against the haters of the Divine ; for she is the Warrior of the Worlds who never shrinks from the battle. Intolerant of imperfection, she deals roughly with all in man that is unwilling and she is severe to all that is obstinately ignorant and obscure ; her wrath is immediate and dire against treachery and falsehood and malignity, ill-will is smitten at once by her scourge. The impulses that are swift and straight and frank, the movements that are unreserved and absolute, the aspiration that mounts in flame are Mahakali's.

## কালী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

মাগো তুঙ্গ আসনা ! বক্ষা সাধনা !  
এসোলো অটু হাঙ্গিয়া ;

গৃহ- তৃপ্তি কুপণ কর মা দলন  
উদার ধ্বংস গাহিয়া ।

দূরি' ছায়া মাধুর্য  
বহি তূর্য  
বাজাও কুহেলি কাননে ;

আজি ধূলি আবর্ত  
ছাইল মর্ত্য  
এসো দুর্কার প্লাবনে ;

যত বাসনা ভ্রান্তি  
লভুক শাস্তি  
মরীচিকা যাক ভাসিয়া,

এসো ভ্রংশি' ধ্বাস্ত  
গতি অশাস্ত  
গর্জে চিত্ত আসিয়া ।

যত যুগসঙ্কিত  
বাধা-নন্দিত  
অম্বর দ্রোহী বাহিনী

হোক্ কুপাণ দণ্ডে  
লক্ষ ধণ্ডে  
লুপ্তিতা হাহাকারিণী

এসো বিদ্যুন্নতা  
বজ্র-বারতা  
বিছাও দৈত্য নাশিয়া

এসো বিপ্লবময়ী !  
বিপ্লবজয়ী  
তাণ্ডব তালে নাচিয়া ।



## “অবিনন্দ, ববীন্দ্রের লহ নমস্কার”

প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম,—ইনি আত্মাকেই সব চেয়ে সত্য ক’বে চেয়েছেন, সত্য ক’বে পেয়েছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্শ্রাব চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে, ইনি এঁব অস্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বালবেন। অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। তারি মধ্যে মনে হ’লো, তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত। কোনো খব-দস্তব মতের উপদেবতার নৈবেদ্যরূপে সত্যের উপলক্ষিকে তিনি ক্লিষ্ট ও খর্ব কবেন নি। তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্য্যময় শান্তির উজ্জল আভা। মধ্যযুগের খৃষ্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে বিক্র শুষ্ক করাকেই চবিতার্থতা বলেন নি। আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী অনুভব কবেছেন, যুক্তাঙ্গানঃ সর্বমেব বিশস্তি। আমি তাঁকে বলে এলুম, আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেবিযে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকবো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে—শৃঙ্খল বিধে।

অবিনন্দকে তাঁর ঘোবনের মুখে ক্ষুদ্র আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্শ্রাব আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—

অবিনন্দ, ববীন্দ্রের লহ নমস্কার।

আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্শ্রাব আসনে অপ্রগল্ভ স্তব্ধতায়, আজও তাঁকে মনে মনে বলে এলুম—

অবিনন্দ, ববীন্দ্রের লহ নমস্কার।

ববীন্দ্রনাথ

## সুভাষিত

ব্যক্তির অহঙ্কারকে অতিক্রম করিয়া আগাদিগকে নিমগ্ন হইতে হইবে নিখিল সত্যায়। চৈতন্যে ও সত্যায়, শক্তিতে ও প্রেমে আমাদের হইতে হইবে বিশ্বমুখী। সেই পরম-লক্ষ্যের পথ হইতে সাধকের আর পশ্চাদ্বর্তন করিবার উপায় নাই। পিছুপানে প্রতিটি পদক্ষেপ দুঃখের দিকেই আগাইয়া চলিবে। কিন্তু এই বিশ্বচৈতন্য লাভ করিতে হইলে সংসারের বাহিরে, নিরালায় যাইবার দরকার নাই। তাহাকে অর্জন করিতে হইবে এই সংসারেই, মানুষেরই জায় কৰ্ম করিয়া—গীতার নির্দিষ্ট পথে।

\* \* \*

আমাদের ইষ্টসাধনাতেও আমরা ব্যাপ্তিকে অতিক্রম করিয়া পাইতে চাই সমষ্টিকে। চাই না—ব্যক্তিগত মুক্তি, চাই এমন মুক্তি, এমন শক্তি আর এমন আনন্দ যাহা আমরা বিশ্বের সাথে বন্টন করিয়া ভোগ করিতে পারি, নিখিলের সঙ্গে একযোগে ভোগ করিবার জগুই যাহাকে আমরা বাহ্য করি। এই সৃষ্টিলীলা ও তার অন্তর্গত ভাগবত প্রয়োজনকেই যদি অস্বীকার করি, তাহা হইলে কি আসিয়া যায় বন্ধন ও মুক্তিতে?...বিশ্বের তার দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া সকলে যদি নিজের নিজের ভার লইয়াই বাস্তু থাকিত, তাহা হইলে মুক্তি হইত অনায়াসলব্ধ।

\* \* \*

সম্রাসীর জায় দারিদ্র্যের অন্ধ পূজা, কিংবা বিষয়ী লোকের ঐশ্বর্য্য-সর্বস্বতা—এ দুইটির কোনটিই শ্রেয় নহে। অর্থও ব্রহ্মের প্রতীকবিশেষ,—বীজগণিতের সঙ্কেতের মত—সমাজে ভাবগত শক্তির একটা বিশিষ্ট প্রকাশ বা রূপ। ইহাকে তুচ্ছ করাও নহে, আবার সর্বস্ব করাও নহে। প্রয়োজন হইলে ইহাকে গ্রহণ করিতে হয়, না পাইলে অর্জন করিতে হয়,—অবশ্য ভগবানের যদি তেমন ইচ্ছা থাকে।

\* \* \*

খ্রীষ্টের প্রেমে নিমগ্ন মেরী যখন সংসারে বিরক্ত উদাসীন হইয়া পড়িলেন, তখন মার্খার অভিযোগের উত্তরে খ্রীষ্ট হাসিয়া বলিয়াছিলেন, “মাখা, তুমি অনেক ব্যাপারে মাখা ঘামাও, মেরীর মন পড়িয়াছে পরম বস্তুতে।” নানা ব্যাপারে মাখা ঘামাইও না, সেই শ্রেষ্ঠ বস্তুতে একাগ্র হও—জীবনের সকল কাজে, সকল ব্যাপারে নিরহঙ্কার হইয়া ভাগবদনুভূতি লাভ কর,—কার্য্য ত্যাগ করিয়া নহে, নির্জনে ভজনা করিয়াও নহে, দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মকোলাহলকেই সোপান করিয়া আত্মোৎকর্ষ লাভ কর।\*

\* খ্রীঃঅরবিন্দের একখানি অপ্রকাশিত পত্রের খণ্ডানুবাদ। সম্পাদক

## কোথায় অরবিন্দ ?

“—তিনি আজ তাঁহার স্বদেশের কোথাও নাই। নাই রাজনীতিতে, সমাজনীতিতে। নাই সাহিত্যে শিক্ষায়। বজায় দেশ যায়;—নাই অরবিন্দ! রচিত হইতে যাইতেছে নবরাষ্ট্র, সেখানেও দেখি না খ্রীঃঅরবিন্দকে! অরবিন্দ আছেন? না, তিনি জীবনমৃত কিংবা তাঁহার অস্তিত্বের একটা গূঢ়তম মহনীয়তা রহিয়াছে! এই নীরবতার সার্থকতা কি? অরবিন্দের তপশ্চা ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির কোন কল্যাণ সাধনে তৎপর কিনা, কোন প্রশ্নই তুলি নাই। কিন্তু আর নহে। বর্তমান যুগের মুগ্ধ ও দ্বন্দ্বের মাঝখানে খ্রীঃঅরবিন্দের নিষ্কলতাকে একপাশে সরাইয়া রাখিলে আর চলে না।

কত কাজ, কত উদগ্র অনুষ্ঠান! ধী বিভাসিত, মণীষা সম্প্রসারিত, অন্তঃকরণ সুবিশাল! ত্যাগ এবং শক্তি অপরিমেয়। অরবিন্দ তবু নাই! ভোগী নহেন, রাজানুগৃহীত নহেন, পরবাসী নহেন, রোগী অসমর্থও নহেন, অথচ জাতির কোনখানেই আজ অরবিন্দ নাই! ইহা একান্ত ভাবেই অধ্যয়নের, গবেষণার এবং অনুসন্ধানের বিষয়। এই অন্তর্গত গোপন্য অধ্যয়ন করিবার প্রচেষ্টার মাঝেই হয়ত আমাদের সর্বসাফল্য এবং শক্তিশক্তির সর্ব উপাদান নিহিত রহিয়াছে।”

—বলাই দেবশর্মা।



## Sri Aurobindo.

The delight of victory is sometimes less than the attraction of struggle and suffering ; nevertheless, the laurel and not the cross should be the aim of the conquering human soul.

God and Nature are like a boy and a girl at play and in love. They hide and run from each other when glimpsed, so that they may be sought after and chased and captured.

We may seek after him passionately and pursue the unseen beloved ; but the lover whom we think not of, may pursue us, may come upon us in the midst of the world and seize on us for his own whether at first we will or no. Even he may come to us at first as an enemy with the wrath of love, and our earliest relations with him may be those of battle and struggle.

## শ্রীদিলীপকুমার রায় অনুদিত

জয়ের দীপ্ত পূলক তীব্র  
ছাড়ি' হৃদি চির-দিগ্বিজয়ী  
কভু তারি পাকে পড়ে,—যেথা ডাকে  
দ্বন্দ্ব বেদনা কুহকময়ী ;  
তবু বাহিত নহে লাহিত  
তপ্ত জীবন দুঃখ-শিখা :  
বিঘ্নবিনাশী পরাণ হরাণী  
পরিবে পরিবে বিজয়-টীকা ।

লীলাময় খাতা লীলাময়ী এই প্রকৃতি হৃজনে  
লুকোচুরি যেন খেলে  
প্রেমিক-যুগল—কিশোর-কিশোরী সাধে,  
এ উহারে খুঁজে, হৃজনার দেখা হয় ক্ষণে ক্ষণে  
পলায় এ—ওরে ফেলে  
শেষে দৌড়ে দৌড়া ছুটি' বাহুপাশে বাঁধে ।

## শুভদৃষ্টি

অলপ বলভে তার  
পাশ্ব বার বার  
খুঁজে কভু আকর্ষ তুমায়...  
যারে নাহি চেনে...তারি...  
তারি নিরুদ্দেশ-যাত্রা-পথে বাহিরায় ।  
কভু বা অচেনা প্রিয় একান্ত বিজনে  
আনমনা পথিকের পিছু লয় গোপন চরণে ;  
লক্ষ নশ্ব কণ্ম মাঝে তার  
প্রবল দুর্ব্বার  
ঝঙ্কারে সে অতিথি অকস্মাৎ উড়ি' আসি' হায়,  
ছিন্ন বল্লরীর সম ছিনিয়া তাহারে ল'য়ে যায়  
তার চির-আপন বলিমা :  
ত্রস্ত হিয়া  
সে-প্রথম বাসরের সঙ্কিলগ্নে কাস্ত গোধূলিতে  
সুনিভতে  
অনাহুত হৃদয়েশে চিনিতে নাহিও যদি পারে  
চির সখা তবু নাহি ছেড়ে যায় তারে ।  
অরিরূপী আসে অরিন্দম...  
প্রেমের ক্ষুরিত রোষে পথ কাটি' লয় সে নির্মম :  
দৌহার প্রথম শুভদৃষ্টি-পরিচয়  
বিমথতা...দ্বন্দ্ব...বেদনার মাঝে হয় ।



## শ্রীঅরবিন্দের বাণী

“এই ভারতবাসীই সব বিশ্বাস করিতে পারে, সব হুঃসাহস করিতে পারে, সব বলি দিয়া দিতে পারে। স্মৃতরাং সকলের আগে হও ভারতবাসী। তোমার পিতৃপুরুষের সম্পদ উদ্ধার কর। উদ্ধার কর আৰ্য্যের চিন্তা, আৰ্য্যের সাধনা, আৰ্য্যের স্বভাব, আৰ্য্যের জীবন-ধারা। উদ্ধার কর বেদান্ত, গীতা, যোগ দীক্ষা। এ সকল শুধু মস্তিষ্ক দিয়া, ভাবাবেগ দিয়া ফিরিয়া পাইলে চলিবে না, জাগ্রত জীবনে উহাদিগকে ফলাইয়া ধরিতে হইবে।”

\* \* \* \*

“অস্তুরাত্মার যে শক্তি তাহাই অসীম অনন্ত—বাহিরের সাম্রাজ্য যদি ফিরিয়া পাইতে চাও, তবে আগে অস্তুরের স্বরাজ ফিরিয়া পাও ; মায়ের আসন এইখানে।”

\* \* \* \*

“নিজের ভিতরে শক্তির উৎস উদ্ধার করিয়া আন—তবে আর সব জিনিষই তোমরা অবলীলাক্রমে ফিরিয়া পাইবে সামাজিক স্বাস্থ্য রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, বিশ্ব-চিন্তার নায়কত্ব, ভূমণ্ডলের রাজচক্রবর্তীত্ব।”

\* \* \* \*

“ইউরোপের Philosophy হইতে আমাদের “জ্ঞান” অনেক বড়। প্রাচীনেরা যাহাকে বলিতেন দৃষ্টি, আধ্যাত্মিক চক্ষে প্রত্যক্ষ করা, তাহারই বলে যে সাক্ষাৎ জ্ঞান তাহাই ‘জ্ঞান’ আর শক্তি অর্থও ইউরোপের Strength নয় যে বিশ্বশক্তি গ্রহনক্ষত্র চালাইয়া লইয়াছে তাহা যখন একটা নাম ও রূপ গ্রহণ করিয়া ব্যাপ্তিভাবে দেখা দিয়াছে তখনই তাহাকে বলি শক্তি।” ভারত উঠিতেছে, কিন্তু ভারতের ভিতর দিয়া প্রাচ্যের জয় হইবে। তাই রাষ্ট্রীয় নেতার পশ্চাতে দাঁড়াইবে বা তাঁহারই মধ্যে আবির্ভূত হইবে সিদ্ধযোগী। একই আধারে শিবাজীর সহিত রামদাসকেও জন্ম লইতে হইবে, কাভুরের সহিত ম্যাটসিনিকেও মিশিয়া যাইতে হইবে। আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন বুদ্ধি, শুদ্ধি হইতে বিচ্ছিন্ন বল, ইউরোপীয় বিপ্লবের সহায় হইতে পারে কিন্তু ইউরোপের বলে চলিলে আমাদের জয় হইবে না।”

\* \* \* \*

“নিজের সহিত নিজের আদান প্রদান ছাড়া, নিজের ভিতরের আলোক ছাড়া জ্ঞান আসিবে না এমন কি, বাহিরের কাজে সফলতার জন্ত দরকার যে পথ-নির্দেশের জ্ঞান সে জ্ঞানও নয়। এই শিক্ষাটুকু আমাদের ততদিন না হইবে ততদিন নীচের অল্প জ্ঞানের আলোকে যে পথেই যতটুকু চলি না কেন, তাহা ব্যর্থ হইবেই।”

\* \* \* \*

“দক্ষিণেশ্বরে যে কাজ আরম্ভ হইয়াছিল তাহা শেষ হওয়া ত দূরের কথা, লোকে তাহার মর্ম্ম এখনও গ্রহণ করিতে পারে নাই। বিবেকানন্দ যাহা পাইয়াছিলেন, যাহা বিকশিত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, সে জিনিস এখনও বাস্তবে মূর্ত্তি লয় নাই। ভবিষ্যতের যে সত্য বিজয় গোস্বামী নিজের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার শিষ্যদের কাছে নিঃশেষে ব্যক্ত হইয়া যায় নাই। যে দিব্য জ্ঞান দেখা দিতে চলিয়াছে তাহা কিন্তু তেমন গোপন নয়, যে শক্তির আবির্ভাব হইতেছে তাহা আরও বাস্তব, আরও শরীরী কিন্তু সে বস্তু কোথায় আসিবে, কবে আসিবে—কে বলিতে পারে ?\*

আর্য্যজাতির উদার বীর যুগে এত ঠাঁক ডাক, নাচানাচি ছিল না। কিন্তু যে চেষ্টা আয়ত্ত করত তারা, তা’ বহু শতাব্দী ধরে স্থায়ী থাকত। বাঙ্গালীর চেষ্টা দু’দিন স্থায়ী থাকে।.....

\* \* \* \*

“লাখ লাখ শিষ্য চাই না, এক শ’ ক্ষুদ্র আমিহশূণ্য পুরো মানুষ ভগবানের যন্তরূপে যদি পাই, তাই যথেষ্ট।...এইরূপ মানুষই এই দেশকে তুলবে।”

\* \* \* \*

যেদিন জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভাবের সামঞ্জস্য ও একীকরণে আয়ত্ত এক্য দেখা দিবে সমষ্টিগত বিরাট পুরুষের ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায়, সেদিন জগন্নাথের রথ জগতের রাস্তায় বাহির হইয়া দশদিক আলোকিত করিবে। সত্যযুগ নামিবে পৃথিবীর বক্ষে, মর্ত্য মানুষের পৃথিবী হইবে দেবতার খেলার শিবির, ভগবানের মন্দির নগরী Temple City of God—আনন্দপুৰী।

## আমন্ত্রণ \*

[ শ্রীঅরবিন্দের Invitationএর অনুসরণে ]

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ।

পাহাড়ে পাথারে মরুভূবক্ষে,  
ঝড় দুৰ্য্যোগ ভেদি' ছ'পক্ষে,  
একেলা চলেছি যাত্রী,  
ওরে, কে চড়িবি আয় তুঙ্গ শিখরে,  
ঝাঁপিবি তুফানে, দলিবি তুষারে,  
মথিবি তিমির রাত্রি !

মোর তরে নহে নগরীর নীড়  
বন্ধ দুয়ার আগল প্রাচীর  
আমি সে পথের পান্থ ;—  
শিরে মোর ছত্র বিরাট আকাশ,  
নীল মহিমায় করে যথা বাস,  
দেবতা সে নীলকান্ত !

বাদ মোর সনে ঝড় ঝন্ঝার,  
মরণ দোসর নশ্ব-সভার  
আমি বিজনে পেতেছি তত্ত্ব ;  
স্বাধীনতা আমি, দিব্য গর্ব,  
শৈলেশ-শির করেছি খর্ব—  
বজ্র ? সে মোর ভক্ত !

ওরে, বরিবি কে যদি জীবনে মুক্তি,  
বিরাটের মাঝে লভিবি ভুক্তি,  
বাধা বন্ধুর লজ্জি';  
রিক্তের বেশে ভীষণে ভেটিবি  
তবে রাজটীকা ভালেতে পরিবি  
তবে হবি মোর সঙ্গী !

---

\* এই কবিতাটি ইঙ্গিতের প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয়। ইহার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের সাধনার একটা বিশেষ অবস্থার পরিচয় আছে, তাই অরবিন্দ প্রসঙ্গে ইহার পুনরুক্তি করিলাম।



## অশেষের কথা

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু

ভগবান অনন্ত অনির্বচনীয়—অশব্দম্পর্শমরূপমব্যয়ম ; তাঁহার লীলাও অসীম, বিপুল অদৃশ্য—অনন্ত উদ্দেশ্য নীতি শক্তিজ্ঞান সৌন্দর্য্য সরসতায় তাহা বিধৃত । আবার তিনি নিত্যেনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং, তিনি অপানিনাদো-জ্বনোগ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষু স শুনোত্যবর্ণঃ । তাঁহাকে ধরিতে গিয়া মানুষ কবি হইয়াছে—অনন্ত সৌন্দর্য্যনীতির ব্যাখ্যা দিতে চাইয়াছে । কেহ হইয়াছে যুক্তিতর্কের ক্ষুরধার যজ্ঞবিশেষ, কেহ কোপীনবস্ত্রং খলুভাগ্যমন্তঃ ; আবার কেহ প্রেমে ভক্তিতে ঢলঢল-বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে । সর্বত্রই অসাধারণত্বের মানবীয় লাহুনা—মানুষের এক একটা দিকের, প্রতিভার এক একটা ধারার চরম অভিব্যক্তি-পরাকাষ্ঠা ; এবং তাহার বৈদগ্ধ্য আংশিক মানুষটি ফুটাইয়া তুলিয়াছে আত্মস্বরূপের বিশেষ ভঙ্গিমাটি ; দাঁড় করিয়াছে মতের পথের ছাঁটাকাটা, ধারাবদ্ধ ভাবের আকার ইঙ্গিত ।

সেই অনোরনীয়ান মহতোমহীয়ানের, সেই সত্যম্ জ্ঞানমনন্তং, সেই অব্যর্থ অনাহত অঘট-ঘটনপটীয়সী শক্তির হৃদিস্ পাইতে হইলে, জীবনে তাহাকে অবিকৃত অক্ষুণ্ণরূপে ফুটাইয়া ফলাইয়া ধরিতে হইলে, শুধু বাহিরে বাহিরে বুদ্ধির বিকাশ আনুগত্য সাধন করিয়া যুক্তিতর্কের কসুরত পায়তারা দেখাইলেই সার্থকতা মিলিবে না ; অথবা কবিত্বের উচ্ছ্বাসময় পরিণতিলাভ করিয়াও সে উদ্দেশ্যের বিশেষ কোন সিদ্ধি আসিবে না । আবার অন্তরঙ্গের কোন একটা শক্তির আত্যন্তিক বিকাশ সাধন করিয়া দার্শনিক নীটশে কথিত যে অতি-মানবতার পদবীলাভ করা যায়—তদ্বারাও ইহার কোন মহত্বলাভ হইবে না ।

ইহার পথ নীটশের রাজসিক অহঙ্কারের, দম্ভের—দানবীয় শক্তির অহুশীলনের মধ্যে নাই । ইহার পথ আছে ত্যাগে—মানুষের সর্বস্ব ত্যাগের মধ্যে ; আছে মানুষের

সমগ্র আধারটিকে সেই মহান আত্মাহার হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার মধ্যে । আধারের শুধু বিশেষ অংশকে নয়—শুধু বুদ্ধি চিত্ত বা প্রাণকে নয়—সম্পূর্ণ আধারটির যে বিভিন্ন রাস্তা, প্রেরণা বা কর্মসচিবগুলি তাহাদের সর্গীর্ণ ও হিসাবকরা সেবা দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে অহমিকার এক বিরাট সাম্রাজ্য, বাঁচাইয়া চলিয়াছে জীবনের এক অমুদার অবনত আদর্শকে, তাহাদের প্রত্যেকের অথবা সকলের সমবেত ধর্ম্ম অভিপ্রায়কে ছাড়িয়া দিতে হইবে উচ্চতর আত্মহা উচ্চতর আদর্শের হস্তে । শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন—  
There must be a total and sincere surrender ;  
There must be an exclusive self-opening to the  
Divine Power.....The Surrender must be  
total and seize all the parts of the being.....  
There must be in no part of the being, even  
the most external, anything that makes a  
reserve, anything that hides behind doubts,  
confusions and subterfuges, anything that  
revolts and refuses.

সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ডারউইন (Darwin) জগতের ক্রমোন্নতির মূলে যে বিবর্তনবাদের কথা বলিলেন, যে বিবর্তনবাদের তথ্য স্মরণাতীত কাল পূর্বে ভারতের দর্শন পুরাণ ভিন্নতররূপে প্রচার করিয়াছিলেন—বিজ্ঞান বিজ্ঞানিতানি—আধুনিক বিজ্ঞান তাঁহাকেই প্রামাণ্য ও অনুসরণ করিয়া স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতে চাহিতেছেন—যে, জগতের প্রত্যেক অণুতে (atom) প্রতিকোষে (cell) একটা সচেতন বুদ্ধি, একটা ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়া করিতেছে । এই মতানুসারে, সেই সচেতন শক্তি জড় হইতে উদ্ভিদ, উদ্ভিদ হইতে পশু—এইভাবে ক্রমান্বয়ে ক্রম বিকাশ সাধন করিয়া, পশুবস্থা হইতে বাঘ ও বানর ভাবের ক্ষয়সাধন করিয়া মানুষে রূপান্তরিত হইয়াছে ; উচ্চ বুদ্ধি ও নৈতিক বৃত্তিসম্পন্ন মানুষের পদবীলাভ

করিয়াছে। কিন্তু সে ক্রমোন্নতি প্রকৃতির ক্ষমতাধীন—  
প্রকৃতির ধর্ম ও জ্ঞান সাপেক্ষ।

বিজ্ঞানের এই অস্পষ্ট এবং ক্রমবর্তী সত্যকে শ্রীঅরবিন্দ  
দিলেন স্মৃতিস্তর সন্তুষ্টি। মানুষকে দিলেন সেই  
অনোরনীয়নে মহতোমহীয়ান চৈতন্যের, সেই সর্বগত অথচ  
সাক্ষীত্ব চৈতন্যময় মস্তুর দিব্য অংশীদারত্ব, দিব্য জয়শ্রী—  
তাহা সাধনের অনাবিল বিশ্বাস, নিরঙ্কুশ প্রজ্ঞা—পারগতার  
অপূর্ব অজ্ঞান সিদ্ধ ওজস্। অনেক সময় দেখা যায় কেন  
রাসায়নিক দ্রব্য (chemical solution) অস্ত্রান্ত বহু  
উপাদানের সমাবেশ করাইয়াও কোনরূপে দানা (crystal)  
বাধিতেছে না। কিন্তু যেমনি একজন বিশেষজ্ঞ রসায়নবিদ  
তাহাতে একটা অপূর্ব বস্তুর সংযোগ ঘটাইলেন, অমনি  
অতিক্রান্ত দানা বাধিয়া গেল। শ্রীঅরবিন্দ, মানবাধারের  
নানাভাবে অপূর্ণ, নিম্ন চেতনার মধ্যে পরা চেতনার  
(divine consciousness) অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ঘটাইয়া তাকে  
উৎকট পথানুসরণ, তুল্য নিয়তিচক্রের কবল হইতে দিলেন  
মুক্তি। মানুষকেই দিলেন দেবজন্মের অধিকার,  
নবজন্মে স্বীকা—To open ourselves to the Universal  
Sakti is possible to every one of us. সঙ্গে সঙ্গে  
জড় অণু, তদুর্জ—সকল অল্পমত অপূর্ণ সৃষ্টি, সকল অচেতন,  
অর্ধচেতন তামসিক সৃষ্টি-বস্তুলাভ করিল অথও সজীবতা—  
ক্রমোন্নতিতে অভিনব ক্ষমতা বিরাটতর দ্যোতনা। মানুষ  
পাইল আত্মস্বরূপের বৃহত্তর যোগসূত্র—বিপুলতর সার্থকতা।  
মানুষ বুঝিল যে, মানবীয় চৈতন্য ফুটিয়া এবং দিব্য  
চৈতন্যের ভাবে রূপান্তরিত হইতে হইতে যগন হয় পরিণত  
ভাগবত চৈতন্যে, তখনই মানুষের আসে দিব্যজন্ম।  
এইটাই চৈতন্যের উর্দ্ধগতি—এই প্রেরণা বা যোগপ্রক্রিয়ার  
চরমাবস্থায় ভাগবত চৈতন্যের মধ্যে মানুষের স্বাতন্ত্র্য-বোধ  
—অহংচেতনার নির্বাণ হয়। সত্য তাহার ব্যক্তিকে  
এক অসীম বিশ্বব্যাপী সত্যায় ডুবাইয়া বিলাইয়া দেয়, অথবা  
বিশ্বাতীত সত্যের সঙ্কিত এক অভিন্ন হয়।

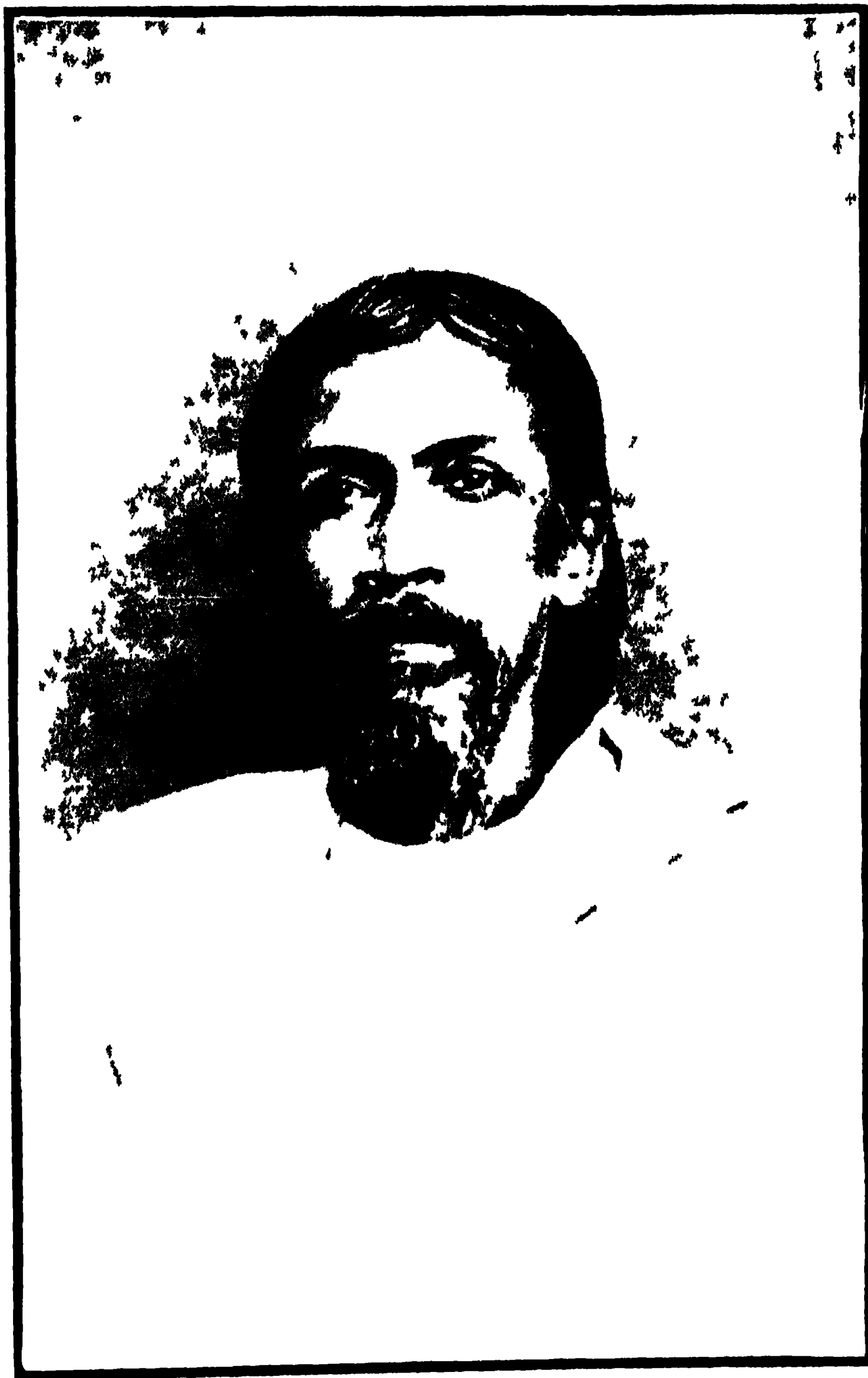
এইরূপে দিব্যসম্পূর্ণতার দ্বারা ইচ্ছামুক্তি হইতে সাধা-  
দিক বুদ্ধি তথা হইতে নৈতিকবুদ্ধি এবং অবশেষে মানুষের  
সমগ্র প্রকৃতিকে অধ্যাত্ম চেতনায় তুলিয়া ধরিবার যে

বিশেষত্ব তাহাতে বিকশিত হয় অশেষের ত্রিকালসম্ভাব্য  
শক্তি, খুলিয়া ধরে ত্রিকালজ্ঞ দৃষ্টি। দর্শন, বিজ্ঞান, কবিতা,  
মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি সমাজতত্ত্ব যুগযুগান্তর ধরিয়া যে সার্থক-  
তার সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, সে প্রশ্ন আকাঙ্ক্ষা  
করিতেছে তাহা সেখানে নীরব হইয়া যায়; পায় তাহাদেব  
চিরন্তন স্বরূপটি এবং তাহাদের অপূর্ব সমন্বয় সমাপানটি।  
সেই জন্ত বোধ হয় অনন্ত জ্ঞান পারাবারে লীলায়ত  
অর্থাত্ত্রিভাষ্যনার সূচনাটুকুমাত্র দেখিয়াই বিশ্বয়বিমূঢ়  
James Cousin লিখিলেন \* প্রায় দুই বৎসর পূর্বে  
New ways in English literature শীর্ষক আশ্রয়  
একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক মাস্ত্রাজে প্রকাশিত হয়। নূতন  
বই প্রকাশিত হইলে যেমন সকল সংবাদপত্রে পাঠান হইয়া  
থাকে, তেমনি আমার বইখানা ফরাসী ভারতব  
পণ্ডিতসমূহের আধ্য কাগজে সমালোচনার জন্ত প্রেরিত  
হয়। (অরবিন্দের) সমালোচনা তাঁহার “আর্য্যে” সেই  
সময়েই বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং আজও চলি-  
তেছে। আজ অবধি এই অপূর্ব সমালোচনার যতখানি  
ক্রমশঃ প্রবন্ধাকারে বাহির হইয়াছে, তাহা আমার সমা-  
লোচিত বইয়ের কয়েকগুণ বড়। তাহাতে আলোচিত  
জ্ঞানের তুল্যশিখর অনেক উচ্চে। ভবিষ্যতের কবিতা—  
“The future poetry” শীর্ষক এই সমালোচনা আলোচিত  
পুস্তকের সকল দীনতা মুছিয়া দিয়াছে; আমার পুস্তকে যাহার  
মাত্র সূচনা হইয়াছিল, এই সমালোচনায় তাহা সম্পূর্ণ সৌন্দর্যে  
গড়িয়া উঠিয়াছে; তাহার যে গভীরতার মাত্র উপর  
স্বরূপটি দিয়া আমার লেখালীলাপক্ষে উড়িয়া গিয়াছিল, সে  
অতলেরও এই আলোচনাতল পাইয়াছে। অরবিন্দেব  
লেখা আগার অসম্ভবশক্তি সত্যে পরিণত করিয়াছে,  
আমার ইচ্ছিতের সব পথটুকু পায় মাড়াইয়া সে তীর্থ যাত্রা-  
খানি সফল করিয়াছে। যাহা এক সময় অল্প একখানি গ্রন্থের  
গুণাগুণ বিচারে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা ভবিষ্যতে একদিন  
একখানি স্বাধীন গ্রন্থে পরিণত হইবে। সে ভবিষ্যত গ্রন্থ-

\* James Cousinএর এই উক্তিটি বারীন্দ্রকুমারের  
অধুনালুপ্ত “নারায়ণ” হইতে উদ্ধৃত।

ইঙ্গিত

শ্রীঅরবিন্দ



You have the word and we are waiting to accept it from  
you India will speak through your voice to the world  
Hearken to me

— Rabindranath





খানি ভাষা সম্পদে ইংরাজী গদ্য সাহিত্যের চূড়ামণিগণের সমতুল্য; কিন্তু তাহার অন্তর্দৃষ্টি ও ভবিষ্যদর্শনের শক্তি বা এই ভাগবতজ্ঞান সচরাচর ইংরাজী সমালোচনা সাহিত্যে কোথাও আমি আজও পাই নাই।

আমার এ কথাগুলি স্বার্থ সঙ্কল্পে নহে; কারণ অরবিন্দের লেখায় আমার বইখানির নামোল্লেখ মাত্র প্রথম অনুচ্ছেদেই শেষ হইয়াছে। আমার ক্ষুদ্র বইখানি এই শক্তির বৃকে ভবিষ্যৎ মুক্তার জননীরূপে বালুর কণাটুকু একরূপ উৎসের মুখে আবরণের উপলটুকু—এ যে সেই তুচ্ছ বস্তু যাহা পরম ধনের দুয়ার খুলিয়া দেয়। কিন্তু এ ঘটনায় ভারতের প্রতিভার গুপ্ত মন্দিরখানি আমাকে দেখাইয়া দিয়াছে। যে নব সৃষ্টির প্রতিভা ও তত্ত্বমর্মোদ্ঘাটনী কল্পনা শক্তি অতীতযুগে দর্শনের মূল তত্ত্বকথার অপূর্ণ মহাভাষ্যের রচনা করিয়াছে এবং কেবল ভারতের নহে, গ্রীস, চীন জাপানেরও নানামুখী সভ্যতা, সাধনা সাহিত্য ও কলার সৃষ্টি করিয়াছে, এই ঘটনায় আমি সেই শক্তির প্রকট লেখা দেখিয়াছি। আর ইহাতে সাহিত্যের সেই অনন্ত প্রসার ও বিস্তৃতির আংশিক সাক্ষ্য পাইয়াছি, যে জ্যোতি, সম্পদ ও বিস্তৃতি ইংরাজী সাহিত্যে গড়িতে গিয়া এই প্রতিভার ঋষিপ্রেরণা জগতের মনোরাজ্যের এক একচ্ছত্র ভাগবত সাম্রাজ্য রচিয়া দিবে।

যাহার কথা বলিতেছি সেই অরবিন্দ ঘোষ জন্মে বাঙ্গালী, যৌবনের পাঠ্যজীবনে Stepheno philipsএর সহচর এবং অধুনা পণ্ডিত্যরীতে স্বেচ্ছায় দেশান্তরিত। যে ঘটনায় তাঁহার দেশত্যাগ তাহা সৌভাগ্যক্রমে আজ অতীত ইতিহাসের একটি বিশ্বতপ্রায় পৃষ্ঠা বই আর কিছুই নহে। কিন্তু প্রধানতঃ সাধনার জন্ম অন্তরের দেবতার ডাকই তাঁহাকে দেশত্যাগ করাইয়াছে। এইটিই হিন্দুর চিরন্তন রীতি। তাঁহার সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই, কিন্তু সেসৌভাগ্যে ভাগ্যবান লোকে বলেন যে অসাধারণ গুণে গুণী এই মহাজনের চক্ষে অন্তর্জগত নিত্য দীপ্যমান, তাঁহার চরিত্রে অপূর্ণ সমগ্র ও মাধুরীর সান্নিধ্য ঘটিয়াছে, এবং সাধনলব্ধ শিবজ্ঞান তিনি জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে দিতে সদা প্রস্তুত।

দর্শনের যে মূলতত্ত্বগুলিরদিকে ইউরোপীয় দর্শন আয়াসে শনৈঃ শনৈঃ যাইতেছে, অরবিন্দের “আর্য্য” পত্রিকায় সেগুলির পূর্ণ নির্দেশ আমরা পাই। সাপেক্ষিক জগতের যে তত্ত্ব ইন্সটিন্ (Ainstein) আবিষ্কার করিবার পরে দুই দশ দিনের মধ্যে মজলিসে নাড়াচাড়া পাইয়া বিশ্বতির অতল-গর্ভে বিসর্জিত হইল, ভারতের এই মজলিসে দার্শনিক কবির কাছে সে তত্ত্ব জীবনের রসস্বরূপ, শুধু বিচারের বস্তু নহে—পরন্তু জ্ঞানের বস্তু, শুধু মস্তব্যোর বস্তু নহে—কিন্তু জীবনে রূপান্তরিত করিবার সামগ্রী।... ..

তাঁহার চক্ষে ভগবান কেবল মতবাদ মাত্র নহেন, তিনি সজীব ও আত্মময় অপরোক্ষানুভূতির যত উপায় ও পন্থার কথাই তাঁহার লেখায় আপু্যমান সমৃদ্ধবৎ রহিয়াছে।... ..

নীটশের অতিমানবতার বিকাশের নিমিত্ত শ্রীঅরবিন্দ সংসারে আসেন নাই, তাহার জন্ম তাঁহার কোন তপস্যার প্রয়োজন ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের প্রকৃতির সহিত যাহারা ছিলেন পরিচিত, তাঁহারা সম্যক জীবনে যে কি প্রচণ্ড শক্তির উৎস হইতে সে প্রকৃতি ছিল উৎসারিত, কি বিপুল গতির তোড়ে সে প্রকৃতি নিনাদিত—সে প্রবাহ ছিল পরিপ্লুত অব্যর্থ। তাহা ছিল নীটশের অতি মানবতার উর্দ্ধ-তর বস্তু আত্যন্তিক শক্তির উপযুক্ততা হইতে বলবস্তুর কিছু। তাই না বিস্মিত রবীন্দ্রনাথ তাঁহার হৃদয়ের বিমুগ্ধতায় অনুপম অর্ঘ্যের রচনা করিয়াছিলেন :—

“অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি তুমি।”  
আবার ঐন্দ্রজালিক পুরুষের মত অলৌকিক কীর্তির কসুরতের নিমিত্ত, কিম্বা রাজনীতি, দার্শনিকতা, কবিত্ব, নৈতিকতা প্রভৃতির দুই একটির চরম সিদ্ধি, চরমোৎকর্ষতা বা চরম অভিব্যক্তি—পরাকাষ্ঠার নিমিত্তও শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব হয় নাই। সেগুলি তাঁহাতে পাইয়াছে অপূর্ণ সমন্বয়, অভূত সামঞ্জস্য; বিকাশ করিয়াছে মহন্তর অর্থ, বিপুলতর সার্থকতা। সেখানে কত তত্ত্ব কত তথ্য, কত ভঙ্গী কত লাস্য, কত রাগ কত ছটায়, কত দীপ্তিতে দ্যুতিতে, কত বর্ণ গন্ধে, কত প্রভায় বিসারে অশেষের সে শতদল পদ্মটী যে ঝলসিয়া উঠিয়াছে—কে তাহার ইয়ত্তা করিবে।

মনে হয় মনীষী পল রিশারের (Paul Richard) সেই উক্তিটা কতখানি সত্য, যখন প্যারিসের কোন এক রেষ্টো-রায় (Restaurant) জনৈক ফরাসী বিদুষীৰ সহিত আলাপ প্রসঙ্গে \* শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :—“জগতে এত বড় আধার আমি কোথাও দেখি নাই ; একাধারে এত বিভিন্ন বিচিত্র শক্তির সমাবেশ ও বিকাশও আমি আর কখন কল্পনা করিতে পারি নাই। শ্রীঅরবিন্দ কি না হইতে পারিতেন। কিন্তু এই সব নিশ্চিত সম্ভবনাকে নিশ্চিত যশ একছত্র পতিত্ব তিনি ছাড়িতে পারিলেন, নিতান্ত অনি-

শ্চিতের সন্ধানে।” প্রত্যুত্তরে ফরাসী মহিলাটি বলিলেন “কিন্তু অনেক ভারতীয় যোগীকেই এই রকম ছাড়িতে দেখা যায় ?” পল রিশার বলিলেন “কিন্তু তাঁহারা যোগী ছাড়া যে অন্য কিছু হইতে পারিতেন তাহার ত কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ—আজও যদি মুহূর্তের জন্তও তিনি একবার কৰ্মক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়ান, তাহা হইলে কবির রাজনীতিকের দার্শনিক, সংস্কারকের সকলের প্রতিভাই পাণ্ডুর হইয়া যায়।”

\* এই প্রসঙ্গটি বোধ হয় দিলীপকুমারের “ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকায়” আছে।

## শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅবনী নাথ রায়

শ্রীঅরবিন্দ আমার কাছে শুধু একটি নাম মাত্র, তাঁকে কোনদিন চোখে দেখিনি, জীবনে যে দেখতে পাব এমন আশাও নেই। কেননা শুনেছি পণ্ডিতের আশ্রমে সম্বৎসরে মাত্র ২ দিন তাঁর লাক্ষ্য পাওয়া যায়। বাকি ৩৬৩ দিন তিনি ঘরের মধ্যেই থাকেন, কেউ তাঁকে দেখতে পায় না।

কিন্তু তবু কেমন ক’রে জানিনে এই নামটার চারিদিকে একটা গভীর শ্রদ্ধা এবং প্রীতি পুঞ্জিত হ’য়ে আছে। কিছু না জেনেই নিঃসন্দেহে যেনে নিয়েছি তিনি পণ্ডিতের আশ্রমে দারুণ তপস্চর্যায় ব্যাপ্ত আছেন। এই তপস্যার ফলে দেশের তথা মানুষ্যের মুক্তি হবে কিনা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারিনে কিন্তু এ-কথা নিশ্চিত জানি যে শ্রীঅরবিন্দ সেখানে যে সাধনায় নিমগ্ন আছেন তার উদ্দেশ্য সামান্য নয়, তার ফল কেবলমাত্র বর্তমান কালেই সীমাবদ্ধ নহে।

এ ধরনের মনোভাবকে নিছক উচ্ছ্বাসময় মনের প্রতীক ব’লে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। বরঞ্চ আমার বিশ্বাস এর মধ্যে দিয়ে ভারতের চিরন্তন তপস্তার আদর্শের প্রতি একটি সুনিবিড় প্রদীপ প্রকাশ পায়।

ভারতের আদর্শ যে ত্যাগ, ভোগ নয়, এ কথা চিরদিনের জন্তে স্থির হ’য়ে গেছে। বিংশ শতাব্দীর এত বড় ভোগমুখী সভ্যতাও আমাদেরকে ভোগের মত্তে দীক্ষিত করতে পারেনি। সারা জীবন বাড়ীর উপর বাড়ী তৈরী ক’রে, গাড়ীর উপর গাড়ী কিনে, এখানে বড়ো বয়সে কেউ আত্মহত্যা করে না। বরঞ্চ সারা জীবন ধরে অর্থোপার্জন ক’রে বড়ো বয়সে সর্বস্ব দান ক’রে যায়, এখানকার

যুবকেরা যৌবনে ফকিরী নেয়। অর্থোপার্জনের ফাঁকে ফাঁকে এখানকার ধনিকের মন প্রকৃতির উন্মুক্ত স্পর্শ পাওয়ার জন্যে লালসায়িত হ’য়ে ওঠে। এ-ই ভারতের ঐতিহ্য, কারোর ক্ষমতা নেই একে উল্টোয়।

না হ’লে শ্রীঅরবিন্দের নামে উল্টা পাণ্টা কথা শুনেছি কম নয় কিন্তু কোন দিন তা মনের উপর রেখাপাত করতে পারেনি। তিনি যে এই সব বিশ্ব-নিন্দুকের চেয়ে অনেক বড়, তিনি যে যোগী, তিনি যে ত্যাগী, তিনি যে সত্য-সন্ধানী, তিনি যে মুমুক্শু, এতে ত আর কোন ভুল নেই। তাঁর মত জলন্ত প্রতিভা আমাদের দেশে ক’জন জন্মেছেন? এ প্রতিভা বিভ্রান্ত হ’তে পারে না। যারা নিন্দুক, যারা অবিশ্বাসী, যারা ব্রণধর্মী তাদের হাত থেকে কারোর কোনদিন পরিজ্ঞান নেই। নিজেদের বিজ্ঞাবুদ্ধি সাধনা চিন্তাশক্তির দিকে তাকিয়ে কথা বলে না বলে কোন কথাই এদের মুখে আটকায় না। কিন্তু জগতে যা সত্য তা চিরকাল সত্যই থেকে যায়—নিন্দা পরীবাদের সাধ্যও নেই তাকে এতটুকু স্নান করে।

আজকের দিনে ভারতের এই যোগীরূপী সাধকের দীর্ঘজীবন কামনা করি। তাঁর ভিতর ভারত-মাতৃকার যে বিশিষ্ট রূপ দেখা দিয়েছে তা আমাদের গৌরবের বস্তু। ভারতের ভাগ্য-বিধাতার কাছে আমি দিনরাত প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে এই মহাপুরুষের দেশবাসী এবং সমকালবর্তী বলে পরিচয় দেবার অধিকারের উপযুক্ত ক’রে গড়ে তোলেন।

# শ্রীঅরবিন্দের সেবায়

শ্রীরতিকান্ত পালিত

শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে, কিছু বলতে যাওয়া আমার সাজে না; তাঁর সম্বন্ধে কিই বা জানি আর কিই বা বলতে পারি? তাঁর বিরাট জ্ঞানের কথা, অনন্তসাধারণ সাধনার ইতিহাস, তাঁর মহামানবত্বের কথা, দেবত্বের কিম্বা ঐশীত্বের কথা, তাঁর ভক্ত খাঁরা, শিষ্য খাঁরা, শ্রীঅরবিন্দকে খাঁরা জানতে চেষ্টা কোরেছেন তাঁরাই বলতে পারেন। শ্রীঅরবিন্দকে আমি নররূপেই দেখেছি,—তাকে শ্রদ্ধা কোরে, ভালবেসে, তাঁর সেবা কোরে যে অপার আনন্দ পেয়েছি,—সে কথাই সামান্য বলতে পারি। শাস্ত্র আমি পড়িনি, ধর্মের উপদেশ আমার জানা নাই, ভগবান আছেন কিনা সে সম্বন্ধে আমি একেবারে অজ্ঞ, কাজেই শাস্ত্রমত তিনি যে কতটা ধার্মিক, দেবত্বের লক্ষণ তাঁহাতে কতটা পরিস্ফুট, জগৎকে তিনি ত্রাণ করবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন কিনা, কিম্বা তিনি নররূপী ভগবানের সাক্ষাৎ বিগ্রহ, এসব চুলচেরা ভাগ করে, বিচার করে দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব।

শ্রীঅরবিন্দকে আমি দেখেছি করুণাময় পালক, স্নেহময় পিতা, অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁর চাঁপা ফুলের মতো আঙ্গুলগুলিকে আমি ভালোবেসেছি, পদ্মের পাপড়ির মতো নরম পা দুখানিতে মাথা দিয়ে তৃপ্তি পেয়েছি, দুধে আলতায় মেশানো গায়ের রঙ দেখে মোহিত হয়েছি। তাঁর ঘর ফুল দিয়ে সাজিয়ে, তাঁর জন্তে রান্না করে, বাসন মেজে যে অতুল আনন্দ পেয়েছি তা ঠিক ভাষায় বোঝাতে পারবো না। তাঁর সেই স্বপ্নলোকের চাহনি আমার দিকে ফেরালে অন্তর আলোকিত হয়ে উঠেছে, তাঁর করম্পর্শে আমার সমস্ত শরীরে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেছে। তাঁর পায়ের তলায় বসলে ইচ্ছা হয়েছে ঐ পা দুটি আমার বুকে জড়িয়ে ধরি। নিকটতম, প্রিয়তম বন্ধুর কাছে যে সব ক্রটি বিচ্যুতির কথা কখনও বলতে পারিনি তাঁর কাছে সে সব কথা না বলে

আমার তৃপ্তি ছিল না। কত বাজে কথা, আবোল তাবোল ভাবে তাঁর কাছে বলে গেছি, কত আবদার করেছি তিনি পরম স্নেহে সে সব শুনে গেছেন।

বোধ হয় সেটা ১৯২২ সাল যখন একদিন কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে গেছিলাম তাঁর কাছে। খুব একটা বৈরাগ্যের তাড়ায় কিম্বা ধর্মলাভের আশায়, কিম্বা বড় নামজাদা লোকের শিষ্য হবো, কি মহাপুরুষ দর্শন করবো, ভগবানের বিভূতি দেখবো, কি বড় একজন সাধক হবো এ সব কোন idea আমার মাথায় ছিল না, তাঁর সম্বন্ধে তখন কিছুই জানতাম না, কিন্তু যে আকর্ষণে তাঁর কাছে ছুটে গেছিলাম, জগতের সমস্ত বস্তু তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ ছিল এবং তখন থেকে বোধ হয় ১৯২৮ সাল অবধি তাঁর কাছে থেকে এবং শুধু তাঁর সেবা করে যে আনন্দ পেয়েছি, যে তৃপ্তি পেয়েছি, সেটাই আমার জীবনের সব চেয়ে বড় পাওয়া। আমার বিশ্বাস যে আমি ভুল করিনি।

তিনি যে কি তা আমি জানি না, জানবার জন্য চেষ্টাও করিনি। মাতৃমের মতই তাঁকে দেখেছি, তাঁর কাছে নিজের অভাব অভিযোগের কথা অকপটে বলেছি, কোন ভয় করিনি, দ্বিধা হয়নি, কুণ্ঠা হয়নি।

যা দেখেছি তাঁর সম্বন্ধে সব কথা বলবার ক্ষমতা আমার নেই। দুই একটা সাধারণ ঘটনার কথা অতি সাধারণ ভাবেই বলতে পারি। শ্রীঅরবিন্দের জন্য রান্না করবার অন্তিমতি আমি নিয়েছিলাম; উচ্ছে, লাল আলু, বিলাতী বেগুন, কুমড়া, সজনে ডাঁটা, ঝিনে, কাঁচকলা সম্মিলিত, ফরাসী কায়দায় পারীয়া রাঁধুনির যে ভোজ্য তিনি ১৭ বৎসরকাল পরমানন্দে খেয়ে এসেছেন তাঁর পরিবর্তে আমার অশিক্ষিত, অপটু হাতের রান্না যে তাঁর কি ভোজ্য হতো তা আমি

জানিনা কিন্তু তাঁর জন্ম রেঁধে, তাঁকে খাইয়ে আমার অতুল আনন্দ হতো এবং সে আনন্দ থেকে তিনি আমায় বঞ্চিত করেননি। তিনি যে কি ভালোবাসেন, কি ভালোবাসেন না সে খবর আমি জানতাম না। নিজের ইচ্ছামত ও পছন্দমত যা কিছু তৈরী করে দিয়েছি তিনি তাই খেতেন, ফিরিয়ে দিয়ে তিনি কখনও আমায় ব্যথা দেননি। শুনেছিলাম তিনি ফুলকপি ভালবাসেন তাই ফুলকপি রান্না করতে আরম্ভ করেছিলাম। দুদিন পরে তিন দিনের দিন তিনি প্রশ্ন করে পাঠালেন ফুলকপি কোথা থেকে এসেছে, আশ্রমের সকলের জন্ম তো ফুলকপি রান্না হয়নি। আশ্রমের সকলের জন্ম রোজ যা রান্না হতো তার এক ডিস করে প্রত্যহ তাঁর কাছে নিয়ে যেতে হতো। এর বেশী বাড়তি কোন জিনিষ গেলেই তাঁর প্রশ্ন আসতো কোথা থেকে এটা এলো। হাত খরচের টাকায় যে কপি কিনেছিলাম এটা যখন তাঁর অবিদিত রইলো না তখন কপির ডিশটি ফেরত আসতে লাগলো। তিনি চাইলেন না যে তাঁর জন্ম আলাদা করে দুচার আনাও খরচ করা হয়। যা সকলে খায় তিনিও শুধু সেই টুকুই গ্রহণ করতেন। অথচ তাঁর ঘরে গিয়ে দেখেছি তাঁর বিছানার চাদর তালি দেওয়া, ছেঁড়া কাপড় পাট করা, এক কোটা সাধারণ মাজনে তাঁর ২৩ মাস যায় আমরা ধুতি ছেঁড়ার আগে পেতাম নূতন ধুতি নূতন চাদর, প্রতিমাসের প্রথম দিনে ছতিন খানা সাবান, উৎকৃষ্ট টুথপেস্ট, Shampoo Powder, সুগন্ধি তেল। প্রতি বছর কত ভক্ত তাঁকে বহরমপুরের গরদ, কাশীর সিক, শান্তিপুরের জড়িপাড় কাপড়, অন্ধদেশের উৎকৃষ্ট খদর দেয়, কিন্তু তাঁর অঙ্গস্পর্শের সৌভাগ্য সেগুলির কচিং ঘটে। বিরাট ভোগ, বিপুল ঐশ্বর্য, অজস্র উপকরণ তাঁর পদতলে পড়ে রয়েছে সব সময়ে, অথচ তিনি পূর্ণ উদাসীন। তাঁর এ নির্লিপ্ততার কথা, উদাসীনতার কথা সেখানকার শিষ্যদের অবধি জ্ঞানবার সুযোগ হয়না কারণ তাঁর ঘরে প্রবেশের অধিকার কারো নেই।

খুব সম্ভব সেটা ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাস যখন পূর্ণতম Conquest এর জন্ম শ্রীঅরবিন্দ outer activityর

থেকে retire করলেন। তখন শিষ্যরা, ভক্তরা আর তাঁর দেখা পেলোনা। তাঁর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ, তাঁর উপদেশ সর্গে শুনবার অধিকার তারা হারালো। তখন মীরা দেখা দিলেন মাতৃরূপে। বৃক্ষ মহীরূহ থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্রতম অপোগণ্ডগুলি অবধি তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে পড়লো না। প্রত্যেককে তিনি স্নেহছায়ায় ঘিরে ফেলতে চাইলেন—শুধু তাই নয়, যারা বাইরে ছিল তারা ভিতরে এলো, খাওয়া দাওয়া থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক বিষয়ে সুন্দরভাবে বন্দোবস্ত হলো, প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে তার ছোটখাটো অভাব অভিযোগগুলো অবধি তিনি নিজে দেখে দূর করে দিতে থাকলেন। সম্মিলিত ধ্যানের বন্দোবস্ত হলো, খবরের কাগজ পড়ার ঘর হলো, লাইব্রেরী ডাক্তারখানা ইঞ্জিনিয়ারীং বিভাগ সব কিছু হলো, প্রত্যেক বাড়ীতে বাগান হলো, তিনি প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে বসতে লাগলেন। ছুঁচ হতো থেকে আরম্ভ করে Stamp Post Card অবধি প্রত্যেকে তাঁর কাছ থেকে পেতে লাগলো। রাত সাড়ে তিনটা থেকে আরম্ভ করে রাত দুটো আড়াইটা অবধি তিনি একটানা পরিশ্রম করে গেছেন। প্রত্যেকের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের দেখে আসা, অভাব অভিযোগ শোনা থেকে ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারী, বেকারী, Carpentry কোন কিছু তাঁর মনোযোগের বাইরে রইলোনা। সবাই তাঁকে মায়ের মত দেখতো কিনা জানিনা কিন্তু তিনি প্রত্যেককে এমন কি বি, চাকর বেড়াগগুলোকে অবধি মায়ের মতন ভালোবাসায় ঘিরে ফেললেন। এ সময়ে তাঁকে যা পরিশ্রম করতে দেখেছি তা অদ্ভুত—ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস একটানা অক্লান্তভাবে খেটে যাচ্ছেন—অথচ শরীরে স্নানিমার লেশমাত্র নেই, মনে অবসন্নতার ছায়াটুকুমাত্র নেই, হৃদয়ে বিরক্তির আভাস নেই। পঁচিশ জন লোক, পঞ্চাশ রকম ইচ্ছা, পঁচিশো রকম অভাব অভিযোগ নিয়ে তাঁর কাছে গেছে, তিনি সকলকে পরম যত্নে, পরম আদরে শান্তি দিয়েছেন, আনন্দ দিয়েছেন সুন্দরভাবে উপদেশ দিয়েছেন। যাকে সবাই তুচ্ছতম বলে



অবহেলা করতো তাঁর স্নেহে সে হয়ে উঠেছে প্রকাণ্ড শক্তিময়, যে ছিল নীরস, শুষ্ক, যার হৃদয়ের সন্ধান পাওয়া যেতোনা তাঁর ভালোবাসা পেয়ে সে হয়েছে হৃদয়বান, সরস, স্বকুমার।



মৌরা The Mother

তাঁর কাছে কেউ ছোট বলে অবহেলার পাত্র ছিলনা। তিনি সকলকে সমান স্নেহে, বরং দুর্বলকে অধিকতর স্নেহে কোলে টেনে নিয়েছেন। একটি বিড়ালের অস্থখ হোলে সারারাত ধরে তার পরিচর্যা কোরেছেন। তাঁর হৃদয়ে স্নেহ অতি অপূর্ণ। ইয়া, যা বল্ছিলাম তাঁর অদ্ভুত কল্পের কথা। ঐ অপরিসীম পরিশ্রম অথচ তাঁর আহার ছিল না নিদ্রা ছিল না। বহুলোক সন্দেহ করেছে, আমার কাছে এসে প্রশ্ন করেছে যে তিনি কিছু খান কিনা। সন্দেহ তাদের হওয়া স্বাভাবিক—তারা তো মানুষ, কিন্তু তারাই আবার মার সম্বন্ধে বলতো যে তিনি মহাশক্তি। তিনি সব জানতেন কিন্তু কখনও বিরক্ত হননি, তাঁর অতুল ভালোবাসা দিয়ে সকলের হৃদয়ের কালিমা দূর করে দিতে চাইতেন।

কতটা সক্ষম হয়েছেন বলতে পারি না কিন্তু তাঁকে বিরক্ত হতে দেখিনি, ধৈর্য্য ছিল তাঁর অপরিসীম। আহার বা নিদ্রা-ত্যাগ করা যে খুব বড় শক্তির কথা এটা আমি মনে করি না; বনেজঙ্গলে এমন সাধু সন্ন্যাসী আছেন যাদের ভাগ্যে কচ্ছিং আহার জোটে। হঠযোগী কিছুদিনের জন্ত আহার ত্যাগ করতে পারেন। কোন কোন পশুও কিছুকালের জন্ত নিরাহারে থাকতে পারে কিন্তু বিনা আহারে বিনা নিদ্রায় এত পরিশ্রম কোন শরীরধারী জীবের পক্ষে যে সম্ভব এটা আমি আর কোথাও দেখিনি। বয়স তাঁর প্রায় ৫০।৫৫ অথচ শরীর যে শুধু অম্লান তা নয় জ্যোতির্ময়, শক্তিতে ভরপুর।

দর্শন, সাহিত্য, কাব্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, কোন্টার নাম করবো, কোন্ বিষয়টি যে তাঁর জ্ঞানের বাহিরে, তার ঠিক পাইনি। কোথায় কোন্ সৃষ্টিাত্মক জীবানু মানুষের অনুবীক্ষণযন্ত্রে প্রথম ধরা পড়ে গেছিল, দূর গগনের কোন্ ক্ষুদ্রতম তারকাটি কিভাবে চলতে চলতে কি রঙের আলো দিল, কোন্ পরমাণুটির কেন্দ্রে কি বিশ্বসংহারী শক্তি নিহিত আছে, কোন্ বিষয়ে কোন্ মনোযৌর কি মত; এ সব তাঁর নখদর্পণে। সাক্ষ্যবৈঠকে অগ্নের আলোচনা তিনি এমন নীরবে শুনে যেতেন, যে যেন সেই সম্বন্ধে তাঁর কিছু জানা নেই, কিন্তু তর্কের মীমাংসাসাচ্ছলে যখন দু'একটি কথা বলতেন, তখন মহা পাণ্ডিত্যভিমानी ব্যক্তিও তাঁর অদ্ভুত জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে বিশ্বয়ে স্থধু নির্ম্মাক হোয়ে যেতো। সকলের সঙ্গে কথা কহিতেন এত সহজভাবে, তাদের মত হোয়ে যে বোঝবার উপায় থাকতো না, তিনি তাদের চেয়ে প্রতি বিষয়টিতেই কত বড় জ্ঞানী। উপদেশ বড় একটা দিতেন না, আদেশ কাউকে কোনদিন করেন নি,—সেখানে সকলেরই ছিল পর্যাপ্ত স্বাধীনতা। বসন, ভূষণ, আহার বিহার থেকে সাধনা করা, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী করতো। নিজ নিজ আধার অনুযায়ী যে প্রত্যেকে পূর্ণতর মানুষে বিকশিত হয়, এটাই ছিল তাঁর ইচ্ছা।

শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিত্বের আদর্শ এত মহান, যে সে পথে চলা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য নয়, অসাধ্য। শ্রেষ্ঠতম মানুষ

বুদ্ধির ভিত্তির উপর মনোবাজ্যের উর্দ্ধতম লোকের জ্ঞানের (Supermind) প্রতিষ্ঠা, চঞ্চল প্রাণকে সংহত করে বিরাট অক্ষরশক্তি কেন্দ্রে পরিণত করা জরামরণশীল ভঙ্গুর দেহের প্রতি অণুপরমাণুটিকে স্থির আলোয়, অবিচলিত শক্তিতে, অখণ্ড আনন্দে রূপান্তরিত করা বোধ হয় মানুষের সাধ্যের অতীত। তিনি তাঁর এই বিরাট অভিযানে কোন্ আদর্শ অনুযায়ী মানুষ বেছে বেছে নিচ্ছেন, সেটা বোঝাও যায় না। হয়তো সর্বব্যাপী সন্ন্যাসী, কি বুদ্ধিমান বিদ্বান তাঁর পক্ষে

হোয়ে গেল unfit আবার হয়তো জগতের চক্ষে, ক্ষুদ্রতম, তুচ্ছতম ব্যক্তিও তাঁর আশ্রয় পেয়ে কৃতার্থ হোয়ে গেল।

শক্তির কথা, তাঁর প্রচেষ্টার কথা, সাধনার কথা কিছুই আমি বলতে পারবো না—তবে আমি দেখেছি এবং আমার স্থির বিশ্বাস যে নিজের অন্তত চেষ্টায়, অনন্তসাধারণ ধৈর্যে তিনি হয়েছেন অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী, পূর্ণতম আনন্দলোকে তাঁর বসবাস, অখণ্ড শান্তি তাঁর করায়ত্ত, শক্তির রাজ্য তাঁর পদতলে।

## শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে ফ্রান্সের মহামনীষী রোমাঁ রোল্যান্স

“India on the March নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

“Here comes Aurobindo Ghose, the completest synthesis that has been realised to this day of the genius of Asia and of the genius of Europe. The West which has been complacently picturing to itself an Orient passive, static, quietist will be surprised to see India surpassing us very soon in the zeal for progress and of activity. If with Ramkrishna, Vivekananda and Ghose, she retires at times into the farthest retreats of her thought, it is only to take a spring and bound forward further to the front. And the last of the great Rishis holds in his hand, in firm unrelaxed grip, the bow of creative energy.

“তারপর অরবিন্দ ঘোষের কথা। এশিয়া ভূখণ্ডের এবং ইউরোপের—এই দুই মহাদেশের প্রতিভার পরিপূর্ণতম মিলন আজ পর্যন্ত এই এক অরবিন্দ ব্যতীত আর কাহারও মধ্যে দেখা যায় নাই। যে পাশ্চাত্য দেশ প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে এক ছবি মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল যে সে দেশ শান্ত, নিষ্ক্রিয়, কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে উৎসাহহীন, সেই দেশই ভারতবর্ষের কর্মশক্তি এবং উন্নতির উন্নত আগ্রহে আমাদের দেশকেও শীঘ্র অতিক্রম করিয়া যাওয়ার সাধনা দেখিয়া বিস্মিত হইবে। যদি কাহারও মনে এই ধারণা হয় যে কখনো কখনো রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ কিংবা শ্রীঅরবিন্দের সহিত ভারতমাতৃকার স্বরূপ চিন্তার অতল গহনে লুকাইয়া থাকিতেছে, তবে তাহার অর্থ এই যে সে পুনরায় একটি স্ববৃহৎ লক্ষ্য প্রদান করিয়া সমস্ত উন্নতির চেষ্টার পুরোভাগে স্থান গ্রহণ করিবে বলিয়াই এরূপ করিয়াছে। আর ইহাদের মধ্যে যিনি সকলের শেষ ঋষি তাঁহারই অশিথিল মুষ্টিতে ধরা আছে স্বজনপটু শক্তির ধন।

## রস-বোধ

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী

ফুল যখন ফোটে তখন সে আত্মসমাহিত ভাবে আপনার বিকাশের মাদকতা নিয়েই ফোটে; সৌন্দর্যের বর্ণাঢ্য সুষমায় মানুষের চিত্তকে বিশ্বয়বিমুক্ত করে তোলবার অপেক্ষা সে কোনদিনই রাখে না কিন্তু মানুষ তার স্বাভাবিক প্রবণতা দিয়ে ফুলকে ভালোবাসতে শেখে এবং অনুভূতির মাধ্যমে তাকে মনঃচক্ষে লোভনীয় করে' তোলে। মানুষের অন্তরের এই স্বভাব-জাত প্রবণতারই নামান্তর রস-বোধ।

রস-বোধের মূলে রয়েছে দুটি উপাদান একটি বহির্মুখী অপরটি অন্তর্মুখী। ফুলের বিকাশোন্মুখ আকুলতা বহির্মুখী, মানুষের হৃদয়ে তার শোভাবিস্তার অন্তর্মুখী। এই বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী বৃত্তি দুটোর একত্র সংমিশ্রণে যে বস্তুর উদ্ভব হয় তাকেই রস-বোধের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে।

একটু সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে বিচার কর্তে গেলে দেখতে পাবো উপরোক্ত বহির্মুখীনতার ধারার ভেতর এমন একটি গতি আছে যা হৃদয়ের কূল স্পর্শ করে' যায়। ফুলের বিকাশের বেদনায় যে তদুগত ভাব ও আত্মস্থ অবস্থা সৃচিত হয় হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে তার একটু নিকট সম্বন্ধ আছে বলতে হবে। এই বিশিষ্ট গতিটিকে বহির্মুখীনতার একটি উপধারা বলা চলে। অপর পক্ষে উল্লিখিত অন্তর্মুখীনতার ভেতর আবার এমন একটি বাহ্যিক এবং ব্যবহারিক ক্রিয়ার আভাস পাওয়া যায় যে, তাকে ও অন্তর্মুখীনতার উপধারা হিসেবে নেওয়া চলে। ফুলের বর্ণ-বৈভব, অনুপম গন্ধ মানুষের অন্তরকে স্নিগ্ধ প্রীতিরসে উচ্ছ্বসিত করে' দ্যায় সন্দেহ নেই, কিন্তু এই ভালো লাগাটা বহিরিচ্ছিন্ন-সাপেক্ষ। সুতরাং স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি একই অবস্থায় দুটো জিনিষ বেশ সুন্দর ভাবে Balanced হয়ে আছে। অন্তর্মুখীনতা ও বহির্মুখী-নতার অবতারণা কর্তায় এই কারণে যে, পরে আদর্শবাদী

রস-বোধ ও বস্তু-তাত্ত্বিক রস-বোধের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের সূত্র যোজনা করা হয়ত আগার পক্ষে কঠিন নাও হতে পারে।

যে প্রেরণায় অতি নিরক্ষর ব্যক্তিও কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে তামাসা দেখতে ছুটে যায় তার মূলে রয়েছে আন্তরিক রস-বোধ। রস-বোধ সবারই ভেতর অল্পবিস্তর গোপন আছে। বাইরের কোন বস্তুকে উপলক্ষ্য করে সময় সময় ত' তা উৎসারিত হয়ে উঠেই, তা ছাড়া পরস্পর মনের মাধুর্য অনুভব করি রস-বোধের সাহায্যে। সুতরাং অনুভূতির সঙ্গেও রস-বোধ অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে আছে। বস্তুতাত্ত্বিক রস-বোধ ব্যবহারিক জগতকে আর আদর্শবাদী রসবোধ অন্তরের অনুভূতিকে কেন্দ্র করে নিজ নিজ রূপকে মূর্ত্ত করে' তুলছে। একের রাজ্য বাহ্যিক ক্রিয়ায়, অপরের রাজ্য কল্পনায়।

রসবোধকে সূক্ষ্মভাবে বিচার কর্তে গেলে তার একটা স্বতন্ত্র মানদণ্ডের প্রয়োজন। সাধারণ বিচারে যে যে প্রক্রিয়া ও প্রয়োগ অপরিহার্য মনের এই রস-বোধনির্দারণের দিকটাতে তাদের সাক্ষাত মেলে না। তাই রস-বোধ নির্দারণ করাটাকে ঠিক বিচার বলা চলে না। পরস্পরের অন্তরের সহানুভূতির কমনীয়তায় যে স্পর্শব্যাকুলতা ফুটে উঠে তাকে বিচারের পরিবর্তে রহস্যোন্মোচন বলাটাই সমীচীন হবে। বাস্তবিক একের অনুভূতির কষ্টপাথরেই অন্যের অনুভূতি যাচাই করে নিতে হয়। এই অনুভূতির ঐক্যই মানুষের অন্তরে রস-বোধ জাগ্রত করে' তুলতে সহায়তা করে।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-সাহিত্য তাঁর যে রূপটি আমা-দের চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে ধরা দ্যায়, তার ভেতর

ছিত্রাঘেবী সমালোচক-প্রবৃত্তির নাম গন্ধও নেই—আছে অপরিমেয় সহানুভূতির মধুরিমা। অনুভূতির করুণ মাধুর্যে সমস্ত জিনিষই তাঁর চক্ষে রস-স্বন্দর হয়ে দেখা দিয়েছে। রুক্ষ রূঢ় সমালোচকের দৃষ্টিতে আলোচনা করে হয়ত তাদের একটা explanation অসম্ভব হত না, কিন্তু তার ভেতর কি তেমন প্রাণের সাড়া পাওয়া যেত? রবীন্দ্রনাথের অন্তরে সদাজাগ্রত রস-বোধ তাঁকে এই ধরনের সমালোচনার কঙ্করাস্তীর্ণ ক্ষেত্র হতে সর্বদাই দূরে ঠেলে রেখেছে।

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি; কবিতার রস-বোধ সম্পর্কে আজকাল অনেক কথাই উঠেছে। আমি এমন লোককে জানি যিনি অকুণ্ঠিত চিন্তে স্বীকার করেন যে কবিতা পড়তে তাঁর ভালো লাগেনা। অথচ দেখছি, সাহিত্যালোচনার বৈঠকে যে-কবিতার অর্থ অপরের নিকট কুয়াসাচ্ছন্ন বলে মনে হয়েছে, তিনি একবার মাত্র পাঠেই তা প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে গেছেন। কেন এমন হয়? কবিতা তিনি আর সবার চাইতে ভাল বোঝেন, কিন্তু কবিতাপাঠ তাঁর নিকট বিমুগ্ধ ও নীরস ঠেকে এ কেমন কথা? অথচ এমনো অনেক দেখা গিয়াছে যাদের মনশ্চক্ষে কবিতার অর্থ তেমন স্পষ্ট উদ্ঘাটিত হয় না তাঁরাই আবার অভিনিবেশ সহকারে নিয়ত কবিতা পাঠে আত্মনিয়োগ করেন।

উক্ত ভদ্রলোককে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছেন যে explanation করবার স্বাভাবিক ক্ষমতা তাঁর ভেতর পুরোমাত্রায় রয়েছে বলেই কোন জিনিষের অর্থোদ্ঘাটন কর্তে তাঁর বিশেষ বেগ পেতে হয়না কিন্তু কবিতার যা সত্যিকার সম্পদ সেই অস্পষ্টতার অনুভূতিই তাঁর ভেতর নেই। কবিতার অর্থ সবটাই উলঙ্গভাবে তাঁর নিকট অনাবৃত হয়ে পড়ে, কিন্তু অবচেতন ভুক্ত vagueness এর অভাবে কবিতার মাধুর্য তিনি ঠিক তেমনভাবে উপভোগ কর্তে পারেন না। চৈতন্যের সঙ্গ এবং অনুভূতি পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন, একের রূপ অত্যন্ত প্রকট অপরের রূপ কুহেলি-গুপ্তিত, অস্পষ্ট। কবিতা অনুভূতির জিনিষ চেতনার নয়। তাই কবিতাব non-expression এর দিকটার প্রতি তিনি বারবার অন্ধই থেকে যান কবিতাও তাঁর নিকট বর্ণাঙ্কণ মাধুরী নিয়ে উৎসাহিত হতে পারে না অথচ অপেক্ষা-

কৃত অল্প বোঝেন এমন অনেক ব্যক্তির দিনরাত কবিতা নিয়ে মাতামাতি করার কারণ অস্পষ্টতা অথবা suppression এর মায়া তাঁদের চক্ষে সাক্ষর স্বপ্ন-স্পর্শ যত অধিক বুলিয়ে দিতে পারে যত পারে না ভাবসম্পদের পূর্ণ চেতনা। কল্পনার পাখায় ভর করে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করার প্রবৃত্তির পিছনে রস বোধের পোষকতাই প্রচুর। জাপানী সাহিত্যে “নো” নাটক ও “হোকু” কবিতার পাঠকদের ভেতর আগরা এই ধরনের রসবোধের সমধিক পরিচয় পাই।

কৃষ্টি বা culture এর সঙ্গে রসবোধের কোন ভাবগত ঐক্য আছে কিনা তা নিরূপণ কর্তে গেলেই দুর্ভাগ্য সমস্তা উপস্থিত হতে পারে। কেউ বলবে, কৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রস-বোধের standardও ক্রমশঃ উন্নত হতে বাধ্য, আবার কেউ বলবে, না রসবোধ এমনই এক বস্তু যার প্রাণশক্তিটুকু জন্মের জীবনী রস হ’তে আহরিত, পারিপার্শ্বিকের আঘাতে যার ক্রম-ক্ষুরণ হতে পারে না ইত্যাদি।

উপরোক্ত মতবাদ দুটোই চরমপন্থী। আমার মতে এই দুই মতবাদের ঠিক মাঝামাঝি পথে চলাই ভাল। রসবোধ জন্মগত সন্দেহ নেই, কিন্তু যাকে উপলব্ধি করে রস-বোধের উদ্ভব হ’তে পারে তাকে সম্যকরূপে বুঝতে হলে merit-এর প্রয়োজন। এই merit স্ফুরিত হতে পারে একমাত্র মানসিক উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে। সুতরাং রসবোধের বেলায় cultureকে একেবারে negligible factor বলে উড়িয়ে দিলে চলে না। তবে এই culture এর প্রয়োজন মুখ্য নয়, গৌণ—এই যা সাধনা। এমনো দৃষ্ট হয় অতি উচ্চশিক্ষিত ভদ্র-লোকের শিক্ষার অনুপাতে কোন কোন গ্রাম্য নিরক্ষর ব্যক্তির রসবোধের মাত্রা অত্যন্ত বেশী। মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হতে তাঁদের অনুভূতির জগত একটু বেশী ব্যাপক হয় এই মাত্র। তা ছাড়া অনুভূতির ক্ষেত্রে culture এর আর কোন দাবী-দাওয়া নেই।

কথাটা স্বাস্তর হলেও না বলে পারছিনে, কিছুদিন পূর্বে প্রমথবাবু বিজ্ঞাপতির কোন কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, এ কবিতা যার কাণে ও প্রাণে একসঙ্গে না।



বাজে তার কাছে কবিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করে' কোন ফল নেই।'

এই প্রাণে বাজাটাই হচ্ছে রসবোধের মূল কথা। কাণে অনেকেরই বাজে, কিন্তু প্রাণে বাজাতেই রয়েছে কবিতার সত্যিকার অনুভূতি ও আন্তরিক রসবোধ। কৃষ্টির সঙ্গে প্রাণে বাজার কোন সম্পর্ক নেই, এর মূলরস মানুষের জীবনী শক্তির ভেতরই আত্ম-গোপন করে' আছে জন্মাবধি।

কিছুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ একটা প্রবন্ধে সাহিত্যের রূপ নিয়ে কতক আলোচনা করেছিলেন। তাতে তিনি সাহিত্যের সাময়িক আলোড়নকে হয় প্রতিপন্ন করেছেন। যে সাহিত্য মানুষের চিরন্তন রসবোধের প্রবৃত্তির খোরাক জুগিয়ে চলে, কোনরূপ সাময়িক উচ্ছলতায় আপনাকে ভেসে যেতে ছাড়ে না, তাঁর মতে তাহাই শাস্ত, নিত্যকালের সঙ্গী। বায়রণের প্রতিভা রাহুগ্রস্ত হয়েছে, কারণ তাঁর ভেতর eternal appeal ছিল না মোটেই। পঞ্চাস্তরে হোমর, দান্তে, গায়টে, শেইক্সপীয়ার, শিক্‌স্টের হগো, কালিদাস, ভবভূতি সর্বদেশে সর্বকালে রসবেত্তাদের চক্ষে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের স্থায় প্রতিভাত হবেন, কারণ তাঁরা রচনার মধ্য দিয়ে শাস্ত অমুভূতির প্রতি যথেষ্ট স্মৃতিচারণ করে' গেছেন। এই চিরন্তন রস-বোধের খোরাক জুগিয়ে যিনি চলেন তাঁর লেখাই সাহিত্যের মণিকোঠায় অম্লান জ্যোতি-সৌন্দর্যে চিরস্থায়ী হয়ে থাকে।

সম্প্রতি কবির অমুরূপ একটা প্রবন্ধে 'সাহিত্যে আধুনিকতার' প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে আধুনিকতাকে কাল দিয়ে মাপা যায় না, একমাত্র মর্জিতেই তার পরিমাপ করা চলে। এই মর্জি বস্তুটি কি? মানুষের বলিষ্ঠ ও ভাবপুষ্ট রসবোধ প্রবৃত্তিই নয় কি? কোন কোন লোল-চর্মে, শ্বেত-শ্মশ্রু পলিতকেশ বৃদ্ধের মুখে আমি এমন বিশ্বয়কর কথা শুনেছি যার মূলগত ভাব প্রচলিত আধুনিকতার ভাবের গণ্ডিকে অতিক্রম করে' গেছে। এইসব অশীতিপর বৃদ্ধ এমন অমুপ্রেরণা পেলেন কোথা হ'তে? কাল দিয়ে নিরূপণ করতে গেলে ত' তাঁদের modern বলা চলে না; তবে কি বলবো তাঁদের সেই প্রেরণার মূলে

বাস্তব অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে? না, ঠিক তাও নয়। পূর্বেই বলেছি মানুষের অন্তরে রসবোধ সদা জাগ্রত অবস্থায় অবস্থান কর্তে, তার উদ্বেল বহুমুখী ধারার সম্মুখে কালের প্রশ্ন ভেসে যায়, শুধু বড় হয়ে দেখা দেয় অমুপম চলার ছন্দ,—অপূর্ব গতি-ভঙ্গিমা। কবিরের ভাষায় বলতে গেলে সেই "শাস্তভাবে আধুনিক" ভাবধারা বাস্তব অভিজ্ঞতার অপেক্ষা রাখে না, মনের প্রবণতার উপরেই তার লয়-ক্ষয় বিশেষভাবে নির্ভর করে।

মানুষের হৃদয়ের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকার রসবোধের পরিচয় আমরা পাই। আবার একের রসবোধের মাত্রার সঙ্গে অপরের রসবোধ তাল রেখে চলতে পারে না। কারণ, প্রত্যেকের মনে রুচি বলে একটা জিনিষ আছে। আমার রস-বোধের কষ্টিপাথরে যাকে সুন্দর বলে মনে হয়, অপরের ক্ষেত্রে তা সুন্দর না-ও হতে পারে। প্রভেদটা আমার রস-বোধের মাত্রাধিক্যের জন্তে নয়, আমাদের উভয়ের রুচিগত বিভিন্নতার জন্তে।

সংস্কার-সর্কস্ব একদল রুচিবাগীশ রসবোধের নমুনা স্বরূপ কথায় কথায় স্বর্গত বন্ধিগচ্ছের দোহাই পেড়ে বাংলা সাহিত্যে তথাকথিত অশ্লীলতাকে লোকচক্ষে অগ্নায়ভাবে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা পান। কিন্তু তাঁদের এই গলা-বাজিতে আর কিছু থাকুক আর নাই থাকুক অদ্ভুত যুক্তি ও রসবোধের চূড়ান্ত পরিচয় যে আছে তা বলাই বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে চিন্তাশীল মনীষী নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের একটা সুন্দর কথা মনে পড়ল। কথাটা এই:—'সাহিত্যে অশ্লীলতার স্থান আছে, কিন্তু অসুন্দরের স্থান নাই।'

বাস্তবিক অসুন্দরকে উপলক্ষ্য করে' মানুষের রসবোধ মোটেই জাগ্রত হতে পারে না; অশ্লীলতার বেলায় পারে। কারণ, অশ্লীলতার প্রবৃত্তিটি চিরন্তন, সুতরাং তাকে কেন্দ্র করে যে অনুভূতি রসবোধের ভেতর দিয়ে নিজেকে সুস্পষ্ট করে' তোলে তার রূপটি চিরন্তন হতে বাধ্য।

পরিশেষে বস্তুতাত্ত্বিক রসবোধ ও আদর্শবাদী রসবোধের সীমারেখা নির্দেশ করে আমি আমার প্রবন্ধ শেষ করব। পূর্বেই বলা হয়েছে, অন্তর্মুখীনতা ও বহির্মুখীনতা রস-বোধের দুটো বৃত্তি। এই উভয় বৃত্তির কোনটি কি

ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে প্রথমে তাই দেখাবার প্রয়াস পাবো। আই ডিজয়্যালিজমের প্রভাবে আমাদের মন সংসারের সীমাবদ্ধ গভীর ভেতর আবদ্ধ না থেকে কল্পলোকের প্রতি উধাও হয়ে ছুটে যেতে চায়। কোন এক অপরূপ ভাবরাজ্যে মায়াজাল বুনবার ব্যস্ততায় তার চোখে মুখে উৎকট ঔৎসুক্য ছাপিয়ে পড়ে। সাহিত্যে যে ভাবে আদর্শবাদ চিত্রিত হয় তার ধারাটি অন্তর্মুখী; কিন্তু আমরা যখন এই আদর্শবাদকে নিজের অন্তরে গ্রহণ কর্তে তৎপর হই, তখন স্বভাবতঃ আমরা লেখকের অনুভূতি এবং আমাদের স্বকীয় অনুভূতির ভেতর একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করি। এই সামঞ্জস্য বিধানের প্রক্রিয়াটি বাহিমুখী-শেলীর Hymn to Intellectual Beauty অপরূপ সন্দেহ

নহে, কিন্তু আমরা যারা তাঁর পাঠক তাদের অনুভূতির গভীরতা আর কতটুকু?

অপর পক্ষে বস্তুতাত্ত্বিকতার ক্ষেত্রে সংসারের অতি সাধারণ দৃশ্যমান বস্তুগুলোকে যেমন করে' পাঠকের মনশ্চক্ষের সম্মুখে এনে উপস্থিত করা হয়, তাতে রচনার ভঙ্গিমা বিশেষ ভাবে বহিমুখীতার গভীর ভেতর গিয়ে আশ্রয় লয়। কিন্তু পাঠকালে আমরা আমাদের অন্তরের অমেয় সহানুভূতির স্নিগ্ধতায় রুক্ষ বিসদৃশ নীত্যপরিচিত বস্তুগুলোকে রসসিক্ত করে তুলি। রিয়্যালিজমের এই গ্রহণের দিকটা অন্তর্মুখী। সুতরাং স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আদর্শবাদী রসবোধ এবং বস্তুতাত্ত্বিক রস-বোধ দুটোই সমান ভাবে balanced হয়ে আছে।

—o—

## তাঁতিরাম

( পূর্বানুভূতি )

শ্রীআশালতা দেবী

তাঁতিরাম জাতিতে কাওরা হইলেও তাহার আচার ব্যবহার চালচলন কথা বার্তায় তেমন কোনও দৈন্ত প্রকাশ পাইত না। তাহার আকৃতিতে কেমন একটা শুচিতা ছিল যাহা দেখিলে ব্রাহ্মণেরও মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার হইত। তাহার স্বভাবগুণে জমিদার বাড়ীর দাদাবাবুদের কাছে সে ত্রুটু আধটু লেখপড়া শিখিয়াছিল, সে নাম সহি করিতে জানিত। প্রাতে উঠিয়া রাধাকৃষ্ণের নাম লিখিতে জানিত, ছলিয়া ছলিয়া রামায়ণ মহাভারত সত্যপীরের পুঁথি পড়িতে পারিত এমন কি ছ' একখানাচি ঠিও লিখিয়া ফেলিত।

গ্রামের কোন পাড়ায় মড়ক লাগিলে টোটকা ঔষধের পুঁটলিটি বগলে তাঁতিরাম সেখানে না ডাকিতেই হাজির হইত। গ্রামের গিন্নীদের ত তাঁতিরামকে না হইলে এক মুহূর্ত ও চলিত না। খোকা খুকীর জল পড়া তেলপড়া

কবচ মাদুলী হইতে গর্তিণী বধূর গর্তেরকল্যাণে হাজার ঝাড়ফুঁকে তাঁতিরামের জয় জয় কার।

এতে আবার তাঁতিরামের পাওনাটাই কি কম ছিল? বাগানের কলাটা কচুটা পেঁপেটা হইতে শশাটা পর্যন্ত তাঁতিরামকে না দিলে তাঁদের মনের খুঁৎমুতি যাইত না। হাঁসিতে হাঁসিতে তাঁতিরাম এই সকল স্নেহের দান বিলাইয়া পাড়ায় ছেলেদের সঙ্গে ভাব করিত।

সেখানে ও কি তার কাজ কম ছিল? দিন নেই দুপুর নেই তার ক্ষুদ্র কুটীর খানি জমজম করিত। কারও ঘুড়ি বানাইয়া কারও লাটাই যোগাইয়া কারও কলম বাড়াইয়া তাঁতিরামের দিনগুলি কাটিত। বালকবাহিনীর সকল আবদারই সে নির্বিচারে তামিল করিত, কেবল বিরূপ হইত তখন যখন কোনও বালক তাহার কাছে পাখীর খাঁচা কিংবা

মাছধরা ছিপের বায়না ধরিত। পাড়ায় মড়া পোড়াইতে, মারামারি দলাদলির আপোষ করিতে অনাথ অনাথিনীর হৃৎখে গলিয়া যাইতে তাঁতিরামের জুড়ি মিলিত না।

গুণের সেরা গুণ তাঁতিরাম বড় স্বকণ্ঠ ছিল। খঞ্জনী বাজাইয়া সে যখন দ্বারে দাঁড়াইয়া গাহিত :—

“মাগো সাধ করে কি তোর গোপালে চাই মা,

তোর গুণের গোপাল কি গুণ জানে বনে বন অন্ন পায় মা”

তখন মৌন পল্লীখানার বৃকে বাৎসল্যরস উপচিয়া উঠিত। যৌবনে একবার মড়কে জীপুত্র ও দুটি কন্যা হারাইয়া তাঁতিরাম আর সংসার করেনাই, কিছুদিন নিরুদ্দেশ ভ্রমণ করিয়া সে বৈষ্ণব বেশে ফিরিয়াছিল। সেই হইতে তাহার জীবনটা পরের জন্ম যত অকাজে ভরিয়া উঠিয়াছে।

তাঁতিরামের গৃহস্থালীটি নিতান্ত ছোট ছিল না। ছোট কুড়েখানি নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের স্মৃদ্য উপবীতটির মত শুচিতার মূর্তি ধরিয়া গ্রামের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়াছিল। গৃহের পশ্চাতে একটা কুপওছিল। তাঁতিরামের সকল কাজের ব্যতিক্রম ঘটিলেও গৃহ ও প্রাঙ্গণ খানি নিকাইতে কখনও ক্রটি দেখা যাইত না। অঙ্গনের মধ্যস্থলে একটি গোময়লিপ্ত তুলসা মঞ্চ; গ্রীষ্মকালে বরা দিবার জন্ম বংশ খণ্ডে একটি ভাঁড় বুলিয়া থাকে। অঙ্গনের আশে পাশে গৃহের পশ্চাতে দক্ষিণে বামে পেয়ারা জাম কুল ও লিচু গাছের বাহুল্য দেখিবামাত্র বেশ বুঝা যায় কোথায় তাঁতিরামের এত ছেলে ধরবার ফাঁদ পাতা। নিঃসঙ্গ তাঁতিরামের সংসারে আরও দুটি প্রাণী ছিল, একটি তাহার মা মরা বেরাল ছানাটি আরটি তাহার অতি যত্নের গাভী যশোদা। প্রবাস যাত্রা কালে সে এই সাথীদুটিকে নিরুর জিম্মায় রাখিয়া আসিত।

উল্লিখিত রাত্রি অবসানে অতি প্রত্যাষেই তাঁতিরাম শয্যাভ্যাগ করিল। কুয়াশায় দিগন্ত ছাইয়া আছে। সেই কুয়াশা ঠেলিয়া রূপসীকে বৃকে ও যশোদাকে হাতে ধরিয়া তাঁতিরাম নিরুরমার গৃহে যাত্রা করিল, দূর হইতে অত প্রতুষ্যে গৃহে প্রদীপের আলো দেখিয়া সে কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইয়া ত্রস্ত পদে অগ্রসর হইল। গুণ গুণ করিতে করিতে প্রাঙ্গণে ঢুকিয়াই উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল “এত ভোরে আলো জ্বলে বসে আছিস কেন দিদি?”

গৃহমধ্য হইতে উত্তর আসিল, “মার কাশিটা বড় যে বেড়ে গ্যালো দাদা, বলিতে বলিতে নিরু ঈষৎ দরজা ফাঁক করিয়া তাঁতিরামকে অভ্যর্থনা করিল। রোগিনী কাশিয়া কাশিয়া নির্জীব হইয়া পাড়িয়া ছিলেন একটু স্তম্ভ হইয়া এতক্ষণে বলিলেন “বাচ্চিস বাবা তাকে আনতে?”

“তাই ভেবে ত বেরিয়েছিলাম মা, তা থাক না হয় কালই যাবো কি বলিস দিদি। অস্থখটা যখন আবার,” তাঁতিরামের কথা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই বিধবা সোচ্ছবে বলিলেন—“না বাবা সে ভয় নেই। তাকে একবার না দেখে আমি মরবো না রে তুই না গেলে ত আমি সোয়াস্তি পাবো না বাবা। গেলে বরং আশায় আশায় বেঁচে থাকবো। আগার কাশি দেখতে দেখতে ভাল হয়ে উঠলো। এই বারে সেরে উঠবো তুই বেরিয়ে পড়'বাপ, বেলা হোলো।” সত্যই এই কথা কয়টি বলিতে বলিতে প্রৌঢ়া যেন একটু বল পাইয়া পাশ ফিরিয়া গুলিলেন। তাঁতিরাম নিঃশব্দে নিরুর চোখে চাহিল। বালিকা ইন্দ্রিতে সম্মতি জানাইল। তখন অগত্যা তাহাকে উঠিতে হইল। একটু অনিচ্ছার সহিত দাওয়া হইতে নামিয়া বলিল ‘তবে যাই মা এবার তাকে না নিয়ে আর ফিরছি না এ তুমি দেখে নিয়ো। তুই কিছু ভাবিসনে দিদি গোবিন্দকে ডাক। আমি বরং কবিরাজ মশাইয়ের বাড়ীটা হয়ে যাব'খন, মা যশোদা, আসি গো মা।” এই বলিয়া গাভীটির গায়ে সম্মেহ হস্ত বুলাইয়া ধীর পদবিক্ষেপে তাঁতিরাম পথে উঠিল।

রসুলপুরের হাটে আজ ক'দিন ধরিয়া মহোৎসব বসিয়াছে। রায়বাবুদের ঘরের বাঁধালক্ষ্মী নাকি হঠাৎ শিকল কাটিয়া বেগের পো জটাধর মল্লিকের ঘরে আসিয়া হাঁটিয়া উঠিয়াছেন। তাই মূতন কর্তার হাতে পড়িয়া রসুল-পুরের হাটে আজ তিন দিন ধরিয়া আমোদ-প্রমোদের রোসনাই জলিতেছে। পূর্ন দুই দিন মধুকাণের গান ও পান্নার কীর্তন হইয়া গিয়াছে। আজ রতন ভাঁড়ারীর দল সীতার বনবাস অভিনয় করিবে। লোকে লোকারণ্য; নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ন হইতেই ভিঁড় জমিতেছে।

এদিকে যাত্রাদলের সাজঘরে বিষম গুণগোল। তাঁবে-দার নিধিরাম অধিকারী মহাশয়ের গঞ্জিকার কলিকার

নেপথ্যে দুটো টান দিয়া এক বিদ্রী ব্যাপার ঘটাইয়া বসিয়াছে। কলিকাটি কর্তার হাতে না দিয়ে টাকে ঢালিয়াছে। ওদিকে সীতা ঠকুরাণী বাকিয়া বসিয়াছেন। লাল বেণারসী-খানা ও বড় ফাদি নথী ছাড়িয়া তিনি কিছুতেই বনবাসে যাইবেন না। ফলে সাজঘরেই এক বীভৎস রসের অভিনয় চলিয়াছে।

ওদিকে আসরে মহা উৎসাহে আখড়াই শুরু হইয়াছে। অধিকারী মহাশয় টাকের জ্বালা ভুলিয়া লোম-বহুল বিশাল ভুঁড়িটি নাচাইয়া গজেন্দ্রগমনে সমরান্বণে অবতীর্ণ হইলেন। প্রথম দৃশ্যে অষোধ্যার রাজসভা। প্রজাপারিষদে মিলিয়া সিংহাগনটি ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গঞ্জিকা সেবনে তাহাদের চোখ-মুখে যেরূপ লালিমা ফুটিয়াছে তাহাতে দর্শকমণ্ডলী মা জানকীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া পূর্কাক্ষেই আকুল হইয়া পড়িয়াছে। কুন্তীগিরের মতই তাহাদের তাল ঠুকিবার ভঙ্গী দেখিয়া মনে ভ্রম হইতেছে যেন তাহারা বিংশ শতাব্দীর প্রজাতন্ত্রের ধুরন্ধর, আজ রামচন্দ্রকে বরখাস্ত করিতে ধমুর্ভঙ্গ পণ করিয়াছে; কিন্তু হায় বুঝিবা তাহাদের এ উদ্ভেজন! নিজের আগুনে নিজেই পুড়িয়া মরে, কারণ রামচন্দ্রের এখনও সাক্ষাৎ নাই। অধিকারী মহাশয় হইতে দর্শকমণ্ডলী পর্য্যন্ত সকলে সোৎসুক দৃষ্টিতে পুনঃ পুনঃ সাজঘরের পথে দৃষ্টিপাত করিতেছেন কিন্তু কই সে নবহর্কাদল শ্যাগরূপ ত নয়নে পড়িল না! এমন সময়ে নিধিরাম আসিয়া অধিকারী মহাশয়ের কাণে নিম্নস্বরে কি বলিল। কথাগুলি কেহ শুনিতে পাইল না বটে, কিন্তু তজ্জ্বলে অধিকারী মহাশয়ের ‘সূর্য্যামার’ মত গোলাকার বদনমণ্ডল যে রজনীচর পক্ষীবিশেষকেও লজ্জা দিল—তাহা সকলেই উপলব্ধি করিয়া, আশু অমঙ্গলের সূচনায় সশঙ্ক হইয়া উঠিল।

কথাটা হইতেছে এই যে রমেন বোস বিগড়াইয়াছে।

চাঁদগাঁয়ের জমিদাররা অভিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে একখানি শাল ও ১টা গিনি বখসিস করিয়াছিলেন, কিন্তু অধিকারী তাহাকে ৮ টাকা আর পেটভাতের বেশী এক কাণাকড়িও দিতে রাজী নহে বলিয়া সে দুটা আত্মসাৎ করিয়াছে। ফলে রমেন আজ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে যে উক্ত বখসিস

না পাইলে সে রাজসভায়ও যাইবে না, জানকীকেও বনবাসে পাঠাইবে না। এই কঠোর বারতা শুনিয়া অধিকারী রাগে দশটা হইয়া বিরাট বপু দোলাইয়া যথাসম্ভব স্বদ্রিত গতিতে সাজঘরে ছুটিলেন। তথায় ঢুকিয়াই তিনি বুঝিবা সেতার ভ্রমেই বেচারী রমেনের কর্ণে হস্তক্ষেপ করিলেন। রমেন এইরূপ অতর্কিত আক্রমণের জন্ত আদৌ প্রস্তুত ছিল না; রাগে ক্ষোভে দিশাহারা হইয়া সে অধিকারীর গণ্ডে হস্ত প্রসারণ করিয়া যখন নাগাল পাইল না তখন সেই ঢকা-নিন্দিত, আপন গোরবে আপনি নিম্নগ ভুঁড়িটির উপরে একটা বিরাশী সিকা ওজনের মুষ্টি প্রহার করিয়া সাজঘর ত্যাগ করিয়া সেই জনসমুদ্রে কোথায় যে উধাও হইল তাহার কোনও তল্লাস মিলিল না।

সারাদিন পথশ্রমে ক্লিষ্ট তাঁতিরাম যখন রত্নলপুরের হাটে পৌছিল ততক্ষণে রমেন পগার পার হইয়াছে। রামচন্দ্র অভাবে ‘সীতার বনবাস’ ফাঁসিয়া যায় দেখিয়া গ্রামের কয়েকটি রসিক যুবক মিলিয়া অধিকারী মহাশয়কে লইয়া তখন অগত্যা ‘কীচকবধের’ পালা জুড়িয়া দিয়াছে।

বহু অশ্বেষণেও যখন রমেনের কোনও সন্ধান মিলল না তখন তাঁতিরাম অগত্যা প্রত্যাষেই গৃহে ফিরিবে সংকল্প করিল। কারণ রোগিণীর অবস্থা তাহার নিকট তত আশা-প্রদ বোধহয় নাই। নিধিরামকে কিছু জলপানি দিয়া সে একখানি বালির কাগজ ও একটি খাগের কলম সংগ্রহ করিল। সকাল হইতে দশ ক্রোশ হাঁটিয়া তাহার যত না শ্রম হইয়াছিল, এই বিচিত্র পত্রখানি শেষ করিতে গলদঘর্ম তাঁতিরামের মুখে তাহার দ্বিগুণ ক্লান্তি ফুটিয়া উঠিল। ক্ষীণপ্রাণ কলমটিও নিদারুণ পীড়নে অচিরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

ছিরি ছিরি গোবিনদো পদো ভরা।

রোণুলপুর স্বকুরবার।

মারোবর রমেনদোর বাবু—

বহু পথ হাঁটিয়া আপোণকার শাখাত পাই না। জানাই-তেচী যে আপোণকার সাস্কর ঠাকুরাণি নীমোনী রোগে



শরাসাই। জিবোণ শওশএ দেখিতে চাহেন জোদি শব্দর  
কোরে আশীবেন। ওনোখা না হয়। ইতি—

শেবোক  
ছিরি তাঁতীরাম।

সত্তজাত শিশুটির আপাদ মস্তক বারংবার দেখিয়াও  
যেমন জননীর তৃপ্তি হয় না, চিঠিখানি নানা ভঙ্গীতে ঘুরাইয়া  
ফিরাইয়াও তেমনি তাঁতীরামের স্নেহের ক্ষুধা মিটিল না।  
সে অতি অনিচ্ছার সহিতই অগত্যা সেখানি নিধিরামের  
জিম্মা করিয়া প্রত্যয়ে রত্নলপুর ত্যাগ করিল।

তাঁতীরাম প্রস্থান করিবার প্রাকালে বিধবার নির্কাণো-  
মুখ জীবনপ্রদীপ একবার উজ্জল হইয়া আবার ধীরে ধীরে  
নিভিয়া আসিল। বালিকা মাতার এই অবসাদে শঙ্কিতা  
হইয়া তাহাদের ধনী জ্ঞাতিবর্গের দ্বারে দ্বারে সাহায্য ভিক্ষা  
করিয়া ফিরিল। কিন্তু ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে

কাহারও তেমন আগ্রহ দেখা গেল না; বরং অকস্মাৎ  
গৃহে গৃহে পেটকামড়ানি, মাথাধরা, বাতের ব্যথা প্রভৃতি  
নানারূপ রোগের আবির্ভাব হইল, এই ত গেল বয়স্কদের  
কথা। ওদিকে আবার বাড়ীর গিন্নিরা তাঁহাদের ষষ্ঠীর  
দানদের কল্যাণ চিন্তায় অতিমাত্র সজাগ হইয়া উঠিলেন।  
ফলে মুমূর্ষুর অন্তিম শয্যাটি প্রতিবেশীদের কোলাহলে  
শরশব্দায় পরিণত হইল না। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে তিনি  
শিশু দুটিকে বুকে চাপিয়া পরম মুক্তির শেষ নিশ্বাসটি  
লইলেন। কিন্তু নিরু তাহা বুঝিল না। সারাদিনের রোগ-  
যন্ত্রনীর শ্রান্ত জননীকে নিদ্রাতুরা কল্পনা করিয়া সে পরম  
তৃপ্তি অনুভব করিল। অলক্ষ্যে কোন নিষ্ঠুর দেবতা যে  
তাহাদের লইয়া কঠোর পরিহাস করিলেন শিশু দুইটিও  
তাহা বুঝিল না। তাহারা মৃত্যুর বুকে নিরুদ্বেগে নিদ্রিত  
হইয়া পড়িল।

( আগামী বারে সমাপ্য )

## আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

( পূর্বানুবর্তি )

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর সামন্ত রায় সাহিত্য সরস্বতী ✓

জন্মতঃ কেহই বড়, কেহই ছোট নয়। সেই সামাজিক  
স্বব্যবস্থাই সুব্যবস্থা, যাহা জন্মনির্বিশেষে প্রত্যেক নারী ও  
পুরুষকে তাহার শক্তি ও চেষ্টা অনুসারে যে কোন দিকে  
ভাল ও বড় হইবার, সমাজ-সেবক হইবার সমান সুযোগ  
দেয়। এইজন্যই আচার্য্যদেব তীব্র ঘৃণা ও আক্ষেপের সহিত  
বলিয়াছেন যে, এ সমাজ পুতিগন্ধময়—ইহাতে প্রলেপ চলেনা,  
ইহার Surgical Operation চাই। সমাজ-সংস্কার বিষয়ে  
বঙ্গালী নাকি একদিন অগ্রণী ছিল—আজ অগ্রাণু দেশের  
তুলনায় পিছাইয়া পড়িতেছে। কংগ্রেসের একজন নেতা  
পরলোকগত পরমেশ্বর পিলে এই জন্ত তাঁহার “Representa-

tive Indians” নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, যে দেশে রাজা  
রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর  
প্রভৃতি সমাজ সংস্কারকের জন্ম হইয়াছে—বঙ্গালী জীবনের  
দৈনন্দিন ইতিহাস ও কার্য্যপদ্ধতি আলোচনা করিলে মনে  
হয় সে দেশ হইতে সমাজ সংস্কার ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে।  
এই সংস্কার জন্য চাই, বিদ্রোহ এবং সেই বিদ্রোহীর ভূমিকা  
গ্রহণের জন্য আচার্য্যদেব দেশের ভবিষ্যৎ আশাশূল বঙ্গালী  
যুবককে ইঙ্গিত করিয়াছেন। আচার্য্যদেব ১৯০৬ অব্দে  
স্বদেশী আন্দোলনের সময় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে একবার  
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে “বঙ্গালী যুবক নিজের স্বার্থের জন্য

নয়—যশের জন্য নয়—দেশোদ্ধার হইবে এই ধারণার উপর কার্য্য করিয়া অমানবদনে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিতে শিখিয়াছে, কিন্তু সমাজসংস্কার কার্য্যে তাহাদের পাওয়া যায় না ইহার কারণ কি? যুদ্ধক্ষেত্রে কামানের সম্মুখে যে বুক ফুলাইয়া এগিয়ে যায় সে বীরপুরুষ বটে, কিন্তু যাহারা সমাজকে টানিয়া তুলিতে গিয়া সমাজ-সংস্কার করিতে গিয়া, বিবেকবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিতে গিয়া, আজীবন সমাজের অত্যাচার ও অবিচার সহ করেন, তাহাদের বীরত্ব অতুলনীয়, যদিও সাধারণের চক্ষে এই বীরত্বের সম্মান অনুভূত হয় না।” সমাজের ভিতর গুণামি ও কপটাচরণের অন্তঃসলিলা প্রবাহিত হইবার পথ রুদ্ধ করিবার বাসনায় আচার্য্যদেব উল্লিখিত বাণী জাতির প্রাণ যুবক-সম্প্রদায়ের কর্ণে পৌছাইয়া দিয়াছেন। আচার্য্যদেব ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে Indian Social Conferenceএতে সভাপতির অভিভাষণে সমাজ-সংস্কার বিষয়ে তাঁহার প্রাণের দরদ দেশবাসীকে জানাইয়াছেন। আজ শুভক্ষণে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে তাঁহার বাণী ও মহৎ আদর্শের রেখাপাত হইয়াছে এবং আশা করা যাইতেছে অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুসমাজ তার দ্রুত বিশিষ্টতা ও উদারতা উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে এবং ত্যাগ ও বীরত্বের মহিমা বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস উজ্জ্বল করিবে।

এস্থলে কিন্তু ইহাও উল্লেখযোগ্য যে আচার্য্যদেব সংস্কার-প্রয়াসী হইলেও ইংরেজী শিক্ষার ও সভ্যতার মোহে মুগ্ধ হইয়া অন্ধসংস্কারের বশবর্তী হন নাই বা প্রত্নরূপ দেন নাই। পুরাদস্তুর খাটি স্বদেশীই রহিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সংস্কার-প্রয়াসীর চরিত্রের ইহা একটি বৈশিষ্ট্য। তিনি পাঁচ বার ইউরোপ গিয়াছেন এবং প্রায় আট বৎসর তথায় কাটাইয়াছেন তথাপি তিনি পাশ্চাত্য দেশীয় ফ্যাশন দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নাই। তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ আচার ব্যবহার একেবারে অনাড়ম্বর, বিলাসিতা-বর্জিত। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার গৌরবময় স্যার. (knight) উপাধি দ্বারা ভূষিত হইলেও দেশবাসীর নিকট তিনি স্যার পি, সি, রায় রূপে পরিচিত না হইয়া প্রাচ্য দেশোচিত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রূপে সমধিক পরিচিত হইয়াছেন। আচার্য্যদেবের সরল ধর্ম্ম-জনোচিত প্রকৃতি ও চরিত্র তাঁহার ছাত্রগণের চরিত্রগঠনে

অনুপ্রাণিত করিয়াছে। plain living and high thinking তাঁহার জীবনের আদর্শ এবং পুরাদস্তুর এই আদর্শের কোন ব্যক্তি বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশে নাই বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। আচার্য্যদেব প্রকৃত পক্ষেই আচার্য্য। নিজের আচার বা কার্য্যের দ্বারা তিনি প্রকৃত আচার্য্যত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রাচীনকালে গুরু শিষ্যের যেরূপ সম্বন্ধ ছিল বর্তমান যুগে আচার্য্যদেব ও তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে সেইরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান।

কি ভাবে অবাকালীর হস্ত হইতে বাঙ্গালীর ধন রক্ষা করা যায়, কি ভাবে বাঙ্গালী দু’টো অন্ন সংস্থান করিয়া নিজেদের অস্তিত্বটুকু বজায় রাখিতে পারে তাহাই দেশবাসীর নিকট ত্রিশ বৎসর যাবৎ নিরবচ্ছিন্ন চীৎকার করিয়া আসিয়াছেন। এমন একদিন ছিল যখন এদেশে ইংরেজী শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল সহজে চাকুরী জোটা। ভবিষ্যতের আশার আনন্দে স্বপ্নের স্বপন দেখতে দেখতে ৭৮ বৎসর আলেয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটে খুব জাঁকাল রকম ডিগ্রি নিয়ে বাঙ্গালী যুবক যখন কলেজ, অধ্যাপক, আর্টস, সায়েন্স প্রভৃতির হাওয়া থেকে আসিয়া একেবারে শক্ত মাটির পৃথিবীতে দাঁড়াইত তখনই বুঝিত যে এই বস্তুর হাটে সে নিতান্তই নিঃসম্বল—এ বাজারে বেচাকেনা করিতে হইলে যে যোগ্যতার দরকার মল্লিনাথের টিকায় বা এম, এ ক্লাসের অধ্যাপকের পাশকরানো নোটে কোথায়ও তার সঙ্গে পরিচয় হয়নি। ত্রিশ বৎসরের বাঙ্গালী যুবক সংসার-জালায় জর্জরিত, চক্ষু নিম্প্রভ, হৃদশাগ্রস্ত, মুখে আনন্দ চিহ্ন নাই,—দেখিয়াথ সত্য সত্যই প্রাণ কাঁদিয়াছিল আচার্য্যদেবের এবং তাই তিনি এই জীবনসঙ্কায় তাঁহার জীবনের বড় আদরের বিজ্ঞান-পরীক্ষাগার থেকে বাইরে এসে বাঙ্গালীর উৎকট অন্নসমস্যার সমাধানে মনোনিবেশ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর আজ পেটের দায়। ‘আগে পেট ভরে খাও তবে ধর্ম্ম হবে’ বিবেকানন্দের এই বাণী তিনি প্রচার করিয়াই নিরস্ত হইলেন না—নিজে দাঁড়ালেন আসিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে। আজ তারই ফলে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর গৌরব ‘বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মেসি-উটিক্যাল ওয়ার্কস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান। বেঙ্গল কেমিক্যাল যখন আরম্ভ করেন তখন কুলির মতন নিজে খাটিতেন।

কয়েক বৎসরের সময় হইতে মাত্র ৮০০ টাকা সংগ্রহ করিয়া বেঙ্গল কেমিক্যাল আরম্ভ করেন,—এখন তার মূলধন অনেক লক্ষ টাকা। এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বাঙ্গালীর প্রথম মস্তিষ্কের ও সমবায় প্রণালীতে কার্য্য করিবার শক্তি জগতের নিকট প্রমাণিত হইয়াছে! বেঙ্গল কেমিক্যাল Calcutta Soap Works, Bengal Canning and Condiments Works, Bengal Miscellany ইত্যাদি কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। এই সব প্রতিষ্ঠানে ইতর ভদ্র অসংখ্য লোক নিযুক্ত হইয়া অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করিতেছে।

প্রকৃত পক্ষে আচার্য্য দেবের দৃষ্টান্তে আজ বাঙ্গালীর নিখ্যা সম্মানের মোহ কাটিয়া গিয়াছে। এখন ধোপ-দুরন্ত অথচ জরাজীর্ণ বাঙ্গালীর ‘বাইরে কোঁচার পতন ঘরে ছুঁচোর কীতন’ আর বরদাস্ত হয়না। এখন বাঙ্গালী পোষাকী জীবনে ও আটপোরে জীবনে পার্থক্য দূর করিবার চেষ্টা পাইতেছে। গৃহে অন্ন-সংস্থান নাই অথচ ডান হাতে খাইবে কি বাম হাতে খাইবে তার গবেষণায় মস্তিষ্কের অপব্যবহার করিতেছে না। এখন বাঙ্গালী বুঝিতে পারিয়াছে যে, ‘পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে পড়লে আর পাখীর ডাকে জাগলে’ চলিবে না। এখন তাহারা শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। আচার্য্য দেবের সংস্পর্শে ও প্রেরণায় আজ বাঙ্গালী “অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু, চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ, উজ্জল পরগায়ু, সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।” কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের উক্তি মর্মে মর্মে অনুভব করিতে পারিয়াছে।

আচার্য্য দেবের দেশ-সেবা ও দানশীলতার কথা বাঙ্গালাদেশের সকলই অবগত আছেন। কত অসংখ্য দরিদ্র ছাত্র যে তাঁহার সাহায্য পাইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে তাঁহার দানও অল্প নহে। তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠদান খাদি ও চরখা প্রচার। তিনি এইজন্ম তাঁহার জীবনের যথা সর্ব্বদা দেশের কাজে উৎসর্গ করিয়াছেন, বাঙ্গালী কেন সমগ্র ভারতবাসী তাঁহার এইরূপ দান ও স্বার্থত্যাগের

কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠা কারখানার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির উপযোগিতা বুঝিয়াও, চরখার শক্তিতে আত্মবান হওয়া ও তার প্রচার উদ্দেশ্যে যথাসর্ব্বদা দান তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। মহাত্মা গান্ধীর চরখা যন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যে অদম্য চেষ্টা ও উৎসাহের সহিত ইহার প্রচার কার্য্যে আচার্য্যদেব আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহা একদিন জাতির ইতিহাসে উজ্জল অক্ষরে স্থান পাইবে।

দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীদের দুঃখ দুর্দশা মোচন কল্পে তাঁহার গঠিত রিলিফ কমিটি বর্তমান যুগের এক অপূর্ণ কীর্তি। কয়েকবৎসর পূর্বে কোন স্থানে বস্ত্র বা ঝটিকা প্রতিষ্ঠা নৈসর্গিক বিপ্লবে দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে দুর্ভিক্ষ পীড়িত নরনারী গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিত আর এই জাতি জাতিরই দুর্ভাবস্থার কথা সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠে পাঠ করিয়া বৃথা সহানুভূতির ভাণ প্রদর্শন করিত। আচার্য্যদেব এই বৃদ্ধ বয়সে নানা দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও খুলনা, উত্তরপূর্ব বঙ্গ প্রতিষ্ঠা স্থানে দুর্ভিক্ষপীড়িতের কক্ষণ আর্তনাদে স্থির থাকিতে পারেন নাই। দেশের লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত ভাই ভগ্নীদের পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আচার্য্যদেবের অনুকরণে অসংখ্য যুবক স্কুল কলেজের পাঠ স্থগিত রাখিয়া তাঁহার পশ্চাদনুবর্তী হইয়াছিল। এমন কি বারানসীনাগরও তাঁহার আহবানে স্থির থাকিতে পারেন নাই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার বুলি লইয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত ভাই ভগ্নীদের উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহপূর্বক আচার্য্যদেবের হস্তে প্রদান করিয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে ইহাতে জাতির ভাবধারা বদলাইয়া গিয়াছে।

✓ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আচার্য্যদেবের সর্ব্বোত্তম প্রতিভা ও নানাপ্রকার কার্য্য সূচীর আলোচনা করা অসম্ভব। আচার্য্যদেব প্রকৃতপক্ষে গীতার একজন সত্যকার নিকাম কর্ম্মযোগী। সপ্ততিবর্ষাধিক বয়ঃপ্রাপ্ত রুগ্ন আচার্য্যদেবের কর্ম্মোন্মাদনা সমগ্র ভারতবাসীকে স্তম্ভিত করিয়াছে। আজি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নাম শুধু বাঙ্গালা দেশে কেন ভারতের সর্ব্বত্রই সুপরিচিত। তাঁহার জ্ঞান গরিমা

অসাধারণ বিজ্ঞানচর্চা, দেশহিতৈষতা প্রভৃতি সদগুণরাজি হিত ব্রতে তাঁহার কঠোর অথচ অনাড়ম্বর স্বার্থত্যাগ, সর্বোপরি তাঁহার অনাড়ম্বর ঋষিকল্প পুত চরিত্র, জাতীয় শিল্পের ও বিজ্ঞান চর্চার উন্নতিকল্পে তাঁহার অসীম সরল কোমল অন্তঃকরণ সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। উদ্যম ও আজীবন চেষ্টা, সমাজের সংস্কার সাধনে দেশের ভবিষ্যৎ আশাভরসার স্থল ছাত্রসমাজের একাধারে তাঁহার উদ্যম ও অকুতোভয়তা প্রভৃতি বর্তমানযুগে একাধারে গুরু বন্ধু ও সহায় তাঁহার গ্রাম আর কে আছেন? দেশ- অতি বিরল।

## শ্রাবণ

শ্রী নরেন্দ্র নাথ ঘোষ

ক্ষ্যাপা শ্রাবণ এল ফিরে মেঘে মেঘে তার  
এলায়ে মলিন রুক্ষ দীর্ঘ জটা ভার।  
বজ্রমুখে বম্ বম্ উচ্ছুমে আকুল,  
রুদ্ধকরে শোভে ভীম ঝঞ্ঝার ত্রিশূল।  
ক্রোধবিকম্পিত বাম করধ্বত তার  
ভৃঙ্গার উছলি' ঝরে বাদলের ধার।  
কুটিল কটাক্ষে বহি বিহ্বল বিভায়  
অভিশপ্ত বিশ্বপানে তীব্র বেগে ধায়।  
মেঘগজ্জ' ঘন ঘন, প্রলয় বিষণ  
বাজায়ে নাচিছে ক্ষ্যাপা নিশি দিনমান।  
সে নৃত্য-চঞ্চল-চল পদতলে পড়ি,  
ছিন্নমূল ক্রমদল যায় গড়াগড়ি—  
গড়া গড়ি যায়—বিশ্ব রসাতলে যায়,  
ক্ষ্যাপা শ্রাবণ এল ফিরে রুদ্ধের লীলায়।





## উদয়-তারা

( পূর্বানুস্মৃতি )

শ্রীশ্রীনীলকুমার ধর

নরেন বলিল—বছর কয়েক আগে আমিও একজন মস্ত-বড় প্রেমিক ছিলাম ভাই, তখন মনে হোত যে কোন সুন্দরী মেয়েকেই আমি সর্কাস্তকরণ দিয়ে ভালবাসতে পারি—এবং এমনও ভেবেছি আমার ভালবাসা কোন একটি মাত্র মেয়ের জগ্গেও নয়! এখন মনে হয় ‘প্রেম, প্রয়োজন’ মাত্র—আজ রাতের প্রেমকে কালকের দিনের আলোয় আর খুঁজে পাওয়া যায় না—এমনি ছোট সে প্রয়োজন!

—আমার মনে হ’চ্ছে নরেন, কোন একটি মেয়েকে তুমি একান্তভাবে ভালবাসবার চেষ্টা কোরেছিলে—কিন্তু ছেলেবেলায় কল্পনার তুলী দিয়ে যে একটি মেয়েকে নিজের মনের উপর তুমি এঁকে রেখেছ, সে আজও তোমায়...

প্রকাশের কথা শেষ হইবার পূর্বেই বাধা দিয়া নরেন বলিল—কথাটা কতকটা ঐ ধরনের বটে, কিন্তু ঠিক ও নয়। শয্যাসজ্জিনী হবার মত অনেক মেয়ে এসে জুটেছে, অথচ যাকে নিয়ে বেঁচে থাকা চলে এমন একটি মেয়ের দেখা আজও পেলাম না—

প্রকাশ বলিল কিন্তু তোমার জীবনে একটি মেয়ের ভালবাসার একান্ত প্রয়োজন, নইলে...

কথা শেষ না করিয়াই প্রকাশ নরেনের মুখের দিকে তাকাইয়া গ্লান একটু হাসিল। অন্ধকারে নরেন সে হাসি দেখিতে পাইল না বটে কিন্তু অনুভব করিল।

—সকল পুরুষের জীবনেই নারীর ভালবাসার প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে প্রয়োজনকে সংক্ষিপ্ত কোরে নিতে না পারলে আমি পট এঁকে আর তুমি পদ্ম লিখে দিন কাটালে ত’ কোন ক্ষতি ছিল না—

প্রকাশ বলিল—কথাটা সত্যি, নরেন। এখন মনে হ’চ্ছে এমনি ভাবে আত্মবঞ্চনা কোরে এ পথে না এলেই যেন ভাল হোত—

নরেন বলিল—তার মানে তুমি এখন ফিরে গিয়ে আর সকলের মত হ’তে চাও—দিন আনা, দিন খাওয়া!

—এই সঙ্কীর্ণ দিন গুজরানের মধ্যে দুঃখ-দৈন্ত অনেক আছে জানি—ওরকমভাবে দিন কাটানো মানে আত্মহত্যা, তাও স্বীকার করি—কিন্তু আত্মবঞ্চনা নেই, ভাই! পরকে বঞ্চনা কোরে রাতে ঘুমের ব্যাঘাত হয় না—কিন্তু নিজেকে ছদ্মবেশ পরানর চেয়ে বড় জালা আর নেই—ঠিক রাজার ভূমিকায় অভিনয় করার পর ময়লা বিছানায় বিনীত বাকি রাতটুকুর মত!—সে কি দুঃসহ অস্থিতি.....

কথা শেষ হইবার পূর্বেই নরেনকে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া প্রকাশ বলিল—উঠলে যে?

—এখানে আমার থাকবার উপায় নেই—

বিস্মিত হইয়া প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

—কেন, সে কথা কি তোমাকে এখনও বুঝিয়ে বোলতে হবে—এরি মধ্যে কি সব ভুলে গেছ প্রকাশ !

—কোন কথাই ভুলিনি, ভাই, তবুও আশ্রয়বন্ধনা কোরতে পারব ন,—

প্রকাশের কথা শেষ হইবার পূর্বেই বাধা দিয়া নরেন বলিল—তার মানে তুমি বরুণার সঙ্গে বাকী আয়ুটুকু কাটাতে চাও, বেশ, কিন্তু তুমি কি মমতাকেও ভুলে গেছ ; যে মমতাকে নইলে তোমার একটি সন্ধ্যাও কাটত না এবং সন্ধ্যা বেলা যার সঙ্গে নিরিবিলিতে বেড়াবার লোভে নানা উপায়ে আমাদের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা কোরেছ ?

প্রকাশ বলিল—জীবনের পথে কত লোকের সঙ্গেই ত' দেখা হ'য়েছে সকলকেই কি আর মনে আছে, না, রাখা সম্ভব । তবুও মমতাকে ভুলিনি কিন্তু প্রয়োজনের পর তাকে মনে কোরে রাখবারও দরকার মনে করিনি—

বেশ একটু ব্যঙ্গের স্বরে নরেন বলিল—ভাল, বরুণার সঙ্গেও তোমার প্রয়োজনের একদিন ঠিক এমনি কোরে শেষ হবে, না ?

—নিশ্চয়, এর চেয়ে প্রবলতর প্রেম যদি কোন দিন আমাকে পাগল কোরে তোলে, বরুণার চোখের দিকে বা তার দেহের দিকে তাকিয়ে এতটুকু মোহ আমার হবে না ।

ক্যাম্পের দুয়ারের দিকে আগাইয়া যাইতে যাইতে নরেন বলিল—বাংলাদেশে না জন্মে তোমার প্যারীতে জন্মান উচিত ছিল । কি বিশ্বাসী দেশ-সৈনিক !

নরেন চলিয়া গেল । প্রকাশ তাহাকে ডাকিল না বারণও করিল না । ও জানে নরেনের মত ছেলেদের পিছনে ডাকিয়া ফিরান যায় না, ওরা প্রকাশ নয় । কবি প্রকাশ, যে প্রকাশ নারীর দেহ ঘিরিয়া স্তব গান করিয়াছে আর তাহার নাম দিয়েছে দেশ সঙ্গীত !

অত্যন্ত অবসন্নের মত শয্যার উপর দেহ এলাইয়া দিয়া প্রকাশ ভাবিতে লাগিল, যে মানুষ দেহের প্রয়োজনকে অস্বীকার করিয়া নিজেকে একটি বৃহৎ আদর্শের জন্ত পাগল করিতে পারে তাহার জীবনে কি অবলাদ নাই, বিশ্রাম-আকাজ্ঞা নাই । পৃথিবীতে বাস করিয়া মাটির আকর্ষণ সে কি করিয়া উপেক্ষা করে !

ভাবিতে লাগিল—আর ঐ অবনী, বন্ধুত্বের চেয়ে পৃথিবীর সকল স্বপ্নের চেয়ে বড় কোন নেশায় নিজেকে একেবারে পরিচিত পৃথিবীর আড়ালে ঢাকিয়া রাখিয়াছে অথচ একদিন তাদের সকলের উদ্দেশ্য ছিল এক, লক্ষ্য ছিল এক । আজ এ রাত্রে সে হয়ত কোথাকার কোন এক কুলীবস্তিতে হতভাগ্য ভিখারীদের সঙ্গে ছিন্ন শয্যা আশ্রয় করিয়া তাহাদের তন্দ্রাতুর চোখের সামনে ভবিষ্যতের রঙীন স্বপন সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে । সে এক অদ্ভুত পৃথিবীর কথা, যে পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে বড় কেহ নাই—যে পৃথিবীতে মানুষ মানুষের টুটী টিপিয়া ধরে না । কিন্তু নরেন বলিয়াছে গতবার যখন তাহার সঙ্গে অবনী হাজতে ছিল, বিচারের শেষ দিন সে তাহাকে বলিয়াছে—বহুদিন পূর্বে অবনী নাকি একটি মেয়ের পাণি-পীড়ন করিয়াছিল । তখন আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সময় ছিল না, অবনীকে লইয়া জেলের গাড়ী তখন চলিতে শুরু করিয়াছে নইলে নরেন বলিয়াছে, সে জিজ্ঞাসা করিত কতদিন পূর্বে অবনী বিবাহ করিয়াছে এবং কেনইবা সে এতদিন এ কথা গোপন রাখিয়াছিল ।

প্রকাশ ভাবিতেছে—অবনী এতদিন বিবাহের কথা গোপন রাখিয়া সেদিনই কেন নরেনকে সে কথা জানাইল আর এমন সময় জানাইল, যখন একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিবার সময় ছিল না । না জানাইলে যখন কোন ক্ষতিই হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না তখন সে বলিলই বা কেন ? কোথায় সেই অবনীর স্ত্রী...

প্রকাশ যখন এইসব কথা ভাবিতেছে বরুণা ধীরে ধীরে আসিয়া প্রকাশের ক্যাম্পে প্রবেশ করিল । বরুণাকে অমন নিঃশব্দে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিতে দেখিয়া প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল—এত রাত্রে অমন ভয়ে ভয়ে তুমি কি মনে কোরে বরুণা ?

একটু পূর্বে বরুণা নরেনকে ক্যাম্প হইতে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়াছে এবং সে মনে করিয়াছিল—প্রকাশ এতক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাই প্রকাশের এই আচমকা প্রবেশে সে নিজেকে অত্যন্ত বিপন্ন ও লজ্জিত অনুভব করিল । প্রকাশের শয্যার দিকে আর এক পাও আগাইতে না পারিয়া স্তব্ধভাবে

মাঝপথে দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল—আমি এখান থেকে পালাতে চাই, প্রকাশ।

শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া প্রকাশ বিম্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—পালাতে চাও, কোথায় পালাতে চাও? দাঁড়িয়ে রইলে কেন এগিয়ে এসে বসো—

কুণ্ঠিতভাবে প্রকাশের শয্যার এক পাশে বসিয়া বরুণা বলিল—আমি কলকাতায় ফিরে যেতে চাই—

বরুণার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া প্রকাশ বলিল—কিন্তু তুমিত জানো পুলিশ আমাদের চায়, আর পুলিশের হাত এড়িয়ে তুমি কোথায় যাবে!

অত্যন্ত বিচলিত কণ্ঠে বরুণা বলিল—কিন্তু যে রকমেই হোক পুলিশের হাত এড়িয়ে আমাকে কলকাতায় যেতেই হবে।

একটু স্নান হাসিয়া প্রকাশ বলিল—পুলিশের হাত এড়িয়ে কোথায় যাবে বরুণা, কলকাতায় কি পুলিশ নেই!

প্রকাশের ঐ স্নান হাসিটুকু বরুণার দৃষ্টি এড়াইয়া গেল না। সে প্রকাশের দু'খানি হাত নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—ও আমি জানি তবুও যা কোরেই হোক আমাদের পালাতে হবে—

বরুণার হাত হইতে নিজের হাত দু'খানি ইচ্ছা করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল—আমাকেও কি তোমার সঙ্গে যেতে হবে নাকি?

মুখ নীচু করিয়া বরুণা বলিল, হ্যাঁ।

—অম্বুং তোমার অভিনয়, বরুণা! কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি যেতে পারব না। কাল সকালে আমি ধরা দেব।

—কি কোরলে তুমি বিশ্বাস কোরবে, প্রকাশ, যে, এতদিনের অভিনয় আজ সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি ধরা দিতে পারব না, তুমিও না—

স্নান হাসিয়া প্রকাশ বলিল—বেশ তুমি কাল কলকাতায় চলে যাও, আর—

—আর তুমি?

—একজনকে ত ধরা দিতেই হবে—

কিছুক্ষণ বরুণা কোন কথা কহিল না তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল—কোন উপায়েই কি আমাদের দুজনের একসঙ্গে পালানো চলে না—

—পালানো হয়ত যায়, কিন্তু আমি পালাতে চাইনে।

—কেন?

—কেনর জবাব নেই বরুণা। আজ সকালেও তুমি যদি আমাকে কোথাও যাওয়ার কথা বোলতে আমি হয়ত অস্বীকার কোরতে পারতাম না, কিন্তু এখন—

—খামলে কেন প্রকাশ, বলা, এখন কি—

—এখন তোমার সঙ্গে যাওয়া অসম্ভব—

কিন্তু কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই প্রকাশের মনে হইল, কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিলে বোধ হয় ভাল হইত এবং বরুণা আরও স্পষ্ট করিয়া তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিত। বরুণা বলিল—এইবল্লে পালানো যায় কিন্তু তুমি পালাবে না; আবার বোলছ অসম্ভব। কি তুমি বোলতে চাও স্পষ্ট কোরেই বলোনা—

প্রকাশ বলিল, আমি যাব না এর চেয়ে স্পষ্ট করে আমি বোলতে পারি না—

—কিন্তু এর চেয়ে স্পষ্ট হোতে তুমি যদি বোলতে, বরুণা, সন্তায় নাম করার যে সন্যোগ আমি পেয়েছি সে সন্যোগ আমি ছাড়তে পারব না এবং আরও স্পষ্ট হোত যদি বোলতে—কিছুদিন পরে তোমার মত অনেক মেয়ে আমাকে ঘিরে চারিপাশে গুঞ্জন করে বেড়াবে, অতএব তুমি বিদায় হও—

বরুণার কণ্ঠস্বরে এমন একটা তিক্ততা ও ঝাঁঝ ছিল যে রাগের মাথায় প্রকাশ তাহার প্রতিবাদ করিতে গেল কিন্তু একটি কথাও বলিতে পারিল না। অথচ কিছু বলিতে না পারিয়া সে যে কি অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল বলা যায় না।

বরুণা বলিল, কেমন এই ত তোমার মনের কথা?

মৃদুস্বরে প্রকাশ বলিল, তোমার কাছে কথাটা হয়ত এমনি দাঁড়াবে—

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বরুণা বলিল, মিথ্যা কেন কথাটা ঘুরোবার চেষ্টা কোরছ!

—কিন্তু আমিও বলি, বরুণা, তোমার সঙ্গে আমার কি এমন সম্পর্ক আছে যার জন্তে তোমার কথা আমাকে শুনতে হবেই; আর আমি কলকাতায় ফিরে যাই বা ধরা দিই তার জন্তে তোমারই বা এত মাথাব্যথা কেন?

বরুণা এর উত্তরে কি বলিতে গেল কিন্তু একটি কথা বলিবার পূর্বেই প্রকাশের ক্যাম্পের দ্বারে আসিয়া যে দাঁড়াইল, সে নরেন। বেশ নাটকীয় ভঙ্গীতে ও বিজ্ঞাপের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—আসতে পারি কি ?

প্রকাশ হাসিয়া বলিল—নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম—না জানি এতক্ষণে কতদূরে গেলে—

প্রকাশের কথায় কান না দিয়া নরেন বরুণাকে একটি ছোট নমস্কার করিয়া বেশ বিনয়ের সঙ্গে বলিল—অত্যন্ত অগ্ৰায় করিচি, ক্ষমা করুন ! এবং বরুণাকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—আপনিই বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন না ?

বরুণা মাথা দুলাইয়া স্বীকার করিল।

নরেন বলিল—ছিঃ, ছিঃ—আপনি হয়ত ভাবছেন যে আমি ইচ্ছা কোরেই ফিরে এসেছি, কিন্তু সত্যি কোরে বলছি.....

বাধা দিয়া প্রকাশ বলিল—আহা, তার জন্তে এত লজ্জিত হবারই বা কি আছে !

নরেন বলিল—এত তোমার কথা, কিন্তু অপর পক্ষের ত.....

মুহূ হাসিয়া বরুণা বলিল—আমি কিন্তু তার জন্তে এত-টুকুও বিব্রত হইনি, নরেনবাবু, বরং আপনি যে ফিরে এসেছেন এটা ভালই হোল—

বিস্মিতভাবে নরেন জিজ্ঞাসা করিল—কেন বলুন ত ?

—আপনার বন্ধুর এত বড় একটা ত্যাগ আপনি নিজের চোখে দেখে যেতে পারবেন !...

বরুণার স্বরে টিপ্পনীর এমন একটা গর্কিত ও উদ্ধত ভঙ্গী ছিল যে নরেন বিস্মিত না হইয়া পারিল না—আর তাহার কাঁটা প্রকাশকে ঠিক তেমনি তীব্রভাবে বিধিল। প্রকাশের দিকে তাকাইয়া নরেন জিজ্ঞাসা করিল—ঠিক বুঝতে পারছি নে.....

বরুণা মনে করিয়াছিল নরেনের এ প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ যা হোক একটা জবাব দিবেই কিন্তু মিনিট দুই কাটিয়া গেলেও প্রকাশকে নীরব দেখিয়া বরুণা বলিল—তোমার লজ্জা কোরছে বোলতে, আমি বলছি ! এই স্বম্বাক্যকার

ঘরে আমাদের প্রেমভিনয় কেবল শুরু হয়েছিল, একটি ‘চুষন বিনিময়’ পর্য্যন্ত তখনও হয়নি, এমনি সময় আপনি ভগ্নদূতের মত হাঁকলেন, আসতে পারি কি, অর্থাৎ জানিয়ে দিলেন ওটা কিছুক্ষণের জন্তে—হয়ত বা চিরকালের জন্তে মূলতুবি থাক—

কথা শেষ করিয়াই বরুণা এমন কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল যে তাহার সেই ধারালো হাসির প্রতি টুকুরা গিয়া বিধিল প্রকাশ ও নরেনের বুকে। অপমানের বেদনায় প্রকাশ বিবর্ণ হইয়া উঠিল আর নরেন ভাবিল কোন রকমে ক্যাম্পের বাহিরে যাইতে পারিলে সে যেন বাঁচে !

প্রকাশ কোন প্রতিবাদ করিল না এবং নরেনও নীরব রহিল দেখিয়া বরুণা পুনরায় বলিল—ব্যাপারটা আবো পরিষ্কার কোরে বোলতে গেলে এই দাঁড়ায়—আপনার বন্ধু দেশ সেবার সর্বশ্রেষ্ঠ সার্টিফিকেটের জন্তে কাল সকালে পুলিশের হাতে ধরা দেবেন বোলছেন, আমি বলছি কাজ নেই ওসব ঝগ্গাটে, তার চেয়ে কলকাতায় চলো—কিংবা অন্য কোন যায়গায়—যেখানে গিয়ে দু’জনে—আপনাদের কবির ভাষায় যাকে বলে ‘নীড়’ রচনা করা যাক। কিন্তু হঠাৎ দেশপ্রেম ওঁর এত প্রবল হ’য়ে উঠেছে যে, এত রাতে আমার মত মেয়ে একা একা ওঁর ঘরে এসে সাধ্য-সাধনা কোরেও মত বদলাতে পারছে না ! আপনার বন্ধু একজন প্রকৃত—মার্ট্যার ! সত্যি, আমি যদি কবিতা লিখতে পারতাম.....

বাধা দিয়া প্রকাশ বলিয়া উঠিল—বড্ড বেশী এগিয়ে যাচ্ছ, বরুণা,

—বড্ড বেশী, না !

প্রকাশ আর কোন কথা কহিল না। নরেনের দিকে ফিরিয়া বরুণা বলিল—দেখুন, সত্যি কথা বোলতে কি, দেশ-সেবা আমার দ্বারা হবে না—এর চেয়ে আশ্রমে ফিরে গিয়ে কাঁথা সেলাই বা তরকারী কোটা এমন কি মালা জপাও ঢের ভাল !

এতক্ষণে বরুণাকে যেন হাতের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে মনে করিয়া বরুণার কথা শেষ হইতেই প্রকাশ গলার স্বর বেশ একটু বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল—কেন গো, তোমার স্ত্রী-স্বাধীনতা, ‘স্ত্রী-সাম্যবাদ’ এসব গেল কোথায় ?



বরুণাও ভাবিল এতক্ষণে সে প্রকাশের গোপন দুর্বল-  
তাকে আঘাত করিতে পারিয়াছে, তাই সেও কণ্ঠস্বর  
অস্বাভাবিক নাটকীয় করিয়া বলিল—তোমার মত পুরুষ যে  
দেশে ঘরে ঘরে—আর যারা পথের মোড়ে মোড়ে কথার  
জাল দিয়ে মেয়ে ধরার ফাঁদ পেতে রেখেছে, সে দেশে  
মেয়েরা কাঁথা সেলাই, তরকারী কোটা—রাগ্না-বাগ্না আর  
মালা জপা ছাড়া কি কোরবে ?

নরেন বলিল—কিন্তু একটু আগে আপনিই ত বলছি-  
লেন যে,—

—কিন্তু আপনি কি বিশ্বাস কোরতে পারবেন যে,  
আপনার বন্ধু চান আমরা দু'জনে একসঙ্গে জেলে যাই,  
তাতে দেশ-সেবকের সভায় ওঁর সম্মানও বাড়বে অথচ  
রোমান্সও হোল ?

বাধা দিয়া প্রকাশ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকিল—বরুণা ?

বরুণা তখনও হাসিতেছে, বলিল—নইলে কলকাতা  
থেকে আমাকে এখানে টেনে আনা এবং আজকের সন্ধ্যায়  
গোলঘরের ছাদে আমাকে প্রেমের কবিতা না শুনিয়ে  
জন-গণের কাব্য শোনার আর কোন মানে হয় না,  
প্রকাশ—

প্রকাশ বলিল—কিন্তু আমি ত তোমাকে জোর কোরে  
ধরে আনি নি কিংবা নিজেকে যেচে তোমাকে কবিতা শোনাই  
নি, তুমিই ত'—

বরুণা বলিল—মুখে না বলে প্রকারান্তরে ঐ ত তুমি  
আমার কাছে চাচ্ছিলে

বরুণার বাড়াবাড়ি দেখিয়া প্রকাশ মনে মনে অত্যন্ত  
রাগিয়া উঠিয়াছিল তাই এবার বেশ একটু চড়া স্বরেই  
বলিল—অপরের মনের কথা বুঝে দান করবার মত উদারতা  
তোমার কবে থেকে হোল, বরুণা—

বরুণা বুঝিল বাণ ঠিক জায়গায় বিধিয়াছে, তাই বেশ  
একটু ক্লান্তি-স্বরে বলিল—অমরেশকে যে দিন ঘর থেকে  
ফিরিয়ে দিয়ে দেখি আর একজন আমার দোর গোড়ায়  
রূপা-প্রার্থী হ'য়ে বসে আছে ! অমরেশকে ফেরান গেল  
কিন্তু এ এমনি না-ছোড়-বান্দা.....

আবছা অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা গেল না, কিন্তু দিনের

আলোয় দেখা যাইত প্রকাশের মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেছে এবং  
এই শীতের রাতে ওর সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে।  
আর বেচারী নরেন, ফিরিয়া আসিবার সময় মনে মনে এই  
বরুণার বিপক্ষে যত কটু ও কঠিন কথা সংগ্রহ করিয়া  
আনিয়াছিল সব যেন ভুলিয়া গেছে এবং সর্বোপরি সে যে  
সমিতির পণ-ভঙ্গ করার অপরাধে প্রকাশকে মৃত্যু-শাস্তি  
দিতে আসিয়াছিল একথা ভাবিয়াই তাহার যেন আর লজ্জার  
অন্ত রহিল না ! তাহার এ অহেতুক লজ্জার কারণ জিজ্ঞাসা  
করিলে সে হয়ত কোন কথাই বলিতে পারিবে না, তবুও এটা  
ঠিক যে বরুণা ও প্রকাশকে পরস্পরের নিকট হইতে ছিন্ন করা  
এখন তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাহার মনে হইতেছে পৃথিবীর  
সীমারেখা যেন এই ঘরের বাহিরে শেষ হইয়া গেছে—এবং  
এদের দু'জনের পৃথিবীতে হঠাৎ সে অনধিকার প্রবেশ  
করিয়াছে ! যেন অজ্ঞাতে কত বড় অপরাধ করিয়া ফেলি-  
য়াছে এমনি অসহায়ভাবে নরেন বলিল—আমি যাই—

এবং সত্যিই সে চলিতে শুরু করিল। বরুণা বলিল—  
পিছু ডাকছিনে, তবুও শুধুন—

নরেন থমকাইয়া দাঁড়াইল, বরুণা আগাইয়া গিয়া  
বলিল—আশ্চর্য্য হবেন না, আমাকে কলকাতায় পৌঁছে  
দিতে পারেন !

মিনিট দুই তিন স্তব্ধভাবে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া  
নরেন বলিল—কিন্তু পুলিশ ত' সত্যিই আপনাদের কাউকেই  
গ্রেপ্তার করবে না—

বরুণা কিন্তু এ খবরে এতটুকু বিচলিত হইল না উপরন্তু  
সে যেন এ খবর অনেক আগে হইতে জানিত এমনি  
শান্তভাবে বলিল—তা হ'লেও, আপনি আমাকে সঙ্গে  
কোরে নিয়ে চলুন—

প্রকাশের মুখের দিকে এক মুহূর্তের জন্তে তাকাইয়া  
নরেন বলিল—তাতে অ'পত্তি ছিল না কিন্তু আমাকে যে  
অনেক জায়গায় ঘুরে যেতে হবে—

বরুণা বলিল—আমারও কলকাতায় পৌঁছবার এমন  
কিছু তাড়া নেই, বেশ ত, অনেক জায়গা ঘুরেই না হয় যাব—

নরেন বলিল—দেখুন মিছে, কথা কাটাকাটি কোরে  
কোন লাভ নেই, আপনাকে সঙ্গে নিয়ে আমি কোথায়ও

যেতে পারব না ! তা ছাড়া এত দিনের পরিচয়ের পরও প্রকাশকে যখন আপনি বিশ্বাস কোরতে পারছেন না... ..

নরেনের কথা শেষ হইবার পূর্বেই বরুণা বলিল—বিশ্বাস আপনাদের কারও উপরেই নেই। দেশ সেবা করুন আর নারীসঙ্গ-বিনিময়ে মৃত্যু-শাস্তির ব্যবস্থাই করুন, নারীর এক কণা কৃপার জন্ত আপনি না পারেন এমন কাজই নেই। বিশ্বাসঘাতকতা থেকে আরম্ভ কোরে বন্ধু হত্যা পর্য্যন্ত—

প্রকাশ এতক্ষণ নীরব ছিল এইবার বরুণার দিকে আগাইয়া আসিয়া তাহার ডান হাত থানা চাপিয়া ধরিয়া বেশ কঠিন কণ্ঠে বলিল—পুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে একথা বোলতে তোমার একটু লজ্জা, এতটুকু ভয় কোরছে না ?

মুহূ একটু হাসিয়া বরুণা বলিল—দেহের জন্ত ভয়, সঙ্কোচ বা লজ্জা থাকলে কি তোমার সঙ্গে এতদূরে আসতে পারতাম।

স্বণায় লজ্জায় বরুণার হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া প্রকাশ বলিল—তুমি এত নীচ, এত ছোট বরুণা !

—চমৎকার প্রকাশবাবু, নারী যখন স্পষ্ট কথা ও সত্য কথা বলে তখন সে হয় নীচ ছোট, কিন্তু আপনি ও আজ পর্য্যন্ত অনেক মহত্বের পরিচয় দিয়াছেন, না ?

নরেন বলিল—আমি যাই। রাত থাকতে বেরতে না পারলে শেষ পর্য্যন্ত হয়ত আমাকেই জেলে যেতে হবে—

বরুণা বলিল—কিন্তু এখনও আপনার বন্ধুর বিষয়ে সব কথা বলা হয়নি, শেষ পর্য্যন্ত শুনে যান !

—কমা কোরবেন, আপনাদের প্রয়ণ-কাহিনী শোনার মত প্রচুর সময় সত্যিই আমার নেই বরুণা দেবী !

নরেনের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর যেন এতক্ষণ ফিরিয়া আসিয়াছে।

—বেশ, কিন্তু যাবার আগে আমার একটা কথার সত্যিকার জবাব দিয়ে যাবেন ?

—কতির সম্ভাবনা না থাকলে সত্যি কথা বোলতে ত আমাদের মানা নেই—

—চলে গিয়ে কি জন্তে আপনি আবার ফিরে এসেছিলেন যখন ত ?

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া নরেন বলিল—এর ঠিক সহস্রের দেওয়ার ক্রমতা আমার নেই, সত্যি—

—থাক যা পারবেন না তা নিয়ে বাড়াবাড়ি নাই বা কোরলেন কিন্তু আমি জানি কেন আপনি এসেছিলেন। আমাদের প্রেমভিনয় দেখবার একটা লোভ আপনার মনে মনে ছিলই কিন্তু তার চেয়ে আমার সামনে নিজের সঙ্গে বন্ধুর তুলনা কোরে বাহবা নিবার লোভ ছিল বেশী, কেমন সত্যি নয় কি ?

বরুণার ঠোঁটের কিনারে আবার সেই ধারালো হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রকাশ এতক্ষণ নীরব ছিল, এই বার বলিল—সত্যি কথা বোলতে ভয় পাচ্ছ কেন নরেন, বলোনা আমাকে গুলী কোরতে এসেছিলে।

প্রকাশের কথা শুনিয়া রাগে বরুণার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল চোখের দৃষ্টি হইয়া উঠিল সদ্য শাবকহারা বাঘিনীর মত। বলিল—কিন্তু হঠাৎ ভাল মানুষের মত ফিরে বাওয়ার মত মতি কেন হোল জিজ্ঞাসা কোরতে পারি কি ?

গম্ভীরভাবে প্রকাশ বলিল, না।

বরুণা বলিল—কথাটা যাকে জিজ্ঞাসা করছি তিনিই জবাব দিন—

নরেন বলিল—না,

এবং বরুণাকে কোন কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া প্রকাশ ও নরেন দুই জনেই ক্যাম্প হইতে বাহির হইয়া গেল। হতবাক বরুণার একবার ইচ্ছা হইল দৌড়াইয়া গিয়া ওদের দুই জনের সামনে দুই বাহু মেলিয়া পথরোধ করিয়া বলে—না, জবাব দিতেই হবে।

কিন্তু বরুণা সেখান হইতে এক পাও নড়িতে পারিল না। ঐ ছোট একটি কথা সেন তাহার পায় শিকল পরাইয়া দিয়াছে এবং আঘাতের এই অস্পষ্ট অবচেতনায় আজ সে নিজের দিকে তাকাইয়া হঠাৎ এমনি মুষড়িয়া পড়িল যে সে নিজেকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল। তাহার মনে হইল ঐ দুইটি ছেলে যদি সত্যিই আর কোনদিন ফিরিয়া না আসে তাহা হইলে তাহার জীবনযাত্রা দুর্ব্বল হইয়া উঠিবে। কেন যে তাহার এই অপ্রত্যাশিত দুর্ব্বলতা, এ হয়ত সে নিজেও জানে না।

রাত্রি তখন প্রভাতের নিকে চলিয়াছে কিন্তু এতক্ষণের

মধ্যে বরুণার চোখে এতটুকুও ঘুম নামে নাই। নিজের ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিয়া শয্যা শুইয়া অবধি কত কথাই যে বরুণা ভাবিতেছে তাহার আর শেষ নাই, না আছে তাদের কোন সামঞ্জস্য। নিঃসঙ্গী ঘরে একা একা শুইয়া আজ তাহার মনে একাধিকবার এই প্রশ্ন জাগিতেছে কিসের জন্ত সে সকল নিয়ম-কানুন ও বাধা-নিষেধের গাঁও ডিঙাইয়া আশ্রমের বাহিরে আসিয়াছে, আর কেনই বা এত জনকে এমন নির্মমভাবে নিজের নিকট হইতে দূরে তাড়াইয়া দিয়াছে। অথচ এদের যে কোন এক জনকেও লইয়া সে বেশ নির্কির্বাদে জীবন কাটাইতে পারিত অন্ততঃ কিছুদিন ত কাটিত। আবার মনে হইয়াছে কিছুদিনের জন্তে নিজেকে অমনভাবে বিলাইয়া দিলে আজ আর তাহার দাঁড়াইবার মত এতটুকু স্থান থাকিত না। কিন্তু এমনভাবেই বা আর কতদিন চলিবে! নিজের অন্তরকে যে চেনে না ক'দিন সে আর এমনি অনিচ্ছিত্ত ভাবে ঘুরিয়া মরিবে। অথচ কি যে সে চায়, কি পেলো যে সে সুখী হইবে তাহাও সে নিজে জানে না। পুরুষের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা লইবার জন্তে পুরুষের গড়া সমাজের বিরুদ্ধে যে অভিযান সে শুরু করিয়াছিল আজ নিজের সেই পাগলামীর কথা মনে করিয়া সে আপন মনে একটু হাসিল। হাসিল এই জন্যে যে সে কি করিতে পারিয়াছে! পুরুষের সমাজ ঠিক তেমনি চলিয়াছে, নারীর অসংখ্য লাঞ্ছনার কাহিনী আজও প্রতিদিন খবরের কাগজে প্রকাশিত হইতেছে। অল্পবয়স্ক ছেলেদের মাঝে যে ছোট চেউ সে তুলিয়াছিল দেশমাতার উদ্ধার স্বপনের আড়ালে ডুবিয়া যাওয়ার মত—আর কতটুকু ঝড় সে তুলিয়াছে! কত যে লাক্ষিতা অসহায় নারী আজ ঘরে ঘরে নানা অত্যাচার, অবিচারে কাটিয়া মরিতেছে সে ক্রন্দন তাহারা শুনিতে পাইতেছেন, স্বাধীনতার স্বপ্নে তাহারা পাগল।

এখন বার বার অমরেশকে মনে পড়িতেছে।

—ছয়—

নরেন ভাবিয়াছিল কলিকাতায় গিয়া মমতা তাহার মামার বাড়ীতেই উঠিবে কিন্তু কলিকাতায় পৌছিয়া শুনি

এতদিন পরে মমতা তাহার সংসার কাছে ফিরিয়া গেছে। আশ্চর্য্য সে কেবল একা হয় নাই, এ বাড়ীর প্রতি ছেলে মেয়েটি পর্যন্ত। নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় তাহার অসুখের সময় মামারা কেহই খাইতে পারে নাই বলিয়াই নাকি এ রাগ কিন্তু যাওয়ার উপায় থাকিলে কেহ কি আর ইচ্ছা করিয়া যায় নাই! কিন্তু এ সব কথায় ভুলিবার বা বুঝিবার মেয়ে মমতা নয়। এ বাড়ীতে একটি রাত্রি ও সে কাটায় নাই উপরন্তু যাওয়ার সময়ে বলিয়া গেছে—মা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ীর সঙ্গে আমারও সম্বন্ধ যে শেষ হয়ে গেছে এ কথা আমার অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল—

এবং যাইবার সময় আরো বলিয়া গেছে, এ বাড়ীতে সে আর ফিরিয়া আসিবে না।

কথা বলিতেছিলেন মমতার বড় মামা।

বলিলেন—ওর কাছ থেকে এরকম ব্যবহার আমরা কেউই আশা করিনি, তা ছাড়া ট্রেন থেকে নেমেই সেদিন ট্রেনে দাঁড়িয়ে ও এমনি চেচামেচি আরম্ভ কোরলে, সত্যি, ওর এরকম মেজাজ আমরা আর কখনও দেখিনি।...কিন্তু এসব কথা এখন থাক নরেন, তোমার খবর বলো। কতদিন পরে দেখ—প্রকাশ, অবনী ওরা সব কেথায়, বিয়ে থা কোরেছে?

—অবনী শুনিছ মাস দুয়েক আগে জেল থেকে বেরিয়ে পশ্চিমের কোথাকার একটা মিলে চাকরী নিয়েছে, প্রকাশ আমার সঙ্গে আজ সকালে পাটনা থেকে কলকাতায় ফিরেছে। বিয়ে আগাদের কারও হয় নি—

মমতার মামা হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—বলো কি হে! এখনও তোমাদের পাগলামী গেল না। আমরা দুভাই কিন্তু তোমরা দুই পড়বার পরেই বিয়ে থা কোরে দিব্য সংসারী হইছি। কি দরকার বাবা ও সব বাজে ঝগাটে যে কদিন ঝাচবে রোজগার কর; থাও দাও—দশজনের একজন হও—

মুহু হাসিয়া নরেন বলিল—আমিও ঠিক ঐ কথা ভাবছি তাই, কিন্তু আজ আর সময় নেই। আর একদিন এসে এসব বিষয়ে আলোচনা করা যাবে

নরেন উঠিয়া দাঁড়াইল। মমতার বড় মামা প্রতাপ

নরেনের পিট চাপড়াইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—আমি  
কিন্তু তোমার right girlএর সন্ধান দিতে পারি।

—পার না কি ?

—হ্যাঁ, নিশ্চয় ?

—নাম কি বলো ত, কোথায় থাকে ?

—নাম তোমার মোটেই অজানা নয়, মেয়েটিকেও তুমি  
চেনো, এমন কি একদিন...

প্রতাপের কথা শেষ হইবার পূর্বেই নরেন বাধা দিয়া  
বলিল—তুমি বোধ হয় মমতার কথা বোলছ কিন্তু কাগজে  
পড়িছি ট্রেন কলিশনে তার নাকি একটা চোখ কানা হয়ে  
গেছে—

মুহূর্তের জন্যে প্রতাপ যেন একটু লজ্জিত হইয়া উঠিল  
তাহার পর বলিল—না এমন কিছু নয়, তবে তুমিও যদি আর  
সকলের মত খুঁৎ ধরো তা হলে—

কিন্তু নরেন এ কথার কোন উত্তর না দিয়া ততক্ষণে  
ঘরের বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

প্রতাপও কথা শেষ না হইতে চূপ করিয়া গিয়া অত্যন্ত  
সঙ্কচিত ভাবে নরেনের পিছনে পিছনে বাহিরে আসিয়া  
দাঁড়াইল এবং কোন কথা খুজিয়া না পাইয়া আপন মনে বাব  
তিনেক বলিল—সে ২১ নম্বরে থাকে, ২১ নম্বর...২১ নম্বর—  
লেন...

( ক্রমশঃ )

## গান

তোমার শাসন,  
আমার পুরস্কার !  
যতই পারো  
ততই মারো,  
আঘাত পরে আঘাত করো,—  
করো যতই তিরস্কার,—  
তোমার শাসন,  
আমার পুরস্কার !  
তব চরণ বাজে  
মরণ মাঝে  
ভয় তরাসে দুঃখে লাজে  
অভয় পরশ চমৎকার !  
তোমার শাসন, আমার পুরস্কার !

রাজটীকা সে কলঙ্ক ভার,  
স্নিগ্ধ সোহাগ তোমার প্রহার  
লাগে শিহর বারংবার—  
তোমার শাসন,  
আমার পুরস্কার !  
তোমার ও শর আমার বুকে  
পুষ্প হ'য়ে ফুটলো সুখে,—  
কুসুম ধনু !  
জুড়ায় তনু,  
লুকায় অহঙ্কার ( কোথায় )  
তোমার শাসন,  
আমার পুরস্কার !





**তর্পণ—**দেশ-প্রাণ শ্যামসুন্দরের তিরোধানে আমরা আর একজন প্রবীণ দেশসেবক ও নেতাকে হারাইলাম। যাহারা আরাম কেশরায় বসিয়া দুনিয়ায় তাঁহাদের সন্ধানী আলো ফেলিয়া মানুষের সকল চেষ্টা ও কষ্টের মধ্যে গোপন ছিদ্র আবিষ্কার করেন তাঁহাদের কাছে শ্যামসুন্দর ত চার, যয়ং ভগবানও নিষ্কৃতি পাইবেন না। স্বপ্নের বিষয় দেশে এমন লোকেরও অভাব নাই যারা শ্যামসুন্দরের জীবনজোড়া আত্মহতির মূল্য বুঝিয়া অন্ধায় মস্তক নত করিবেন।

**স্বাগত !—**বিশ্ববিদ্যালয়ের নববিধানমতে প্রবেশিকা পরীক্ষার সকল বিষয়ে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা বঙ্গভাষায় হইবে। এই সন্ধিক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত রবীন্দ্রনাথের সংযোগ অনেক শুভ-সম্ভাবনার সূচনা করিতেছে। এমন পরিণত বয়সে নূতন করিয়া স্বেচ্ছায় গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ আর একবার প্রমাণ করিলেন যে দেহে বদ্ধ হইলে কি হয়, মনেপ্রাণে তিনি চিবতরুণ !

**অসান্তরান—**জ্যামিতির দুই সমান্তরাল রেখার ন্যায় হিন্দু ও মুসলমানের ব্যবধান কায়েমী হইয়া উঠিয়াছে, মিল আর কোথাও হইতেছে না। রসূল, লিয়াকৎ, চিররঞ্জন, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ দিকপালগণ যে মিলন ঘটাইতে পারিলেন না, পর পর দুই গোল বৈঠকে যে প্রশ্নের সমাধান হইল না, ম্যাকডোনাল্ড তথা ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা হঠাৎ ১৭ই জুলাই তারিখে সেই অসাধ্য সাধন করিবেন এ আশা আমরা করি নাই। কাজেই আশাতন্ত্রের পশ্চাত্তাপ। আমাদের ঘটে নাই। তৃতীয় পক্ষের শাস্তিবারির ছিটায় যখন ভাই ভাইএর বা পিতাপুত্রের কলহ মিটাইবার প্রয়োজন হয় তখন লজ্জা রাখিবার ঠাই থাকেনা। তাই অতি দুঃখেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন “I hate to appeal.” কথাগুলির গম্ভীর দুই

বিড়ালের পিঠক ভাগের বিডঘনার কথা পড়িয়া বাল্যকালে কতই না হাসিয়াছি। জাতিব জীবনে সেই আখ্যায়িকার পুনরভিনয় দেখিয়া কাদিতে ইচ্ছা হয়! রাজনৈতিক দাবা খেলার নিচিত্র চাল দেখিলে অব্যবসায়ী লোকের বিস্ময়ের আর অবশি থাকে না। মুসলমানের প্রতি অযথা পক্ষপাতিত্ব দোষে হিন্দুর পক্ষে যে ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ, তাহাই আবার গজনবী প্রমুখ আত্মরে ছেলেদের পক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে হারাম। ৬দেশবন্ধু মুসলমানদের প্রাধান্য দিতে চাহিয়াছিলেন, মহাত্মা ত সাদা চেক সহি করিয়া দিতেই প্রস্তুত। আমরা কিন্তু এর কোনটাতেই স্বাস্থ্যের বা শাস্তির লক্ষণ দেখিতে পাইনা। যে ব্যবস্থা একের জ্বরদন্তী বা জ্বিদ এবং অপরের দুর্কলতা, উদারতা বা বিষয়বিরাগের বশে গড়িয়া উঠে তাহা পাকা ব্যবস্থা নহে, যে কোন মুহূর্তে কাঁসিয়া দাঁড়াইতে পারে।

আমাদের যত দুঃখ ও লজ্জার কারণই ঘটুক না কেন, তৃতীয় পক্ষের কিন্তু জয়জয়কার !

**জলধর সন্দর্ভনা—**রবিবাসরের উত্তোগে সেদিন প্রবীণ সম্পাদক জলধর সেন মহাশয়ের উদ্দেশে যে বিপুল সন্দর্ভনা অনুলিখিত হইয়াছে বিপুলতাই তাহার একমাত্র পরিচয় নহে। এই সন্দর্ভনাসভায় আন্তরিকতা ও অন্ধাভালবাসার পাত্র কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সভাপতি স্বয়ং শরচ্চন্দ্র ও সাহিত্যরথী প্রমথ চৌধুরী মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া নগণ্যতম সাহিত্যাহুরাগী পর্যন্ত সকলেই বাংলার সাহিত্যিক ‘দাদা’কে স্ব স্ব অঙ্কগুলি অর্পণ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন। মামুলি বাগবিত্তারের ঘটনা এখানে ছিল না। কেমন একটা সহজ প্রীতির আভাস সমবেত নরনারীর চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সম্পাদকরা যেন কতকটা কাব্যের উপেক্ষিতের মত। রাসায়নিক catalytic agent এর ন্যায় ইহারা লেখক ও পাঠকে মিল ঘটাইয়া দেন, কিন্তু নিজেরা থাকিয়া যান অন্তরীক্ষে। জলধর দাদা যে উপেক্ষিত নহেন তাহার ভূরি প্রমাণ পাইলাম রামমোহন লাইব্রেরীতে। তিনি শতায়ু হইয়া বাংলা সাহিত্যের সেবা করণ এই আশাই আমরা করি। বাঙ্গালার গণ্যমান্য সম্পাদকদিগের দুই চারিজনকে সে সভায় উপস্থিত দেখিলে আমরা খুসী হইতাম। রবিবাসরের সম্পাদক তাঁহাদের ডাকিতে জুলিয়াছেন বলিয়াও ত মনে হয় না।

**কালান্ধকারে**—আরামে বিলাসে তুচ্ছতার সেবায় যখন আমাদের দিন কাটিয়া যাইতেছে তখন কারার অন্ধকারে সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন তিল তিল করিয়া ক্ষয় পাইতেছেন ওদিকে ইউরোপে আর এক দৃশ্য, মহাপ্রাণ টুটুকি রুগ্মশীর্ণ দেহমন লইয়া দেশ হইতে দেশান্তরে একটু মাথা রাখিবার আশ্রয় খুজিয়া বেড়াইতেছেন! অথচ ইহাদের এ দুঃখ-বরণ নিতান্ত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, শুধু মানুষেরই দুঃখ মোচনের জগু। সেই মানুষই আবার ইহাদের নিষ্ঠুর কারারক্ষী! এ বিড়ম্বনার শেষ কোথায়?

**শরৎ বন্দনা**—আগামী ৩১শে ভাদ্র বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সপ্তপঞ্চাশতম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে দেশের পক্ষ হইতে

তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইবে। ৩১শে ভাদ্র তারিখে সন্ধ্যা ৬টার সময় টাউন হলে মহিলাগণ তাঁহাকে বরণ করিবেন এবং মানপত্র পাঠ করিবেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঐ তারিখে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিবেন। পরদিন ১লা আশ্বিন টাউন হলে বেলা ৫টার সময় সাহিত্য সম্মিলন হইবে। দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ রচনার ভিতর দিয়া শরৎচন্দ্রের প্রতি তাঁহাদের প্রজ্ঞা প্রদর্শন করিবেন। রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ, শরৎচন্দ্রের প্রত্যভিভাষণ, প্রমথ চৌধুরী, জলধর সেন, রাধারাণী দেবী, হুমায়ুন কবির, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যিকগণের লেখা একত্র ছাপিয়া “শরৎ-বন্দনা” নাম দিয়া একখানি বই প্রকাশ করা হইতেছে। শ্রীশরৎ লাইব্রেরী এই বইখানি ছাপিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ১লা আশ্বিন সাহিত্য সম্মিলনের দিন এই বইখানি মুদ্রিত অবস্থায় পাওয়া যাইবে। ২রা আশ্বিন সাধারণ সম্পাদক শ্রীনির্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাড়ীতে এক প্রীতি-সম্মিলনের আয়োজন হইয়াছে। ৩রা আশ্বিন চিত্রায় “পল্লীসমাজ” চলচ্চিত্রে দেখান হইবে এবং ৪ঠা আশ্বিন ষ্টার থিয়েটারে “ষোড়শী” অভিনীত হইবে।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বেশি কিছু লেখা আজ বাহ্যল্যমাত্র। দেশের সমবেত নরনারী যে এই সম্বর্ধনার আয়োজন করিয়াছেন তাহা হইতে বোঝা যাইতেছে তাহাদের মন কত গভীরভাবে তিনি অধিকার করিয়া আছেন।

## পুস্তক পরিচয়

শ্রীশচীন্দ্রলাল ঘোষ

**পত্রাবলী—ধর্ম ও বিজ্ঞান**। শ্রীদিলীপ কুমার রায়, বীরবল এবং শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত লিখিত কয়েকখানি খোলা চিঠির সমষ্টি, মূল্য ১/-। প্রকাশকের নামের উল্লেখ নেই।

১৪৪ পৃষ্ঠার এই বইখানি নানাদিক দিয়েই উল্লেখ যোগ্য। ‘সংসাহিত্য’—ভারাক্রান্ত বাংলা দেশের পাঠকের কাছে এতে আলোচিত বিষয়গুলি দুর্বোধ্য এবং রসহীন লাগলেও লাগতে পারে; কিন্তু জিজ্ঞাসু পাঠকের মন যে প্রতি

পৃষ্ঠায়ই চিন্তার গোরাক পেয়ে আনন্দিত হবে, একথা নিশ্চয় করে’ বলা যায়।

আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার—যা’কে গুপ্ত মশায় “বিজ্ঞানমুগ্ধ দর্শন” বলে’ অভিহিত করেছেন—কেমন করে’ মানুষের মনের অন্তর্নিহিত ধর্মচেতনাকে জোর করে’ অবরুদ্ধ করেছে, সে সম্বন্ধে বাংলা দেশের একজন চিন্তাশীল তরুণ এবং দুইজন সুপক্ক চিন্তাবীরের আলোচনা পরম উপভোগ্য, একথা বলা বাহ্যল্য। এই

পত্রগুলির সঙ্গে হয়ত পাঠক অল্প-বিস্তর পরিচিত আছেন, কারণ এগুলি বিভিন্ন বাংলা মাসিক পত্রে বেরিয়েছিল; এবং যতদূর স্মরণে আসে, বাংলা সাহিত্যে ৩রা মেজমুন্সের ত্রিবেদীর পর বিজ্ঞান ও ধর্মের সম্বন্ধ নিয়ে আলোচনা এই প্রথম। এই কারণে সাহিত্য ও চিন্তার ক্ষেত্রে বইখানির একটা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব আছে।

পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানের কুসংস্কার কেমন করে' জনসাধারণের এবং ছ'চারজন বিখ্যাত ব্যক্তির মনে ধর্মের স্থান করে' বসল, তার মূল আলোচনা করতে গেলে প্রায় আশী বৎসর পেছিয়ে গিয়ে ডারুইনের ক্রমাভিব্যক্তিবাদ এবং পরমাণু আবিষ্কারের যুগে গিয়ে পড়তে হয়। সহস্রাব্দ বিজ্ঞানের নবজ্ঞানের আলোকে বাইবেলের গাল-গল্পের মূল আবিষ্কার করায় লোকের মনে চলিত ধর্মের প্রতি একটা অশ্রদ্ধা এসে' যায়। তারপর বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের যত উন্নতি হ'তে লাগল, ততই বিজ্ঞানের মতবাদের উপরে লোকের শ্রদ্ধা বেড়ে' যেতে লাগল; ফলে দাঁড়াল এই, বিজ্ঞানের অঘটন-ঘটন ক্ষমতার ওপরে লোকের হো'ল অসীম বিশ্বাস—এমন কি কোন কোন বৈজ্ঞানিকও এমন আশা করে' বসলেন যে বিজ্ঞানের দ্বারা হয়তো জগতের সব রহস্যের দ্বার একদিন উন্মোচিত হ'তে পারবে। যাকে Scientific materialism বা বৈজ্ঞানিক জড়বাদ বলে, তার মূলে আছে এই আশা—পাশ্চাত্য এ'কেই করে' নিল তার বিশ্বাসের বনিয়াদ। এই বনিয়াদের পরে মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের আশা-ভরসার বাসা বাঁধতে গিয়ে দেখা গেল, ধর্ম বিশ্বাসের ইমারতের চেয়ে এই নববিশ্বাসের মাল-মসলা অনেক কম। কাজেই এমন সব জিনিষ দিয়ে কাঁক ভর্তি করতে হ'ল—যাকে' ইংরাজীতে বলা যায় Conjectural belief অর্থাৎ আনুমানিক বিশ্বাস। এটার প্রকৃতি হ'ল স্বতন্ত্র—না ধর্ম, না বিজ্ঞান। ধর্মের কুসংস্কার দূর করতে গিয়ে আমদানী হ'ল বিজ্ঞানের টিকিট-মারা কুসংস্কার।

কিন্তু বিজ্ঞান যতই পদার্থের বিশ্লেষণ করতে লাগল, ততই দেখা যেতে লাগল, জড় তার সূক্ষ্মতমরূপে গিয়ে আর জড় থাকছে না, একটা সমধর্মী বিদ্যুৎকণায় গিয়ে পরিণতি লাভ করছে। তখন ধারা বিজ্ঞানের উপর

বিশ্বাসের ভিত্তি-খাড়া করেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও দার্শনিক গোলযোগ শুরু হ'ল। এই গোলযোগটাকেই বোধ হয় দিলীপকুমার “বিজ্ঞানের ট্রাজেডি” বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এ ট্রাজেডির ফল হ'ল ভালই—বৈজ্ঞানিকের মনে সর্বস্বতার যে একটা আত্মসম্মতি ছিল, সেটা একটু একটু করে' খসে' পড়ল। এদিকে জীববিজ্ঞা ও মনোবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক অনুশীলন যতই এগুতে লাগল, ততই দেখা যেতে লাগল, মনের ও প্রাণের ধর্ম জড়বিজ্ঞানের তথাকথিত নিয়ম কানুনের মধ্যে ধরা পড়ে না। এদিকে জড়বিজ্ঞানও শক্তির হাতে পড়ে শেষ পর্যন্ত পঞ্চত্ব লাভ করল।

এ পর্যন্ত বিজ্ঞানের প্রদর্শিত পথে চলা—অর্থাৎ বিশ্লেষণ করা—সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু এখন মনীষী মহলে প্রশ্ন উঠল, জড় যে শক্তিরই একটা রূপ, সেকথা মানুষাম; কিন্তু শক্তির এত বিচিত্র রূপায়নই বা কেন, আর এ শক্তির খাটা রূপটাকে উপলব্ধি বা অপর কোন উপায়ে গোচরীভূত করা যায়ই বা কেমন করে' ? ইথারের সমষ্টি এই জড়জগতে যুহুযুহু রূপই বা বদলাচ্ছে কেন, আর ইথার—বিমুক্ত মনেই বা নব সৃষ্টির অনুভূতি জাগছে কেন ? এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিজ্ঞানকে অবলম্বন করতে হ'য়েছে বিশ্বাসের ওপরে। অবশ্য বিশ্বাসের ওপরে নির্ভর করা বিজ্ঞানের পক্ষে আজ নতুন নয়—কারণ, বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র কয়টাই হ'চ্ছে নিছক বিশ্বাস বস্তু। বৈজ্ঞানিক মন তাই এখন আর বিচারের বাইরে যেতে আপত্তি করছে না—বিচারের বাইরে, হয়তো বা যে একটা স্বতঃপ্রাণোদিত সত্যের ইঙ্গিত মানব মনে আছে, সেটাকে অবলম্বন করতে তুচ্ছ করছে না। এইখানেই বিজ্ঞানের হ'চ্ছে “স্বমতি”।

কিন্তু একথা মানতেই হ'বে যে যে ধর্মের আসনে পূর্বে বিজ্ঞান বসে' রাজত্ব করেছিল, তার সঙ্গে আজ যে ধর্ম রচিত হ'চ্ছে তা'র আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখা যাবে। সে ধর্ম ছিল লোকাচার প্রদীড়িত, এ ধর্ম হ'বে মুখ্যতঃ ব্যক্তিগত। হয়তো হৃদয় বা অদূর ভবিষ্যতে কোন দিন কোন জাতি এই ধর্মে বলীয়ান হ'য়ে “মহতো মহীয়ান” হ'বে—কিন্তু আমার বিশ্বাস, ধর্মের সার্বজনীন হ'বার দিন এগিয়ে আসছে। নব ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তি ব্যক্তির প্রতি অন্ধ ভক্তি নয়; এর ভিত্তি হ'চ্ছে বিজ্ঞানের কুসংস্কার মুক্ত জ্ঞানের মধ্যে, দেহহীন আদর্শের মধ্যে। এর সঙ্গে প্রত্যেকের কোন বিরোধ থাকছে না, বিশ্বাসেরও কোন বিরোধ থাকছে না। এ ধর্ম বিশ্বাস “ভিত্তিতে হৃদয়-গ্রন্থিহীনভাবে সর্বসংশয়াঃ”। কিন্তু এর মূলের কথা হ'চ্ছে—বিজ্ঞান নয়, বিশ্বাস।

# জীবন বীমা

জীবন বীমার নাম সকলেই শুনিয়াছেন। ইহার ইংরাজী নাম “লাইফ ইনসিউর”। আমাদের দেশে ইহার প্রসার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে ইহা মঙ্গলের বিষয়। বীমার উপকারিতা সকলেরই বোঝা উচিত। ইহা একটা জাতীয় উন্নতিকর প্রতিষ্ঠান—বীমা দ্বারা একদিকে যেমন নিত্য প্রয়োজনীয় খরচ হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্যতের সংস্থান হয়, অপরদিকে তেমনি সহস্র সহস্র লোকের চাঁদার টাকা একত্রিত হইয়া কোম্পানীতে একটা বিপুল অর্থশক্তি দাঁড়ায়। এই অর্থ দ্বারা দেশের কল-কারখানা তৈরী প্রভৃতি নানাপ্রকার উন্নতি মূলক কার্য হইয়া থাকে। এইজন্য ইহা জাতীয় উন্নতিকর প্রতিষ্ঠান।

বীমা সম্বন্ধে সাধারণ লোকের অভিজ্ঞতা যত বৃদ্ধি পাইবে সমাজের ও জাতীর পক্ষে তত মঙ্গলজনক হইবে। অনেকে মনে করেন বীমা করিয়া যে টাকা গচ্ছিত রাখিবেন তাহা অপেক্ষা ব্যবসায়ে লাভ অধিক হইবে। সে সকল লোকের ধারণার উত্তরে বলা যাইতে পারে—ব্যবসায়ে অধিক লাভ হয় সত্য কিন্তু বীমা ভবিষ্যতের সংস্থানের উপায়। এই হিসাবে তাঁহারা বীমাকে না দেখিলে ইহার স্বার্থ উদ্দেশ্য ও উপকারিতা বুঝিতে পারিবেন না।

প্রতি মাসে যে অর্থ সাংসারিক খরচের জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে তাহা হইতে দু'এক টাকা কমাইয়া কোন ব্যবসা ত' হয়ই না, পক্ষান্তরে সে টাকাও কোনরূপে জমা রাখিলে অনটনের সময় খরচ হইয়া যায়। বীমা করিলে নিয়মিত চাঁদা একপ্রকার বাধ্য হইয়াই দিতে হয়। ইহা একপ্রকার বাধ্যতা মূলক সঞ্চয় এবং কিছুদিন দেওয়ার পর ইহা আমাদের সাংসারিক খরচের ন্যায়ই গণ্য হইয়া যায়। এইরূপে কিছুকাল পরে বা মেয়াদান্তে দেখা যায় যে এক

কালীন একটা বড় রকমের মূলধন পাওয়া যায়। বার্ষিকে অথবা মধ্য বয়সে এইরূপ একটা বড় রকম মূলধন পাইলে সকলেই ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া উন্নতি করিতে পারেন বা নিশ্চিন্ত মনে জীবন যাপন করিতে পারেন। দৈবাৎ বীমা করা অবস্থায় মৃত্যু হইলে যে সুবিধা পাওয়া যায় তাহার বিষয় বর্তমানে আর কাহারো অবিদিত নাই বলিলেই চলে। বীমার প্রধান উদ্দেশ্যই এই যে অকালমৃত্যু হইলে নাবালক পুত্রকন্যাগণ ও বিধবা পত্নী যাহাতে নিঃসহায় অবস্থায় পথে আসিয়া না দাঁড়ায় তাহারই উপায় নির্ধারণ। যাহাদের পূর্ব পুরুষের নগদ অর্থ ব্যবসা বা জমিদারী আছে, তাঁহাদেরও বীমা করার প্রয়োজন হয়, কারণ ঐ সকল ব্যবসা ও নগদ অর্থ যখন আছেই তখন সামান্য কিছু জমাইয়া ভবিষ্যতের চিন্তা করিতে দোষের কিছু হয় না, উপরন্তু, বাঁচিয়া থাকিলে মেয়াদান্তে বীমার টাকাগুলিও ব্যবসা জমিদারী বা অন্য কারবারে খাটান চলিতে পারে। সর্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রয়োজনীয় কথা হইতেছে যে জমিদারই হউক মহাজনই হউক মৃত্যুর পর তাঁহাদের ব্যবসা জমিদারী, মহাজনী কিরূপভাবে চলিবে, নাবালক পুত্রকন্যা, বিধবা পত্নীকে কি ভাবে কাটাইতে হইবে, দেনদারগণ তাঁহাদিগকে কি ভাবে ফাঁকী দিবে না দিবে তাহা কিছুই বলা যায় না—সে ক্ষেত্রে বীমা করা থাকিলে লব্ধ অর্থ হইতে ভবিষ্যতের সমস্ত বিপদ কাটাইয়া উঠিয়া তাঁহারা অনায়াসে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে পারেন। এমনও দেখা যায় যে বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বা বড় ব্যবসাদারের নাবালক পুত্র নগদ টাকার অভাবে তাহার পিতার মৃত্যুর পর সকল দিক ধোয়াইয়া দেনার দায়ে পথে বসিয়াছে। এই সকল কারণে আজকাল ধনী, দরিদ্র, ব্যবসায়ী জমিদার, মহাজন সকলেই কিছু না কিছু টাকার বীমা করিয়া রাখিতেছেন।



রাজকর্মচারী বা চাকরীজীবিদিগের ত কথাই নাই। যত্নর পর বা চাকরী নষ্ট হইলে এক দিবসের আহাধ্যের সংস্থান হয় এমন লোক তাঁহাদের মধ্যে কমই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বর্তমানে সকলের মধ্যেই বীমা করার জ্ঞান একটা আগ্রহ দেখা দিয়াছে ও দেশের মধ্যে বীমা সম্বন্ধে আন্দোলনের বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার কারণ হইতেছে বীমার যথেষ্ট উপকারিতা ক্রমেই লোকের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে।

বীমার প্রসার হওয়ার আরও কারণ নির্দেশ করা যায়। বীমাকোম্পানীর সংখ্যা বৃদ্ধি তাহাদের মধ্যে প্রধান—তন্মিহ্ম পূর্বে যে সকল কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে অল্প টাকার বীমা লওয়া হইত না এমন কি কোন কোন কোম্পানীতে দু'হাজার টাকার কম বীমাপ্রস্তাব গ্রহণ করা হইত না। একহাজার টাকার বীমা করিলেও যে চাঁদা দিতে হইত তাহার হার কিছু উচ্চ ছিল। ইহা জনসাধারণের পক্ষে সকল সময় সম্ভব হইয়া উঠিত না। ইহা ভিন্নও ১ কিস্তির টাকা না দিতে পারিলে বীমার সমস্ত টাকাই বাতিল হইয়া যাইত।

বর্তমানে এই সকল অসুবিধাই দূর হইয়াছে। এখন এমন অনেক কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে যাহাতে প্রতি মাসে আট আনা বা এক টাকা চাঁদা দিয়া একশত টাকা হইতে পাঁচশত টাকা পর্যন্ত বীমা করা যায়। এই সকল কোম্পানীতে যে কেহ ইচ্ছা করিলে একটি পলিসি করিয়া ভবিষ্যতের সংস্থান করিতে পারেন। এমন কি মাসিক ১০-১৫ টাকা আয় যাহার আছে তিনিও একটি বীমা করিতে পারেন। ভবিষ্যতের সংস্থান ও পুত্র পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় সকলেরই করিতে ইচ্ছা হয়। এই নিয়ম দ্বারা সকলেরই বীমা করার সুবিধা হইয়াছে এবং এই নিমিত্ত বীমার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

বীমা সম্বন্ধে সাধারণ লোকের অনেক ভুল ধারণা আছে ইহা দূর হওয়া আবশ্যিক। সাধারণতঃ যে সকল ধারণার বশবর্তী হইয়া জনসাধারণ বীমা করিতে সন্দেশ করেন তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে, কোম্পানী গভর্ণমেন্টের দ্বারা রেজিষ্টারীকৃত কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাদের জ্ঞান

দরকার যে রেজিষ্ট্রী না করিয়া কোন বীমা কোম্পানীই স্থাপিত হইবার উপায় নাই। প্রতি কোম্পানীই গভর্ণমেন্ট নিযুক্ত হিসাব পরীক্ষক (actuary) দ্বারা প্রতি বৎসরই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত হয় ও গভর্ণমেন্টের নিকট তাহার সংবাদ (Report) দাখিল করা হয়।

প্রধান কথা হইতেছে বীমার নিয়ম এরূপ বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈয়ারী যে উহার তহবিল ঘাটতি পড়িবার কোন উপায় নাই—উহা ক্রমে বৃদ্ধিই পাইতে থাকিবে। কোম্পানী বীমাকারীর নিকট হইতে টাকা নিয়মিতকাল পর্যন্ত লইবে ভিন্ন দিবে না। উক্ত টাকা স্বদে খাটাইয়া বীমাকারীকে যে দাবীর টাকা দিতে হইবে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইবেই এমনই কৌশলে উহার চাঁদার তালিকা প্রস্তুত এ সকল প্রসঙ্গ বিস্তৃত আলোচনা করা এ প্রবন্ধে সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ গভর্ণমেন্টের নিকট গচ্ছিত টাকা একটা নাম মাত্র বিশ্বাসের হেতু প্রকৃত কথা হইতেছে সত্যতা। সত্যতার সহিত না চলিতে পারিলে সকল কোম্পানী বা ব্যবসায়ই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে—সে হিসাবে ধরিতে গেলে ভয় বা সন্দেহ নাই এমন কোন ব্যবসা বা কারবারই হইতে পারে না।

এই সম্পর্কে আমরা দি এশিয়া মিউচুয়াল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডএর কথা দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। এই কোম্পানী ১৯৩০ সালে রেজিষ্ট্রি হয়। হেড অফিস ১৫ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা। ইহা এই দুই বৎসরের মধ্যে সম্ভাব্যজনক কার্য্য করিয়াছে। ইহার ম্যানেজিং এজেন্টস মেসার্স বোস এণ্ড কোঃ। ইহার প্রথম ম্যানেজিং এজেন্টস ছিলেন মেসার্স ইষ্টার্ন ফাইন্যান্সিয়াস। তাঁহারা প্রাথমিক ধরনের অসুবিধার জন্মই হউক আর অপর যে কোন কারণেই হউক কোম্পানী হাতে লইয়া পলিসি গ্রহণ না করিয়াই বর্তমান ম্যানেজিং এজেন্টসের হস্তে সমর্পণ করেন। সেই কারণে ১ম বৎসর রেজিষ্ট্রি অবস্থায় কোন কাজ না লইয়া পড়িয়া থাকে।

অতএব কোম্পানীর বয়স দুই বৎসর হইলেও যে সময়

হইতে বর্তমান ম্যানেজিং এজেন্টস কোম্পানী হাতে লইয়াছেন সেই সময় হইতে ( গত ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ) কার্য আরম্ভ হইয়াছে এবং ১৯৩২ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত পূর্ণ এক বৎসর কার্য হইয়াছে ।

এই পূর্ণ এক বৎসরের মধ্যে কোম্পানীর কার্যবিবরণী দেখিলে ইহার পলিসি হোল্ডারগণ ও জনসারারণ সম্বন্ধে হইবেন । কোম্পানী বীমা প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে ১০০০টি এবং পলিসি বিতরণ করিয়াছে ৭১০টি । ইহার অধিকাংশ পলিসিই পাঁচশত টাকার এবং মেয়াদী । আট বৎসরের মেয়াদী একটি তালিকা আছে, অধিকাংশ বীমাই সেই তালিকার অন্তর্ভুক্ত ।

অতএব গড়ে প্রায় ৩০ সাড়ে তিন লক্ষ টাকার পলিসি

বিতরিত বীমা গ্রহণ করা হইয়াছে ।

বাংলা দেশের সকল স্থান হইতে এবং বাংলার বাহিরে গয়া, পাটনা, কাশী, আসাম প্রভৃতি স্থান হইতে বীমা প্রস্তাব আসিতেছে ।

যশোহর, মাগুরা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে কোম্পানী এক একটি ব্রাঞ্চ অফিস খুলিয়াছেন এবং সম্প্রতি নবদ্বীপে আর একটি ব্রাঞ্চ অফিস খোলার ব্যবস্থা হইতেছে ।

ম্যানেজিং এজেন্টসগণের সততায় ও ব্যবহারে কর্মীগণ সকলেই সম্বৃত । এজেন্টগণকে উচ্চহারে কমিশন ও বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে । বীমাকারীগণকে সর্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয় । আমরা এই নূতন কোম্পানীর মঙ্গল কামনা করি ।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য

ভাদ্র সংখ্যায় “ইঙ্গিতের” একাদশ সংখ্যা শেষ হইল, যে সকল গ্রাহক গ্রাহিকাগণ অত্യാপি তাঁহাদের চাঁদার টাকা পাঠান নাই বা আংশিক দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ তাঁহারা যেন আগামী সংখ্যা বাহির হইবার পূর্বে তাঁহাদের দেয় চাঁদা আমাদের আফিসে পাঠাইয়া দেন ।

বিনীত

কার্য্যালয়ক্ষ ।



১ম বর্ষ

আশ্বিন, ১৩৩৯

১২শ সংখ্যা

## শেষ প্রশ্নের জের

শ্রী আশালতা দেবী

“ইজিত” সম্পাদক সমীপেষু :—

সঙ্গে ‘শেষপ্রশ্ন’ সম্বন্ধে একটি পত্র পাঠালাম। লেখিকার বয়স খুবই কম কিন্তু লেখার ভঙ্গীতে, মননশক্তিতে প্রকায়, দরদে, চিন্তাশীলতায় তিনি প্রবীণেরও প্রকা আকর্ষণ ক’রেছেন অতি অল্পদিনে। (রবীন্দ্রনাথ এঁর সম্বন্ধে আমাকে বলেছিলেন ও লিখেওছিলেন, ‘আশার মননশক্তি বিস্ময়জনক—অসামান্য’) আমি এই শ্রেণীর সমালোচনা ভালোবাসি। শেষপ্রশ্নকে কারুর ভালো যদি না লাগে বলুক—লাগলো না—কিন্তু প্রকার সঙ্গে বলুক—দরদের সঙ্গে বলুক। শুধু নিরপেক্ষ scientific criticismএর দোহাই দিয়ে অইণীয় মানুষকে অপমান করা অকর্তব্য। সেদিন প্রতিভাবান চিন্তাশীল কবি বুদ্ধদেবও আমাকে এই কথা লিখেছেন :—

“আমি scientific mode of criticismএ বিশ্বাস করি না। সমালোচনার মধ্যে যদি প্রাণস্পন্দন ফুটিয়ে তুলতে হয়, তবে তাকে পার্সনাল হ’তেই হবে।” এই কথাই এমার্সন ব’লেছেন বড় সুন্দর করে যে সেই লেখাই লেখা যার মধ্যে দিয়ে লেখককে দেখা যায়। সাহিত্য নৈর্ব্যক্তিক—impersonal নয়—নিবিড়ভাবে ব্যক্তিক—personal, subjective. আশালতার লেখার মধ্যে দিয়ে লেখিকাকে দেখতে পাওয়া যায়, তাই ওঁর লেখা এত লোকের ভালো লাগে—ওঁর মতের সঙ্গে মিলুক বা না মিলুক। এই জিনিষটাই আমাদের দেশে অত্যন্ত বিরল—বিশেষ ক’রে সমালোচনায়। কারণ বিশেষ করে সমালোচনায়ই আমাদের দেশে লোকে চায় প্রাণপণে বিজ্ঞ হ’তে—objective হ’তে। কেন ? যা ভেবেচিন্তে মনে

হয়েছে ও ছিয়ে বলব সাধ্যমত—নিজেকে লুকোবো কেন, প্রাণপণে নিরপেক্ষ হ'তে গিয়ে? Aldous Huxleyর নানা সমালোচনা প'ড়ে যখন মুগ্ধ হই তখন ভাবি—কেন মুগ্ধ হ'লাম? ওঁর মতের সঙ্গে তো অনেক ক্ষেত্রেই মেলে না। কিন্তু তাতে কি? ওঁর লেখার মধ্যে দিয়ে লেখকের হৃদয়স্পন্দন মেলে যে—এর বেশি চাই কি? চরম ও পরম সত্য ধরির দেয়—সাধারণতঃ লেখকের কাছে চাই রস এবং এ রস ফুটে ওঠে যখন লেখক লেখার মধ্যে দিয়ে একটু স্পষ্ট উকি মারেন। আশালতার ও লেখার মধ্যে দিয়ে তাঁর শেষপ্রশ্ন-পাঠে সাড়া দেওয়ার ভঙ্গীটি দেখতে পাই, তাই ভালো লাগে—শেষপ্রশ্ন সম্বন্ধে তাঁর মতামতে সায় দেবার দরকার করে না সব সময়ে।

আশালতার চিঠির সর্বত্র তাঁর বক্তব্যটি ফোটেনি। একটু স্বত্ব করে লিখলে ফুটত। আশা করি ভবিষ্যতে এ যত তিনি নেবেন।

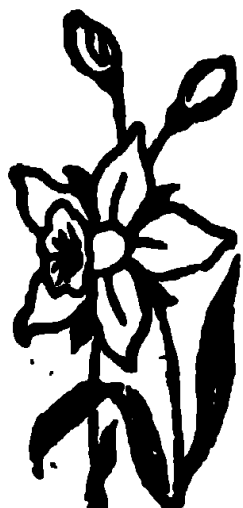
একটা কথা শুধু আমি বলতে চাই—আর্টে formএর perfectionএ সাড়া দেয় না কে? ফর্মের—রূপের—পিছনেও একটা সত্য আছে একথা মানবে না কে? আমি কেবল বলি যে শুধু রূপই শিল্পের চরম কথা নয়, রূপ মূল্যেও সুরভেদ আছে। ভীষ্মের রূপ সর্বাদ্বন্দ্বিতার ভাবে ফলালে তার যে মহিমা—সে মহিমা শকুনির সর্বাদ্বন্দ্বিতার রূপের চেয়ে বড় এই কথাই শুধু আমি বলতে চেয়েছি। এবং এত জোর করে বলতে চেয়েছি, কারণ আধুনিক art for art's sake রূপ অসার ধ্রুৱকে অনেকে বেদবাক্য ব'লে মনে করেন। মনে করেন শুধু formএর perfection হ'লে আর কিছুই দরকার নেই। আমি বলি একথা সত্য নয়। আর্টে শুধু বলার ভঙ্গীই না—বক্তব্যেরও দাম আছে—এবং ছ'জন্য বলার ভঙ্গী যদি সমান সুন্দর হয় তবে যার বক্তব্য গরিমা বেশি তার সৃষ্টিই বেশি বড় হবে। না' মিজারেবলএ

জীন ভালজীনের চরিত্রও সুন্দরভাবে আঁকা—অর্থলোভী খেনার্ডিয়ারেরও। কিন্তু আর্টিষ্ট বলেন যেহেতু খেনার্ডিয়ারের চরিত্রের রূপায়ন-সৌন্দর্য জীন ভালজীনের রূপায়ন-সৌন্দর্যের চেয়ে কম নয়—সেহেতু ও দুই-ই তুল্যমূল্য। একথা সত্য নয়। শেষপ্রশ্নে অক্ষয়ও ফুটেছে, কমলও। কিন্তু কমল ঢের বড়। আর্ট ফর আর্ট সেকিষ্ট রা একথা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন যখন ন্যাপকিনের ছবি দেখব তখন শুধু দেখব তার ন্যাপকিনত্ব ফুটেছে কিনা! এতেই আলডুস আপত্তি করেছেন। প্রেমের সুন্দর ছবি ঈশ্বরের সুন্দর ছবির চেয়ে বড়, মহত্বের ছবি কার্পণ্যের চেয়ে, আত্মদানের ছবি সাবধানতার চেয়ে, সরলতার ছবি বিজ্ঞতার চেয়ে। এ মরালিটি নহ—মূল্যভেদ। বড় উপলব্ধিতে যে আনন্দ ছোট উপলব্ধিতে তার চেয়ে কম আনন্দ। কাজেই বড় উপলব্ধির সুন্দর চিত্রণ ছোট উপলব্ধির সুন্দর চিত্রণের চেয়ে বেশি মর্মস্পর্শী, যেহেতু আর্ট জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন একটা অদ্ভুত mushroom গোছের পদার্থ নয়—জীবনের valuesকে অবজ্ঞা করতে পারে না সম্পূর্ণ।

কিন্তু একথা বলার মানে নয় গাধার ছবি সুন্দর ক'রে আঁকা হ'লে রাফায়েলের মাদোনার ভক্ত তার পানে ফিরেও চাইবে না। কেবল বলবেন মাদোনা বেশি বড় সৃষ্টি। আশালতা ঠিকই বলেছেন, জীবনে প্রত্যেকেরই অতীশা হবে ছোট থেকে বড়র পানে যেতে চাওয়া—কাছে থেকে দূরের অভিসার। আধুনিক শিল্পসর্বস্ব মন গভীরতার সৌন্দর্য হারাচ্ছে ব'লেই বলার সময় এসেছে যে রূপায়নেও ছোট বড় আছে ও formই “একমাত্র” বস্তু নয়। এটুকু আশালতার পত্রের সঙ্গে ছাপবেন দয়া করে। ইতি

বশংবদ

শ্রীদিলীপকুমার রায়





## শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার সায়

### করকমলেশু

ভাগলপুর ৪ঠা আগষ্ট

#### শ্রীচরণেশু

মণ্টু দা ভাই, এ'মাসের ইঙ্গিতে, আপনার 'শেষপ্রশ্ন' নিয়ে লেখা চিঠি পড়লুম। এ নিয়ে ইতিপূর্বে অনেক লেখা পড়িছি, শেষপ্রশ্নের বিপক্ষে এবং সপক্ষে এত যুক্তিতর্ক উঠেছে যে যুক্তির ধুলিতে, আসল জিনিষটির মর্মস্থানে প্রবেশ করতে যেন বাধে। 'শেষপ্রশ্নের' রচনারীতি যে অবিসংবাদিত শরৎচন্দ্রের চির-পরিচিত এবং চির-মধুর ঠাইল, তা'ত এক নিমিষেই বুঝতে পারবেন। লেখার 'ফর্ম' নিয়ে আপনি অনেক কথা লিখেছেন এবং পরিশেষে 'Aldous'এর বই থেকে যে সুন্দর উদ্ধৃত অংশটুকু দিয়েছেন তজ্জন্ম কৃতজ্ঞতার শেষ পাইনে। বস্তুতঃ ওই ক'টি লাইন পড়েই ওঁর ওই বইখানি পড়তে লোভ হচ্ছে। কিন্তু 'ফর্ম' নিয়ে যা লিখেছেন তার সহিত মূলতঃ আমার কোথাও মতভেদ নেই। তাই শেষপ্রশ্ন নিয়ে কিছু বলব ভেবে বসি সন্তোষ আগে ফর্মের সম্বন্ধে আমার যা' মনে পড়েছে একটু বলতে ইচ্ছা করছে। অথচ এই সমস্ত নিরতিশয় সত্য কথাকে মেনে নিয়েও 'ফর্মের' সৌন্দর্য্য এবং একান্ত আকর্ষণ আমার কাছে লেশমাত্র কম বোধ হচ্ছে না। 'Aldous Huxley' একস্থানে লিখেছেন 'you must paint with passion and the passion will stimulate your intellect to create the right formal relations' কিন্তু মনে করুন প্রত্যেকের passion নানাবিধ ভাবে দেখে, নানাপ্রকারে অল্পভব করে, আবেগের এই বহুরূপই প্রত্যেকের স্বতন্ত্র রচনারীতির কারণ। একই বস্তু দু'জনে বলতে বসলে এক রকম করে বলতে পারে না। প্রতিজনের বলার ভেতর তার অল্পভব, তার চিন্তার বিশেষ ধারা, তার

ব্যক্তিত্বের নানা ছায়ায় দিক তার বলার ভঙ্গীকে বিশিষ্টতা দেবেই।

রবীন্দ্রনাথের যে কোন প্রবন্ধ পড়লেই মনে হয় না কি, তাঁর লেখার ধরণ যে কেবল তাঁর স্বকীয় চিন্তাকে রসে সিক্ত এবং সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ করেছে এই শুধু নয়, তাঁর রচনারীতির বিশেষ ভঙ্গী—কোন কথার ওপর বেশী জোর দেওয়া কোন চিন্তাকে একটু এগিয়ে নিয়ে আসা, এমনি নানারকমের, বলা যায়না গোছের সাজাবার অপূর্ণরীতিতে তাঁর মানসিক জগতের অনেকখানিকে প্রকাশ করেছে। তাঁর মানসিক জগতের সে ব্যক্তিত্বকে আমরা সেই 'ফর্মের' ভেতর দিয়ে না পেলে ধরতে পারতুম না।

আলডুস হাক্সলিই ত তাঁর 'Music at night' প্রবন্ধে লিখেছেন "The substance of a work of art is inseparable from its form; its truth and beauty are two and yet mysteriously one." আপনি অস্কার ওয়াইল্ড এবং টলষ্টয় টুর্গেনিভ এবং রোঁলা এই সকল নিয়ে তুলনা করেছেন। ওরও গোড়াকার কথাটা ত দাঁড়াল সেই অল্পভব। রোঁলা এবং টলষ্টয়ের অল্পভবজগত দিগন্ত প্রসারিত, তাঁদের চিন্তা মানবরাজ্যের আকাশ এবং সমুদ্রকে নিয়ে, সেখানকার বিচিত্ররূপ। সেখানে কেবলই সূর্য্যাস্তের বর্ণচ্ছটা নেই আলো-অন্ধকার, বড় শান্তি, সৌন্দর্য্য, কুরুপ সকলই রয়েছে। এই বিশাল অল্পভবের প্রকাশরীতি কেমন হবে বলুন? রোঁলার 'John Christopher'এর ঠাইল কি টুর্গেনিভের 'Smoke'এর রীতিতে লেখা হতে পারে? না টলষ্টয়ের 'Resurrection' 'অস্কার ওয়াইল্ড'এর 'Lady Windmere's fan'এর রচনা-ভঙ্গীতে লেখা হবে? প্রত্যেকের অল্পভব-জগতের ওপর তাঁর ঠাইলের গঠন নির্ভর

করে। মনে হয় যেন অ্যালডুস হাকসলে এই কথাটাই বলতে চেয়েছেন তাঁর নানা প্রবন্ধে এবং নানা উপন্যাসে। আপনি যে ‘art for art’s sake’ কথাখানা নিয়ে এত রাগ করেছেন তা ‘ফর্মের’ সৌন্দর্যের বিন্দুমাত্র উপেক্ষা করতে নয় তা হচ্ছে মানুষের অমুভব জগতকে ছোট্টর থেকে বড়তে নিয়ে যেতে। সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীথেকে আরও ঢের বেশী দূর প্রসারিত করতে। অ্যালডুস হাকসলেও আধুনিক মনের এই অমুভব-রূপগতা নিয়ে দুঃখ করেছেন এবং তার কারণও দেখিয়েছেন ভারি সুন্দর।

ওর ‘Art and the obvious’ প্রবন্ধখানি এই নিয়ে লেখা। উনি বলেন মানুষের বড়ো অমুভব, বড়ো চিন্তা, বড়ো স্নেহসম্পর্ক, যা কিছু উচ্চ আর্ট হয়ে প্রকাশ পেতে পারত তা এই ডিমক্রাসির যুগে এই সার্কজেনীন অক্ষর পরিচয়ের তাড়াতে আগেকার চেয়ে অধিকাংশের অবসর এবং অর্থ প্রচুর হয়ে পড়তে, অজস্র ছাপার বহির মারফতে, যেমন করে প্রকাশ পাচ্ছে তা এতই কুশী এত তৃতীয় শ্রেণীর হয়ে প্রকাশ পেতে বসেচে, যে কেবল এই কুরূপ প্রকাশভঙ্গীর জ্বালাতে, যাদের প্রতিভা রয়েছে, সত্যাকার দেবার কিছু রয়েছে, তাঁরাও জীবনের এই সব বড়ো অমুভব থেকে নিজদের সরিয়ে নিচ্ছেন, এবং যে সকল বস্তুতে নিবদ্ধ করছেন তা আমাদের অন্তরকে গভীরভাবে মগ্নিত করে না। সুখদুঃখের আন্তরিকতায় আলোড়িত করে তোলে না—এক কথায়, তারা বেশীর ভাগ জীবনমূলের ছোটখাট অবাস্তব ডালপালা—মূল কেন্দ্রগুলি না—তাই ওঁদের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি হয়ে পড়েচে কেবল ‘শক্তি নিয়ে নিষ্ফল খেলা’ শুধু রূপায়নের চর্চা করা।

তাই লিখছেন না উনি “The excesses of “Popularart” have filled them with a terror of the obvious—even of the obvious sublimities and beauties and marvels. Now about nine-tenths of life are made up precisely of the obvious. Which means that there are sensitive modern artists who are compelled, by their disgust and fear, to confine themselves to the exploitation of only a tiny fraction of existence.” জীবনের যে কথা আমরা গভীরভাবে অমুভব করি, যা আমরা পরম বেদনার

ভিতর দিয়ে বুঝেছি, যেভাবে এত গোপন যা প্রকাশ করতে বাধে, এমনিতরো আমাদের জীবনের করুণাশ্রজলে ভেজ মণিমাণিক্যগুলি যদি ‘popular art’এর দৌরাতিতে এমনি বুটো মতি, আর রঙ মেখে বাজারে এসে দাঁড়ায়, ইচ্ছে করে না কি তাদের লুকিয়ে রাখি? কিছু না বলে উড়িয়ে দিই।

গভীর কথাকে হালকা করে ভাসিয়ে দিয়ে চোখের জলকে চোখে কুটো পড়েচে বলে হেসে উড়িয়ে দিয়ে গভীর স্নেহের বস্তুকে, লীলালাঞ্চে চটুল কথায় নিঃশেষ করে দিয়ে—যা কিছু না, যা অত্যন্ত ক্ষণভঙ্গুর অতিশয় ক্ষুদ্র, ভারি সাধারণ তাদেরকে নিয়েই বাড়াবাড়ি করি। মণ্টু দা ‘art for art’s sake’ কথাটায় এইদিক থেকেই বেদনা পাবার রয়েছে। ‘ফর্মকে’ তাচ্ছিল্য করে কখনই নয়—আজ প্রাণ অন্তর্হিত হয়েছে বলেই না দেহের সমস্ত লাবণ্য বিলাসই কদর্যা ঠেকেচে। কীটস “Grecian Urn” নিয়ে কবিতা লিখেছেন তার দেহসৌষ্ঠব দিয়েই সে দেহাতিরিক্ত কিছুকে প্রকাশ করেছে কিন্তু সে রূপময় পাত্রের ভিতরে জলই থাক বা গোলাপ জলই থাক কীটসের কবিতা লেখার প্রেরণার অভাব হোতনা। কিন্তু মানুষের বেলায় কেবল সুরূপ এবং সুবিশ্লিষ্ট দেহের সুষমা নিয়ে চোখের তৃপ্তি হবে (তাও হবে কিনা সন্দেহ!) অথচ মন সাড়া দেবে না কারণ মনের নানা ব্যঞ্জনা, নানা অমুভবের লীলা, বুদ্ধির গভীরতা ধীশক্তির প্রশান্তি এইত সেরূপের ধারাবাহিক ইতিহাস, একে বাদ দিয়ে রূপ, রূপ নয় থাক না তার যতই নিখুঁত সমালোচনার বহির সহিত মেলার—লক্ষণ। তাই ‘ফর্মকে’ দোষ না দিয়ে আজকের দিনের আর্টিষ্টের অমুভব-দৈন্য, অমুভব-শূন্যতাকে দোষ দিন। ভিতরের যে আবেগ নিজের অন্তর্বাণের পথ করে নেয় সে আবেগ যে সৃষ্টি হয়ে উঠবে না—আপনি কি মনে করেন, বড়োবড়ো লেখকের ষ্টাইল একটা ভেবেচিন্তে বেছে নেওয়া পদ্ধতি? তা বোধ হয় না। তাঁদের বলবার কথাই, তাঁদের বলবার ধারাকে কেটে নিয়ে চলে।—“You must paint with passion and the passion will stimulate your intellect to create the right formal relations.” (Aldous Huxley)

তাই না? তাই বলুন আজকের দিনে সত্যিকার passion নেই, যে সকল বস্তু চিরন্তন কালের, যা নিয়ে সর্বস্ব দিয়ে ভালোবেসেও তার স্বরূপ চিনতে ইচ্ছে করে তাদের এত সস্তা, এত প্রগল্ভ এত অদ্ভুত করা হচ্ছে যে সে আবেগের বাষ্প মেঘ হয়ে কারও মনে জমতে পারচে না, যদি বা জমচে, ত স্বপ্ন এবং বিচ্ছিন্ন এবং বিতৃষ্ণায় ও বিরাগে আপনার মধ্যেই আবদ্ধ, তা একীভূত হতে পারচে না, তাই এ শুষ্কতা ঘূচিয়ে বর্ষণও দিতে পারছে না।

কিন্তু ‘শেষপ্রশ্নের’ কথা যা নিয়ে শুরু করেছিলেন, এ বইখানির রচনারীতিতে শবৎবাবুর চিরজনের প্রিয় এবং চিরমধুর ষ্টাইলের একটুখানিও ক্ষুণ্ণতা ঘটেনি। এবং ‘কমলের’ চরিত্র ওঁর সৃষ্টির বিন্ময়। (অবশ্য কমলের আশ্রমের কথা নিয়ে বাক-বিতণ্ডাগুলো বাদে) কমলের চরিত্র এক বাণ্ডিল তর্ক নয় সে যুরোপীয়ান সমাজের বাসিন্দাও নয়, সর্বোপরি সে সাধারণ নয়। কমল কি এদেশে, কি পশ্চিমের দেশে কোথাও পথেঘাটে, রাশি রাশি চোখে পড়েনা। সে দুর্লভ। হয়ত কমলের দেখা পেতে, কি ভারতবর্ষে, কি যুরোপে বছরদিন থেকে চোখ পেতে বসে থাকতে হবে। মুচিপাড়ায়, মাতাল ছোটলোকের মহলায় একেবারে একাকী এবং নিঃসহায় হয়ে দিব্য মনের স্মৃতিতে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেবার মত সাহস এদেশের এবং কোন দেশের খুব বেশী মেয়ের নেই। টাকাকড়ির দিক থেকেও এমন অনন্তনির্ভরপরায়ণতা, এমন দৃষ্ট আত্মসম্মান এমন কঠোর অমশক্তি কজন মডার্ন মেয়ের রয়েছে বলুন, রূপের কথাটা না হয় এখন তোলা থাক। কমল যে মডার্ন নয় এবং কমল যে যুরোপের সন্তানকল সব চেয়ে কম—একথা বোধ করি অসংশয়ে বলা যায়।

প্রেম-ব্যাপারে তার দুঃসাহসেরও যেমন অবধি নেই তেমনি তার নিষ্ঠুর ধৈর্য্য, তার অপূর্ণ সন্তান তার কল্পনাতীত মহাশক্তি এরও ত আর তুলনা দেখা যায় না। কমলের সহিত মডার্ন মেয়ের যে কত তফাৎ তা কী সুন্দর করেই না দেখিয়েছেন শবৎবাবু বেলাকে নিয়ে এসে। কমল আর যাই করুক কোন সুবিধা কোন সুনায কোন অর্থের খাতিরেই যে কথা তাদের দুজনের, তাকে অসম্মানের

লাঞ্ছনার ধূলোয় টেনে এনে সকলের করতে পারত না। যে প্রেম একদিন সত্য ছিল, তা আজ মিথ্যে জানবার যখন অবকাশ এ’ল কমল নিঃশব্দে বিনা ক্রোড়ে তাকে মেনে নিয়েচে কিন্তু যার একদিন সমাদরের অবধি ছিলনা, তাকে নীরবেই বিদায় দিয়েছে, মনের মাঝে ক্ষণকালের পাওয়া স্মৃতির টুকরাগুলি তেমনি স্নিগ্ধ এবং সুন্দর করে রেখেই সে বিদায় দিয়েছে,—একে অসম্মমে, নির্দয় প্রতিশোধ নেবার নিকরুণতায় এতটুকু মলিন হতে দেয় নাই। তাই মনে হয় কমলের জীবনে এত আনন্দ-উৎস এল কোথা থেকে! জীবনে প্রেমের ক্ষেত্রে, নিদারুণ বঞ্চনা পেলে bitterness কাটিয়ে উঠতে পারেনা—কিন্তু কমল যদি বারংবার নিফল হয় তবু ওর রসভারাক্রান্ত চিত্তে কোন দিন এতটুকু সরসতার অভাব হবেনা। যার চিত্তসম্পদ এত বেশী তারই এত সাহস সাজে, অগ্নিকে মানাতনা। তাছাড়া ওর সত্যপ্রিয়তা এরকমই বা কে কোথায় দেখেচে বলুন—অজিত যখন কিছুই না জেনে এই কঠোর সংঘমে অভ্যস্ত সুন্দরী তরুণীর প্রতি প্রকায় আবেগে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বলচে “যারা অকারণে আপনার গ্লানি ক’রে বেড়ায় তারা কিন্তু আপনার পাদম্পর্শেরও যোগ্য নয়। সংসারে দেবীর আসন যদি কারও থাকে সে আপনার।” বলতে পারেন, একাল সেকাল, পূর্বদেশ, পশ্চিমদেশ, কোথায় কোন অপূর্ণ সুন্দরী তরুণী—তরুণের মুখের ‘এই ভাব-বিহ্বল প্রশংসামদিরা নিঃশেষ ক’রে পান করেছে? কাছে পেয়েও কেবল সহনাতীত সত্যভাষণে একে বিনষ্ট করে দিয়েছে? কমল এই “দেবীর আসন” শুনে কেবল অকৃত্রিম বিন্ময়ে চেয়ে রইল, মেলেড্রামাটিক ভঙ্গীতে তার দীপ্ত গ্রীবা উদ্গমিত করে এই দেবীর আসন বজায় রাখতে এতটুকু চেষ্টা করলেনা। তার পূর্বজীবনের, তার জন্মগ্রহণের অসংবৃত ইতিহাস খেঁচায় বলে গেল, এতে যদি একজনের “স্নেহে ও প্রকায়বিস্কারিত হৃদয়, বিতৃষ্ণা ও সঙ্কোচে বিন্দুবৎ” হয়ে যায় তাতে তার কিছু আসে যায় না।

‘কমল’ শবৎচন্দ্রের অপূর্ণ সৃষ্টি, তাকে যদি কেউ যুরোপ থেকে আমদানী এক বাণ্ডিল তর্ক ছাড়া আর কিছু মনে না করেন, তবে সেটা একান্তই ব্যক্তিগত মতামত।

কমলের দেখা পেতে হ'লে ওদেশের এবং এদেশের পথপ্রান্তে দু'টি চোখ পেতে বসে থাকতে থাকতে ক্ষয়ে গেলেও ওর দেখা বেশী পাওয়া যাবে না। কিন্তু একটা কথা বলি শুনুন, কমল চরিত্র হিসেবে অতুলনীয় হয়েছে, ওর স্পন্দন রয়েছে, ও শরৎচন্দ্রের অপর সমস্ত চরিত্র সৃষ্টির মতই সজীব, কিন্তু ওর তর্কগুলো কী বলুন ত? শরৎচন্দ্র যে ইতিপূর্বে 'পল্লীসমাজ' এবং এমনিতিরো বহিতে নানা প্রশ্নের নানা সমস্যার চিন্তার দিক থেকে কিছু উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছেন, তা উপভোগের হয়েছে, কারণ সে সমস্ত ব্যাথা সত্য, সে সব সমস্যা বড় বেশী আপনার, অথচ শেষপ্রশ্নের পাতার পর পাতা যে নিয়ে তর্ক আজকালকার দিনে মূল রয়েছে তার কোথা? ভারতবর্ষময় কেবলই আশ্রমের ডালাপালা চড়াচ্ছে, ব্রহ্মচর্যাশ্রম খোলা ছাড়া লোকের মাথায় আর দ্বিতীয় চিন্তা নেই এ ভাবনা তাঁর হঠাৎ বেশী করে মাথায় এ'ল কেন? তাই কমলের কথাবার্তা এবং কমলের তর্কের স্রোত যেন একটা কাল্পনিক সমস্যার কাল্পনিক প্রশ্নোত্তর মালা। সত্যিকথা বলতে কি, আশ্রম নিয়ে আর সনাতন ধর্ম নিয়ে কেবলই তর্কের পুনরুজ্জ্বলিত পড়তে মাঝে মাঝে বেশ কষ্ট হয়। আর এক সত্য যে চিরকাল চলে না এযুগের সত্য যে আর এক যুগে অচল একথাটা আজকাল এত সোজা এবং যাদের একটুখানি বুদ্ধি রয়েছে তারা এতই নিঃসন্দেহ করে বুঝতে পারে যে, আশ্রমবাবু—অজিত, যারা দেশ-বিদেশে যথেষ্ট ঘুরছেন, উচ্চশিক্ষায়, তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে, জীবনের অভিজ্ঞতায় কারো চেয়ে কম নছেন, তাঁদের বুঝতে এত কষ্ট হবে? এবং সেই কথা গজাল দিয়ে গৌড়বার ভার কমলকে নিতেই হবে। যুগের কথা আর কি! দশ বিশ বছর আগে যা সত্য বলে লোকে অসংশয়ে মেনে নিয়েছে যা নিয়ে dogmatism, orthodoxyর সীমা ছিলোনা আজ তারাও অচল, এইত কিছুদিন আগে বিজ্ঞানের চরম অধিকার নিয়ে লোক কত না মেতেছিল, আজ সকলেই অস্পষ্টভাবে অনুভব করছে, এবং বড় বড় বিজ্ঞানের কর্তারাও বলেছেন অনেক কিছু রয়েছে, যা বিজ্ঞানের বাইরে এবং তারা টেটটিউবে আঁকজোক কষে প্রমাণ না হলেও সত্যের দিক থেকে হয়ত বেশমাত্র কম নয়। মানুষের সকল সময়ে

একরকম moodএ থাকে না, তার সত্যোপলব্ধি তার সত্যতার ইতিহাস জীবনের ধারা এরাও কখনো একটা অপরিবর্তনীয় moodএ স্থির হয়ে থাকতে পারেনা, এক যুগের mood আর এক যুগে বদলাবে, দশ বছর আগেকার সত্য দশ বছর পরে অসত্য হয়ে যাবে, এই সোজা কথাটা বোঝাবার ভার নিয়ে কমলের মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী মেয়ে কেবলই চৌকি টেনে নিয়ে বসে বোঝাবে, আর বাকী সকলে আকর্ষণ চক্ষু বিস্ফারিত করে শুনেবে কেউ দেবে বাহাবা, কেউ করবে পঞ্চমুখে নিন্দা—এ যুগের শিক্ষিত পুরুষ কি এত বোকা? তা কখনো নয়। শরৎবাবু ভুল করেছেন এখানে। আমাদের রামায়ণ মহাভারতে পাইনে কি, এক এক রাজার প্রায় এক কুড়ি বিয়ে, কোন রাণীর একশ' ছেলে। তখনকার যুগে সত্যতা বিস্তারের প্রথম দিনে স্বল্প লোকসংখ্যায় যা ছিল পরম সত্য আজ ভারতবর্ষের সনাতনরীতির মাঝে ডুব মারবার সহিত তাকেও মানতে কেউ বলে নাকি? আজ সে কথার চেয়ে অসত্য আর কি আছে বলুন? কোন সুশিক্ষিত ভদ্রলোকে সে কথা শুনে আজ ভয়ে না শিউরে উঠবে? এবং কোন শিক্ষিত বা শিক্ষিতা আজ birth-control না করে বলুন? তাই বলে কি প্রমাণ হয়ে যায় রামায়ণ মহাভারত অসত্য বা তার কাব্য হিসেবে অমূল্য মাধুর্য নেই? অজিত, ইরেন, যে সব মনীষিগণের উদ্দেশ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে বারংবার করজোড়ে নমস্কার করছে, বারংবার আবেগে তাদের চক্ষুর পল্লবপ্রাস্ত সজল হয়ে আসছে, সেই সব মনীষীদেরই বা তারা বোকার মত অত করে অভিনন্দন করতে গেল কেন? তাঁরা করেছেন কি? প্রত্যেক বস্তুর প্রথম সংস্পর্শ এবং প্রথম প্রভাব মোহের সৃষ্টি করে অথচ সেটা সাময়িক। আগেকার দিনে যখন লোকে প্রথম প্রথম বিলেত যেত তখন ওর আবেশ ছিল দুর্বীর মনে হত নিজের যা কিছু সব ছেড়ে দিয়ে ওদের যা কিছু সবই নিই। এটা যে একদিন অদূর ভবিষ্যতে কেটে উঠতই সেটা স্বতঃসিদ্ধ। তা কোন মনীষির আবির্ভাব না হ'লেও হোত, ওঁরা উপলব্ধ্য মাত্র। শরৎবাবু কি মনে করেছেন, আশ্রমবাবুর মত লোকে যার জীবনের নানা দিকের অভিজ্ঞতা এত অপরিমিত, যিনি দরদ দিয়ে সব সত্যকে বুঝতে চান, তিনিও এ সকল নিরতিশয়



সহজ সত্যকথাগুলো কমলের মুখ থেকে না শুনলে বুঝতে পারেন না। এইত হোল তর্ক-বিতর্কের কথা—তর্কের দিক থেকে এ বইখানা নিষ্ফল—এতে প্রতি তর্কে ‘গোরার’ মতন ঝড় উথলে ওঠেনা,—গোরা এবং বিনয়ের কথোপকথনের মাঝে যে প্রবলতা, যে স্বাভাবিকতা, যে একান্ত সৌন্দর্য্যময় প্রতিযুক্তির তীক্ষ্ণতা ছাড়ে ছাড়ে পরিস্ফুট, তার কিছুই নেই এক কথায় একে intellectual নভেল কোন মতেই বলতে পারিনে। Intellectual অংশটুকু বাদ দিয়ে ‘কমলের’ চরিত্র বড় সুন্দর। কমলের যে দিকটা যে ভাবে স্ফুট করতে চেয়ে বেলা এসেচে তা’ও বেশ।

নীলিমাকেও বড় ভাল লেগেছে,—বোকা পুরুষের দলকে বাদ দিয়ে ওই মেয়েটিই একমাত্র কমলকে কিছু বুঝেছিল, তাই বেলার স্বামীত্যাগের কাহিনী বলতে যেয়ে সাহস এবং মনের জোরের কথা নিয়ে আশুবাবু যখন কমলের সঙ্গে বেলার তুলনা তুললেন, নীলিমা আহত হো’ল, এখানে বেলা ও নীলিমায় যে কাথাবার্তা হয়েছে, তা ভারি সুন্দর।

“বেলা প্রশ্ন করিল কিন্তু তার স্বামী থাকলে সে কি কোরতো? নীলিমা বলিল, তাঁর সেবা কোরতো, রাঁধতো বাড়তো, ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করত, ছেলে হলে তাদের মানুষ করত; বস্তুত, একলা মানুষ, টাকাকড়ি কম, আমার বোধ হয় সময়ের অভাবে তখন আমাদের সঙ্গে হয়ত একবার দেখা করতেও পারত না। বেলা কহিল তবে? নীলিমা বলিল, তবে কি? বলিয়াই হাসিয়া ফেলিয়া কহিল কাজকর্ম করবোনা, শোক-দুঃখ অভাব-অভিযোগ থাকবেনা, হরদম যুরে বেড়াবো এই কি মেয়েদের স্বাধীনতার মানদণ্ড নাকি? আপনি বরঞ্চ এইখানটি পড়ে দেখবেন, নীলিমার কমলকে ভালো লেগেছিল কিন্তু ও আচ্ছন্ন হয়নি, তাই কমলকে ও ষতটা বুঝেছিল আর বোধ করি কেউ অমন করে বোঝেনি। তা’ছাড়া নীলিমার জীবনের সমস্যা, কোন কাল্পনিক সমস্যা নয় তা নগরে নগরে আশ্রম বিস্তারের ভয়েব চেয়ে আমাদের ঢের বেশী আপন্যার, তাই ওই সংক্ষিপ্ত চরিত্রটি অমন করে মনে লাগল। কমল প্রেমের কথা নিয়ে যে সমস্ত কথা যেমন করে বলেচে তার সবই অভ্রান্ত নয়, কমলের পক্ষে বা সত্য,

যারা কমল নয় তাদের পক্ষে তা তেমনই ভুলে ভরা। নীলিমা এই সহজ সত্যটুকু বুঝেছিল, তাই ও যে ছ’এক জায়গায় কমলকে প্রতিবাদ করেছে তাই হয়েছে ষথার্থ ব্যক্তিত্ব সমেত প্রতিবাদ।

তারপর কমলের সব চেয়ে খেঁচা গভীর কথা, যা নিয়ে আশুবাবুকে সে বারংবার আঘাত করেছে যাকে সে মনের জরা বলেচে, সে কথাও ত আজকের দিনে সোজাভাবে অনেকেই অনুভব করেছে। প্রেমের ব্যাপকতার চেয়ে স্থিতির চেয়ে তার প্রগাঢ় মুহূর্তগুলি কমলের কাছে আদরের ধন। এর খাতিরে সে অনেক কিছু ছাড়তে পারে—কোন বন্ধনের স্থায়ীত্ব সে স্বীকার করেনা, করে কেবল এই অপূর্ণ ক্ষণকাল এই তার কাছে মণিমাণিক্য। কিন্তু প্রেমের মত প্রত্যেক বড় শিল্পিরও ত সৃষ্টির ধারাবাহিকতার ইতিহাস সমান উজ্জ্বল নয়। আকাশের তারার মত অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে এই উদ্ভাসিত মুহূর্তগুলি চকিতে দেখা দিয়ে যায় কিন্তু এদের গাঁথবে সে কি দিয়ে? স্থায়ীত্বের ইতিহাসই প্রেমের সবটা নয় জানি, কিন্তু কোন সূত্র নেই গোত্র নেই নাম নেই বস্তু নেই, পরম্পরা নেই কেবল মদিরতাময় গভীরতম গুটিকতক ক্ষণকালের স্মৃতি এতেই কি সবটা ভরে ওঠে? এই সম্পর্কে ‘অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার’ কয়েকটি লাইন মনে পড়ে নাকি?

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসরের প্রাত্যহিক সাধনা তাঁকে অমরতা দিয়েচে, কিন্তু এর প্রতিদিনই কি তিনি প্রেরণা পেয়েচেন? তা হয়ত পাননি, তাঁর প্রতিদিনের সাধনাই তাঁর great moment গুলিকে সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য সৃষ্টির অমরতায় বিদ্রুত করে রেখেচে। বাট্রাও রাসেলও ত প্রেমসম্পর্কের কথা লিখতে যেয়ে বলেচেন প্রেমের এই great moment গুলিকে একগাছি মালার মত করে গোঁথে তুলতে গেলেই, একটা common life চাই, common interest চাই, এবং পরম্পরের ব্যক্তিগত জীবনকে নিশিয়ে দিয়ে এক common interest সৃষ্টি করে তুলতে হবে বলেই সন্তান চাই কিন্তু তবু আশ্রমের এবং ভারতবর্ষের বিগত ধর্ম্মের তর্কে কমল যে পরিমাণে নীরস, এই প্রেমসম্পর্কের কথাবার্তায় তার কথাগুলি স্থানে স্থানে তেমনই অপূর্ণ, ছ’এক জায়গায়

দেখুননা কী স্বন্দর তার কি তুলনা রয়েছে? নীলিমা প্রশ্ন করচে “কমল তোমার কথাই যদি সত্যি হয়, সত্যিকার ভালোবাসাও যদি ভুলের মতই সহজেই ভেঙ্গে পড়ে, মানুষে তবে দাঁড়ায় কিসে? তার আশা করবার বাকী থাকবে কি?” কমল তার উত্তরে বলবে “যে স্বর্গবাসের মিয়াদ ফুরালো, থাকবে তারই একান্ত মধুর স্মৃতি, আর তারই পাশে ব্যথার সমুদ্র” এই ধরনের ভাবনায় এবং এই ধরনের উত্তরে হয়ত প্রশ্নের জবাব মেলেনা কিন্তু মনের মাঝে যে স্রের রেশ রেখে যায়, তা সকল প্রশ্নের অতীত।

কমলের প্রতিপক্ষ হিসেবে একটি লোককে নামান হয়েছিল রাজেন, তার নিকলুম শুভ্রতা তার কর্মের বিষয় সব্যসাচীর, এবং উপেক্ষার চরিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু সব্যসাচীর মত রাজেন্দ্র অত মধুর হ’য়ে ফুটে পায়নি। কারণ সোজা—রাজেন্দ্র সত্যিই কুসার, নারীবর্জিত চরিত্র মাধুর্য্য হিসেবে মনকে আমাদের ততখানি দোলা দেয় না, যেমন দিয়েছিল সব্যসাচী স্মিত্রার সহিত তার প্রচ্ছন্ন অথচ ক্লহীন সম্বন্ধের আভাসময় হয়ে। সব চেয়ে শেষে একটা কথা আপনি নীরেন্দ্রনাথ এবং অন্নদাশঙ্করের লেখার অত প্রতিবাদ করতেই বা গেলেন কেন? ওঁরা বলেচেন শরৎচন্দ্রের এবার থামা উচিত। এই ত? কিন্তু মনে করে দেখুন যদি, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্যকুমার, কিংবা অন্নদাশঙ্কর বা নীরেন্দ্রনাথ ‘শেষপ্রশ্নের’ মত একখানা বই লিখতে পারতেন লোকে কি স্বপ্নেও ভাবত বা কখনো লিখতে পারত, “তোমরা এবার থাম!” তা পারতনা। বরঞ্চ বলত, তোমরা খুব লেখ-সব কাজ ছেড়ে বেশী সময় করে নিয়ে লেখ।” অথচ

শরৎচন্দ্রের বেলায় এ প্রশ্ন ওঠে কেন? তার কারণ যিনি শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্ব লিখেচেন, যিনি লিখেচেন গৃহদাহ তাঁর কাছে ‘শেষপ্রশ্ন’ অপ্রত্যাশিত বিষয়ের বস্তু পাওয়া নয় বরঞ্চ নিরাশ হওয়া। তিনি শরৎচন্দ্র বলেই লোকে তাঁকে খামতে বলেছে! (যদিও আমার মনে হয় এ বলাটা অনধিকার চর্চা, কারণ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এখনো ‘শেষপ্রশ্নের’ মত একখানা উপন্যাস লিখতে পারতে পারেন এমন লেখক কাউকে দেখতে পাইনে।) ভেবে দেখুন ত শাজাহান যদি তাজমহল গড়ার পর, তার চেয়ে ছোট কিছু রচনা করতেন লোকে মনে মনে কি বোলতনা যে তোমার অক্ষয় সৌন্দর্য্য লোকের দান যে এখনো আমাদের মনকে ভারাতুর করে রেখেচে, এর পর দৃষ্টিকে নাগিয়ে আনতে যে বাধে। কিন্তু সত্যি শ্রীঅন্নদাশঙ্করের এবং কিছু পরিমাণে নীরেন্দ্রনাথের সমালোচনা আমার বড় খারাপ লেগেছিল। তাতে অসহিষ্ণুতা, কেবল ব্যক্তিগত মতামতের দৃষ্ট, এত বেশী করে প্রকাশ পেয়েচে। শেষপ্রশ্ন শরৎবাবুর সর্বোত্তম সৃষ্টির অন্তর্গত নয়, কিন্তু এতেও যে সৌন্দর্য্য এবং রচনারীতির যে মাধুর্য্য মাঝে মাঝে ছড়িয়ে রয়েছে তা একটুখানি শ্রদ্ধা মনের মধ্যে রেখে চোখ কাগ খোলা রেখে পড়লে ভালো করেই উপভোগ করা যায়। কিন্তু আর লিখবনা। একে ত এই পড়তে আপনার ধৈর্য্য থাকবে কিনা জানিনে বেশী বড় করে আর পীড়া দেব কেন? কিন্তু আরও অনেক কথা হয়ত বাকী রইল।

আমার বিনম্র প্রণাম গ্রহণ করেন। ইতি



# মায়া

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

১

পাশের বাড়ীর কালিন্দি গাইটাকে দেখিলে ফটিকের একবার তাহার দোলায়মান কণ্ঠটায় হাত বুলান চাই। কালিন্দিও ঠিক তেমনি—সে মাথা নেড়ে, গা চেটে, নানারূপ ভাব-ব্যঞ্জনার দ্বারা এই দরদী লোকটির নিকট হইতে আদর কাড়িয়া লয়। আর ফটিকের কাজকর্ম সব চুলায় যায়।

ফটিক ভদ্র গৃহস্থের ছেলে। কিন্তু সে নিজের হাতে শাক সব্জী—লাউ কুমড়া—বেগুন শশা—আলু কপি—ক্ষেত ভরিয়া তৈয়ারী করে, প্রাণ ভরিয়া খায় আর গাঁয়ের লোককে বিলাইয়া দেয়। সে যখন সকালে জলযোগ শেষ করিয়া কোদাল কুড়ুল লইয়া বাগানে যায়, তাহার মাতা পরিত্রাণ যদি ডাকিয়া বলেন, “বাবা! গোলা থেকে ধান্য কতক ধান পেড়ে দিয়ে যা” ফটিক ক্ষেপিয়া উঠে। তাহার সময় হয় না। কিন্তু সেই পায়ে বাহির বাড়ীর প্রাঙ্গণে যদি কালিন্দিকে দেখে তাহার চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠে। হাতের কোদাল কুড়ুল ফেলিয়া রাখিয়া সে তাহার গলদেশের লোমগুলি কুরাইয়া আরাম দিতে থাকে। কতটা সময় কাটে এই নগণ্য জীবের প্রতি অস্পষ্ট স্নেহের জড়িমায় থেয়াল থাকে না। আবার বাগানের কাজ সারিয়া বড় এক ঝাঁক কচি ঘাস স্বস্তি লইয়া যখন ঘরে ফিরে—কালিন্দিকে চোখে দেখিলে তাহার মুখে কতক অংশ ওঁজিয়া দিয়া আসিতেও ভুল হয় না। বাস্তবিকই গরুটির নধর স্তূঠাম চেহারা যেমন—তেমনি কাল কুচুচে লোমগুলি দিয়া যেন তেল গড়াইয়া পড়ে। দেখিলে অনেকেই চোখ পাকাইয়া থাকে। কিন্তু ফটিকের মত এমন গলা জড়াইয়া পরিতে কাহাকেও দেখা যায় না।

ফটিকদের রান্নাঘরের পিছনেও শাকসব্জীর ছোট একটি ক্ষেত ছিল। এই ক্ষেতটিতে ঠিক দুপুর বেলাটায় কালিন্দির একদিন নির্ঝিবাদে ঢুকিয়া পড়িবার সুবিধা হইল।

রান্নাঘর হইতে অমলা সব্জীবাগের দিকে সচঞ্চল নজর দিয়া ব্যস্ততার সঙ্গে ফটিকচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিল,

“দাদা, তোমার সব্জীবাগে গরু পড়েছে। ধেই—ধেই এঃ! একেবারে মাঠ করে ফেললে যে!”

ফটিক তখন স্তব্ধ তরকারীগুলি একপাশে সরাইয়া রাখিয়া ভাতের সঙ্গে ঝোলটুকু কেবল মাখাজোকা করিয়া লইতেছিল। সে হাত উচু করিয়া পিড়ির উপর সোজা হইয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল,

“কাদের গরু?”

“কনকদাদের কালিন্দি। এঃ! শেষ করে ফেললে যে! তোমার এত সাদের আলুর গাছ একটাও রাখলে না। কুমড়া গাছের তক্তকে ডগাগুলি কিভাবে মুড়িয়ে মুড়িয়ে শেষ করছে দেখ।”

ফটিক রাগিয়া বলিল, “তোমার হাঁটুতে কি বাতে ধরেছে? তাড়িয়ে দিতে পারলিনে?”

“আমার হাত জোড়া—মা ঘাটে গেছে।”

ফটিক এবার ঘাসের জলটা হাতে ঢালিয়া উঠিয়া পড়িল। একখানা বংশখণ্ড লইয়া যেন ক্ষেপিয়া সব্জীবাগের দিকে ছুটিল। ফটিককে ধাওয়া হইয়া আসিতে দেখিয়া কালিন্দি চঞ্চল হইল। তবুও চলিবার পথে সচঞ্চল মুখখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ফটিকের ক্ষেত-পাট উজ্জাড় করিয়া তাহাকে পরিহাস করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া চলিল। ফটিকের তখন খুন চড়িয়া গিয়াছিল। সে সেই লাঠি দিয়া পিটাইতে পিটাইতে প্রায় পোয়াখানেক রাস্তা তাহাকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। তারপর রণে ভদ্র দিয়া একটা গাছতলায় আসিয়া ইপাইতে লাগিল। ক্রোধলীপ্ত চক্ষু দুটি হইতে তখন অনল বিস্কুরিত হইতেছিল। এইরূপে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর সে বাড়ীর পথে ফিরিয়া আসিল।

অমলা বসিয়া বসিয়া ইহার ভাতের খালা চৌকি দিতে-

ছিল। ফটিক তথায় না উঠিয়া সম্মুখের ঘরের দাওয়ার উপর জলচৌকিখানা টানিয়া লইয়া তাহার উপর আসিয়া বসিয়া পড়িল। অমলা চাহিয়া দেখিল, ইহার ক্ষুধার্ত চক্ষু দুটি তখনও যেন শিকার অন্বেষণে ফিরিতেছে। সে ভাবিতে সাহস করিল না। ভাত আগলাইয়া সেইকপই বসিয়া রহিল। আর মাঝে মাঝে ইহার ঘনাক্ষকার মুখখানা চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়াও ইহার ক্রোধ শান্তির লক্ষণ যখন সে দেখিল না, তখন সে বলিল, “দাদা, ভাত যে শুকিয়ে গেল।”

ফটিক উত্তর দিল না।

তখন সে তাহাব মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “দাদার ভাত কিন্তু কড়ি কড়ি হয়ে গেল মা!”

মাতা রান্নাঘর হইতে বলিলেন, “এখনও খেতে বসিসনি ফটিক? খেয়ে ফেলেছে তার আর কর্বি কি। মুখেব ভাত ফেলে উঠে গেলি—খেয়ে নে।”

ফটিক এবার অমলাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “তুই যা’ত একবার কনকদাদেব বাড়ীতে। গরু যেন বেঁধে রাখে। না বাঁধতে পারে ত অমন দজ্জাল গরু বেচে ফেলে দিক।”

ভাইটি যে কি রকম প্রকৃতির অমলারই জানা ছিল অধিক। যা’ কিছু হুকুমদারী এই মেয়েটিকে সে কবিত। আর ভাল-মন্দ সে খাটিয়া খাটিয়া মরিত। তাহাও আবার যুথের কথা মুখে থাকিতে সম্পন্ন না করিলে বন্ধা থাকিত না।

সে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ বাদে আবার ফিরিয়া আসিল।

ফটিক জিজ্ঞাসা করিল, “বলেছিস?”

“হাঁ।”

“কাকে?”

“জ্যোঠাইমাকে।”

“কি বললেন তিনি?”

“ওমা! তিনি দেখি আরও পাঁচ কথা শুনিয়া দিলেন।

ফটিক রাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি বললেন?”

“বললেন,—ফটিকে ত আর ঘেরা-বেড়া করবে না। গরুর আর দোষ কি মা? এখন ক্ষেত-পাটের ধান উঠে

গেছে, সকলের গরুই ত ছাড়া—আমরা বা বেঁধে খাওয়াব কেন?”

ফটিক উত্তেজিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “হাবা মেয়ে কোথাকার! তুই বুঝি তাই শুনে এলি?”

অমলা বলিল, “আমি বললাম,—দাদা ত চমিশগুণ্টা ঘেরা-বেড়া নিয়ে পড়ে আছে। সকাল বেলায় ক্ষেতে ঢোকে—আর এসে চানু করে। আবার গা গড়িয়ে যায়—আব সন্ধ্যাবেলায় ফেবে।”

“তার জবাব কি পেলি?”

“তিনি ত হেসেই লুটিপুটি। বললেন—ফটিকেব ঘেরা-বেড়া? ও আমার কপাল! সেই বুঝি বছর চারেক আগে একবার বাঁশ কিনেছিল। সেই পচা বাখাবি দিয়ে আব কতকাল তালি দেবে? তাতে মা, গরু রাখা যায় না—পয়সা খরচ করতে হয়।

অমলা যেভাবে হুবহু কথাগুলি বলিয়া গেল, ফটিকেব মনে হইল, কনকেব মাতা বিধুমুখী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহাব সঙ্গে যেন এই বাদ-প্রতিবাদ কবিতেন। তাহার চক্ষু দুটি জলিয়া উঠিল। সে উত্তেজিত হইয়া ডাক দিল,

“নিধে!—নিধে!”

নিধিরাম বাড়ীর ভৃত্য। সে আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। ফটিক বলিল,

“তুই যা ত, কনকদাদাদের লাল গাইটা যেখানে পাবি বেঁধে আনবি। যা—এক্ষুনি যা।”

নিধিরাম চলিয়া গেল। ফটিক তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

কালিন্দিকে লইয়া সে ফিরিয়া আসিলে অমলা বলিল, “আহা! দাদা, গরুটা যে নেই—কি মারই মেরেছ?”

ফটিকও চাহিয়া দেখিল। তাহার দুর্জয় ক্রোধেব সমস্ত চিহ্নটাই গরুটার পৃষ্ঠদেশে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। কোথাও দড়ার মত ফুলিয়া উঠিয়াছে—কোথাও বা ক্ষতচিহ্ন প্রকট হইয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে।

মেয়ের কথা শুনিয়া হরিমতি ঘরের বাহির হইয়া আসিলেন। গরুটিকে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি বলিলেন, “আহা! এ করেছিস কি! অবলা জাত—এর উপর



আর বাঁধা-ছাঁদা করে মুন্নি জড় করিস্নে। আমার মাথা খাস ছেড়ে দে।”

মাতার কথা শুনিয়া ফটক আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কোন জবাব দিল না। রাগে ফুলিতে ফুলিতে গরুর দড়িগাছটি হাতে লইয়া জোরে টানিতে টানিতে তাহাকে বাগানের ভিতরে লইয়া গেল। সব্জীবাগ অতিক্রম করিবার সময় ক্ষেতটির সে শ্মশান-দৃশ্য দেখিয়া তাহার ক্রোধ আবার দ্বিগুণতর বেগে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

হরিমতি যখন দেখিলেন ছেলে তাঁহার কথা মানিল না, গরুটি লইয়া বাগানে ঢুকিল, তিনি আর কিছু বলিলেন না। ইহার একশ্রুমেঘির নিকটে সকলকেই হার মানিতে হইত। তিনি এই গায়েব জালা মেয়েটির উপর ঝাড়িতে লাগিলেন। বলিলেন,

“হা করে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস্ কি? ভায়ের কীর্তি? কাকে এঁটো কাঁটা নিয়ে ছড়াছড়ি লাগিয়েছে—চোখেব মাথা খেয়েছিস্? যত অকল্যাণ সবই ভাই বোনে টেনে আন্‌বি। এ গৃহের মঙ্গল হবে? কখখন না।”

অমলা খালা বাসন লইয়া ঘাটে গেল। ফটক বাগানে ঢুকিয়া গভীর জঙ্গলে ঝোপেব মধ্যে গরুটি বাঁধিয়া রাখিয়া আসিল।

২

বাগানে জামগাছ তলায় ঝোপেব মধ্যে কালিন্দির পাশে ফটক একলাটি বসিয়া। গরুটির পৃষ্ঠের এই দৃশ্যচিহ্নগুলি তাহার নিজের হাতের স্মৃতি। লুক্ক মক্ষিকার দল খুঁচিয়া খুঁচিয়া ক্ষতের পরিসর বাড়াইয়া তুলিতেছে। গরুটির দুইচোখ দিয়া জলের ধাবা বহিয়া শুকাইয়া আছে। প্রাণ তাহার ছ্যাৎ করিয়া উঠিল কিন্তু মাটির উপর বসিয়া আজ আর গলদেশ বেঁটন নয়—মাছিগুলি তাড়াইয়া দিতেও যেন তাহার মাথা কাটা পড়িতে লাগিল। আহা! এই কালিন্দি যে তাহার কত আদরের! ইহাকে ত সে কোনদিন ছুঁই করিয়া দেখে নাই। ইহার পৃষ্ঠে দৃশ্যচিহ্ন আঁকিয়া দিতে পূর্বের এমন কোন চিহ্নই সে রাখে নাই যাহার ফলে সে

আজ ইহার নিকটে মাথা তুলিয়া বসিতে পারে। কালিন্দি কি তাহাকে চিনিতে পারিতেছে? ফটকের সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। গতদিনের মমতাহীন ঘটনাগুলি মনে উঠিয়া বেদনায় তাহাকে একান্ত কাতর করিয়া তুলিল।

কিন্তু কালিন্দিব মুখখানা ক্রোড়দেশে তুলিয়া লইয়া সে যখন তাহার গলদেশ পূর্বেরই মত কুরিয়া দিতে লাগিল, তখন তৃপ্তিতে কালিন্দির দুই চক্ষু বুজিয়া আসিল। এবং সে তাহার কণ্ঠদেশ ইহার ক্রোড়ের উপর আরও অধিক রাড়াইয়া বাড়াইয়া ধবিতে লাগিল।

ফটক দেখিল ইহার সহিত আত্মীয়তা তখনও ছিন্ন হয় নাই। তাহার চক্ষু হইতে কয়েক ফোটা অশ্রু বরিয়া পড়িয়া নির্জনে বনস্থলী ভিজাইয়া দিল। কালিন্দির চোখের শুক ধারা দুটি পুঁছিয়া দিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। সে কয়েকবার তাহার মুখে মুখ মিলাইয়া গোয়ালঘরে চলিয়া আসিল।

হরিমতি রাম' চাপাইয়াছিলেন। গো-শালা রামাঘর হইতে বেশী দূরে ছিল না। মেয়েকে ডাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

“বিচালি কাটে কে রে?”

অমলা বলিল, “দাদা বোধ হয়।”

“এখন বিচালি কাটবে—গরু মাঠে যায়নি?”

“গেছে।”

“তবে?”

অমলা বটি ছাড়িয়া ঘবে আসিল। মায়ের কাণের কাছে মুখ লইয়া চুপি চুপি বলিল, “কালিন্দির জন্তে বোধ করি।”

হরিমতী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, “হা, দরদে ত আর টানায় না। যা না দেখে আন্‌বি, কে?”

অমলা পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিল ফটকই বটে! বিচালি কাটিয়া থৈল দিয়া মাথাঝোকা করিতেছে। তাহার পর সে যখন চুপড়িখানা স্বন্ধে লইয়া বাগানে গেল, অমলাও পিছু পিছু তাহার অনুসরণ করিল।

ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া দরদের সঙ্গে হাতে তুলিয়া সে

বধন কালিন্দিকে খাওয়াইতেছিল, অন্তরের কোন্ একান্ত সখ্যতার সহিত জড়িত হইয়া সমস্ত মায়ী মমতা চক্ষুটিতে জল হইয়া যেন মুক্তা ঝরিয়া পড়িতেছিল। অমলা বাড়ী ফিরিয়া বলিল, “মা! কালিন্দির কিন্তু গো-জন্ম কেটে গেল। দরদ ঢেলে কি সোহাগ জানান হচে একবার দেখ এস।”

হরিমতী জবাব দিলেন না। অমলা আবার তরকারী কুটিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে সে দেখিল, ফটিক বর্ণাক্ত দেহে ঘরে ঢুকিয়া কেরোসিনের বোতলটি লুকাইয়া লইয়া আবার বাহির হইয়া যাইতেছে। দুই হাসিতে অমলার মুখখানা উজ্জল হইয়া উঠিল। সে তাহা লুকাইবার জন্ত হাঁটুর উপর মাথাটি নত করিয়া রাখিল।

ফটিক চলিয়া গেলে কোতুহলের বশবর্তী হইয়া সেও বাগানের মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিল। ঝোপের ফাঁক দিয়া দেখিল, কালিন্দি তথায় বাধা রহিয়াছে। ফটিক তাহার ক্ষতর উপর কেরোসিনের পটি আঁটিয়া দিতেছে। অমলার হাসি পাইল। সে মুখে কাপড় দিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বটির উপর আশিয়া বসিয়া মুখ কাচুমাচু করিয়া বলিল, “মা, আমি ত তোমার কেরোসিন ঢাল ফেলি—আলোয় তেল ভরতে জানিনে। আজ আবার তেল কিনতে হবে তা বশে দিচ্ছি।”

“কেন?”

“কাল গোটা বাশটা পিঠের উপর ভাজলে—আজ আবার কেরোসিন ঢেলে—খাবার দিয়ে আদর জানান হচে।”

অমলার কথা শেষ না হইতেই ফটিক আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং রান্নাঘরের দাওয়ায় তাহার সামনাসামনি আসিয়া বসিল। বলিল, “কি টিপ্পনি কাটা হচ্ছে? তেলের ভাবনাটাই তোমার কিছু বেশী। আবার ক্ষেতের ফসল যা নষ্ট করেছে সে ভাবনাটাও আমারই বেশী। যাক—তোমার আলো ভরতে যে তেল নষ্ট করেছে তার বেশী পেলে ত কথা নেই?”

অমলা মুখ রান্না করিয়া কহিল, “আমার দরকার কি? মা বকে যে!”

ফটিক একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, “দ্যাখ্, কাল রাগের মাথায় যে কাণ্ডটা করে ফেলেছি, তোদের দয়ার শরীর—খোঁটা দিতে তোরা ছাড়িস্ নি। কিন্তু আজ তার গায়ে একটু তেল ঢেলেছি বলে তোরাও যে সেই পাষণ হয়ে উঠেছিস্। শোন—নিজের দোষটা একটু দেখতে শিখিস্।”

অমলা বলিল, “আমরা ত পাষণ আছি। গরু অবলা জাত, তার পিঠের উপর তোমার মত নাঙল চব্বতেও কেহ পারে না।”

ফটিক হাসিয়া বলিল, “সে কথা ঠিক বলেছিস্। কিন্তু তোদের মত হাত গুঁটাতেও ত কেউ পারে না। কালকের মত মাথা গরম হবার কোন কারণই ত তোদের ঘটেনি। এত মায়ার শরীর তোদের—একটু তেলের মায়ী ত্যাগ করতে পারিস্নে কেন?”

অমলা এবার ভিন্ন পথে ফটিককে কাহিল করিতে যেন উত্তত হইল। বলিল, “এখন গরুটা ছেড়ে দেবে—না বেঁধে রেখে বিচালির গাদাটা শেষ করাবে?”

“ওঃ! তাতেও তোদের বেজ্ঞে উঠেছে?”

“তাতে বাজেনি। তুমি ছেড়ে দিলেও সে খেতে পাবে। যারা গরু পুষেছে—তাদের বিচালিও আছে। কাল থেকে বনে জঙ্গলে গরুটাকে বেঁধে রেখেছ, পোক মাকড়ে পিঠখানা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, তাতে বুঝি দরদ হয় না?”

গরুটিকে আদর যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া আসিয়া তাহার অন্তরের ব্যথা কেবল জুড়াইয়া উঠিতেছিল, অমলা যেন তাহার উপর আবার একটি বিষাক্ত দ্রব্য ছুঁড়িয়া মারিল। সে অত্যন্ত কঠোর হইয়া সিদ্ধান্ত করিল যে, গরুটি বাগানের মধ্যে না খাইয়া শুকাইয়া মরিলেও সে তাহার গলার দড়ি নামাইবে না।

অমলা কিন্তু তাহার দাদাকে রুঢ় কথা বলিয়া কিছু থমকিয়া গেল। সে স্বর নরম করিয়া কহিল।

“গরুটা যে ক্ষতি করেছে, সত্যই রাগ হয়—তা’বলে অত রাগ?”

সমবেদনা জানাইতে গিয়াও সে একটু মোচড় দিল। হয়ত সেটা ইচ্ছাকৃত নহে।

গায়ের রক্ত জল-করা এতদিনের পরিষ্কারের বস্ত্র যে লুটিয়া খাইল তাহার উপর ভগিনীর বিচার-বুদ্ধি দেখিয়া সে বিরক্ত হইল। ক্রোধ-বিকৃত মুখখানা নামাইয়া লইয়া সে বসিয়া রহিল।

ঠিক এই সময়ে কনকের মাতা বিধুমুখী গরুটীর খোঁজে একবার অমলাদের বাড়ীতে আসিলেন। দূর হইতে অমলাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

“অমলি, মা, ফটিক বাড়ী আছে?”

অমলার মুখের অন্ধকার-ভাব তখনও কাটে নাই। সে অমনি বিস্ময় মুখে বলিল,

“আছেন।”

বিধুমুখী অঙ্গনে পা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ফটিক, বাবা, গরুটি ত কাল থেকে পাচ্ছি না, বেঁধে রাখিসনি ত?”

ফটিকের দুই চোখে আবার সেই উদ্দীপ্ত চাহনি। অন্তর তখন আবার উত্তেজনায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বলিল,

“আমি বাধ্ব কেন?”

বিধুমুখী বলিলেন, “কাল তোদের ক্ষেতে এসে পড়েছিল, তারপর আর তাকে দেখিনি। সমস্তদিন খোঁজাখুঁজি করেছি, রাত্রেও সবাই আলো জ্বলে খুঁজছে। বাবা, বেঁধে থাকিস্ ত ছেড়ে দে। বাছুরটা ডেকে ডেকে সারা হচ্ছে।”

ফটিক কহিল, “যে শাস্ত গরু তোমাদের, অপর কার ফসল পয়মাল করেছে, হয়ত খোঁয়াড়ে দিয়েছে। সবাই ত আর ফটিক নয়।”

বিধুমুখী বলিলেন, “শাস্ত সে কথা মিথ্যা নয়। কালগরুমাঝেই শাস্ত হয়। তা ছাড়া আমাদের কালিন্দী ত শিং দিয়ে চটাখানা সরাতে জানে না। একেবারে আলাগা পেলো গরু জাত—সে ভিন্ন কথা।”

ফটিকের কালকার কথাটা মনে পড়িয়া গেল। সে বিজ্রপের স্বরে কহিল, “জ্যেঠাইয়া, টাকা কেবল তোমাদেরই আছে। আমরা ঘেরা-বেড়া করতে পয়সা কোথা পাব? যা-ত অমলি, ঘেরাটা একবার দেখিয়ে আনবি?”

বিধুমুখী মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, সে কথাও বুঝি দাদার

কাণে দেওয়া হয়েছে। কি মেয়েই হয়েছিল যে! ঘেরার আর দেখব কি? দুবেলাই দেখছি। কতকগুলো ফুলের কাঁটা এনে ঠেসে রেখেছিস—তার উপর বাথারী পড়লে না আঁট-সাঁট থাকে?”

রান্নাঘর হইতে হরিমতী মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, “তাই বলে যাও দিদি! আমরা ত ওর সঙ্গে কথা বলতে সাহস পাইনে। এত করে বলি যে,—ফটিক, ভালমত ঘেরা-বেড়া না করতে পারিস্ ত এ সকল করিসনে। হাতের তৈরী ফসল নষ্ট হলে পুত্রশোকের মতই লাগে। বছর বছর কি কম ফসলটা তৈরী করে? হাতখানাও সেই রকম, যে বীজটে ছড়াবে—রক্তবীজ হয়ে বেড়ে উঠবে। তারপর যখন ফলফুলে ছেয়ে ফেলে, ঠিক সেই সময় এসে গরু পড়ে একদিনেই সব শেষ করে দিয়ে যায়। এই ত চিয়দিন দেখে আসছি।”

বিধুমুখী বলিলেন, “সেত আমরাও জানি। শরীরের ত এই দশা—রোদ নেই বিষ্টি নেই—চব্বিশ ঘণ্টা গাছ-গাছালি নিয়ে পড়ে আছে।”

হরিমতী বলিলেন, “শরীরের কথা আর বলোনা দিদি! মাসের মধ্যে পাঁচটা দিনও কি ওর ভাল যায়! পেটটা পিলেতে যেন রাম-রাজস্বি করে বসে আছে। চব্বিশ ঘণ্টা ওর গা দিয়ে জ্বর বইছে। বললে হেসে উড়িয়ে দেয়। আমাকে কি স্থখী হতে দেবে ওরা?”

বিধুমুখী বলিলেন, বাস্তবিক দিদি, ও পেটটি দেখতে আমাদেরও ভয় হয়। এত খাটুনি খাটাও ত ভাল নয়।”

“খাটুনি বলে খাটুনি। আলুর ক্ষেতে ভাঁড়-ভাঁড় জল টেনে যখন ভর্তি করে, তখন মনে হয় পুকুরটাই বুঝি ধরে এনে জমীর উপর ঢালে।”

বিধুমুখীর মনে গরুটার কথাই জাগিতেছিল। তিনি দেখিলেন, ফটিকের সঙ্গে যে ভাবে কথাটি শেষ করা হইয়াছে, পুনর্বার ঐ কথার উত্থাপন করিবার যেন কোন সূত্র নাই। বলিলেন,

“যাই। গরুটির ভাবনাই বেশী হয়েছে। বাছুরটা গলা শুকিয়ে মারা না যায়।”

তিনি যখন ফটক পার হইবেন, ফটক ডাকিয়া বলিল,  
“চল্লে নাকি জ্যেঠাই মা?”

“যাই বেলা হল—রাগা বাগা রয়েছে। গরুটার জ্ঞে মনে আর স্বস্তি নাই।”

“সকাল বেলায় খালি হাতে যাচ্ছ—কিছু তরকারীপত্র নিয়ে যাও।”

তিনি এক পায়ে দু’ পায়ে ফিরিয়া আসিলেন। ফটক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সব জীবাগের নিকটে গেল। অন্ধকর্তিত ডালগুলির ত্রিয়মান অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ ধক্ ধক্ করিয়া জলিয়া উঠিল। বলিলেন,

“আহা! বড্ড ক্ষতি করেছে যে!”

ফটক কোন কথা বলিল না। সে নানাবিধ তরকারীতে চুপড়ী পূর্ণ করিয়া কালিন্দীর মনিবের হাতে তুলিয়া দিয়া প্রাণ যেন কিছু হাল্কা করিয়া লইল। বিধুমুখী চলিয়া গেলেন। ফটকও সেই পায়ে চুপি চুপি বাগানে ঢুকিয়া কালিন্দীর শিংএর দড়ি খুলিয়া দিয়া আসিল।

৩

“মা, দাদা কিন্তু আবার লেপ মুড়ী দিলে।”

ফটকের লেপ মুড়ী দেওয়া নূতন নয়। মাসের মধ্যে এক আধবার সে শয্যার আশ্রয় লয়। হরিমতীর ইহা সহিয়া গিয়াছিল। মায়ের প্রাণ—উৎকর্ষিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

“আবার জ্বর এল? কাল রাত্তিরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, সারারাত ছটফট করেছে। বাসন মেজে কবরেজ মশায়কে একবার ডেকে আনবি, যা।”

মাতার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। দুঃখিনী জননীর ঐ একটি মাত্র ছেলে। একটু উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিলে অত্যাচার করিতেও ছাড়িবে না। গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন জ্বরটা কিছু বেশী হইয়াছে। মাতার শীতল হস্তের স্পর্শ পাইয়া সে বলিল, “পিলেটা বড় টাটাচ্ছে, মা।”

হরিমতী তাহার সমস্ত দেহে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

ফটক এবার বেশ একটু ভোগাইল। জ্বরটা বাকিয়া

তাঁহাকে অচৈতন্য করিয়া ফেলিল। বিকারের ঘোরে কখন সে বলে, “অমলি কালিন্দিকে ছেড়ে দে—বেঁধে রেখে আর কষ্ট দিস্নে। কখন বলে, একটুখানি কেরোসিন দাও না। গরুটা যে মাছতে পড়ে মারা যায়!”

কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধে কোন ফল হইল না। হরিমতী শিওরে বসিয়া দিন কাটাইতেছিলেন। তাঁহার জীর্ণ বস্ত্রের মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিয়া বাহিরে আসিবার প্রয়াস পাইতেছিল। আশা নিরাশার এমনই একটা দ্বন্দ্বের দিনে গ্রামের নিম্নশ্রেণীর একটি লোক আসিয়া একটা মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গেল। হরিমতী কবিরাজী ঔষধ বন্ধ করিয়া দিলেন। নূতন ঔষধের ব্যবহারে এক সপ্তাহের মধ্যে রোগের অর্ধেক কমিয়া গেল।

ফটক দেখিল অমলা মেঝের উপর বসিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতেছে। সে কহিল, “কি বিটকেল ঔষধ গোলাচ্ছিস্ন রে! চনার গন্ধে যে বাঁচিনে?”

অমলা একটু হাসিয়া বলিল, “চনাইত।”

“চনা কেন? কে বলেছে খেতে? কবরেজ মশায়?”

“না, আর একজনে। এই খেয়েই ত পেটের পিলে অর্ধেক কমে গেছে। বছর ধরে কবরেজী ঔষধ খেয়েছ কি ফল হয়েছে তাতে?”

ফটক কেমন অসচ্ছন্দভরে কহিল, “চনাই ঔষধ হল রে?”

অমলা বলিল, “শুধু চনা কেন—আরও কি সমস্ত শিকড় বিকড় দিয়ে গেছে। তাও আবার বলে গেছে স্বপ্নকণযুক্ত কাল গরুর চনা চাই।”

কাল গরুর নাম শুনিয়া ফটক কেমন বিচলিত হইয়া উঠিল। কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “চনা কোথায় পাস্ন?”

“কনক দাদের বাড়ীতে—কালিন্দীর।”

ফটক আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। চক্ষু মুদ্রিত করিল।

ঔষধ প্রস্তুত হইলে অমলা তাহা লইয়া ফটকের নিকটে আসিল। বলিল, “দাদা! ঘুমুলে নাকি?”

ফটক চক্ষু মেলিয়া বলিল, “না—দে।”



অমলা জিজ্ঞাসা করিল, “আজ যে মুখ শিকট বিকট কবলে না?”

“গন্ধটা কম লেগেছে।”

“তা অমন হয়। বন বাঁদাড়ে ছাই ভস্ম খেয়ে এসে দুধে চনাতে গন্ধ হয়। দুধে গন্ধ পাও? দুধও যে খাচ্ছ তার।”

ফটিক চক্ষু বুজিয়া কহিল, “না।” একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল, “আমাদের গরুতে দুধ হয় না?”

“দুধ আর হয় কৈ? তুমি অসুখে পড়ে রইলে। ভাল খাবার দাবার ত পাচ্ছে না একটা।”

সে ঐষধের সাজ সরঞ্জাম নির্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দিয়া প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিল। ফটিক ডাকিয়া কহিল, “কালিন্দি বেশ সেরে উঠেছে?”

“ওমা। কালিন্দির আবার কি হল?”

“সেই যে—”

ফটিক চুপ করিয়া গেল। বলিল, “বা—যা, সূজীটা আগের ভাগে রেঁধে দিতে বলিস্।”

ফটিক বালিসের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

৪

ফটিক সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। বাড়ীর কাজ কর্মও কিছু কিছু করিতে লাগিল। দেখিল কালিন্দি বেশ সারিয়া উঠিয়াছে। পিঠের দাগগুলি মিলাইয়া গিয়াছে। কোন চিহ্নই আর নাই।

তাহার মুখে দারুণ অরুচি হইয়াছিল। মাতা যেখানে যে ভাল জিনিসটি পাইতেন ছেলেকে আনিয়া খাওয়াইতেন। কিন্তু মেয়েলোক হইয়া তাহার রুচিমত সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতেন না।

সে দিন সকালে হাতে মুখে জল দিয়া ফটিক গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। অনেকটা পথ হাঁটিয়া সে বহির সেতের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বহির তখন ক্ষেতে ঘাই-বার উদ্যোগ করিতেছিল। ফটিককে দেখিয়া কহিল, “বড় বাবু যে? দণ্ডবৎ হই। তা’ এই পেরাতককালে? দেহ যে শেষ করে ফেলেছাও।”

ফটিক বলিল, “ই। বহির! এবার মরে বেঁচে উঠেছি।

মুখখানা এমন খারাপ হয়েছে—কিছুই খেতে ভাল লাগে না। শুন্লাম, তোমার ক্ষেতে নাকি পটল ধরেছে?”

“ধরতে কেবল শুরু করেছে।”

“ক্ষেতে হাত দাওনি?”

বহির হাতের ছকাটায় দু’তিনবার টান দিয়া কহিল, “মিথ্যে বলে গো-জন্ম নেব কেনে? একটা হাট করেছি। আষ্টগুণ্ডা পয়সায় সের বিকিয়েছে। সকাল বেলাটায় যখন মুখ ফুটে বলে ফেলেছাও—একটু বস, আমি ক্ষেত হয়ে আসি।”

তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া বহির ক্ষেতে চলিয়া গেল। এবং কিছু পটল কাঁচা পেঁপে ও ডুমুরে ছোট একখানা চুপড়ি ভর্তি করিয়া আনিয়া দিল। ফটিক বলিল, “এ করেছ কি? না—না, তুমি ছা-পোষা মানুষ; এত সব রেখে দাও।”

বহির হাসিয়া কহিল, “বড় বাবু তোমার হাতের দেব্য বারজনা খায়—মুই বুঝি আর কিছু জানে না। মাঝে অনেক দিন তরকারিপত্তব দিতে পারিনি, নিয়ে যাও।”

ফটিক তরকারির বোঝা লইয়া ঘামিতে ঘামিতে অনেকটা দূরে যখন মাঠের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল, দেখিল চারজন বাহকে যেন একটা মৃতদেহ বাঁশে বুলাইয়া লইয়া চলিয়া আসিতেছে। সে চলিতে চলিতে এক একবার নজর দিয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। বাহকেরা নিকটে আসিলে সে তাহাদের চিনিতে পারিল। জিজ্ঞাসা করিল, “কাদের গরু?”

“কনক বাবুদের।”

সে ভীত ভ্রষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কালিন্দি?”

“ই বাবু।”

“কি হয়েছিল?”

“বসন্ত।”

ফটিকের হাতের চিহ্নগুলি কালিন্দির দেহে মিলাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বর্তমান রোগের ক্ষতগুলি যেন তাহারই হাতের নিদর্শনরূপে সমস্ত দেহটার উপর জলিতেছিল। এই মাঠে এইখানে দাঁড়াইয়াই সে তাহাকে প্রহারে জর্জরিত করিয়াছিল। বাহকেরা যখন কালিন্দিকে লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল, সে তখন হাতের বুড়িটার উপর সজোবে এক পদাঘাত করিয়া তরকারীগুলি রাস্তার উপর ছড়াইয়া দিয়া রিক্ত হস্তে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

## জন্মান্তর

শ্রীমনোহর মৈত্র

জন্মান্তর মানিনাকো আমি,  
তবু যদি ফিরে আসি তব ধরণীতে  
ভগবান, আর মোরে পাঠায়োনা এই মরা দেশে !

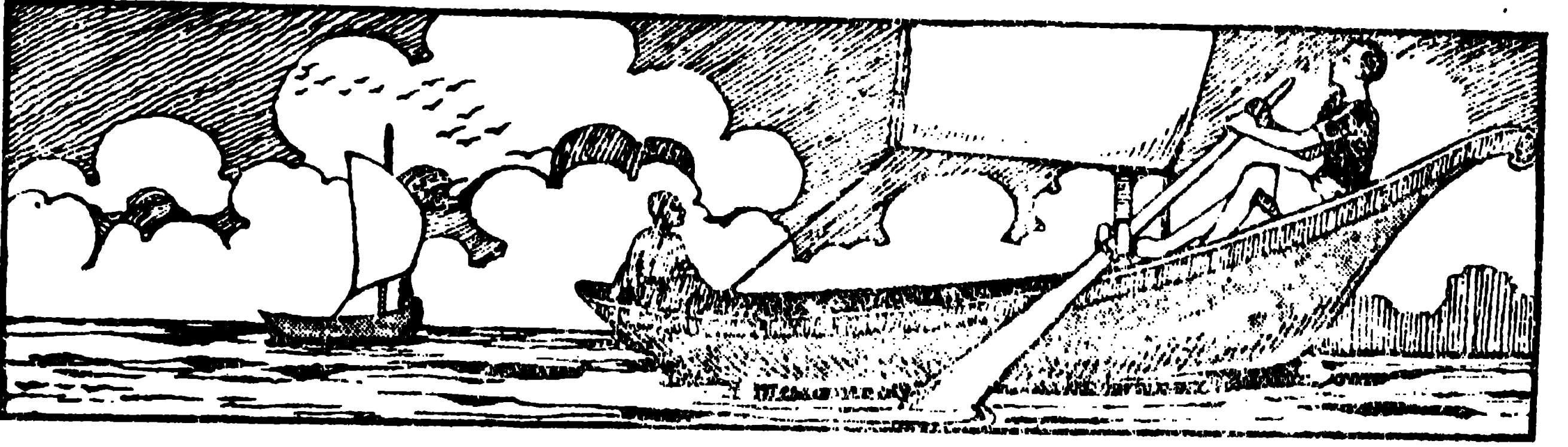
একে একে গেছে মোর তেইশ বছর,  
এরি মাঝে বুড়া হ'য়ে গেছি,  
দেহেতে লেগেছে ঘুণ, তা'রো আগে মন মরিয়াছে,  
বুড়া দেহে বুড়া মন আর আমি পারি না বহিতে ।

প্রকৃতির শ্যাম-শোভা, চাঁদ আর তারা,  
আকাশ বাতাস ফুল, এই লয়ে রব চিরদিন !  
মানুষেরে ভালবাসিবনা ?  
চাহিবনা উদার সমাজ ?  
নারী আর নরে কভু হবেনা মিলন ?  
দেহের কামনা শুধু বড় হবে হায় !  
হবেনা মনের পরিচয় ?

উদার জীবন আমি চাহি  
অগাধ অবাধ ওই আকাশের মতো,  
বিরাট উদার নীল বারিধির মতো,  
মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গের মতো  
নিশি-দিন যথা খুশী করি বিচরণ,—  
এই শুধু কামনা আমার ।

আবার আসিতে হয় যদি  
ভগবান, আর মোরে আনিওনা এ পোড়া ভারতে !  
চাহি আমি সেই দেশ খানি  
যে দেশ হয়নি বন্দী দাসত্বের জালে,  
যে দেশে মানুষগুলি আজো তাজা আছে—  
নীতি ও শাস্ত্রের চাপে যায়নি শুকায়ে,  
যে দেশে নারী ও নর হাতে হাত রেখে  
একান্ত বন্ধুর মতো পাড়ি দেয় জীবনের বন্ধুর সরণি,  
অনর্থক বৈরাগ্যের ক্লেশে  
আপনারে করে না বঞ্চনা,  
ক্ষণস্থায়ী জীবনে পূর্ণ করে যারা  
প্রেম-প্রীতি-হাসি-গানে, নব নব মাধুর্যের রসে,  
জন্ম লব তাহাদের মাঝে ।





## মনো-মর্মর

শ্রীহিমাঙ্গিনারায়ণ বসু

মানুষ জীবনে চায় শান্তি, কিন্তু সর্বত্র না হোক, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পায় সে অশান্তি। নিগূঢ় তাহার কারণ জানিবার তাহার কোন বালাই নাই; সে জানে ব্যক্তিগত শান্তি সমাধান নিয়ন্ত্রণে তাহার আছে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অধিকার। অন্তরায় বিঘ্ন যাহা কিছু আছে তাহা ত্রিবিধাত্মক রহস্যের—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈতিক বিধানই সে-সবের জন্মদাতা। মানুষের কল্যাণ-শক্তি সেখানে পঙ্কু, নির্দোষ—“ভূজবল জ্ঞানবল বালকের বালুখেলা অনন্তের কালসিকুনে।”

তাই বলিয়া সে-অশান্তিদানবের প্রতিকার প্রতিবিধান করিতে, নিষ্কৃতি অব্যাহতি পাইতে মানুষের চেষ্টা, সতর্কতার কি ক্রটি আছে? তাহার জ্ঞান মানুষ পাজিপুঁথি দেখিয়া পা ফেলিতেছে, সত্যনারায়ণ মনসা চণ্ডীর সিম্মি দিতেছে, রাজা পরীক্ষিতের মত আপদ-নির্মুক্ত সৌধ-প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করিতেছে, ভাইটামিন এ, বি, সি, ডি খাইয়া দেহের প্রতিরোধ বাড়াইতেছে; আবার রুদ্রদেবতার দ্বারে জোড়া ছাগ-বৎস মানং করিতেছে, শান্তি স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা হইতেছে—সামান্য শান্তিরোধি।

কিন্তু কি দুর্লভ এই অশান্তি দানব!! তাহার চকুলজ্জাটীও নাই। অতিকায় ঘটোৎকচেরই মত মানুষের জীবনের কুরুকুল জাঁতিয়া পড়িয়াই আছে।

মানুষ আপনাকে বহুরূপে দিয়া ও পাইয়া তৃপ্তিরোধ

করিবার জ্ঞান ঘর সংসার রচনা করিতেছে কিন্তু বিনিময় প্রতিদানের আসক্তি এবং বিচ্ছেদের সংঘাত আসিয়া তাহার সকল স্বপ্ন, সকল হৈম্যা, সনতা, শান্তিই কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে। নতুবা কালচক্রনের নিম্নম নিয়তির করাল আবর্তন আসিয়া তাহার তাসের ঘরের পথটুকু ও লুটাইয়া দিয়া যাইতেছে।

নিছক আত্মসন্তোষের পথ ছাড়িয়া মানুষ পরিল পদার্থপরতা,—দেহ, সঙ্গীর্ণতা, স্বাদিকার প্রেমভক্তা বর্জন করিয়া গহণ করিল উদারনীতির পরাকাষ্ঠা—সত্ত্বগুণের সকল প্রেরণাগুণিরই করিল সাধনা; তবুও হায়, সেখানেও রহিয়া গেল ঐদারিক অহমিকার উচ্চাত্তর স্বপ্ন-কামনা, সেখানে রহিয়া গেল ব্যক্তিগত কড়ি, কল্পনা, মাপ, আকাঙ্ক্ষার একান্ত নির্দয়তা, রহিয়া গেল অশেষের নিকৃপশন পিপাসা, নিঃশেষেরও আশঙ্কা।

পারিবারিকভাব, সঙ্গীর্ণ মানসিক ঘূর্ণা, ও সন্তাপকে ছাড়িয়া দিয়া মানুষ উঠিল নৈতিকতার চেতনায়; দেশের বাণী নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিল, দেশের কর্তব্যকে সে নিজেরই বলিয়া বরণ করিয়া লইল। পাইল যাহা তাহা শান্তি নয়, অশান্তিরই নামান্তর—তাহার কল্যাণ প্রেরণা আত্মসামর্থ্যের মানন-উপকূলে আছাড় খাইয়া কেবল হাহাকার, আর্দ্রনাদ, আক্ষালনই তুলিল—“যত উচ্চ তোমার হৃদয় তত দৃঢ় জ্ঞানিত নিশ্চয়।”

মানুষের মধ্যে চলিয়াছে উদ্দেশ্য বিধেয়র একটা চিরন্তন প্রহেলিকা ; তাহাদের গরমিল গাঁজামিল হইতেই মানুষের জীবনের আসিয়া পড়িয়াছে মানুষের স্বাতন্ত্র্যের দুঃখময় অধ্যায়টি ; আসিয়াছে দুর্ভোগ, অশান্তি, বিদ্রোহ অথবা পাপপুণ্য, ধর্মাধর্মের শাখত ধ্বংস—অসিয়া পড়িয়াছে দুর্নিবার অশান্তি । মানবপ্রকৃতির এই চিরন্তন অবস্থাটি আঁকিতে গিয়া বেদ বলিলেন ‘দেবাসুর সংগ্রামের’ কথা, জোরোয়াষ্ট্রিয়ান ধর্মে (Zoroastrianism) তাহাই বর্ণিত হইল আহুরমজদা ও অর্হিমানের সংগ্রামরূপে, আবার বৌদ্ধেরা বলিলেন ‘মারের’ আক্রমণ এবং কোরাণ বাইবেল বলিলেন ঈশ্বর ও সয়তান বা ইব্লিসের সংগ্রাম ।

ইহার সমাধান বা নিবারণ যাহা হইল, তাহা হইতে সৃষ্টি হইল ভারতের বৈরাগ্য ধর্মের মায়াবাদ ; ভগবানের বাহুরূপ, প্রতিভাসিক উদ্দেশ্য সার্থকতাকে, জীবনজগতের অর্থ উপযুক্ততাকে অস্বীকার করিয়া, এড়াইয়া চলিয়া মুক্তির, শান্তির পথ নির্দ্ধারিত হইল—জীবনজগত থাকিল অম্লেরই অবাধ একাধিপত্যের জগৎ । আবার মানুষের মন, প্রাণ, চিত্তের প্রত্যেক বৃত্তিটাই জীবনের সমতার পরিপন্থী জানিয়া গ্রীক ষ্টোয়িক (stoic) আদর্শ তাহাদের সর্বথা নিগ্রহ বা উচ্ছেদ করার উপরই মানুষের শান্তির একমাত্র পন্থা নির্দেশ করিল—মানুষ হইল দারুভূত মুরারী । পারস্যের ম্যানিকিয়ান তত্ত্ব (Manicheanism) মানুষের অকল্যাণ, ব্যর্থতার মূলে আবিষ্কার করিল ‘শয়তান’ নামে দ্বিতীয় একজন স্রষ্টা । ফলে মানুষের মনের উপর রহিয়া গেল শয়তানের ভগবন্ত্য প্রভাব, সাধনার অনাবিল সার্থকতায় আসিয়া পড়িল একটা শঙ্কা, ত্রাস, নিরর্থকতার প্রপীড়ন ।

জীবন ত সংগ্রামই বটে—সংগ্রামেরই আধার ; কিন্তু মানুষ এই সংগ্রামকে পরিণত করিয়াছে শত্রুতারূপে—দ্বৈষ, হিংসাকে করিয়াছে তাহার অস্ত্র, সহচর, পাণ্ডেয় । ব্যষ্টির স্বার্থের নীতিকে করিয়াছে মানুষ সংগ্রামের মানদণ্ড, তাহার চেতনাকে—চেতনার সামর্থ্য, পারগতা, দৃষ্টি, উপভোগকে করিয়াছে সংগ্রামের নিয়ামক, প্রবর্তক । তাই আত্মার এই লাঞ্ছনার নামকরণ হইয়াছে ‘শয়তানের

প্রতিদ্বন্দ্বিতা’, আর আত্মমোহের দুষ্কৃতি আখ্যা লইয়াছে “অদৃষ্টের বিড়ম্বনা ।” নিরহঙ্কার, নিষ্ঠামতার সে সিদ্ধবীথ্য মানুষের কর্ম্মধারে নামিয়া আসিয়া তাহাকে তাই ধ্বংসের আবিলতা, ধ্বংসের অশেষ সম্ভাপ হইতে মুক্তি দেয় নাই ।

জীবনের সংগ্রাম হয় যদি মহত্তর উদ্দেশ্যে এবং মানুষের সব-কিছু সার্থকতার মূলে থাকে যদি সেই বিধানের অর্থ্য হস্ত—মানুষ যদি বিশ্বনিয়ন্তা কর্তৃক সেই যুদ্ধ হইতে জয়ী হইয়া উঠিবার জগ্ন নির্ধারিত হইয়া থাকে, যেমন শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন—Is it not so that in nature Pain is a possibility which has to be exhausted and man has been selected as the instrument to bring it into existence, in a limited space, for a limited time and, work it out of the cosmos— তাহা হইলে মানুষের কর্তব্য, স্বধর্ম হইবে সেই বিরাট উদ্দেশ্যের আত্মপত্য ; তাহা হইলে জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত, দুর্ভোগ নিবাতন, শোকদুঃখ, জরা মৃত্যুতে মানুষের থাকিবে না কোন ব্যক্তিগত বিক্ষোভ । সে সকলের মধ্যে মানুষ দেখিতে পাইবে বিপুলতর মঙ্গলের ইঙ্গিত । বিঘ্ন, অত্যাচার, প্রতিকূলতা তাহাকে নিরুত্তম হীনবল না করিয়, তাহাতে আনিয়া দিবে তাহাকে খাঁটি হইয়া উঠিবার অসামান্য ও অশ্রান্ত দক্ষতা । তখন যুদ্ধই যদি তাহাকে করিতে হয়, তাহা হইলে সে-যুদ্ধ সে করিবে সাংখ্যের পুরুষের নিষ্ক্রিয় উদাসীনতার দ্বারানহে—স্বকীয় স্বকীয় প্রয়োজনের দ্বারা সে-যুদ্ধকে সে আলিঙ্গন করিবে সকল কল্যাণতর সিদ্ধির জন্মদাতারূপে । তখন নিজের জীবনকে সে বিবেচনা করিবে দিব্যাভিব্যক্তির একান্ত সহায়ক, একমাত্র যন্ত্র—শুদ্ধতা, শক্তি, আলোক, প্রসারতা, শান্তি, আনন্দই তাহার জীবনের একমাত্র কাম্য, তাহার জীবনের সকল ধৃতি, প্রগতির উৎস ।.....“For this step carries you back beyond border-line from the life of stress and suffering in the ignorance into the truth of your spiritual being, into its deep peace and its intense Ananda.”—Sri Aurobindo.



## অপ্রত্যাশিত

### শ্রীহাসিরাশি দেবী

রাতদিন হাসিই ঘেন ওর রোগ ;

বড়শা' নন্দিনী তাই রাজুর ওপোরে সময় সময় বড় রাগ করে, বলে—দাঁতে কুটো নিস্ ছোট বৌ, বিধবা মামুষের অত হাসি কি লা ? লোকেই বা হঠাৎ ব'লবে কি ? সবদিক দেখে শুনে চ'লতে হবে তো ?

ছোট বৌ রাজু তবু হাসে ; বড় শ'য়ের ছোট ছেলেটাকে কোলে টেনে নিয়ে উত্তর দেয়—

“তোমার যেমন কথা মেজ্দি, হাসি কি কখনও থামান' যায় ? লোকে বলুক, আর নাই বলুক, হাসি বাধা মানবে কেন ? ভাল জালায় পড়েছি বাপু !”

রাগ হয়, দুঃখ হয় ; নন্দিনী তাই আর উত্তর দেয় না,— মুখ ভার করে নিজের মনে বলে

“মরগে যা, আমার তাতে কি !”

কিন্তু তবু মনটা কেমন করে ! আহাঃ—ওষে অনেকদিন আগে, তার সম্ভান হবার আগেই স্নেহের ভাগ নিয়েছিল, ওষে সম্পর্কে ছোট বোনও হয় ।

নন্দিনী বলে

“আমার ও শ'খের করাত হ'য়ে রইল, আসতেও কাটে, যেতেও কাটে । রেহাই আর এ জীবনে পাব না ।”

\* \* \*

পাশের বাড়ীতে বিয়ের নিমন্ত্রণ ;

কাপড় জামা বার করবার জন্তে চাবীটা রাজুর হাতে দিয়ে নন্দিনী ছেলেকে দুধ খাওয়াতে ব'সলো ;—

“মাগোঃ মা, ছেলেটাও কি দুষ্ট, ছোট বোয়ের কাছে ছাড়া কেন যে দুধ পর্য্যন্ত তার মায়ের কাছে খেতে চায়না কে জানে ?” ছোট বৌ কিন্তু এদিকে একবার তাকালেও না, চাবীটা নিয়ে সরাসর ওপোরে চ'লে গেল ।

নন্দিনীর বড় রাগ হ'লো, কিন্তু ও'ক তো ডেকে আর

ফেরানও যায়না, তাই ছেলের পিঠে গোটাকতক কিল-চড় বসিয়ে সে ওদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে, শুনলে ছোট বৌ বাক্সের তাল খুলছে ।

নানা রং বেরংএর কাপড় জামা একপাশ ক'রে রাখতে রাখতে রাজুর হাতে একখানা ফটো ঠেকতেই সে তুলে নিলে, দেখলে সে একটি বুকের প্রতিকৃতি । অনেকদিন আগে এই ফটোখানাই দেখিয়ে নন্দিনী বলেছিল,

“তোর সোয়ামী, প্রণাম কর ।”

সে আজ অনেকদিনের কথা, বিয়ের বছরেই । মনে পড়ে বিয়ের কয়েকদিন পরেই স্বামীর মৃত্যুর কথা । উঃ সেদিন চ'লে গেলেও মনের ওপোর থেকে তার পায়ের চিহ্ন মোছেনি ।

শিউরে উঠে, রাখতে গিয়েও সে ফটোখানকে রাখতে পারলে না, আড়ষ্টের মত চেয়ে রইল ।

কতক্ষণ এমনি ক'রে ছিল তার খেয়াল ছিলনা,—হঠাৎ নন্দিনীর ডাকে মুখ ফিরিয়ে দেখলে নন্দিনীর মুখগানা যেন আষাঢ়ের মেঘের মত খমখমে হ'য়ে উঠেছে ; রাজু একটু হাসতেই তাকে সরিয়ে দিয়ে নন্দিনী নিজেই কাপড়-জামা বেছে গুছাতে বসলো ।

রাজু একটা কথাও ব'ললে না, ফটোখানা নন্দিনীর পাশে রেখে, থোকাকে উঠিয়ে নিয়ে নির্দীকে ঘর থেকে বার হ'য়ে গেল ।

ছোট বড় এমনি আঘাত দিনের মধ্যে প্রায় পাঁচ ছয় বার রাজুকে অগ্ৰগনা ক'রে ফেলতো । যাবার আর স্থান নেই,—সম্পর্কেও আর কেউ কোথাও নেই গার কাছে দুদিন অন্ততঃ গিয়েও জুড়ানো যায় । বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ীর ঘা পড়ে, তবু মুখের ওপোরে হাসি ভেসে উঠে,—কেন কে জানে ! ওটা বুকি বিখাতার দেওয়া অভিশাপ ।

সেদিন ওপোর থেকে নীচে নেমেই রাজু শুয়ে প'ড়েছিল,—মনে হচ্ছিল বুকের মধ্যে বুঝি এক সঙ্গে একশোটা ঢেঁকির পাড়' পড়ছে।

খোকা তার রুম্ম চুলগুলোকে নিয়ে খেলা করছিল ; এমন সময়ে দরজার কাছে একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনাল

“রাজু—”

মুখ তুলে রাজু দেখলে তার ছোটবেলার সই—সরি। অতিকষ্টে “বোস্” বলেই হঠাৎ মাথাটাকে আবার হুইয়ে ফেললে।

সরি এসে ব'সলো, কিন্তু হঠাৎ কথা কইতে পারলে না, নির্ঝাঁকে রাজুর স্বপ্নাবিকৃত মুখখানার দিকে চেয়ে রইল।

সরি বুছেছিল সবই,—কিন্তু না বোঝার ভাণ ক'রে শুধু বললে

“কি হ'য়েছে আমায় বলবি ভাই ?”

রাজু একটু সামলে নিয়ে মুখ তুলে হাসলে—  
আবার সেই হাসি।

বিরক্ত হয়ে সরি বলে উঠলো

“ওমুখে আর হাসি মানায় না সই, বরং কান্নাটাই দেখাবে ভালো।”

হাসিমুখে রাজু জবাব দিলে

“কিন্তু কঁাদতে যে ভুলে গেছি ভাই !”

ছুজনেই নির্ঝাঁকে ব'সে রইল ; কেই বা কি বলবে ?  
বলার মত কি কথাই বা আছে ?

নির্ঝাঁকে উঠে দাঁড়িয়ে, সরি হঠাৎ ব'লে উঠলো

“একটা কথা রাখবি ভাই ?”

রাজু বললে

“সাধ্য হ'লে রাখতে পারি, বল।”

“বিশেষ কিছু নয়, যখন এসব অসহ্য বোধ হবে তখন সরিকে ভুলিস্নে রাজু,—তার কাছে শাস। সুখ না হোক, প্রাণপাত ক'রেও সে তোকে একটু শান্তিতে রাখবার চেষ্টা ক'রবে।” সে চ'লে গেল,—রাজু উত্তর দিলেনা।

২

ছোট বৌ যে গৃহত্যাগ ক'রেছে এ কথাটা প্রথমে

নন্দিনীই পাড়ায় প্রচার ক'রে কঁাদতে ব'সলো। কিন্তু সে কান্না বেশীক্ষণের নয়, শীঘ্রই থেমে গেল।

\*

\*

\*

ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই রাজু যখন এসে সরির দরজায় দাঁড়ালো তখন সরি ঘরের কাজকর্ম সেরে ছেলেটাকে নিয়ে দরজার দিকেই আসছিল। রাজুকে দেখে প্রশ্ন করলে

“কার সঙ্গে এলে ?—”

অভিভূতের মত রাজু উত্তর দিলে

“কার সঙ্গে আবার ? একাই।—”

“একাই ? এই দূরের পথে ?”

সরি যেন চ'মকে উঠেই বিমর্ষ হ'য়ে পড়লো ; তারপরে হাত ধ'রে বললে

“এস।”

আড়ষ্টের মত রাজু গিয়ে সরির কাছে রান্না ঘরে ব'সে প'ড়লো—জলন্ত আঁচটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেবলই মনে পড়তে লাগলো কেমন ক'রে সে এই জীবনে প্রথম পথে বার হ'য়েছে, কেমন ক'রে টিকিট কেটে ট্রেনে উঠেছে, আর কেমন ক'রেই বা এতদূরে হেঁটে এসে সরির বাড়ীতে উঠেছে !

সরি প্রশ্নের পরে নানা প্রশ্ন করে যাচ্ছিল, কিন্তু দুই একটার ছাড়া উত্তর পাচ্ছিল না। বিরক্ত হয়ে সে চুপ ক'রে গেল, রাজু চুপ করে উত্তরের আঁচের দিকে চেয়ে ব'সে রইল। কাজের ছুতো ক'রে গিয়ে সরি তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা ক'রলো—

“ও পাগল হ'লো নাকি ?”

স্বামী মুখভঙ্গী সহকারে উত্তর দিল—

“পাগল না আরও কিছু, বরং কত লোককে পাগল ক'রে দিতে পারে ও, দেখে নিও।”

সেদিন সরির ঘরের দিকে বড় গাঙগোল হচ্ছিল, রাজুর মনে হ'লো সেও একবার গিয়ে দেখে আসে ব্যাপারটা কি ? কিন্তু যেতে গিয়ে তার পা উঠলো না, জানালা দিয়ে দেখলে সরির স্বামী টল্‌তে টল্‌তে সরির বালা ছুঁগাছি খুলে

নিয়ে বার হ'য়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা বুঝতে এক মুহূর্ত দেবী হ'লোনা। নিজের অজ্ঞাতেই সে উচ্চারণ করলে—

“ভগবান !—”

ভগবানের বদলে সরির ছেলেটা চীৎকার ক'রে শুধু কঁদে উঠলো।

একঘুমের পরে যেন একটা ঝাঁকুনি খেয়ে রাজু চ'মকে উঠলো ;—মনে হ'লো সরি যেন কি ব'লতে এসেছিল, ফিরে গেল ;—দ্রুতপদে ছাদের দিকে অগ্রসর হতেই পাশ থেকে হঠাৎ যে তার হাত চেপে ধ'রলে তাকে দেখেই রাজুর চমকে উঠলো—সে সরি নয়, তার স্বামী ।—

রাজু হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা ক'রলে—

“শীগ'গির ছাড়ো ব'লছি—”

“—না ছাড়লেই বা কি করতে পারো তুমি ?”

সে হোঃ হোঃ ক'রে হেসে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজুর খাঁকা লেগে ছিটকে প'ড়ে চীৎকার উঠলো—

“খুন ক'রলে রে,—বাবারে !”

নিজের ঘর থেকে সরি বার হ'য়ে এলো,—রাজু সেখানে আড়ষ্টের মত দাঁড়িয়েছিল সেদিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে স্বামীর কাছে ছুটে গেল, বেদনারুদ্ধ স্বরে সেও চীৎকার ক'রে উঠলো—

“আমার একি হ'লো গো……

আবার পথ……

রাজু চলেছে, কোথায় যাবে ঠিক নাই, হাতে পয়সাও

নাই। পথ ডাকছে,—তাকে যেতেই হবে যে,—নাই বা জানলো পথের শেষ কোথায়।

চোখের সামনে অগণিত মনুষ্যশ্রোত, ট্রাম, বাস, মোটর, বাইক কত কি চ'লেছে,—সেও চ'লেছে—। একবার যেন কাণে এলো নন্দিনীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে সরি ডাকছে—

“ওরে ঘরে আয়,—ফিরে আয়।”

কিন্তু যাবার পথ যে সে ভুলে গেছে—তাই আর সেখানে ফিরবে না,—ফিরতে ইচ্ছে হ'লও না। সে চ'লছিল……পথ……পথ……কেবল পথ……দেড় দিনের উপবাসক্লিষ্ট দেহ আর চ'লতে পারছিল না, ঘুরতে ঘুরতে কোথায় এসেছে তাও সে জানতো না। হঠাৎ মাথা ধূরে উঠতেই সে সেইখানে ব'সে পড়লো ;—একবার সামনের জনসজ্জের দিকে তাকাবার চেষ্টা ক'রলে তাও পারলেনা। জ্ঞানহীন দেহখানা পথের ধূলায় লুটিয়ে পড়লো।

দিন তিনেক পরে যেদিন সরির চিঠি রাজুর মৃত্যু-খবর বহন করে তার ভাস্করের বাড়ী পৌছাল সেদিন আকাশে ঘনঘটা দেখে নন্দিনী তার দৃষ্ট ছেলেমেয়েকে ভয় দেখাচ্ছিল—

বাইরে বেরিওনা, একুণি ছোটমা এসে মারবে।

চিঠিখানা পড়েই নন্দিনী যেন পাথর হ'য়ে গেল, একফোটা চোখের জল তো দূরের কথা, একটা দীর্ঘশ্বাসও তার বুক কাঁপিয়ে বার হ'য়ে এলোনা। নির্দাকে, নিঃশব্দে শুধু চোখ মেলে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। যেন বলার ভাষা আজ তার ফুরিয়ে গেছে।

## বৈকালী ভোগ

শ্রীকালিদাস রায়

মম নিকুঞ্জের পুষ্পে পূজিয়াছি তোমায় বার বার,  
ফল শস্ত্রে রচিয়াছি তোমা লাগি ভোগ আয়োজন,  
তারাই পেয়েছে তোমা হইয়াছে প্রসাদী তোমার।  
আমি দূরে থেকে গেছি কলুষিত ছিলাম কেমন।  
পূজারী প্রসাদ পায় দেবতায় নিজে নাহি লভে।  
জীবনেরে অর্থ্য যদি করিতাম পাইতাম তবে।

একথা ভাবিনি যবে ফুলসাজি ছিল এ জীবন।  
ভাবিনি যবে তা ছিল সোপচার নৈবেদ্যের মত।  
তোমার প্রসাদী হতে আজি প্রভু করি নিবেদন।  
দাহতপ্ত এজীবন চক্করত ধূলি ঝঞ্ঝাহত।  
যৌবন বসন্ত অস্তে বৈশাখের বিকাল বেলায়।  
হউক বৈকালী ভোগ এ জীবন তব বেদিকায়।

# তাঁতিরাম

( পূর্বাহ্নবৃত্তি )

শ্রীআশালতা দেবী

নিরুদ্দিষ্ট রমেনের প্রতীকায় বিধবা অস্তিম নিখাস ত্যাগ করিলেন, দরিদ্রের দারিদ্র্যের অপরাধ যদি বা সম্ব হয়, তার তেজস্বিতার অপরাধ কখনও মার্জনা পায় না, ধনী জাতি গোত্রের স্বল্প নিক্তির পাল্লায় নিরুর মার তেজ নাকি তাঁর দৈগ্ধের অনুপাতে অনেক বেশী ছিল। স্বপ্নের ভিটায় অতি অনুরাগের অখ্যাতিও তাঁর কম ছিল না। তাই জীবনে যাদের ছায়া তাঁর ত্রিসীমানায় পড়েনি, জীবনান্তেও তারা সমস্তে তাঁর স্পর্শ হইতে আত্মরক্ষা করিল; তার উপর সেরা অপরাধ নিরুর মা ঘরে মরিয়াছিলেন। একরূপ অশাস্ত্রীয় মৃত্যু প্রায়-শিস্তের অপেক্ষা রাখে, কাজেই জাতিত্ব ও রক্তের দোহাইকে ছাপাইয়া উঠিল শাস্ত্রের দোহাই। গাঁয়ের একটি কোণে অতি সঙ্কোচে বাস করিত ঘর কয়েক ভাঁড়ারী কায়েত। তাঁতিরামের তব্বিরে তাহারাই আসিয়া বিধবার সংকারের ব্যবস্থা করিল, সেই দিন থেকে বালিকা নিরু শিশুভাই দুইটির হাত ধরিয়া তাঁতিরামের শুচিশূন্য কুটিরে যাইয়া গৃহস্থালী পাতিয়া বসিল। এতক্ষণে বাসুকির মাথা নড়িল। পাশের বাড়ীর জ্যেষ্ঠামশাই এর আভিজাত্য এ কদাচারের প্রশ্রয় দিতে নারাজ, পাড়ার মোড়লদের ডাকিয়া বৈঠক বসিল, তাঁতিরামের উদ্দেশে অনেক কটু কাটব্যও বণিত হইল, কিন্তু শ্রদ্ধা বেশী দূর গড়াইবার পূর্বে রমেন আসিয়া সকল গোলযোগের অবসান করিয়া দিল।

নিধিরামের জিন্মায় তাঁতিরাম যে পত্রখানি রাখিয়া আসিয়াছিল তাহারই স্বত্ব ধরিয়া রমেন অবশেষে সত্যই একদিন ফিরিল। নিজের অপরাধের ভারে তার মন প্রাণ এত পীড়িত ছিল যে পাড়া পড়ন্তীর অপরাধ বিচার করিবার ইচ্ছাও তাহার হইল না, কেবল তাঁতিরামের প্রতি একটা মুগ্ধ কৃতজ্ঞতায় সে অভিভূত হইয়া রহিল।

গ্রামের পঞ্চায়েৎ বসিয়াছে জ্যেষ্ঠামশাইএর চণ্ডীমণ্ডপে, ছোট বড় অনেক মুকুন্দি আসিয়া আসর জমকাইয়াছেন।

রমেন ও তাঁতিরামের তলব হইয়াছে। আসরের এককোণে গরুড় পক্ষীর ভঙ্গীতে হাত দুটি জোড় করিয়া বসিয়া আছে তাঁতিরাম, কিন্তু রমেনের সাক্ষাৎ নাই। যমের তলবের দিনে যারা তার মুমূর্ষু শাশুড়ীর যুগে এক ফোটা জল আগাইয়া দেয় নাই, তাহাদের তলবকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিব না, কিন্তু তাঁতিরাম রেহাই পাইবে কিসে? সাতপুরুষ ধরিয়া বাবুদের হুকুম তামিল করিয়া করিয়া কাওরা পাড়ার স্বতন্ত্র ইচ্ছা বলিয়া কিছু ছিল কিনা সন্দেহ। সেই পাড়ার লোক হইয়া তাঁতিরাম না আসিয়া পারিল না।

“না হয় মড়া দু’দিন বাসিই হ’ত, তুই ব্যাটা কাওরা কোন সাহসে এসে চৌধুরী গুপ্তির হওয়া মড়ার সাথী হ’তে চাস? বুকের পাটা—”

জ্যেষ্ঠামশাই এর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া অতি বিনীত কণ্ঠে তাঁতিরাম ত্রস্ত ব্যস্তে বলিয়া উঠিল “আজ্ঞে সে কি কথা কর্তা, গরীবকে অপরাধী কর্দেন না, আমরা চিরটাকাল আপনাদের শ্রমের কাঠ জুগিয়ে আসছি, হুকুম পাবার আগেই যে কাজ এতদিন ক’রে এসেছি, তার বেশী ত কিছু করিনি, দেবতা। পাড়ার লোকে যখন মা ঠাকরুণকে—।”

“রাখ তোর মা ঠাকরুণ” বলিয়া মিত্তির মশাই ফৌস করিয়া ফণা তুলিলেন। “ব্যাটার কথা শুন্লে পিস্তি জলে ওঠে, এদিকে বেশ মিষ্টি মিষ্টি আজ্ঞে, মশাই করা আছে দেখি, পেটে পেটেই যত বজ্জাতি! যখন দেখি সারা গায়ে পোষ্টাকিসের সিল মেরে পাড়া কুড়ুতে চলেছে, ভাবি কাওরাটার আত্মপক্ষের কথা!”

তাঁতিরামের বেদনা-বিবর্ণ মুখে কি একটা কথা উচ্চারণ হইয়াও হইতেছিল না এমন সময়ে ঝড়ের বেগে রমেন আসিয়া ঘটনার স্রোত একেবারে ফিরাইয়া দিল। রাগে সে ফুলিয়া আটুটা হইয়াছিল। আজ আর তাহাকে দেখিয়া সেই উচ্ছ্বল উৎপীড়িত যাত্রার আসামী বলিয়া চেনা যায় না।



তাঁতিরামের হাত ধরিয়া কৃতভাবে একটা ঝাঁকানি দিয়া সে ক্রোধ ও অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বলিল “রামদা তোমায় আমি অত করে বল্লুম এসোনা এখানে, শুনুলে কি আমার কথা ? কায়েতের মড়া বাসি হোক, পচুক, তাতে কিছু ষেয়ে আসবে না, সংস্কৃত পুঁথিতে তার ভাষ আছে, কিন্তু তার ত্রিসীমানায় মাড়াবার অধিকার কোনো কেতাবই তোমায় দেবে না, দায়নি।” জ্যোঠামশাই এর—দিকে ফিরিয়া রমেন উগ্রকণ্ঠে বলিয়া চলিল “আপনি যা চেয়েছিলেন, তাইত হ’লো জ্যোঠামশাই, তবে আর কেন আমাদের কাওরা-সংসর্গ থেকে উদ্ধার করার ভাণ কর্ছেন ! আমরা যদি ফিরে এসে ঐ ভিটেয় জুড়ে বসি, তা’ হ’লে টেনিসকোর্ট অসম্পূর্ণই থেকে যাবে যে—”

তাঁতিরাম এতক্ষণ বাণবিদ্ধ কুরঙ্গের মত বিবর্ণমুখে একবার বাবুদের আর একবার রমেনের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতেছিল। সর্কনাশ কোথায় গড়াইতেছে অগুমান

করিয়াই যেন হঠাৎ যস্থিং পাইল। মুখর রমেনকে রস্তু করিবার বৃথা চেষ্টায় সে তার গায় হাত বুলাইয়া কি বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু রমেনের কণ্ঠে আজ দুই সরস্বতীর আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁতিরামকে যত্নভাবে সরাইরা দিয়া সে উত্তেজিত সুরে বলিল “না দাদা আজ আমায় সবটা বলে যেতে দাও। হ্যাঁ, আমি কাওরাকেই বেছে নিলুম জ্যোঠামশাই। পর্কতের আড়ালে থাকবার একটা বড় বিপদ আছে, সেটা হচ্ছে পর্কতের গ্রাস। যে আওতায় থেকে মার গতি হ’ল কাওরার হাতে সে আওতা আর নয় ! ভিটে কিন্তু আমি অবৈদ মিঞার কাছে না বিকুই ত কি বলেছি ! রামদা আজ থেকে আমি কাওরা পাড়ায়ই একজন হলাম, তোমাদের আশ্রয়েই আমার সব চেয়ে নিরাপদ আওতা ! এই বলিয়া ভীত বিস্মিত তাঁতিরামের হাত ধরিয়া রমেন প্রস্থান করিল।”

শেষ

## ‘আমির’ ঋণাণী

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু

নই আমি ক্ষুদ্রত্বের বন্ধন কারণ।  
বাধা, ভয় ক্লেশ হয় মায়ায় বিকাশ লয়—  
বুদ্ধ নাইকো যেথা নাই আলোড়ন  
সম্পূর্ণ প্রশান্তিরূপে আমি নারায়ণ ॥  
প্রপঞ্চ-অতীত জ্ঞানে আমার আসন।  
রোগ শোক, দৈন্ত্যভরা অহমের ব্যথা-কারা  
ভাঙ্গে গড়ে আমারই সে ভেদমূঢ় মন—  
আমি নই, সে আমাতে\* তাইত এমন !!

আমি অজ্ঞ, আমি নিত্য ব্যক্ত সনাতন।  
‘বহুস্যামি’-ভাব ধ’রে কামনা পৃথক করে—  
বদ্ধ হয় নামরূপে জীব সে অধম  
এতই ভীষণ তার বুদ্ধির বিভ্রম ॥  
লীলারূপে আমি তার নশ্ব সহচর।  
কোথায় আমার ঘর—কেবা সে আপন পর ?  
বিশ্বযোগে আমি তাঁর ঋণিক পূজার  
তাঁরি দেওয়া অধিকারে মোর অধিকার ॥





থোলো দ্বার!—যুগের পর যুগ হিন্দু-মন্দিরের পাষাণ প্রাচীরে ধ্বনিত হইতেছিল অস্ত্রের করাঘাত। আজ সেই করাঘাত অস্ত্রের মন্দিরে গিয়া পৌঁছিয়াছে শুধু মহাত্মারই প্রেমের গুণে। তাই বহুদিনের রুদ্ধ দরজা আজ সহসা উন্মুক্ত! জাতির ভাগ্যবিধাতা করুন সে দ্বার যেন মুক্তই থাকিয়া যায় শান্ত কালের জন্ত! ভাবালু বলিয়া প্রাচীর অপবাদের অস্ত্র নাই। কিন্তু জীবনে যে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, ভাবরাজ্যেই হয় তার অধিবাস বা উদ্বোধন!

প্রেক্ষা!—সাতটি দিনে বিশ্বের চিত্রলোকে যে টেউ উঠিয়াছে তাহার দোলা সাত শতাব্দীতে থামিবে কিনা কে জানে! এমনি টেউ একদিন উঠিয়াছিল মগধে, জেরুসালেমে, নদীয়ায়। ছবিঘর রংমহলের দরজায় জড়ি সমান চলিয়াছে, পূজার বাজারের বিকিকিনিতে মন্দা পড়ে নাই—তবু অস্বীকার করিবার ঘো নাই যে দেশের আপামর সাধারণের অসাড় মনে একটা গভীর সাড়া জাগিয়াছে। আজ মহাত্মাজীর উপবাস ব্রতের উদ্‌যাপন হইল, আমাদের জীবনশ্রোত কাল হইতে আবার তেমনি পঙ্কিল আবর্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিতে থাকিবে, খাইয়া পরিয়া বঞ্চিত হইয়া ও বঞ্চিত করিয়া আবার আমাদের দিন কাটিতে থাকিবে! তবু ভবিষ্যৎবংশের কাছে আমাদের গর্ব করিয়া বলিবার অধিকার থাকিবে “আমরা চক্ষুচক্ষে

দেখিয়াছি সে দিবা দৃশ্য!” ভাক্তার আশ্বেদকরের জিদের আশঙ্কায় আমরা কণ্টকিত হইয়াছিলাম, মহাত্মার ষাট-মস্তকের কাছে তাঁহাকেও নির্দ্বিধ ভূজঙ্গের মত ফণা সংবরণ করিতে হইয়াছে, ধরা দিতে হইয়াছে—প্রেমে এমনই হয়!

সুভাষচন্দ্র।—সরকারী ও বেসরকারী চিকিৎসকগণ সুভাষচন্দ্রের রোগ নির্ণয়ে একই রায় দিয়াছেন। তিনি তিলে তিলে ক্ষয়রোগে ক্ষয় পাইতেছেন। কিন্তু শুধু রোগ-নির্ণয়েই কি সরকারের সব দায়িত্বের সমাপ্তি হইল! আজ কতদিন হইয়া গেল, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধে একটা সুব্যবস্থা হইল না! যে বিষম রোগে তিনি আক্রান্ত হইয়াছেন, আলো বাতাস সূর্যোদ্ভাপই তার একমাত্র ঔষধ! সুভাষচন্দ্র ধনীরা ছাড়া, আশৈশব আরাম বিরামে অভ্যস্ত, কয়েক বৎসর যাবৎ দীর্ঘ কারাবাসে যে তাঁহার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? স্বেচ্ছায় স্থখ সৌভাগ্য উচ্চপদ ত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল মাত্র একটা উচ্চভাব বা আদর্শের প্রেরণায় শতক দুঃখকে বরণ করেন তাঁহারা জগদ্বরেণ্য। কিন্তু ভাগ্যের এমনি বিড়ম্বনা যে, যুগে যুগে দেশে দেশে তাঁহাদেরই জীবন লইয়া যত নিষ্ঠুর খেলা চলিয়া আসিতেছে! আমরা আশা করি সরকার এখনও এ বিষয়ে ঔদাসীন্য ত্যাগ করিবেন; বাংলার নয়নের মণি সুভাষচন্দ্র—তাঁরই মহার্ঘ্য জীবন আজ সরকারের নিকট গচ্ছিত এই কথাটি যেন তাঁহারা বিস্মৃত না হন!





২য় বর্ষ

কা্তিক, ১৩৩৯

২য় সংখ্যা

## রবীন্দ্রনাথ—“নিরুদ্দেশ যাত্রায়”

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু

রবীন্দ্রনাথের চিত্তলোকের ইন্দ্রানী নিয়ন্ত্রী যিনি, তাঁহার স্বপ্নাভিমাণের শ্রেয়সী প্রেমসী যিনি তিনি শুধু নীরস গতিময়ী, কেবল চলশালিনী নহেন। তাঁহার চলন-বলনে আছে অপকৃপ সুখমা—তাঁহার আকার ইঙ্গিতে হাস্তে-লাস্তে রবীন্দ্রনাথের কাছে খুলিয়া ধরিয়াছে এক গঙ্ঘর্ক-জগতের কী একটা, ইন্দ্রজাল! কী এক স্পন্দ-পীড়িত দিব্য-আবেশে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়তন্ত্রী উন্মুগ্ন, সমবদ্ধ—তাঁহার লীলায়িত মুচ্ছনায় তাঁহার সমস্ত সত্তা স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মানসীকে সম্বোধন করিলেন “সুন্দরী”—“আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী।”

কিন্তু এ সৌন্দর্য্য ইহের অন্তত্যা-বস্ত্র নহ—এ “সুন্দরী”ও মূল রক্ত-মাংসের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌরিনী শরীরিনীও নয়।

সাধারণ মানুষ সৌন্দর্য্যকে যে চোখে, যে অর্থে দেখে, যে সার্থকতায় ফলাইয়া তুলে ইনি সৌন্দর্য্যের সে সহজলভ্য সহজসিদ্ধ পাত্রী বা আধেয়া নহেন; ইঁহার সৌন্দর্য্য তুরীয়ে, ইন্দ্রিয়াতীত অমৃতের রহস্য লাক্ষনায়। ইঁহার উদ্দেশ্য অর্থের অপকৃপ অভিব্যক্তনায় ধরণধারণের অপূর্ণ সৌকুন্যার্থে, গতি-প্রকৃতির বিপুল গাঙ্ঘ্যার্থে রবীন্দ্রনাথ অক্লান্ত। রবীন্দ্রনাথ সম্মানস্বলভ ভাব-বৈদম্ব্যে, বালকের কৌতুহলীতে প্রশ্ন করিতেছেন—

হোথায় কি আছে আশ্রয় তোমার

উর্ধ্বমুগ্ন সাগরের পার

মেঘচূড়িত অন্তর্গিরির

চরণ তলে ?

কি অপকৃপ দিব্য অভিযানের কণ-চিত্র রবীন্দ্রনাথের মানস পটেই না ফুটিয়া উঠিয়াছে !

তবে এখানে একটা কথা উঠে। নিকৃদ্দেশ পথগাড়ীর অজানিতের গানে, সুরে, টানে, যদিও রবীন্দ্রনাথের, সুন্দরের হাতের রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবন-পরিণাম সম্বন্ধে মাঝে মাঝে এত সংশয়, শঙ্কা, এত নিরাশ কাতরতা, এত জড়িয়া অস্বচ্ছতা কেন ? তাঁহার—

“সংশয়ময় ঘননীল নীর

কোনদিকে চেয়ে নাহি হেরি

তীর” প্রভৃতিতে—

যেন একটা অপূর্ণতার, একটা ব্যর্থতার, আঁধার কুহেলিকার, একটা করুণ রসই ফুটিয়া উঠিতেছে ; যেন বিশ্বের প্রাণের স্পন্দন, একটা “অসীম রোদন” ঘন নিবিড় হইয়া রবীন্দ্রনাথের হৃদয় তন্ত্রীকে তীক্ষ্ণ, বিক্ষুব্ধ, আলোড়িত করিয়া তুলিতেছে।

একথা, এভান, এ অবস্থায় প্রত্যেক ভাববাদী সুন্দর কাণ্ডাই নৃত্যাদিক ওতপোত ! জীবনের রৌদ্রদগ্ধ আঘাত-ক্লিষ্ট বেলাভূমির ছন্দহীন বিক্ষুব্ধতাকে আপনার না করিয়া, সহজ স্বচ্ছন্দ না করিয়া যাহারা তাহা এড়াইয়া চলিয়াছেন, উদাও হইয়া চলিয়াছেন শুধু হৃদয়ের, গভীরের ঐ অতলস্পর্শী হিলোল প্রবাহে, গুঞ্জনকলকাতে আপনাদের ভরাইয়া রাগিতে—ইহের দুর্ভোগ নগ্নতা, চলন-বলন, প্রস্থ-আকাজ্জাকে ঢাকিয়া রাগিতে চাহিয়াছেন অমৃতের প্রহেলিকার অবগুঠনে, জিজ্ঞাসু-মনের নোঝাপড়া কর্তব্যাকর্তব্যকে ইতি দিয়া, অস্পষ্ট উদাসীন, কুয়াশাচ্ছন্ন করিয়া রাগিয়াছেন অবাঙ্মনসো-গোচরের প্রহেলিকায়—তাঁহাদের প্রত্যেকেই অল্প বিস্তর এই দশাপন্ন ; প্রত্যেকেরই এই কথা—এই সমস্যা।

সুন্দরের এইরূপ রহস্যলাঞ্ছনায়, সেধানকার আলোয়ার সম্মোহনে রবীন্দ্রনাথও যে কিছু-না-কিছু বিভ্রত হন নাই, তাহা বোধ হয় না। বিশেষতঃ “নিকৃদ্দেশ যাত্রায়” তাঁহাকে দেখিলে সেই ধারণাটিতে আর সন্দেহের স্থান থাকে না। তবে হয়ত বা তাঁহার রূপদেব অন্তর-পুরুষের অপূর্ণ স্পর্শাশু-কুল্যে সে-ভাবটা ভাষা-স্বরের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলে নাই সাধারণ সৌন্দর্য পিপাসুর মত সন্দেহ অবিশ্বাস, নৈরাশ্য

নিকৃদ্দেশতার একটা অজ্ঞাতকের ছায়াচিত্র ; তাহাতে কাতরতা, কুহেলিকা, নিরাশ্বাস হয়ত মিলিবে, তবুও তাহাতে আছে চন্দনের ন্যায় শীতল, স্বাস্থ্য, বিগলিত প্রলেপ, তাহাতে আনিয়া দেয় দেবলোকেই জাগ উদাস উন্নয়ন।

তারি পরে ভাসে তরণী হিরণ

তারি পরে পড়ে সন্ধ্যাকিরণ

তারি মাঝে বসি এ নীরব হাসি...

সেইজন্য আবার এখানে দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ফলিরা উঠিয়াছে দুই পুরুষের দুইটা তত্ত্বের, দুইটা ভাবের অঙ্গাঙ্গী সমাবেশ ; একটা ‘নেতির’—অন্যটা ‘ইতির’ ; একটাতে তিনি গন্ধর্ব্বরূপে, অপরটাতে মাহুঘরূপে ; এই দুই লোকের, দুই পুরুষের, দুই ভাবের আলো আঁধার পড়িয়া মাঝখানে যে ঝিলিঝিলির সৃষ্টি হইয়াছে, যে বাঙ্মনস পুরুষ আত্মবিকাশ করিয়াছেন, তাহাই হইতেছে কবি রবীন্দ্রনাথের “নিকৃদ্দেশ যাত্রায়” আত্মস্বরূপ।

কবি রবীন্দ্রনাথ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের চিত্তপুরুষ রহস্যবাদী (mystic)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে স্বতন্ত্র একটা সত্তা আছে, যেটাকে আমরা মাহুঘ রবীন্দ্রনাথই বলিব, অর্থাৎ যেটা মানবীয় অপূর্ণতা, হিসাব নিকাশের অদীন—সেটা অনেকাংশে অজ্ঞতাবাদী (Agnostic)। কবি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি অন্তর্ভুক্তি সঙ্গাগ তীব্র হইয়াছে, ছুটিয়া ছলিয়াছে সৌন্দর্যের রহস্যগার মহন লুণ্ঠন করিতে—তুরীঘের, অবাঙ্মনসো-গোচরের কিম্বি কিম্বি স্পর্শে মুগ্ধ থাকিতে ; তাঁহার ভাষাতেই বলি :—

আপনার মাঝে আছে সে অনেক দূরে।

শান্ত মনের শুকগহনে ধ্যানের বীণার সুরে।

কিন্তু যেখানেই সৌন্দর্যের শিল্পরাণী সে দৃশ্য ঢাকা দিয়া অজ্ঞাত দৃশ্যাস্তরে প্রবেশ করিতেছেন—সেই নয়নাভিরাম পরিচিত স্বপ্নমাকে ভাবিয়া চুরিয়া স্বন্দরতর সুন্দরতর বস্তুর সৃষ্টি করিতেছেন, তাহার অঙ্গে অঙ্গে লীলায় প্রক্রিয়ায়, গতি প্রকৃতিতে ফুটিয়া উঠিতেছে যেন একটা অসুন্দরেরই কুসুম-করাল কালিগামণ্ডিত রুচী, অথবা তাহাতে বিরাজ করিতেছে শুধু নীরব গম্ভীর নিস্তব্ধতা—তখনই মাহুঘ রবীন্দ্রনাথ সেধান হইতে চোক কান ফিরাইয়াছেন। সে



রহস্য তত্ত্বের যবনিকা ভেদ করিতে, তাহাকে বুদ্ধিগম্য প্রোক্ষল করিতে কবি গুরাক্ষী হইয়া পড়িয়াছেন। সে রহস্য-তত্ত্বকে রহস্যের দ্বারাই রহস্যময় করিয়া রাখিতে তৃপ্তি বোধ করিয়াছেন। সেখানে যেন মানুষ রবীন্দ্রনাথের পশ্চাত্তাত্ত্ব অনড় নির্দিষ্ট জীবনভূমির সহজ নিশ্চিন্ততার ভিত্তি হাতছানি দিয়া তাঁহার কবিপ্রাণে শঙ্কা-কুলতার স্পন্দনই জাগাইয়া তুলিতেছে। তাঁহার সুন্দরতমের পরিপ্রেক্ষিতে (Perspective) জীবনের আলেখ্য, জীবনের সম্বন্ধ (compatibility) যেন আরও বিসদৃশ অল্পপযোগিতার দীর্ঘশ্বাস ধনিত করিয়া তুলিতেছে। তাই অভিমান অল্পযোগের সুরেই বলিয়াছেন—খাঁধার রজনী আসিবে এগনি মেলিয়া পাখা।

প্রাচ্য পাশ্চাত্যের নিকট আখ্যা পাইয়াছে—The mystic orient; সেই mysticism এর কবিত্ব ভাবুকতা রবীন্দ্রনাথের মতো লাভ করিয়াছে বোধহয় পরাকাষ্ঠা। আবার কবিত্বের যে ত্রিবিধ ধারায় ইউরোপের, ইউরোপ নয়, সমগ্ৰজগতের কবি প্রতিভা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মতো কেল্টিকের (celtic) সেই অনন্তের জ্যোতনা, সেই অশব্দীরিণীর মোহন মর্ছনা, সেই অনির্দেয় ইন্দ্রজাল, সেই অচিন্ত্য অপ্রকাশ দিব্য-চেতনা যেন তাহাদের তরতরে আবুঝে ভঙ্গিমা লইয়া কবি সম্রাটের অন্তর-লোকে স্তম্ভকতিত হইয়াছে সেখানে আছে গ্রীকদক্ষতার স্বচ্ছতা, স্পষ্টতা ত বটেই, অদিকঙ্ক বস্তুর ভাবের উপলব্ধিতে ততোদিক নির্মলতা, তদপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃততা,—অনাবিলতা। তাঁহার অসীমের অধিব্যঞ্জনাতে ঠিক যেন একখানি স্বচ্ছ দর্পণের সম্মুখে স্ফটিকের প্রতিবিম্বিত করিয়া ধরিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের “নিরুদ্দেশ যাত্রায়” এর কয়েক পংক্তিতে কবিত্বের গ্রীক প্রতিভার সেই দক্ষতা যেন আরও সমুজ্জল হইয়াছে। যথা :—

ওই যেখা জলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা  
ঝলিতেছে জল তরল অনল  
গড়িয়া পড়িছে অথর তল  
দিখ'খু যেন চল চল অঁখি

অশ্রুজলে ॥

অবশ্য কাব্যে গ্রীক প্রতিভা যে আদর্শ দিয়াছে তাহা খুব সম্ভবতঃ নয়—তাহা দৈন্য সঙ্কীর্ণতার দৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ। বস্তুকে ভাবকে সে করিয়াছে খুবই স্বচ্ছ স্পষ্ট, ধারণা কল্পনাকেও সে ছাটিয়া কাটিয়া স্থূলবুদ্ধির উপযোগী ও এত মর্ক্যভাবগম্য করিয়াছে যে, সাধারণ তরুণ-ভাবপ্রবণ চিত্ত তাহাতে হারাইয়া ফেলে তাহাদের সমস্ত তদুৎকৃষ্টত্ব প্রেরণা কল্পনা। যেমন মাথু আর্গল্ডে :—

The day in his hotness  
The strife with the Palm  
The night in her Silence  
The stars in thier Calm.

এখানে তাহারা পায় না সে অনির্দেয়তার প্রহেলিকা, ভাবের আটা, কল্পনা উপলব্ধির ঐশ্বর্য—একটা ইন্দ্রিয়াতীত স্বপ্নছায়া, কল্পনার একটা ইন্দ্রজাল একটা গগনবিসারী ইন্দ্রধনু। কবিত্বের সহজবোধ্য ভাবটিকে সম্মুখে পাইয়া সমুচ্চের সম্ভবনাকে তাহারা অনেক সময় উপেক্ষা করে।

গ্রীক প্রতিভার এই অসম্পূর্ণতা, এই দৈন্য অভাব ক্রটিটুকুরবীজ প্রতিভার মতো পাইয়াছে, বিকাশ করিয়াছে শুদ্ধতর, পূর্ণতর সমৃদ্ধতর রূপ। বস্তুকে, ভাব উপলব্ধিকে সুবোধ্য পরিচ্ছন্ন করিবার যে গ্রীক প্রেরণা, দক্ষতা তাহার সহিত আসিয়া মিলিয়াছে রবীন্দ্রনাথে কেল্টিকের সেই বিপুলের স্বপ্ন, ভূমার সেই আবছা হাতছানি—“চকল আলো আশার মত কাঁপিতে জলে।” অথবা—“আশার স্বপন ফলে কি হোথায় সোণার ফলে?” এই দুই প্রতিভার দুটি প্রেরণা দুটি উপযুক্ততা মিলিয়া মিশিয়া রবীন্দ্রনাথের আরও সুন্দরতর, আরও মহনীয় শুদ্ধতর সার্থকতর হইয়াছে; এবং সেটি আরও রহস্যময় আরও কোতুহলোদ্দীপক—বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিবার ঔৎসুক্যে নিবিড় উদ্‌গীর শূন্যতর মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি সুন্দরীর নীরব ইঙ্গিতে—

“যখন শুধাই ওগো বিদেশিনী  
তুমি হাস শুধু মধুর হাসিনী  
বুঝিতে না পারি, কি জানি কি আছে  
তোমার মনে?”

আবার কেবল সেই জগৎই আমরা দেখিতে পাই, কবি

শিবসুন্দরের শুভ্র বিগলিত বর্ণায় ভাসিতেই চাহিয়াছেন। তাহাতে যুক্ত হইতে চাহিয়াছেন, সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চলিয়াছেন আপন চিত্রলোকের মৃদুল হিল্লোল, আব্রেশর, ভাববাদকতার মধ্য দিয়া। জানিবার, বুঝিবার, ধরিবার তেমন চেষ্টা করেন নাই। তাহার অর্থকে, অবয়বকে তেমন দ্যুতিময় সজীব প্রাণবস্তুর করিয়া তুলেন নাই—যতখানি করিয়াছেন ছায়ায়, স্পন্দন, ভাবময়। বস্তুতঃ রবীন্দ্রপ্রভাব বস্তুতে রোমক প্রতিভার মত দেয় নাই দৃষ্টি কল্পনার, ভাব উপলব্ধির সে জলন্ত বজ্রসার স্বৈর্য্য,—মজের, প্রাণশক্তির সে বিদ্যুৎস্রোত উদ্দীপনা। সেটি দিয়াছে কাব্যে রোমক প্রতিভা।\* রোমক প্রতিভা শুধু ভাব আব্রেশর যাহা দেয় নাই, দিয়াছে ভাবসিদ্ধত্ব, দিয়াছে তপঃশক্তির তীব্রলেখা, দিয়াছে প্রাণের স্পর্শ, ওজস্ব, বীৰ্য্য—দিয়াছে স্বজন কারিগরী। রোমক আদর্শের এই প্রেরণা স্বামিজীর মধ্যেই পাইয়াছিল সমুচ্চ গ্রাম, বিকাশ করিয়াছিল শ্রেষ্ঠতর পরিণতি :—

শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি

জীবনে সত্য সার—

তরঙ্গ আকুল, ভব-ঘোরে, একতরি

করে পায়াপার ॥

অথবা—

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন

ভয় কি তোমার সাজে ?

দুঃখভার, এতব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার

প্রোতভূমি চিতামাঝে ॥

অথবা মিল্টনের—Fall'n chorub! to be weak is miserable.

কিন্তু “নিকৃদ্দেশ যাত্রায়” রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে যেন চিত্তিত সন্দ্বিহান হইয়া উঠিয়াছেন। অজানা অনিশ্চয়তার

সম্মুখীন্য তাঁহাকে যেন পীড়িতও করিতেছে। তিনি তাঁহার সৌন্দর্য্যরাণীর সাথে সাথে দিব্য-লৌলুপতা লইয়া উড়িয়া উড়িয়া চলিয়াছেন বটে, কিন্তু যখনই তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে নিজের দিকে, সেই খণ্ডিত দৃষ্টির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে ব্যক্তিগত অসুন্দর অসঙ্গতির চিত্র—জীবনজগতের পরিণাম-শীতলতার হতাশ-চিত্র। তখনই তাঁহার ভঙ্গ হইয়াছে চিরসুন্দরের একতানতা, স্বর-তাল কাটিয়া গিয়াছে, চলন-বলনে ধ্বনিত হইয়াছে কেমন যেন নিঃসহায়তার একটা উদাস ছন্দ।

সংশয়ময় ঘন-নীল নীর

কোনদিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর—

অথবা—আঁধার রজনী আসিবে এখনি

মেলিমা পাখা,

সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক

পড়িবে ঢাকা—

তাই বলিয়া এ চিত্ত-চাঞ্চল্য, এ বেস্বর ছন্দপতন রবীন্দ্রনাথের জীবনজগতের নশ্বরতা নৈরাশ্যমূলক প্রতি-ক্ষেপনা নয়, অথবা স্বকীয় অপদার্থতার আত্মবিবাক্তিও নয়। আবার ইহা দীনহীনতার আত্মবিলাসও না। এ-চিত্ত-চাঞ্চল্য অবশেষের—অশেষের মাঝে নিঃশেষ করিয়া বিশেষ হইয়া উঠার। এ বেস্বর সুরেরই নবজন্মের ক্রন্দন—কণ্ঠকে নীরব করিয়া স্বকুময় করিবার সুভাষ স্পন্দন—একটি নিম্নতং। এ পতন শুধু আপন ছন্দের নয়, অসুন্দরেরই পতন—“ধসে যাবার ভেসে যাবার ভাববারই আনন্দরে।” সর্বত্রই দেখি বাহ্যগত (Phenomenal) অস্বাচ্ছন্দ্য অশোভনতাকে সহজ সুন্দরের চিরন্তন রাগিনী লাস্যে বাধিয়া দিবার অশ্রান্ত অথচ অকুণ্ঠ স্বাকার—অস্যা মহিমান-মিতি বীত শোকঃ।”

\* রোমক প্রতিভার দ্বায় রবীন্দ্রপ্রতিভা যে পায় নাই কোন তাপস শক্তি, স্বৈর্য্য স্বদৃঢ়তা, সে কথা বলিবার আদৌ কোন অভিপ্রায় নাই এ প্রবন্ধের। বরং রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভার বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া আমরা দেখাইতে পারি তাহার বিপরীতটাই। দেখাইতে পারি যে, রোমক আদর্শ রবীন্দ্র প্রতিভায় বিকাশ করিয়াছে একটা নূতনতর সার্থকতা—ভিন্ন একটা রূপ। এ প্রবন্ধে আমরা দেখাইতেছি রবীন্দ্রনাথের অস্ত্র দুই একটা দিক। বিশেষভাবে যে সুরটি ভঙ্গীটি ফুটিয়া উঠিয়াছে “নিকৃদ্দেশ যাত্রায়”।

রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছেন বিরাটের বিরাট বিপুলের  
বিপুলত, স্বপ্নের স্বপ্নতটক ; চাহিয়াছেন অনন্তের আনন্দ  
টুকু—বস্তুর নিবিড় রহস্যটুকু । সৃষ্টির যে সাক্ষ ইন্দ্রজাল,  
যে অব্যক্ত প্রহেলিকা তাহার মধ্যে রাখিতে চাহিয়াছেন তিনি  
একতানতা, তাহাতে তাঁহার চিত্তচকোর বিভোর । পাছে  
সে একতানতা, সে বিভোরতা, সে প্রহেলিকা ইন্দ্রজাল  
কাটিয়া যায়, সেই জন্ত তাহাদের পূর্বাভবের দিকে তিনি  
চোখ মেলিয়া তাকান নাই ; হয়ত বা দৃষ্টির আপাদমস্তক  
তাকাইবার সে রূঢ়স্পর্শে সে প্রশান্তি, সে সুসঙ্গতি ক্ষুণ্ণ নষ্ট  
হইয়া যায় ।

এইরূপ অতিমাত্র সংরক্ষণতার ফলে তাঁহার অনুভূতিতে  
সুটিয়া উঠিয়াছে অতি-সাবধানতা, একটা অতি সন্দর্পণ  
সতর্কতা । সেখানে সত্য স্বপ্রতিষ্ঠ সাবলীল ভঙ্গী না লইয়া  
অনেক স্থলেই লইয়াছে যেন একটা বিড়ম্বনার মশক রাগিণী  
বিরহের এলায়িত অবোরা—

বিকল হৃদয় বিবশ শরীর  
ডাকিয়া তোমারে কহিল অদীর—  
“কোথা আছ ওগো করহ পরশ  
নিকটে আসি ।”

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা, রবীন্দ্রনাথের দুর্গতদের  
দুর্গতি নিবারণের মধ্যেও দেখিতে পাই সৌন্দর্য্যবোধের  
অনুরূপ ধর্ম । পরাদীনতার যে স্বলরূপ, যে বাস্তবতা—  
মহুশ্বের যে অবমাননা লাজনা, দারিদ্র্যের মধ্যেও যে  
নিঃসহায়তা বুদ্ধি, উদরের তাড়না তাহার জন্ত ঠিক তাঁহার  
অনুভূতি তেমন পীড়িত হয় নাই ; হঠলে হয়ত তিনি  
মুহূর্তের জন্যও মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া আবেগপূর্ণ বক্তৃতা  
দিতেন, কিম্বা ভিক্ষা পাত্র হস্তে ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিয়া  
বেড়াইতেন, অথবা সঙ্কট-নিবারণী সজ্ব করিয়া চরকায় সূতা

কাটিতে বসিতেন । কিন্তু তাহার কোনটীও তিনি করেন  
নাই । তাঁহার স্বাদেশিকতা, তাঁহার দুর্গতদের দারিদ্র্য-  
পীড়া উদ্ভূত সজাগ হইয়াছে সেইখানে যেখানে তিনি  
পরাদীনতা দাসত্বের মধ্যে অনুভব করিয়াছেন মহুশ্বের  
ঐক্যের শ্রীহীনতা, দারিদ্র্যের মধ্যেও অস্বন্দরতা,—  
কদম্বতা । তিনি জানেন দাসত্ব, অস্বচ্ছন্দ্য অস্বচ্ছন্দ্যের  
কোন নিজস্ব কর্তব্য বা সার্থকতা নাই যদি তাহা স্বন্দরের  
ক্রমে গড়িয়া না উঠে । সেই জন্য বস্তুতঃ অপেক্ষা তাব-  
ত্বের উপরই জোর বেশী দিয়াছেন । তাহার সুর তাল  
কাটিবার শক্তিও তাঁহার খুব তীব্র—সেইজন্য অতি-সতর্ক ।

পরাদীনতায়, জীবনের অপরিসরতা গতানুগতিকতায়  
ভারতবাসীর মনপ্রাণ, উৎসাহ উত্তম গুমট—মৃতকল্প । শুধু  
ভারতবাসী বলিব কেন, সমগ্র ইউরোপও কলকারখানা, বস্ত্র  
যান্ত্রিকতার রুঢ়তায় আইটাই ; রবীন্দ্রনাথ তাহাতে আনিয়া  
দিলেন ফাকুনের পরশ—লোকহরের বার্তা—নূতন আশা  
ভরসার সজীবনী আবহাওয়া । পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রনাথ যে  
এতটা সমাদর পাইলেন তাহার একমাত্র কারণই ইহা—

দেশালে সমুখে প্রসারিয়া কর  
পশ্চিম পানে অসীম সাগর,  
চঞ্চল আলো আশার মত  
কাঁপিছে ভলে ।

যে স্বর, যে রাগিণী তিনি ধরিয়াছেন তাহা অশ্রুতের—  
গ্রীকদের সেই Music of the Spheresএর । কীটসের  
ভাষায় বলিতে গেলে হয়—But those unheard are  
sweeter”. যে ভাষা তিনি পাইয়াছেন তাহা অপূর্ণ,  
অনুপম—অনবদ্য ; আপন গোরবেই সে যেন লতাইয়া  
লতাইয়া বিলাইয়া বিলাইয়া মণ্ডনের উপর মণ্ডন দিয়া সহজ  
স্বচ্ছন্দ গতিতে উড়িয়া চলিতেছে ।



## বনাম

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মল্লিক

কথায় বলে ঘরকথা... !

এর ঝগড়া, হাঙ্গামা, আপদ বালাই অনেক !

সেদিন বুলু তার স্বামীর ওপর হঠাৎ রাগ করে চির প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী নির্জন কারাবাসের ব্যবস্থা করতে যাবে, এমন সময় কি গনে করে মত বদলিয়ে সে স্থিরভাবে শোফারকে বললে—“গাড়ী নিয়ে বিনয় বাবুদের বাড়ী যান, আর আমি একটা চিঠি দিচ্ছি—সেটা তাঁর বড় মেয়েকে দেবেন—তিনি এই গাড়ীতেই চলে আসবেন, বুঝেছেন ?”

ইনি হচ্ছেন আমাদের বুলুর রাগুদি ! বিনয় বাবুর বড় মেয়ে—বি, এ পাশ করে বসে আছেন। বুলু তার একান্ত অমুগত ও অমুরক্ত ! বুলুর মতে—রাগুদি জানেনা বা বলতে পারে না—এমন বিষয়ই নেই ; ঐ তো সেবার মিনতির স্বামী চিঠি দিচ্ছিলো না, রাগুদিই পরামর্শ দিয়ে সব ঠিক করে দিল। ঐ তো রাগুদির ছোট বোন মিলু—কে এক তরুণ কবি নলিন না পুলিন—তাকে দেখবার আর আলাপ করবার জন্য একেবারে হস্তদস্ত বলেই হয়—রাগুদিই ত’ ইত্যাদি ইত্যাদি !

এ হেন রাগুদির জন্ম যখন বুলু আজ বিশেষ পত্রসহ ও মোটরসহ ‘কল্’ পাঠালো তখনই ব্যাপারটা যে একটু গড়িয়েছে সেটা বুঝতে বাকী রইল না।

একটা কথা বলতে ভুলেছি। আগাদের এই রাগুদির কথা প্রসঙ্গে এটুকুও বলে রাখা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না, যে, ‘চোখে দেখলাম আর প্রেমে পড়লাম’ যাকে বলে ‘Love at’—এসব রাগুদি মানেন না। তিনি বলেন—‘প্রেমের গতি হবে গুরুপক্ষের চাঁদের মত। প্রতিপদের দিন থেকে কলায় কলায় বেড়ে ক্রমে পূর্ণিমায় পরিণতি প্রাপ্ত হবে। মাঝে মাঝে মেঘলা রাত হয়—হোক, কিছু আসে যায় না। কিন্তু ঐ মিলুর মতো—দেখলুম না, মিললুম না, জানলুম না, চিনলুম না—গোটা কতক কবিতা

পড়েই—বাস্ ! নাক উঁচু আর ভুরু ছোট ক’রে মেঘদূত হাতে আরাম কেশরায় বসেপড়লুম ‘ওডিকলোন’ আর ‘স্মেলিংসন্টের’ শিশি সঙ্গে নিয়ে,—আর কেউ কাছে এলেই, ‘খাবোনা যাও, কিছু ভালো লাগছে না,—খিদে নেই—এখন ঘুমবনা ঘুম আসছে না—না, বলছি অশুধ করেনি ইত্যাদি,—এসব রাগুদির দ্বারা হবে না বাপু।

রবীন্দ্র রায়, এম, বি,—মেডিক্যাল কলেজের হাউজ ফিজিশিয়ান, বয়স—সাতাশ কি আটাশ। ভালো খেলোয়াড়, নার্সদের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। এ হেন লোভনীয় ও বরনীয় সুপাত্রটি আপাততঃ আমাদের রাগুদির তথাকথিত “প্রতিপদ—পূর্ণিমা—পরিণয়—প্রগতির”—মঞ্চের ! রাগুদি বলেন—“মিঃ রায় এখনো ছেলেমানুষ ! তত স্টাট-নয়, ই্যা—তবে একেবারে ‘হোপলেসও নয়, তাইতো আমি এখনো”—ইত্যাদি !

\* \* \* \*

রাগুদি এলেন বুলুদের বাড়ীতে—।

বুলু—আঠারো উনিশ বছরের রূপসি ম্যাট্রিক-পাশ করা গাইয়ে তরুণী,—স্বধীরের নব-পরিণীতা। স্বধীর বহু,—বি, এ, আপাততঃ কোন সলিসিটরের সহকারী, ভবিষ্যৎ—রোদে-পড়ে-থাকা-অভ্রের মতোই উজ্জল।

বুলু ব্যস্ততা সহকারে রাগুদিকে চা ইত্যাদি খাইয়ে তার শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো। রাগুদি বললেন—“ব্যাপার কি বলতো বুলু ? এত জরুরী ‘কল্’ করেছিস কেন ?”

বুলু মুখখানা আধাঢ়ের আকাশ করে তুলে তার ‘কেশ’ বিবৃত করতে শুরু করল। রাগুদি বিচকণ চিকিৎসকের মত গম্ভীর ভাবে শেষ পর্যন্ত শুনে কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হলেন। তারপর নিরিবিলি পরামর্শ চলল অনেকক্ষণ ! মাঝে মাঝে দু’চারটি যা’ দরকারী কথা হ’ল, তা’ এই “তোকে মরতে হবে—” !



“—এ্যা—” ?

“মরতে পারবি ? মানে—এই—যখন সুধীর বাবু বিকেলে ঘরে আসেন—সেই সময়। মাথা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা দিয়ে বিছানায় পড়ে উঃ, আঃ করবি, মাথার কাছে টেবিলে একটা আধখোলা মফিয়ার শিশি আর একটা মোটা খোলা চিঠি সুধীর বাবুর নামে—পড়ে থাকবে। চিঠিটা কি রকম হবে—তা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিস ? এই যেমন—তোমার দোষ দিই না, দোষ আমার মন্দ অদৃষ্টের ! বিধাতা কপালে আমার স্বামী সৌভাগ্য লেখেননি—কি করব’ ! আমার মৃত্যুই ভালো,—স্বামীর ওপর সন্দেহ রেখে আমি বাঁচতে চাইনে। যখন স্বামীর প্রেমটো হারিয়েছি, তখন আর—, এই সব থাকবে আর কি, বুকে ছিস্—পারবি ?”

বুলু সাগ্রহে ঘাড় নাড়িলে !

সেইদিন—অর্থাৎ—বোদিন মধ্যাহ্নে বুলু রাণুদিকে ডেকে পাঠায়, সেই দিন সুধীর যদিও অফিসে যাবার নাম করেই মোটর বাইকে চড়ে ঘর থেকে বার হ’ল, সে সোজা গেল কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের ইনডোরওয়ার্ডের হাউস ফিজিশিয়ান রবিদার কাছে। রবিদা তখন রোগীদের ‘ডায়েট-কার্ড’ নিয়ে অবস্থাভাবী একটু আদটু অদলবদল করছেন—এমন সময়ে সুধীর চোখ মুখ লাল করে ওয়ার্ডের মধ্যে এসে হাজির। একবার এদিক ওদিক চেয়ে সোজা রবিদার কাছে গিয়ে কাদের ওপর আস্তে আস্তে চাপড় মেরে বললে—“তোমার সঙ্গে বিশেষ দরকার আছে রবিদা, একবার বাইরে এসো—শীগগীর।”

রবিদা সুধীরকে ভালো করেই জানেন : একটু তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিয়ে তিনি বাইরে এলেন। সুধীর অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে বললে—

“তখনই বলেছিলাম তোমায়, তুমি শুনলে না—নিজে ঘটকালি করে আমার বে’ দিলে,—আর এখন এইসব গোলমাল, অশান্তি, একেবারে প্রত্যহ আমার অসহ্য ! তোমার কথায় বে’ করে—নাঃ—আমি নিকর দেশ হবো !”

হেসে রবিদা বল্লেন—“ওরে ঠাণ্ড হ’। ব্যাপারটা কি

বল দেখি, বুলু কি মাসীর বাড়ী চলে গ্যাচে ? দাম্পত্য কলহটা বাধল কি নিয়ে ?”

“বুলু আমাকে সন্দেহ করে !”

“সন্দেহ করে ? কিসের ?”

“বুলু বলে—‘আমি ওকে আর ভালবাসিনা, বাইরে বেশী সময় কাটাই, সব কথার ঠিক মতো জবাব দিই না— and what not ! আর এদিকে বোধ হয় রাণুদীর সঙ্গে এতক্ষণ কন্দী ফিকির আঁটা শুরু হয়েছে...”

“বটে !”—রাণুদীর নামে রবিদার মুখে একটু তরল হাসি চিক্‌মকিয়ে উঠলো। খানিক ভেবে বলে উঠল “ধাবড়াও মৎ...ওঝারও ওঝা আছে বন্ধু...”

বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটা...সুধীরের অফিস থেকে ফিরবার সময় হয়েছে, রাণুদি গম্ভীরভাবে একটি সোফায় গা এলিয়ে বিশ্রাম ক’চ্ছেন। বুলু বিছানায় চাদর গায়ে দিয়ে প্রস্তুত হয়ে পড়ে আছে। তার মাথার কাছে সুধীরের নামে থামে মোড়া একটা মোটা চিঠি খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। টেবিলে একটা খালি শিশি গড়াচ্ছে...গায়ের লেবেলে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা ‘পয়সন্’...ওডিকলনের শিশিটাও তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে...টেবল-ফ্যানটা খুব জোরে ঘুরছে। বলতে গেলে আয়োজন একরকম সর্বস্বীন ! এখন সুধীর এলেই হয়। মোটর বাইকের শব্দ কাণে এলেই—রাণুদীর শিক্কা মতো বুলু নাক পর্যন্ত চাদরটা টেনে দেবে।...চোখ মুখ বিকৃত করে—“উঃ—গেলুম—বাবারে—আঃ—মাগো—” এই সব শুরু করে দেবে... রাণুদি ঘন ঘন মাথায় জলপটি দেবেন। তার পর সুধীর ঘরে ঢুকলেই রাণুদীর কাজ শেষ...বুলুর কাজ আরম্ভ। বুলুর হুঁচোখে হুঁফোটা ‘মিসারিং’ দেওয়াই আছে—অশ্রুধারার জল বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

নিস্কর নীরব ঘরটির মধ্যে একমাত্র টাইম পিস্টাইট জীবনের সাদা দিচ্ছে। রাণুদি ধীরে ধীরে নড়ে বসলেন। তার পর ঘড়ির দিকে চেয়ে বল্লেন, “এবার বোধ হয় বেচারী আসবে...বুলু, সব ঠিক ঠিক মনে আছে তো ! সহজে কিছুতেই যেন গলিস্নে.....ওকে কাদাবি আগে .....তারপর—যখন দেখবি একেবারে হাঁটু গেড়ে

কাকুতি মিনতি কচ্ছে—তখন আস্তে আস্তে সুর বদলাবি।”

বুলু চাদরটা একটু নাগিয়ে বললে—“রোজ তো ও এই সময়েই আসে, আজ দেরী হচ্ছে কেন? অফিস ফেরোং সে তো কোথাও যায় না!”

“হতে পারে পথে কারোর সঙ্গে দেখা হয়েছে—কি—এখনও অফিসেই আছে, ওদের যা কাজ।”

আরও মিনিট পনেরো কাটলো—এই ভাবে নিঃশব্দে ...। বুলু চাদর-ঢাকা অবস্থায় পড়ে থেকে ঘামতে লাগলো...রাগুদি ক্রমেই সময় ঘনিয়ে আসছে মনে করে ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলেন...ছ’টা বাজলো...

এই রকম নীরবে আরও মিনিট তিনেক যেতে না যেতেই পাশের ঘরে টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো বুলু-বলন শব্দ ক’রে...

বুলু নিরাশ হয়ে বলে উঠলো—“দেখলে রাগুদি, আমি বলেছিলুম? নিশ্চয়ই কোন বন্ধুর সঙ্গে বায়স্কোপ দেখতে গ্যাছে—বলতে চায় বাড়ী ফিরতে রাত হবে—যাওতো ধরোগে রিসিভারটা—”

রাগুদি একটু পরে গম্ভীরভাবে ফিরে এসে বললেন—“বুলু, তোকে ডাকছে—তুই আয়,—আমায় বলতে চায় না”—বুলু এদিক ওদিক তাকিয়ে সন্দর্পণে উঠে রাগুদির সঙ্গে গ্যালো পাশের ঘরে...

\*

\*

নিতান্ত অসহায় ভাবে রাগুদির মুখের দিকে চোখ তুলে বুলু আকুল হয়ে কঁদে উঠলো—“কি হবে রাগুদি—”

রাগুদি একটু গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন—“চল, আগে সেখানে গিয়ে দেখি—উনিতো বললেন তেমন ভয়ের কিছু নেই—”

বাধা দিয়ে বুলু কঁদতে কঁদতে বললে—“আমি জানি রাগুদি আমি জানি, আমাকে ভুলিও না,—ডাক্তাররা ঐ রকমই বলে—”

“আচ্ছা নে, তুই সব জানিস,—এখন চট্ট করে যা—কাগজটা ব’দলে মে’ আগে—”

মেডিকেল কলেজের প্রাঙ্গণে গাড়ী ঢুকতেই বুলু রাগুদির হাতে নাড়া দিয়ে বলে উঠলো কঁদ কঁদ করে—“ঐ ঠাখো রাগুদি—”

“কিরে?” বলে রাগুদি সেই দিকে চোখ ফিরাতেই দেখলেন—একটা ভান্সা-চোরা মোটর বাইক প’ড়ে আছে।

কোন রকমে স্থির হয়ে রাগুদি বললেন—“অতটা উতলা হসনে বুলু—গাড়ী ভেঙ্গে গ্যাছে বলেই হয়তো সে খুব সিরিয়াসলি উন্ডেড্ নাও হাতে পারে—”

...সিঁড়ির কাছেই বরিদা অত্যন্ত গম্ভীর মুখে এসে দেখা দিলেন। তাঁর মুখচোখের ভাব দেখেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল’ যে ব্যাপার বিশেষ গুরুতর!

বুলু আর রাগুদি কাছে আসতেই তিনি বলে উঠলেন—“নমস্কার মিস চ্যাটার্জি—এই যে বুলু এসেছিস, এইদিকে আয়।”

“সেজদা—অ্যাকসিডেন্টটা কখন হয়েছিলো?”

“প্রায় সাড়ে-পাঁচটা আনাজ—বোধ হয় অফিস থেকে ফেরবার পথে। রাস্তার লোক আর বাস-ড্রাইভারের কথা থেকে বোঝা যায় যে স্থধীর খুব ‘কেয়ারলেশ’ বাইক চালিয়ে রং সাইড্ দিয়ে আসছিল,—এই যে ছ’নম্বর ক্যাবিন, দাঁড়া একটু, আমি আগে দেখে আসি—”

একটু পরে বরিদা ক্যাবিনের বাইরে এসে স্নানমুখে বললেন—“এখনও ‘সেন্সুলেশ’! বুলু, ভয় পাবার বিশেষ কিছু নেই—বাচবে তবে একটা পা বোধ হয় অ্যাসপার্টিটে করে ফেলতে হবে”—বুলুর বকের মধ্যে কে যেন একটা মোচড় দিলো! ভয়ে, দুঃখে তার মুখখানি একেবারে বিবর্ণ হ’য়ে গেল!

“—কি করি বুলু—ওর অদৃষ্টে ছিলো, এতে দুঃখ করা উচিত নয়,—”

রাগুদি জিজ্ঞাসা করলেন—“আমরা কি ভিতরে আসতে পারি?”

তিনি বললেন—“ই্যা, যদি আপনারা রোগীর পক্ষে কোন রকম উত্তেজনার সৃষ্টি না করেন—তা হলে—”

স্থধীর অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে! মাথার প্রায় সমস্তটাই ব্যাণ্ডেজ ঢাকা, মাঝ একটা চোখ পর্যন্ত! তান

পাশের পাঞ্জরের কাছে একটা কাঠ দিয়ে শক্ত ক'রে বাঁধা! ষা পায়ের হাঁটুর ব্যাণ্ডেজের অবস্থা দেখে স্পষ্টই বোকা যায় যে সেখানটায় আর বিশেষ কিছুই নেই। ঘরের চারদিকে দুটি নার্শ, তিনটি ছাত্র আর গোটা দুই হাউজ ফিজিশিয়ান নিঃশব্দে চলাফেরা করছেন।

বুলুর মাথা ঘুরে উঠলো। সে প্রায় হতচেতন হ'য়ে "রাগুদির গায়ে এলিয়ে পড়ল"।

রাগুদি বুলুকে নিয়ে বাইরে এলেন। বুলু নিতান্ত ছেলেমানুষের মত কঁদে উঠলো। রবিদা ও একটি নার্শ বাইরে এলেন। বুলুকে সেই নার্শের তত্ত্বাবধানে দিয়ে রাগুদি বললেন—

"দেখুন, আমাদের একটা বসবার জায়গা পাওয়া যায় নাকি? বুলুকে নিয়ে আমি ও ঘরে বসতে মোটেই সাহস করছি নে।"

রবিদা কোন উত্তর না দিয়ে আবার ক্যাবিনে ঢুকলেন। একটু পরে বাইরে এসে বললেন "শীঘ্র জ্ঞান ফেরবার কোন আশা নেই, তবে যদি ফেরে, তাহলে জানবো যে এযাত্রা ও বেঁচে গ্যালো। ততক্ষণ—আচ্ছা আশুন আমার সঙ্গে—"

বুলু এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হয়ে বললে "সেজদা, তোমরা যাও আমি এইখানে নার্শের সঙ্গেই থাকবো।"

'ভিজিটারস্‌ রুম' এসেই রাগুদি বললেন—

"মিষ্টার রায় সত্যিই কি স্বধীর বাবুর পা কেটে ফেলা দরকার হবে? কোন উপায়েই কি ওটা এড়ানো যায় না—?"

রবিদা প্রবীন চিকিৎসকের মত গাঙ্গীধীর সহিত বললেন "আমাদের মেডিক্যাল সায়েন্স অফিসারে এতক্ষণ ওটা সেরে ফেলাই উচিত ছিলো, কিন্তু কেবল বুলুর মুগ চেয়েই এতক্ষণ আমি দেরী করেছি—ওরা বোধ হয় এতক্ষণ সে সমস্ত প্রিপারেশন্‌ শেষ ক'রেছে—"

রাগুদি আর থাকতে না পেরে টেবিলের ওপর রবিদা'র হাতটি সজোরে চেপে ধরে বললেন—কম্পিত স্বরে "রবিবাবু আপনাদের সমস্ত বুদ্ধি—সমস্ত শিক্ষা দিয়েও যদি স্বধীর বাবুকে কোন রকমে ওটা থেকে বাঁচাতে পারেন ত করুন, বন্ধুভাবে এ কেসটা আপনি ট্রিট করুন। নৈলে বুলু বেচারীর

অবস্থা অসহ্য হবে! আর এদিকে আমি কিনা ওকে স্বধীর বাবুর বিরুদ্ধে—" রাগুদি হঠাৎ নীরব হ'লেন।

রবিদা বললেন,—“আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে বুলু আমার পিশতুতো বোন, বোনের জন্তু কি কর্ত্তে হবে না হবে সে সম্বন্ধে উপদেশ নেওয়া আমি কারোর কাছ থেকেই দরকার মনে করি না,—তাছাড়া স্বধীরও আমার মন্ত বন্ধু, সেদিক থেকেও আমার কর্ত্তব্য আমি ভাল বুঝি—!”

৫

রাত্রি প্রায় তিনটের সময়ে রবিদা ক্যাবিনের বাইরে এসে খবর দিলেন—“স্বধীরের জ্ঞান ফিরেছে, বুলু—কথা বলতে চাস তো আয়, কিন্তু খবদার, কান্নাকাটি করিসনে যেন লক্ষ্মী দিদি—।”

“না সেজদা, কান্দবো না—” বলে রবিদার সঙ্গে বুলু ক্যাবিনে ঢুকলো। স্বধীর বৃহৎ দৃষ্টি মেলে কাতরভাবে বুলুর দিকে তাকালে! বুলুর কচি বুকখানি স্বধীরের সমবেদনায় হাহাকার কর্ত্তে লাগলো! প্রাণপণে নিজেকে সযত্ন ক'রে স্বধীরের পায়ের কাছে এসে দাঁড়ালো। স্বধীর অন্ন হাত নেড়ে বুলুকে আরও কাছে আসতে ইসারা করল। বুলু আরো কাছে সরে এসে একবার রবিদার মুখের দিকে চাইলো। রবিদা দ্রুত পেরে অল্প একটি হাউজ ফিজিশিয়ানের সঙ্গে নিম্নস্বরে দু' একটা কথা বলে আবার একবার স্বধীরের পালস দেখে বাইরে গেলেন।

স্বধীর ক্ষীণ দুর্বল স্বরে বলল—“এসেছো বুলু? আমি মনে করেছিলুম তুমি মাসীমার কাছে কালই চলে গ্যাছো!”

অশ্রুধার স্বরে বুলু বললে—“না বাইনি, ঘরেই ছিলুম—!” বেদনা-করুণ কর্ত্তে স্বধীর থেমে থেমে বললে...

“বিদায় বুলু...চললুম আমি...”

বুলু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কঁদে উঠলো—“কোথায় যাবে তুমি?”

“যে—দেশের রাতে কখনো চাঁদ ওঠে না, যেখানে প্রিয়া নেই,—সেই দেশে!...আমার মৃত্যুর পর তুমি স্বধী হ'য়ো.....ওঃ, বুলু, তুমি কি কষ্টটাই না পেলে আমার বিষে ক'রে—!”

বুলু তার স্বামীর একটা হাত ধরে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে

বললে—“কেন ওই সব বলে আমার কঁাদাচ্ছ? আমি কি করেছি?”

সুধীর নিরাশার মলিন হাসি হেসে বললে—“তুমি করোনি কিছুই বলু—মানিক আমার, তোমার কোন দোষই নেই। আমার নিয়ে সুখী হবে, এ বোধ হয় বিধাতার ইচ্ছা নয়। তা না হ’লে তোমার বিড়ালটাই বা কেন আমার গালে কপালে আঁচড়ে দেবে, আর তাকে জানালা গলিয়ে পাশের ছাতে ফেলে দেওয়ার জন্য তুমিই বা কেন সারারাত আমার সঙ্গে কথা বন্ধ ক’রে দেবে? দোষ কারোরই নয়। বিধি বলে একটা কিছু আছে বলু, এ তারই বিধান! উঃ, কত সাধের স্বপ্ন আমার নাতাসে মিলিয়ে গ্যালো, বলু—!”

বলু চোখে আঁচল চাপা দিয়ে মিনতি-করণ-কণ্ঠে বললে “তুমি আমার ক্ষমা কর্তে পারবে না তা হলে?... আমি যদি তোমার কাছে হাতযোড় ক’রে ক্ষমা চাই...?” বলতে বলতে বলু সত্য সত্যি তার হাত দুটি জোড় করে দাঁড়ালো, —অপরাধীর মত, সজল নয়নে শত ব্যাকুল প্রার্থনা ও আবেদনের আভাষ মাখিয়ে...

...এর পরেও সুধীরের সংযমের বাঁধ আর বাগ মানলো না। তড়াক ক’রে রোগশয্যা থেকে লাফিয়ে উঠে বিন্ময়বিমূঢ়া বলুকে বাহবেষ্টনে বন্দী ক’রে নাটকীয় ভঙ্গীতে বলে উঠলো—“প্রার্থনা মঞ্জুর তব অয়ি প্রাণেশ্বরী—!”

ক্যাবিনের বাইরে এসে রবিদা রাগুদিকে বললেন—

“আসুন মিস চার্টার্ডজ, আপনাকে পৌছে দিয়ে যাই— ওরা আলাদাই আসুক—”

একটা ট্যাক্সির মধ্যে রাগুদিকে বসিয়ে নিজেও গম্ভীরভাবে উঠে পাশে বসলেন। ট্যাক্সি মেডিক্যাল কলেজের গেট পার হতেই রাগুদি একটি সবিস্ময় প্রশ্ন করলেন, “সুধীর বাবু কি তাহলে সত্যিই ম্যাক্সিমডেন্ট করেন নি?”

“নিশ্চয়ই না।”

“তবে—?”

দৃষ্ট ছেলের মতো মুচুকে হেসে রবিদা বললেন—

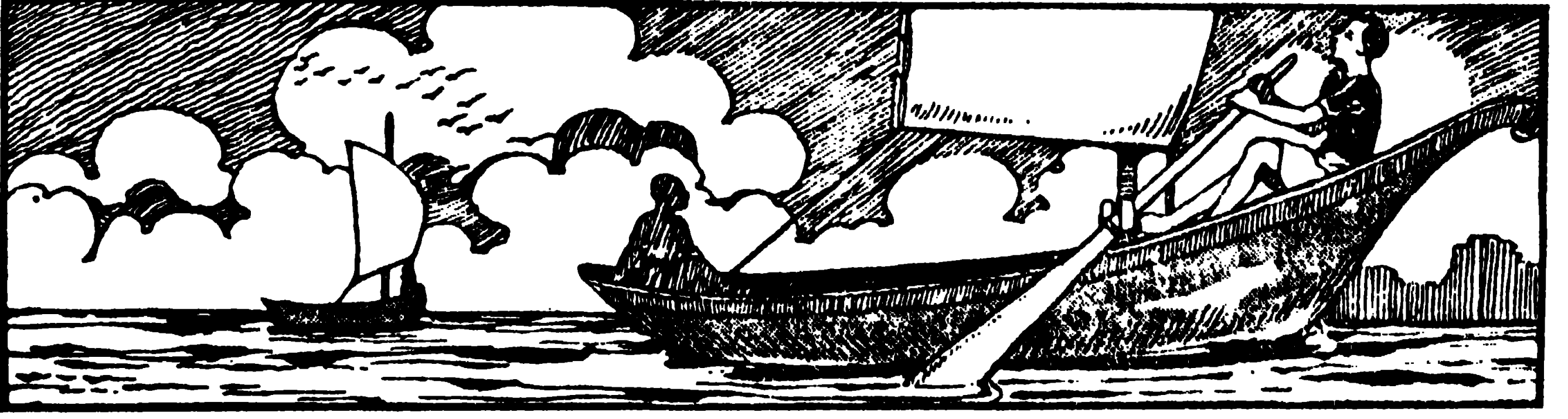
“দাম্পত্য-যুদ্ধে পরাজয়ের লজ্জা থেকে বেচারী সুধীরকে বাঁচাবার জন্য এই অভিনয়টুকুর দরকার ছিলো। ভাঙ্গা মোটর বাইকটী যে সুধীরের নয়, আপনারা এতক্ষণ তা লক্ষ্যই করেন নি।...যতই নারী প্রগতি আর স্ত্রী জাগরণের কথা বলুন মেয়েরা চিরকালই মেয়ে এবং ছেলেরাও চিরকালই ছেলে !”

রাগুদি নিতান্ত অপ্রস্তুত এবং অবাক হ’য়ে রবিদার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন !

রবিদা ধীরে ধীরে বাঁ হাতদিয়ে রাগুদিকে জড়িয়ে কাছে টেনে এনে ডানহাত দিয়ে তাঁর চিবুক তুলে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে খুব মিষ্টি ক’রে বললেন—“তুমি হেরে গ্যাছো রাগু,—আমি তোমায় জিতলুম।...এবার স্বীকার করচ’ তো—আমি স্মার্ট...?”







## বিংশ শতাব্দী ও প্রেমেন্দ্র মিত্র

শ্রী প্রণব রায়

উপলব্ধি আর ব্যাখ্যা—এ দু'য়ে তফাৎ যথেষ্ট। ভালো লাগাটা সহজ, কারণ ভালো লাগে মনে মনে; কিন্তু যখন প্রশ্ন করা হয়—‘কেন ভালো লাগল?’ যুক্তিল বাপে তখনই। ফুল ভালো লাগে সকলেরই, স্বগন্ধটুকু উপভোগ করে’ বড় জোর বলতে পারা যায় ‘চমৎকার!’ কিন্তু ফুলের সমালোচনা যদি করতে বলা হয়, তা’ হ’লে বাগানের মালীর চেয়ে নিজেকে অকিঞ্চিৎকর মনে করে কোনো কোনো ব্যক্তির লজ্জায় অধোবদন হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না—। মানুষের নিগূঢ় অন্তর্ভূতিলোকে কথা শুদ্ধ; সেই অনির্ক-চনীয়তাকে ব্যাখ্যা করার মতো দুঃসাধ্য ব্যাপার আর নেই।

ভবু, বিচার ও তর্ক যখন উঠেচে, তখন আসরে যোগ দেওয়া যাক—।

এক কথায় প্রেমেন্দ্র মিত্রকে বিংশ শতাব্দীর চারণ বলা চলে। তাঁ’র কবিতায় আমরা শহরের ধূমকলঙ্কিত আকাশ, ধূলিরুদ্ধ রাজপথ, আর বিজ্ঞান জগতের বজ্রজটিলতার একটি বিরাট মূর্তি দেখতে পেলাম। আধুনিক যুগ হচ্ছে ব্যস্ততার যুগ, প্রতিযোগিতার যুগ এবং আত্মহত্যার যুগ। এই সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা, মূঢ় দর্প নিষ্ফল প্রয়াস থেকে আধুনিক কালের মানুষের মুক্তি নেই—একথা প্রেমেন্দ্র অনুভব করেছেন। আত্মার সৌন্দর্যালোক থেকে এক সর্দনাশা নেশায় মানুষ নিজেকে রুদ্ধ বস্তুজগতে অন্তরীণ করে’ রেখেচে; সেই

নির্কাসিত ও নিপীড়িত মানবাত্মার ব্যাকুলতা কবির হৃদয়কে এমনভাবে স্পর্শ করল যে, তিনি বিংশ শতাব্দীর জগত থেকেই তাঁ’র কাব্য-পরিমণ্ডল বেছে নিলেন! একথা ঠিক যে, অনুভূতিই হ’ল কাব্যের সর্কস্ব,—বিষয়বস্তু নয়।

আরও সঙ্ক্ষেপে বলা যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যের মাটির জীবন নিয়ে, স্বপ্নের ফিরি করা তাঁ’র পোষায় নি। কেননা :—

“সারা দুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি

আর খাল কাটি ভাই, পথ বানাই,

স্বপ্নবাসরে বিরহিনী বাতি মিছে সারা রাতি পথ চায়,

হায় সময় নাই!”

আধুনিক জীবনের মূল মর্ম্মকথাটি হচ্ছে ‘হায় সময় নাই’! এ যুগের সাম্রাজ্যবাদ আর ধনবাদ, শক্তি ও অর্থের উন্মত্ত নেশা মানুষকে বিশ্বাসের অবকাশ দিচ্ছে না,—স্বপ্নবিলাসের অবসর তাঁ’র নেই।

স্বপ্ন প্রবণতার চেয়ে প্রেমেন্দ্রের কাব্যে দার্শনিকতাই বেশী, মনে হয়। তিনি অনুভব করেছেন যত, চিন্তাও করেছেন তত! তাঁ’র কবিতা মস্তিষ্কের দ্বারপথে হৃদয়ানু-ভূতির গহনলোকে প্রবেশ করে।

জীবন-ব্যাপারে তাঁ’র দৃষ্টি অসাধারণ তীক্ষ্ণ এবং বোধশক্তি আশ্চর্য্যকর প্রবর। যে মানুষ “তারকালোকে

ছন্দ, সূর্য্যোদয়ের বাণী জেনেচে, ভালোবাসা সৃজন করেছে ;  
তবু সে-ও যে হিংসার অন্ধকারায় শুধু বাঁচবার আশাটুকু  
সভয়ে লালন করে”, প্রেমেন্দ্র তা লক্ষ্য করেছেন। জন্মালে  
মামুষের মৃত্যু যে একদিন ঘটবেই, এর চেয়ে পুরাতন  
প্রত্যক্ষগোচর ঘটনা পৃথিবীতে আর নেই। তবু যখন  
পড়ি :—

“ভুখ্ দিলে যে, বুক দিলে যে,  
দুখ দিতে সে ভুল্ল না,  
মৃত্যু দিলে লেলিয়ে পাছে পাছে।”

তখন মনে হয়, একটি নতুন রহস্যের আবিষ্কার হ’ল।  
কবি প্রেমেন্দ্র নয়, দার্শনিক প্রেমেন্দ্র বলছেন :—

“নিখিল ভুবন ভরি’ খেলিতেছ কাদিবার খেলা  
অনাদি অতীত কাল ধরি’।”

এখানে স্বতঃই একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—জীবন সম্বন্ধে  
প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতবাদ কি? তিনি দুঃখবাদী, না  
আনন্দবাদী?

প্রেমেন্দ্রকে দুঃখবাদী বললে, চট করে’ এ-কথার  
প্রতিবাদ করবার যো নেই। কেন না তিনি বলছেন,  
দেবতার জন্ম হ’ল স্মরণ সুপবিত্র প্রভাতে—মাটির কোলে,  
বিধাতার আশীর্বাদ নিয়ে।\*\*\*

তারপর চেয়ে দেখি,  
কোথা মোর ভগবান?  
জীর্ণ গৃহে, আবর্জনা চারিদিকে,  
তা’রি মাঝে আলোহীন, বায়ুহীন কক্ষে  
ছিন্ন শয্যা’পরে শুয়ে,  
রোগরুদ্ধ ক্ষুধাকীর্ণ দেহ ল’য়ে  
দেবতা আমার ফেলে দীর্ঘশ্বাস।”

এ পৃথিবী তাঁ’র কাছে “বেনামী বন্দর”; “যন্ত্রের জটিল  
পথে বিকলাঙ্গ জীবনের শুধু ব্যঙ্গ-সমারোহ”ই তাঁর চোখে  
পড়চে।

কিন্তু এর পরেই তিনি বলেছেন!

“পশ্চাতে আসিছে যা’রা

তার। যেন ধরণীর এ কলুষ দেখিতে না-পায়;  
মোদের চোখের জলে শেষ হোক সব তাপ গ্লানি  
শেষ হোক মানব-আত্মার এই কাতর কাকুতি  
আমাদের বেদনায়।”

প্রেমেন্দ্রের কবিতায় দুঃখবাদ আছে বটে, তবে তিনি  
একচক্ষু হরিণের মতো দুঃখবাদী নন। তাঁর দুই চোখই  
খোলা, একচোখের দৃষ্টি এই পাপপঙ্কিল পৃথিবীর দিকে,  
অপর চোখের দৃষ্টি যেখানে “অন্ধকার রক্ত ভরি’ আলোকের  
আর্জস্বর কাদে প্রতি তারকায়—।”

দুঃখের অন্ধকার রাতে তিনি শুভকামনার একটি প্রদীপ  
জালিয়ে রেখেছেন! তাই তিনি বলছেন :—

“পৃথিবী স্মরণ হয় যেন!”

জীবনের অপচয় ও অপমৃত্যু তাঁকে যেমন ব্যাকুল করেছে,  
জীবনের সমারোহও তাঁকে তেমনি অভিভূত করে’ তুলেচে।  
তিনি দেখছেন, মৃত্যু-শোকস্তব্ধ গৃহদ্বারেও নব জন্মের শব্দ  
বাজ্জে, কবরের মাটি ফুঁড়েও তৃণশিশু আবার মাথা তুল্চে;  
তখন তিনি বললেন :—

“রচ গান যৌবনের।”

দার্শনিক এখানে কবি হ’য়ে উঠলেন। আসল কথা  
প্রেমেন্দ্র দুঃখবাদীও নন, আনন্দবাদীও নন,—আশাবাদী  
বললেই তাঁকে ঠিক বোঝা যাবে।—

• বিংশ শতাব্দীর এই নাগরিক সভ্যতা ও যন্ত্রজগতের  
পাপ, কদাচার, অবিশ্বাসের মধ্যেও তিনি এক অনাগত  
সৌন্দর্য্যময় যুগের দিকে ইঙ্গিত করছেন। থাকলই বা  
তাঁর কবিতায় পশ্চিমের ছায়া; পশ্চিম থেকে ভারতবর্ষের  
জীবনে যে সমস্তা আর গ্লানি এল, আমাদেরও সঙ্গীর্ণ  
সাহিত্যে তা’কে রূপ দেওয়া হয়েছে,—এ-ই আমাদের  
সৌভাগ্য।



## কত দূরে ?

শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ

জাতিতে সে ডোম, তিনটি মেয়ে লইয়া অল্পদিন হইল  
স্বাধীন হইয়াছে।

নীচ জাতি হইলেও তারা ঠিক ভদ্রলোকের মতই  
চলিত। বাহিরের হাওয়ায় স্বাধীনভাবে কেউ কখনো  
তাদের চলিতে দেখে নাই। কিন্তু আজ নিরুপায়।  
স্বজাতীয় পাঁচজনের গায় আজ তাহাকে চলিতেই হইবে।  
স্বামী কিছুই রাখিয়া যায় নাই।

দাওয়ায় বসিয়া সে কাঁদিতেছিল—ঘরে কিছুই নাই।  
ছোট মেয়ে তল্লী যখন খাইতে চাহিবে, আঁচল ধরিয়া কাঁদিবে,  
তখন তার অবোধ নিরুপায় মনকে কি বলিয়া প্রবোধ দিবে ?

“মণিয়া !”—

সে চমকিয়া উঠিল। সম্মুখে ফল্ল, সম্পর্কে দেবর। তার  
লালসাপূর্ণ সত্বক চাহনি মণিয়ার বুকে শতশেল বিদ্ধ  
করিল। সে যে একটু আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে  
সে ভরসাও কি ভগবান তাহাকে দেন নাই ? স্বামীর  
সঙ্গে জীবনের আশা আকাজক্ষা সবই গিয়াছে, রাখিয়া  
গিয়াছে জালাময় অনন্ত শোক। তাহাতেও নিবৃত্তি নাই।  
আরো যে কত জালা সহিতে হইবে কে জানে ?

“মণিয়া, আজও তুই কাঁদাছিস ? কত ক’রে বলছি,  
আমার ঘরে চল, রাগী হয়ে থাকবি……”

উত্তরে রোষদৃষ্ট কণ্ঠে সে বলিল, “রাগী হ’তে হলে আর  
সে ব্যবস্থা তোমার কর্তে হ’তনা……”

“হবেনা কেন ? আমি যে তোকে ভালবাসি মণিয়া।”

“আমায় ভালবাস ? সে ভালবাসার মান একবার  
রাখ দেখি।”

মণিয়ার অন্তরের শুভ্র আলো ফল্লকে পথ দেখাইতে  
পারিল না, সে তার বিপরীত অর্থ করিয়া মণিয়ার হাতখানি  
ধরিয়া আবেগময় কণ্ঠে বলিল “সেই মান রাখবার ভগ্নেই ত  
তোকে নিকে করতে চাই মণি !”

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া মণিয়া বলিল “বাও  
এখান থেকে, তোমার কোন কথা শুনতে চাইনে।”

ফল্ল বিষ্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল।

মণিয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল “ফেলু যদি  
ওরকম কথা আমায় বল আর গায়ে হাতদিয়ে অপমান  
কর তবে আমি পুলিশ ডাকবো—ঠিক জেনো।”

ফল্লরও দৈর্ঘ্যের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। ক্রোধ-  
কম্পিতকণ্ঠে বলিল, “আমিও দেখে নেব, এত তেজ তোর  
কোথায় থাকে।”

\* \* \*

বিধাতা দরিত্র করিয়াছিলেন তো রূপ দিয়াছিলেন  
কেন ? এই রূপই মণিয়ার কালস্বরূপ, পথে ঘাটে  
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহাকে বিপদ গ্রস্ত করিতে  
ছাড়িল না।

কিন্তু নিরুপায়, পথে তাহাকে বাহির হইতেই হইল।

মরিবার সময়ে স্বামীর শেষ কথা কয়টি আজও তার  
মরম কোণে প্রতিধ্বনি তোলে “মণিয়া !—মণি, চলছি কিন্তু  
যা দিয়েছিস তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে।”

মণিয়া আঁচলে চোখ মুছিতে ছিল, তখন তার উত্তর  
দিবার শক্তি এতটুকুও ছিল না।

মণিয়ার অশ্রু-সজল মুখের পরে স্নিগ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া  
সে বলিল “জানি অনেক কষ্ট পাবে, অনেক লাঞ্ছনা, অনেক  
গঞ্জনা সহিতে হ’বে। তবুও এই শেষ মিনতি, ইহ জীবনের  
খেলাই খেলা নয়। যেখানে অবিচার, অত্যাচার নেই  
সেখানে দুঃখ হলেও তার সহজ, শ্রেষ্ঠ পথ তুমি বেছে  
নিতে পারবে না ? বল মণি ! আমার বুকে হাত দিয়ে,  
এ অমূল্য দানের সম্মান রাখবে ?”

স্বামীর শেষ মিনতি—অশ্রু বস্তায় কথা বলিবার শক্তি  
লুপ্ত। সে নিরুত্তরে স্বামীর বুকে হাত রাখিয়া শপথ

করিতেই হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল “এই টুকুর জোরেই আবার তোমার সঙ্গে আমার মিলন হবে—মণি!”

ঐ টুকুর জোরেই যদি তাকে ফিরিয়া পাওয়া যায়, তবে কেমন করিয়া সে তার শপথ প্রত্যাহার করিবে? রাস্তা খাঁটে নিমগ্না মণিয়ার কাণে আসিল দুইজন ভদ্রলোকের অল্পাটবাণী।

“দেখ, মেয়েটি কি হুন্দর”!

“তোমার পছন্দ হয়?” “দূর গাধা, ও যে ভোম” “হলোই বা ভোম, মানুষ ত?—তাছাড়া লাভের পক্ষে সুবিধা অনেক খানি।”

“ছিঃ!—এরা আবার ভদ্রলোক” মণিয়া নীরবে চোখ মুছিয়া কাজে মন দিল।

এমনি রোজই শুনিতে হয়। বাহির হইয়া যে তার কত অশান্তি, কত বিভ্রাট, সে তাহা এতদিন অনুভব করিতে পারে নাই। যার জন্ত আজ তাহাকে এমনি অপমান সহিতে হইতেছে তার পায়ে প্রাণের অর্ঘ্যরূপে বিকাইয়া দিতে চায় তার শেষ সম্বলটুকু। হায় সে কোথায়? কতদূরে?

\* \* \*

রূপের বাজারে মেয়ে তিনটির নাম থাকিলেও সব চেয়ে মাথা বাড়াইয়া উঠিয়াছিল ছোট মেয়ে তল্লী।

মায়ের সঙ্গে সেও মায়ের কাজের সহায়তা করে। মিউনিসিপ্যালিটির বাবুরা তার স্বভাবসুন্দর সরল বাক্যে ও অনিন্দ্য সুন্দর চেহারায় আকৃষ্ট হইয়া মাঝে মাঝে খাবার কিনিয়া দেয়, তাই সবাইকে দিয়া নিজে যায়।

মণিয়ার মাহিয়ানা মাত্র আটটি টাকা। এই দিয়াই চারজনের পেট চালাইতে হয়। বড় মেয়ে লক্ষ্মী—সে জন্ম-মুলো, মেঝো-মেয়ে শুল্লীর ওপরে তার কাজের নির্ভর, তল্লী ও লক্ষ্মী তার কাজের কি সহায়তা করিবে?

ফাগুয়ার উৎসবে ফক্কুর বাড়ীতে বড় রকমের ভোজ। উৎসবে সকলেই যোগ দিয়াছে কেবল তল্লী ও তার মা বোনেরা দেয় নাই।

প্রাঙ্গনে উত্তরের উপর প্রকাণ্ড ডেগচিতে মাংস সিদ্ধ হইতেছিল। তার আশেপাশে পাড়ার সকলে হৈ—ঠে

করিতেছে। তল্লী ম্লান মুখে বলিল “মা! ভেঁকী ওখানে যাচ্ছে।”

“ওদের খেতে বলেছে, তোকে তো বলেনি।”

বাতাসে তল্লীর ফুঃফুরে চুলগুলি দুলিতেছিল মাথা নাড়িয়া সে বলিল “না বলে খেতে হয়না—না?”

“না।—আর না যাওয়াই ভাল। ফাগুয়ার ওসব মাংস টাংস খাওয়া পছন্দ করি না।”

“এ ছিঃ! মা—আমি ও মাংস খাইনা।” মণিয়া নিরামিষ খায়। তল্লীও তার সঙ্গে খাইয়া অভ্যস্ত। কচিং কখনো মাছ মাংসের যোগাড় হইয়াছে তো বরাহের মাংস এ বাড়ীতে কখনো আসে নাই।

একটা মাংসের টুকরা খাইতে খাইতে ভেঁকী বেড়ার ধারে অগ্রসর হইয়া ডাকিল “তল্লী”—

তল্লীর প্রাণ ছুটিয়া যাইতে চাহিলেও মায়ের অমূল্য্য সে কথাটা পর্য্যন্ত বলিতে পারিল না, আর পূজার দিনে ঐ মাংসের কাছে যাইতেও তার ঘৃণা হইতেছিল।

ঘরের মধ্য হইতে মণিয়ার কাণে ফক্কুর উচ্চ ডাক হাঁক শোনা গেল। সে যে কি উদ্দেশ্যে এই বিরাট ভোজের আয়োজন করিয়াছে তা পাঁচজনে ফাগুয়ার উৎসব মানিয়া নিলেও মণিয়ার বুঝিতে বাকী রহিল না।

\* \* \*

বাহিরে তল্লী খেলিতেছিল। দাবায় বসিয়া লক্ষ্মীর পা ব্যথা হইয়া গিয়াছে, উঠিতেই ধপাস করিয়া পড়িয়া গেল। শুল্লী ফুলতলায় ফুল কুড়াইতে গিয়াছে। আত্মিনায় মণিয়া। বেতের ঝুড়িটা তার প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। লক্ষ্মীর পতন শব্দে ছুটিয়া আসিল।

হায়রে! জন্ম-মুলো চিরকালই দুঃখ সহিতে হবে, তবে এগিয়ে সে রইল না কেন!

মনে একবার আসিতেই বুকটা ছঁ্যাৎ করিয়া উঠিল। “না—না—থাক রয়েছে—রয়েছে।”

তল্লী ছুটিয়া আসিয়া দুটা টাকা দেখাইয়া বলিল “এই দেখ—! কে দিয়েছে বল ত?”

মণিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া বলিল “কে দিয়েছে রে?”

“জানিনা!—আবার দেবে বলেছে—আবার দেবে!”



ব্যাপারটা যেন মণিয়ার কাছে তেমন সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হইল না।

সেই দিন বৈকালে তাদের দ্বারে একখানি জুড়ি গাড়ী দাঁড়াইল, তল্লী কলহাসো বলিল, “ঐ দেখ মা সে এসেছে।”

“কেরে—কে ?”

বুকের মধ্যে এমনি স্পন্দন আরম্ভ হইল যে, তার স্পষ্ট অভিমান হইল যে এ আর কিছুই নয়, রোজকার অভিনয় আজও দেখিতে হইবে।

টাকা দুইটা হাতে লইয়া মণিয়া বাহির হইয়া আসিল।

গাড়ী হইতে যে নামিল, তার দিবা সূদর্শন কাস্তি, বিলাস ব্যসনে ধনবানের পুরা পরিচয়।

মণিয়া নাক সিঁটকাইয়া মুখ ফিরাইয়া নিল।

“তল্লী, এ টাকা কার ?”

“তল্লী আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল।

“দিয়ে দাও। আমি না বলে দিয়েছি যে যা দেবে ফিরিয়ে দেবে।”

তল্লী ভয়ে ভয়ে টাকা ফিরাইতে গেলে সে সহাসো বলিল, “দিয়েছি কি ফিরিয়ে দেবার জন্তে ?”

মণিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিল “দেবার মানুষের ত অভাব নেই, তাদের দিনগে, দুঃখিনীর মেয়ে.....”

“দুঃখিনীর মেয়ে বলেই তো দিয়েছি মণিয়া। কিন্তু এ দুঃখ ত' তোমার থাকবে না—”

ছিঃ—ছিঃ। একি শুনিতে হইতেছে তাকে। রাগে দুঃখে—মণিয়ার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ভগ্ন হৃদয় তার আন্তরিক কাদিয়া বলিল “ওগো কই গো তুমি—কতদূরে ? তোমার সম্মান রাখতে গিয়ে আজ আমার এত শাস্তি।”

“মণিয়া, কাদছো ? দুঃখ কি ? তোমার দুঃখ সারাতেই তো এসেছি, মেয়েদের নিয়ে চল আমার বাড়ীতে, রাণীর হালে থাকবে।”

“উঃ—ভগবান একি শোনালে ?”

মণিয়ার হাতখানি হাতের মধ্যে পুরিয়া লইয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে সে বলিল “ভয় কি মণিয়া ?—মণিয়া !”

আবার সেই হাতের অবমাননা—এই হাতে যে তার

শেষ স্মৃতি বিজড়িত। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেও এই হাতের স্পর্শ আবার তাহাকে সচকিত করিয়া কর্তব্যের পথে টানিয়া নিতে প্রয়াস পাইল। হোক সে ধনী রাজাধিরাজ, তার কাছে নিজের বাড়ীতে নিজেকে অপমানিত হইতে দিবে না, সে হাতটা সবলে ছিনাইয়া লইয়া দ্বারে খিল আঁটিয়া দিল।

গভীর বিষয়ে আগন্তকের মুখে নির্গত হইল “আশ্চর্য্য !”

\* \* \*

এমনি করিয়া স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটায় সকলেই মণিয়ার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল।

লক্ষ্মী আর ঘরের বাহির হইতে পারে না। চারিদিক হইতে ইট পাটকেল আসিয়া তার কোমল অঙ্গ কত বিকৃত করিয়া দেয়।

শূলীর একটা কাজ ঠিক হইয়াছিল, শত্রুরা পিছনে লাগিয়া সে আশাও নির্মূল করিয়া দিল।

তল্লী মাছের অমুজ্জায় কারো নিকট হইতে পাবারটা পর্য্যন্ত নেয় না। বাড়ীতে যে ডালা সাজী প্রস্তুত করিয়া দুই পয়সা উপার্জন হইত তাও আজকাল হয় না—বিকায় না।

তেল অভাবে তল্লীর কালো চুলের বর্ণ পিঙ্গলে দাঁড়াইয়াছে।

শূলীর দৃষ্টে বলিষ্ঠ চেহারা অনাহারে ক্লশ হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষ্মীতো জন্ম-মুলো।—অবশ্যে তার বড় টানা চোখ, আরো জলন্ত—বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন তিনজনেই রাস্তায় বাহির হইয়াছে।

লক্ষ্মী ধীরে পা টানিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। মণিয়া ভয়ে আকুল।

“লক্ষ্মী ! বাড়ী যাও মা !”

লক্ষ্মীর মুখ দিয়া অনেক খানি লালা বাহির হইয়া পড়িল। জলন্ত চক্ষু টানিয়া, বিকট দৃষ্টি হানিয়া বলিল, “মা—দাবনা।” “এই তোর নাম কিরে ?”

“আমায়—ম—লক্ষ্মী—হ—” দাঁত মুখের কি বিকট ভঙ্গী। হায় সেতো খেঁচায় করে নাই, এ যে বিধাতার দান—কর্মফল, এও তার অপরাধ ?

উত্তরে দ্রুত বালক ছুটিয়া আসিয়া বলিল “ভ্যাংচাচ্চিস ? দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা।” বলিয়া থাকা দিয়া চলিয়া গেল।

লক্ষ্মী তা সামলাইতে না পারিয়া নর্দমায় পড়িয়া গেল।  
নর্দমায় গভীর খাত, তাতে কাদা কাদা জল।

উন্মাদিনী মণিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তুলিতে চেষ্টা  
করিল—পারিল না। শূলী ও তল্লীকে ডাকিল।

তিনজনে বহুকষ্টে অচৈতন্য লক্ষ্মীকে টানিয়া পাড়ে  
তুলিল। ঘেন কাদায় গড়া সংমৃষ্টি। শিশি ভাঙ্গা কাচ  
গায়ে ফুটিয়া জমাট রক্ত কাদায় মিশিয়া একাকার হইয়া  
গিয়াছে।

মণিয়া আর্ন্তকণ্ঠে কাদিয়া উঠিল, কেউ সাড়া দিল না।  
তুই একজনের চোখে পড়ায় তারাও অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া  
বলিল, “ওর দফারকা। গ্যাছে তো গ্যাছেই; হুলো  
মেয়েটার জন্ত এত দরদ!”

হায়রে!—মায়ের কাছে হুলো আর স্বস্থ?

অঙ্গহীন, অকেজোও যে মায়ের কাছে মাণিক!

প্রতিবাদে তার বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল হুলো হইগেও  
সে রক্তমাংসে গড়া মানুষ। তারও ব্যথা, বেদনা, অনুভূতি  
আছে।

\* \* \*

তারপর অনেক বছর কাটিয়া গিয়াছে। তল্লী আর লক্ষ্মী  
তাহাকে ভাবনা হইতে মুক্তি দিয়া অনেক দূরে কোন অজানা  
রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে।

শূলীর বিবাহ হইয়াছে এক মাতালের সঙ্গে। খাবার  
যোগাড় করিতে না হইলেও শূলীর ভাবনা ভাবিয়া আজও  
তার চোখে জল আসে।

শীতের সন্ধ্যা। মেটে পাতিলের আগুনে মণিয়া তার  
কর্ণক্লান্ত শীতল দেহ উষ্ণ করিতে প্রয়াস পাইতেছিল।

সহসা কে আসিয়া নীচু হইয়া প্রণাম করিল।

মণিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল—শূলী! এতক্ষণ শূলীরই  
ভাবনা ভাবিতেছিল, অনেক দিন তার সহিত দেখা নাই।  
শূলীকে পাইয়া আনন্দে মনটা সজীব হইয়া উঠিল।

“উঃ! এত রোগা শুকনো কেনরে?” শূলীর নিরুত্তর  
গভীর মুখের দিকে চাহিয়া মণিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল  
“ওকি শূলী! তোর কাপড়ে ও কিসের দাগ? শূলী সেন্ধান  
সামলাইয়া লইতে যাইতেছিল, মণিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাকে  
বুকে জড়াইয়া কাদিতে লাগিল “শূলী! হতভাগী! সবাই  
আমায় মুক্তি দিয়েছে, তুই কেন দিলিনে?” শূলী অবাক  
হইয়া গেলো। যে মা হুলো কণ্ঠা মেয়েকে বাঁচাইবার জন্ত  
জীবন পণ করিয়াছিল তাঁর মুখে আজ একি বাণী?

শূলীর কপালের রক্ত মণিয়ার হাত বহিয়া পড়িতে লাগিল।  
অশ্রু সজল কণ্ঠে মণিয়া কহিল “এমনি রোজই মারে  
বুঝি?”

দরদর ধারায় রক্ত ঝরিয়া পড়িল। “হায়! হতভাগী,  
কেন তোকে ডাকাতে হাতে দিয়েছিলুম। আর তোকে  
যেতে দেবনা—আট টাকার জায়গায় চৌদ্দ টাকা হয়েছে।  
আমাদের কিসের অভাব শূলী?”

অজস্র রক্তপাতে শূলীর ক্ষীণ দুর্বল শরীর আরো  
দুর্বল হইয়া মায়ের বুকে ঢলিয়া পড়িল।

\* \* \*

শূলীও তাকে মুক্তি দিতে বসিয়াছে। কণ্ঠা শূলীর  
শিয়রে বসিয়া সে কত কী ভাবিতেছিল।

ভাবনার শেষ নাই। সেই নর্দমায় পতিতা লক্ষ্মীর  
ভাঙ্গা হাতখানি!

উঃ! সে যে কি কষ্ট কি যাতনায় রাত্রিদিন মর্মভেদী  
ক্রন্দনে স্বেচ্ছায় মুক্তি পাইতে চাহিয়াছিল তাই বুঝি ভগবান  
তাহাকে মুক্তি দিয়াছিল, সেইটী জানিয়াও আজ আবার  
মুখ দিয়া সেই কথাটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যার জন্ত  
অভিমাণে শূলীও তাকে মুক্তি দিতে বসিয়াছে।

হায় ভগবান! মুণের কথাটিকে সত্য সত্যই সত্যে  
পরিণত করিবে? সে যে কত বড় দুঃখে অশান্তিতে কথাটা  
বলিয়া ফেলিয়াছে সেইটা একবার ভাবিয়া দেখিলে না?  
সেওতো মানুষ, কত সহিবে?

তাই বা কেন? তল্লী তাহাকে মুক্তি দিক। এ কথাটা  
ভুলেও মুখ দিয়া বাহির হয় নাই তবে তাকেই বা ভগবান  
তুলিয়া নিলেন কেন?

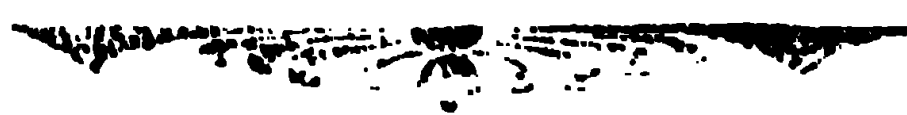
“আমায় মেরোনা গো!—মেরোনা!”

“শূলী, কি বল্ছিস মা?—আর আমি ওখানে পাঠাব না,  
তুমি সেরে ওঠো।”

শূলী মায়ের কথা শুনি কি না কে জানে! সে তখন  
প্রলাপের মাধ্যম উত্তর করিল “মা! আমাকে দিদি  
ডাকছে।”

ওপারের ডাক আসিয়াছে। শেষবার মা বলিয়া মায়ের  
কোলে শূলী জন্মের মত চোখ বুজিল।

মণিয়া আর্ন্ত চীৎকারে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া  
কাদিয়া উঠিল, “অনেক হয়েছে গো! অনেক হয়েছে—  
এখনো কি আমার পাপের ভোগ ফুরোয় নি? ওগো!  
বলগো বল কোথায় তুমি “কত দূরে?”



# বার্তাবাহী

( একাক্ষ নাটিকা )

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর বি, এ

—ঃ পরিচয় :—

বাগানে—

জনৈক বৃদ্ধ

জনৈক অপরিচিত

উষা

স্নাতা

জনৈক চাষা

জনতা

} রত্নের পৌত্রদ্বয়

গৃহস্থে—

জনৈক গৃহস্থামী

ঐ পত্নী

গৃহস্থের দুই কন্যা

এ

শিশুপুত্র

নিরাক্ষর চরিত্র

[ অনেক দিনের পুরাণে একটি বাগান। পিছন দিকে একটি বাড়ী, নীচের তলেব তিনটি খোলা জানালা দিয়ে বাহিরে আলো এসে পড়েছে, ঘরের মধ্যে আলোর চারিদিক ঘিরে একটি পরিবার বসে আছে—বাহির হতে তাদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পরিষ্কার ভাবে। পিতা বসে আছেন অগ্নিকুণ্ডের পাশে, মাতা টেবিলের উপর হাত রেখে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সামনের পানে। স্ত্রী পরিচ্ছদে সজ্জিত দুটি মেয়ে চুপ করে বসে সেলাই করছে, তারা হাসছে যেন স্বপ্ন দেখছে জেগে জেগেই। ঘরটি শান্তিপূর্ণ। মাঝের কোলে একটি শিশুপুত্র ঘুমুচ্ছে, একটি মেয়ে উঠে ঘরের মধ্যে পদচারণা করতে লাগলো ধীরে ধীরে—তার ভাবে যেন কোন স্বপ্নের আহ্বান। জানালার শাশীগুলো ঝক ঝক করছে উজ্জল আলো প্রতিকলিত হয়ে ]

( জনৈক বৃদ্ধ এবং জনৈক অপরিচিত বাগানের

মধ্যে প্রবেশ করলো সন্তর্পণে )

বৃদ্ধ। এইটাই বাড়ীর পিছনকার বাগান, ওরা এখানে কখনও আসে না। ওদের প্রবেশ দ্বার ওদিকে। ওদিককার দরজা বন্ধ, এদিকটা গোলা—ওই আলো দেখা যাচ্ছে।...হ্যাঁ।

ওরা আলো জেলে বসে আছে। আমরা এসেছি জানতেও পারেনি, ওদের মা এখুনি হয়তো বাহিরে আসবে তাহলে আমরা কি করবো ?

অপরিচিত। আমাদের কি করতে হবে ?

বৃদ্ধ। দেখি, ওদের সকলেই ঘরের মধ্যে আছে তো ! —হ্যাঁ, ওদের পিতা আগুনের ধারে বসে আছেন হাঁটুর উপর হাত রেখে—মাও বসে আছেন টেবিলের উপর হাত রেখে...

অপরিচিত। ওদের মা আমাদের দিকে চেয়ে আছেন।

বৃদ্ধ। না, উনি দেখছেন না কিছুই, তাকিয়ে আছেন শূন্যদৃষ্টিতে শুধু। দেখতেও তিনি আমাদের পাবেন না, একটি বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছি যে আমরা। কিন্তু আর কাছে যেও না.....ওই—ওরা হ'জন যুতা মেয়েটির বোন—ওরা সেলাই করছে ধীরে ধীরে, শিশুটি ঘুমিয়ে পড়েছে, ওই দেওয়ালের কোণের ঘড়িটার ন'টা বেজেছে... কোন ছুঁটনার কল্লনাও ওরা করতে পারে নি, আর ওরা কথাও কইছে না।

অপরিচিত। আমরা কোন বকন ঈসারা করে ওদের

পিতাকে ডাকিনা কেন?—উনি তো এদিকে মুখ ফিরিয়েছেন, একটি জানালায় গিয়ে আঘাত করবো? সকলের আগে একজন তো শুনতে পাবে.....

বৃদ্ধ। কি করবো, তা এখনও ঠিক জানি না..... আমাদের খুব সতর্ক হতে হবে।—ওদের পিতামাতা দুজনেই বৃদ্ধ এবং ক্লান্ত—বোন দুটিও বালিকা মাত্র।.....ওরা সকলেই তাকে ভালো বাসতো খুবই। এমন সুখী পরিবার এর আগে আমি দেখিনি কখনও.....না না জানালার কাছে যেও না। ওদেরকে সাদাসিধে ভাবে কথাটা বলে ফেলাই আমাদের ভালো যেন অতি সাধারণ একটি ঘটনা ঘটেছে। আমরা শোকার্ত হয়েছি এ ভাব যেন ওদের কাছে না দেখাই, তা'হলে তারা মনে করবে তাদের দুঃখ আমাদের চেয়েও বেশী হওয়া উচিত তাই তারা আরও শোকার্ত হয়ে পড়বে। চল আমরা দরজায় গিয়ে knock করিগে—যেন বিশেষ কিছুই ঘটেনি! আমিই প্রথমে ঘরে ঢুকবো। আমাকে দেখলে ওরা অবাক হবে না মোটেই, কেননা আমি এখানে প্রায়ই আসি গল্প শুদ্ধব করতে।

অপরিচিত। তা'হলে আমি এখানে অপেক্ষা করি, ওরা তো আমায় কখনো দেখেনি!

বৃদ্ধ। না, আমার একা যাওয়াটা ভালো দেখাবে না। সামান্য দুটো কথায় শোনা শোক-সংবাদ কি দারুণ তুমি তা'জানো না। আমি সমস্ত পথটা এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে এসেছি—আমি যদি একা যাই তা'হলে প্রথমে আমাকেই কথা বলতে হবে, সামান্য ক'টা কথায় ওরা সব বুঝতে পারবে, তখন আমি কি বলবো!—একটা অসহ্য স্তব্ধতা, তারপর মর্মান্তিক দীর্ঘশ্বাস!—না না, তখন সেখানে আমি একলা দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না, আমার হৃদয় তা'হলে বিদীর্ণ হয়ে যাবে! তারচেয়ে আমাদের দুজনের যাওয়াই ভালো, অনেক বাজে কথার মাঝে এই খবরটা বলবো, নানা বাজে কথার মধ্যে এই মর্মান্তিক শোকটা অনেকটা হালকা হয়ে যাবে। একবার ভেবেছ—আমি একা গেলে আমার প্রথম কথাটা কি ভীষণ শোনাবে! কিন্তু আমরা দুজনে গিয়ে নানা বাজে কথার ফাঁকে কথাটা

বলবো তা'হলে এই নিদারুণ শোক একেবারে ওদের বুকে গিয়ে লাগবে না, তার তীব্রতা অনেকটা লঘু হয়ে যাবে বাজে কথার মাঝে।—তাইতো শোকদুঃখের সময় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প শুদ্ধবে যেতে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। নিজেকে নিঃসঙ্গ করে রাখলে শোক বুকের মাঝে শুষ্ক হয়ে ওঠে—বুকটাকে বিদীর্ণ করে দেয়। আমি তো এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি—তোমার কাপড় ভিজলো কি করে কোমর পর্যন্ত—

অপরিচিত। আমি এক কোমর জলে নেমেছিলুম যে।

বৃদ্ধ। আমার কতক্ষণ আগে তুমি ওকে দেখেছিলে?

অপরিচিত। একটু আগে। আমি ওই গাঁয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলুম। অন্তর্গামা সূর্য্যের লালিমা তখন নদীর বুকে ঝলমল করছিল; নদীর মেই সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো, কাছে গিয়ে দেখি তার এলোমেলো চুলগুলো ভাসছে।

[ ঘরের মধ্যে দুটি মেয়ে জানালার দিকে ফিরলো ]

বৃদ্ধ। ঘরের মধ্যে চেয়ে দেখ তার বোন দুটির চুলও কেমন ঘাড়ের ওপর নাঁচছে যেন।

অপরিচিত। ওরা যে এই দিকেই চাইছে দেখছি—আমি বোধ হয় জোরে কথা বলছিলাম।

[ মেয়ে দুটি মুখ ফিরিয়ে সেলায়ে মগ্ন হোল ]

ওরা আবার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কি বলছিলাম—ই্যা, তারপর আমি কোমর পর্যন্ত জলে নেমে তার হাতদুটি ধরে পারে নিয়ে এলাম—সেও ছিল ঠিক এই মেয়ে দুটির মতই সুন্দরী!

বৃদ্ধ। সে এদের চেয়েও বেশী সুন্দরী ছিল বলে আমার মনে হয়। কিন্তু আমি যেন ক্রমেই সাহস হারিয়ে ফেলছি।

অপরিচিত। সাহসের কথা কি বলছেন? মানুষে যা করতে পারে তা আমরা করেছি; আমি দেখবার প্রায় ঘণ্টা খানেক আগে তার মৃত্যু ঘটেছিল।

বৃদ্ধ। আজ সকালেও সে ছিল। সে যখন গির্জা থেকে বাইরে আসছিল তখন আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, বলে সে আজ নদীর ওপারে যাবে আমার বাড়ীতে। হায়রে! তখন কি সে জানতো যে আমার সঙ্গে তার সেই শেষ দেখা! তার চোখের পানে তাকিয়ে মনে



হয়েছিল কি যেন সে বলতে চেয়েছিল আমাকে কিন্তু সাহস করে নি।

অপরিচিত। ক'জন চায়া আমার বলে যে সারা বিকেলটা ওই মেয়েটিকে নদীর ধারে ঘুবে বেড়াতে তারা দেখেছে ; তারা ভেবেছিল বোধ হয় সে নদীর শোভা দেখছে, কিন্তু ওই নদীতেই যে সে—

বৃদ্ধ। না—না, কি করে তার মৃত্যু ঘটেছে তা কেউ বলতে পারবে না। লোকে জানবে কি করে! মানুষের জীবনের স্পন্দন অনেক রকমেই তো খেমে যেতে পারে! ওই ঘরের ভিতরটা যেমন ভাবে তুমি দেখতে পাচ্ছ বুকের ভিতরটা তো তেমন করে দেখতে পাও না!—সকলেই তোমার আগারই মত শুধু অন্ধকারেই ঘোরে। মানুষের সামর্থ্যই বা কতটুকু! হৃগের স্বপ্নই শুধু তারা দেখতে জানে! বহুদিন ধরে বার সঙ্গে তুমি বাস করেছ, সে আজ আর নেই। তার আদরের নাম ধরে যতই ডাকাডাকি করনা কেন—কোন ফল হবে কি?—জগৎটাই এই! কেউ কিছু নয়—কেবল কতকগুলো প্রাণহীন পুতুল, নিজেকেই তার চেনেনা, নিজেদের পূর্ব ওপর দিয়ে কত কি ঘটে যাচ্ছে তা তারা জানেনা!—যে আজ মরেছে সে হয়তো কাল একটা শুকনো ফুলের পানে তাকিয়ে তার ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে!

অপরিচিত। দেখুন, ঘরের ভিতর ওরা হাসছে।

বৃদ্ধ। ওদের ছুঁতাবনা হয়নি মোটেই, আজতো তার ফিরে আসবার কথা নেই।

অপরিচিত। ওরা সব চুপ করে বসে আছে, ওদের বাবা মুখে হাত দিয়ে বসে আছেন।

বৃদ্ধ। উনি স্ত্রীর কোলের ঘুমন্ত ছেলেটির পানে চেয়ে আছেন।

অপরিচিত। আর ওর স্ত্রী, পাছে ছেলেটির ঘুম ভেঙে যায় বলে মাথাটি তুলতে সাহস করছেন না।

বৃদ্ধ। মেয়েদুটিও হাতের কাজ বন্ধ করেছে—এখন সব চুপচাপ!

অপরিচিত। ওদের হাতের জামাগুলোও নামিয়ে রেখেছে।

বৃদ্ধ। সকলে শিশুটির পানে চেয়ে আছে।

অপরিচিত। ওরা জানেনা আমরা ওদের পানে এমন করে দেখছি।

বৃদ্ধ। আবার আমাদের ওপরও আর একজন চেয়ে আছেন।

অপরিচিত। ওই, ওরা এদিকে চাইছে—

বৃদ্ধ। কিন্তু ওরা কিছুই দেখতে পাবে না।

অপরিচিত। মনে হচ্ছে ওরা বেশ সুখেই আছে—তবু যেন কেমন একটা খম্বা ভাব!

বৃদ্ধ। ওরা ভেবেছে ওরা বুঝি সব বিপদের বাইরে—দরজা বন্ধ, লোহার গরাদ দিয়ে জানালা তৈরী, ঘরের দেওয়ালগুলোও শক্ত, দরজার খিলটাও বেশ মজবুত।—আগে থেকে যতটা সাবধান মানুষ হতে পারে তা ওরা হয়েছে কিন্তু—

অপরিচিত। আগেই হোক আর পরেই হোক আমাদের তো বলতেই হবে। কেউ হয়তো এখনি এসে হঠাৎ ওদের খবর দেবে। মেয়েটির শবটিকে ঘিরে একদল চায়া জড়ো হয়েছিল তাদের কেউ এসে এখনি হয়তো দরজায় ধাক্কা দেবে—

বৃদ্ধ। উষা ও আভা শবের কাছে আছে। চাষারা প্রথমে একটা মাচার মত তৈরী করবে তারপর তারা আসবে। উষাকে বলে এসেছি তারা আসবার আগেই সে যেন আগে এসে আমার খবর দেয়। উষার না আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো—সেও যাবে আমাদের সঙ্গে। [ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ] দেখ, এমন ভাবে স্তব্ধে হবে না, এর চেয়ে ওদের কাছে গিয়ে অল্পকথায় একেবারে সব বলে ফেলাই যেন ভালো!

[ উষার প্রবেশ ]

উষা। দাদাভাই, ওরা আসছে।

বৃদ্ধ। এখন কতদূরে?

উষা। যেখানে রাস্তাটা নেমে গেছে—ওই খানটার।

বৃদ্ধ। বেশ নিঃশব্দে আসছে তো!

উষা। আমি ওদের চুপিচুপি আসতে বলেছি, আভা ওদের সঙ্গেই আসছে।

বৃদ্ধ। সঙ্গে অনেক লোক আছে ?

উষা। সারা গাঁয়ের লোক ওদের সঙ্গে আসছে।  
সঙ্গে আলোও আছে—আমি নিভিয়ে দিতে বসেছি।

বৃদ্ধ। কোন্ দিক দিয়ে তারা আসবে ?

উষা। তারা ওই সরু পথটা দিয়ে আসছে আস্তে আস্তে।

বৃদ্ধ। কতকগণে তারা এসে পড়বে ?

উষা। ওদের খবর দিয়েছি, দাদাভাই ?

বৃদ্ধ। না, এখনও তাদের কিছু বলিনি, এখনও ওরা আরামে আগুন পোহাচ্ছে! দেখলেই বুঝতে পারবে জীবন—

উষা। আহা, এখনও ওরা কত শান্তিতেই না আছে—  
মনে হচ্ছে যেন ভুল দেখছি।

অপরিচিত। দেখ, মেয়েদুটি উঠে দাঁড়িয়েছে।

উষা। হ্যাঁ, বোন দুটি উঠেছে।

অপরিচিত। ওরা জানালার কাছে আসছে বোধ হয়।

[ দুটি বোন ছু পাশের জানালায় এসে দাঁড়ালো।

তু'জনেই বাহিরের অন্ধকারের পানে

তাকিয়ে রইল অপলক দৃষ্টিতে ]

বৃদ্ধ। মাঝের জানালায় কেউ এল না ?

উষা। তু'জনে বাহিরের পানে চেয়ে আছে। হয়তো  
ওরা শুনেছে—

বৃদ্ধ। বড় বোনটি হাসছে—

অপরিচিত। ছোটটির চোখে ভীতিব্যাকুল দৃষ্টি—

বৃদ্ধ। কে বলবে আত্মা দেহের কতখানি অধিকার  
করে থাকে—

[ দীর্ঘ নিস্তব্ধতা। উষা বৃদ্ধের কোণে মাথা রাখলো। ]

উষা। দাদাভাই!

বৃদ্ধ। কেঁদোনা দিদি—লক্ষ্মিটি! কাদবার পাল  
আমাদের হয়তো একদিন আসবে।

[ আবার নিস্তব্ধতা ]

অপরিচিত। মেয়ে দুটি অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে  
আছে—

বৃদ্ধ। যদি শত শত বছরও এগিঁভানে ওরা চেয়ে থাকে

তাহলেও এই অন্ধকারের মধ্যে ওরা দেখতে পাবেনা কিছুই।  
ওরা চেয়ে আছে এদিকে কিন্তু ওদের বিপদ ঘনিষে উঠছে  
অগ্নিদিকে।

অপরিচিত। ওই পাহাড়ের দার নিয়ে কারা যেন  
এদিকে আসছে।

উষা। ওরাই বোধ হয় শব নিয়ে আসছে—দূর থেকে  
ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।

অপরিচিত। ওরা যখন পথের ওই উচু ভায়গাটায়  
আসবে, তাঁদের আলোয় তখন সবই দেখতে পাওয়া যাবে  
স্পষ্ট করে।

উষা। অনেক লোক আসছে। আমি যখন এলুম  
তখনও নতুন নতুন লোক এসে জড়ো হচ্ছিল। অনেকখানি  
পথ ওরা ঘুরে আসছে।

বৃদ্ধ। শেষ পর্যন্ত ওরা এসে পৌঁছবেই। ওদের  
আমি দেখতে পাচ্ছি ওই পাহাড়টার কাছে—ছোট ছোট  
পুতুলের মত দেখাচ্ছে, যেন কতকগুলো পুতুল তাঁদের  
আলোয় নাচছে। ওদের দেখলেও মেয়ে দুটি কিছুই বুঝতে  
পারবে না—বিপদ এগিয়ে আসছে কেউ তাকে থামাতে  
পারবে না। শত বাধার মধ্য দিয়েও বিপদ আসবে, যারা  
বিপদ নিয়ে আসছে, তারাও ওকে থামাতে পারবে না—  
তাদের ব'য়ে নিয়ে যেতেই হবে। নিজের পথ অদৃষ্ট নিজেই  
তৈরী করে নেয়।

উষা। দাদাভাই, দেখ বড় মেয়েটি আর হাসছেনা।

অপরিচিত। ওরা চলে গেল জানালা ছেড়ে।

উষা। ওরা মাঝের কাছে গেছে।

অপরিচিত। বড় মেয়েটি ধুমন্ত শিশুটির গায়ে আস্তে  
আস্তে হাত বুলাচ্ছে দিচ্ছে। ওদের বাবা ঘড়িটার পানে  
চেয়ে আছে।

উষা। দাদাভাই, আজ ওদের বলো না।

বৃদ্ধ। তুমি ক্রমশই সাহস হারাচ্ছ—ওদিকে আর  
চেয়োনা। এই আশী বছর বয়সে আজ আমি জীবনের  
সত্য বুঝতে পারলুম এই প্রথম। আর সকলের মত  
শীতকালে ওরাও আগুন পোহাচ্ছে, কিন্তু তবু যেন মনে হচ্ছে  
ওরা এ জগতের নয়। এর চেয়ে রহস্য জীবনে আর কি

আছে! ঘরের দরজা বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হয়ে ওরা বসে আছে, মনে করেছে দরজা বন্ধ করলে নিশ্চিন্ত আর আসতে পারবে না। কিন্তু জগৎ তো আর ওদের এই ঘরটার মধ্যেই শেষ হয় নি। ওরা জানেনা আমি বিপদের খবর এনেছি—ওদের দরজা থেকে কতটুকুই বা দূরে! ওদের অনিচ্ছিন্ন শাস্তিটুকু আমিই আজ আড়াল করে আছি আহত পাগাঁকে হাঁতের মধ্যে ধরে থাকার মত; ছেড়ে দিতে ভয় হচ্ছে!

উষা। আজ আর বলোনা দাদাভাই, ওদের ওপর একটু করুণা কর—

বুদ্ধ। ওদের উপর আগরী করুণা করতে পারি ভাই, কিন্তু আমাদের উপর তো কেউ করুণা করবে না।

উষা। কাল বলো দাদাভাই—সকাল হলে সূর্য উঠলে তারপর বলো, তা'হলে ওদের তত কষ্ট হবে না হয়তো।

বুদ্ধ। সত্যি দিদি, আজ রাতে ওদের এসব না বললেই হয়তো ভালো হয়! দিনের শোক লঘু হয়ে ওঠে, কিন্তু তা'হলে ওরা আমাদের বলবে কি? শেকসংবাদ সামান্য কারণেই মানুষকে ক্ষুব্ধ করে। যাদের কারুর মৃত্যু হয় তারা সকলের আগেই সে খবরটা জানতে চায়, অল্প লোক তাদের আগে জানলে তাদের কষ্ট হয় আরও বেশী।—শোকটাকে তারা সম্পূর্ণ নিভের করে রাখতে চায়! আজ এ খবর যদি ওদের না দি, তা'হলে ওরা মনে করবে ওদের সর্বস্ব বৃষ্টি আমি চুরি করে রেখেছিলুম।

অপরিচিত। গোপন করবার সময়ও নেই আর। শববাহকদের গুণনধরনি আমি শুনেতে পারছি।

উষা। ওরা পাহাড়ের নীচে এসে পড়েছেন।

[ আভার প্রবেশ ]

আভা। আমি ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলুম দাদাভাই, ওই পাহাড়ের নীচে ওদের অপেক্ষা করতে বলে এসেছি। ওর হাতের আংটিটা আমি নিয়ে এসেছি। তাকে মাচার উপর এমিভাবে ওইয়ে দিয়েছি যেন ধুমুছে। ফুলের মালা দিতে পারলুম না, ওখানে তো ফুল পাওয়া গেল না। ফুলগুলো এত এলোমেলো যে কিছুতেই সেগুলোকে গোছাতে পারলুম না। তোমরা এখানে কি করছো?—ওদের কাছে বসনি কেন? [ জানালার মধ্য দিগে ঘরের

ভিতরটা লক্ষ্য করে ] ওরা ত কেউ কাঁদছে না—এখনও ওদের বলনি বৃষ্টি?

বুদ্ধ। এখনও তুমি ছোট মেয়ে আভা, আনন্দপূর্ণ তোমার প্রাণ! তুমি বোঝ না।

আভা। কেন বুঝবো না আমি? [ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ] কিন্তু এতো ভালো করনি দাদাভাই!

বুদ্ধ। তুমি জানোনা আভা—

আভা। আমি বাই তা'হলে, আমি ওদের বলবো—

বুদ্ধ। একটি দাঁড়াও, ওদের পানে একবার চেয়ে দেখ।

আভা। কিন্তু আর তো চুপ করে থাকবার সময় নেই!

বুদ্ধ। কেন?

আভা। তা' জানি না, কিন্তু তা' অসম্ভব!

বুদ্ধ। এখানে এস আভা—

আভা। ওরা এখনও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে যে—

বুদ্ধ। ফিরে এস আভা—

আভা। [ ফিরে দাঁড়িয়ে ] তুমি কই দাদাভাই? আমার মাথা ঘুরছে, তোমায় তো দেখতে পাচ্ছি! কি করবো দাদাভাই, কিছুই তো আমি ঠিক করতে পারছিনি!

বুদ্ধ। ওদের পানে আর চেয়ো না, বতকণ না ওরা সব শুনেছে—

আভা। তোমার সঙ্গে যাবো আমি দাদাভাই!

বুদ্ধ। না দিদি, তুমি এখানেই থাকো। তোমার দিদির পাশে ওই পাথরটার উপরে বসো—ওদিকে চেয়ো না। তোমরা ছেলেমানুষ, এ দৃশ্য দেখলে কখনো ভুলতে পারবে না। তোমরা জাননা চোখে বধন মৃত্যুর ছায়া পড়ে, মানুষের মুণের ভাব তখন কেমন হয়। ওরা কেঁদে উঠবে হয়তো,—তবু ওদের পানে তাকিয়ে না। না হলে হয়তো কোন শকই হবে না ওখানে—যদি কোন শকই না হয় তা'হলেও ওদিকে তাকিয়ে না, সাবধান! শোকে মানুষকে কতখানি ব্যাকুল করে তোলে আগে থেকে কেউ তা বলতে পারে না, কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বুকের ভিতর থেকে—তাতেই সব শেষ হয়ে যায় সাধারণতঃ!

[ পাহাড়ের নীচ থেকে শববাহকদের অস্পষ্ট গুঞ্জন ধ্বনি  
ভেসে এল। কজন লোক বাগানেব মধ্যে প্রবেশ  
করলো তাদের কথা ও পদশব্দ শোনা গেল ]  
অপবিচিত। [ লোকগুলোর প্রতি ] জানালাব কাছে  
যেও না, খানে দাঁড়াও, শব্দ শোনায ?  
অনেক চান। ওরাবের পথ ধবে তাবা দবজাব দিকে  
গেছে।

[ বন্ধের প্রশ্নান ]

[ উমা ও খান পাখবের উপর বসলো। লোকগুলোর  
মনে অস্পষ্ট গুঞ্জন ধ্বনি হতে লাগলো ]  
অপবিচিত। [ লোক গুলোর প্রতি ] চুপ, কথা  
বলো না।

[ ঘবেব ভিতবে বড় মেয়েটি উঠে দবজাব কাছে

শিখর খিলটি ভালকরে দেখে এল ]

আভা। ওরা দবজা খুলছে।

অপবিচিত। খুলছে না, বন্ধ কবছে।

[ নিশ্চকতা ]

আভা। দাদাভাই এগনও ঘবেব মধ্যে যায় নি ?

অপবিচিত। না। সে মেয়েটি দবজা বন্ধ কবে এসে  
মানের কাছে বসেছে।

[ নিশ্চকতা ]

আভা। দিদি, তোমাব হাতটা দাও।

উমা। ভয় কব, আভা ?

[ ছ'বোন পরস্পরকে জড়িয়ে ধবলো ]

অপবিচিত। তোমাদেব দাদাভাই বোধ হয় দবজায়  
ধাক্কা দিয়েছেন—সবাই চমকে উঠে দবজার দিকে চেয়ে  
পরস্পরবের মুখেব পানে চাহছে।

আভা। দিদি আগাব কান্না পাচ্ছে—

[ উমাব বকে মুখ বেখে আভা কঁদে উঠলো ]

অপবিচিত। বোধ হয় আবার ধাক্কা দিয়েছেন,  
ধড়িটার পানে একবার তাকিয়ে ওদেব বাবা দবজাব পানে  
এগিয়ে যাচ্ছেন—

আভা। দিদি, আমিও যাই দিদি—

উমা। না, না আভা।

[ জোব কবে আভাকে ধরে রাখলো ]

অপবিচিত। ওদের বাবা এবার খুব সাবধানে দবজা  
খুলে দিচ্ছে—

আভা। আপনি ওদের দেখতে পাচ্ছেন ?

অপবিচিত। কাদেব ?

আভা। গাবা শব্দ আনছে ?

অপবিচিত। না। দবজাটা উনি একেবারে খোলেননি,  
একটু ফাঁক করেছেন মাত্র। আমি ওই উপত্যকাব  
খানিকটা অংশ আব ঝর্ণাটা ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছি।  
দবজাব ফাঁক দিয়ে তোমাদেব দাদাভাইকে দেখে ওদেব  
বাবা বলেন—‘ওঃ আপনি।’ তোমাদেব দাদাভাই ঘবের  
মধ্যে এলেন, ওদেব বাব দবজাটা আবাব বন্ধ করে  
দিলেন।

[ লোকগুলো জানালাব কাছে গেল, উমা আর আভাও  
গেল জানালাব কাছে। বৃদ্ধকে ঘবেব মধ্যে দেখা যাচ্ছিল।  
মা উঠলেন খুমস্ত শিশুটিকে ভাল কবে ওইয়ে রাখলেন;  
মেয়েটিও উঠলো। একটি মেয়ে বৃদ্ধকে বসতে বললো,  
বৃদ্ধ বসলো না, জানালাব পানে তাকিয়ে বইলো। গৃহস্থ  
বৃদ্ধকে এমন অসমবে আসতে দেখে বিস্ময়ভরা জিজ্ঞাসা  
দৃষ্টিতে তাব পানে তাকিয়ে বইলো।

অপবিচিত। তোমাদেব দাদাভাই বলতে সাহস  
কবছেন না, আমাদেব দিকে চেয়ে আছেন—

[ লোকগুলো অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি কবে উঠলো ]

চুপ।

[ লোকগুলোকে দেখে বৃদ্ধ জানালাব দিক হতে চোখ  
ফিবিয়ে নলেন। শেষে বসলেন হাতের  
উপর মাথা বেখে ]

তোমাদেব দাদাভাই বসেছেন।

[ ঘবেব ভিতবে সকলেই বসলো, তারপরি বৃদ্ধ বলতে  
আবশ্য কবলেন—হঠাৎ ঘবের ভিতরে।

সকলেই চমকে উঠলো ]

আভা। এইবার দাদাভাই বলেন বুঝি—

[ জানালাব কাছ থেকে সবে এসে দুহাতে

সে মুখ ঢাকলো ]



অপরিচিত। চুপ। \* এখনও বসেন নি।

[ ঘরের ভিতরে মা পথের দুপাশে পল্ল ক'বলেন কেনন  
যেন সন্ধিগ্ধভাবে, ন পব ঘবেব ফিলে সকলেই বুদ্ধকে  
প্রশ্ন কবতে লাগলো। ] 'বুদ্ধ ক'বললেন, 'কথা বললেন, শেষে  
মাথা হেলিয়ে জানালেন—হ্যাঁ। ]

\* এইবার উনি সব'ধনে ফেলেছেন—এককথায় সব বলে  
ফেললেন।

\* সকলে। ব'লে ফেলেছেন—ব'লে ফেলেছেন—

অপরিচিত। আমি কিছুই শুনেছি পাচ্চিন।

[ ঘরের ভিতর বুদ্ধ উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে সকলে উঠে

দরজা কাছের গেল। 'গৃহস্থ' ক'ম্পত হ'ল

দরজা খুলে দিলেন \* ছুটে বাহিরে

চলে যোচ্ছিলেন, ব'লি ব'লি দিলেন।

সকলে। ওবা বাহিরে আসছে—

[ বাগান থেকে বাহির হয়ে সকলে গেল দরজা দিকে, শুধু  
অপরিচিত লোকটিই দাঁড়িয়ে বইলো জানালার কাছে।

ঘবেব ভিতরেব সকলেই বাহিরে চলে গেল, শুধু

যুগ্ম শিশুটি ঘুমাতে লাগলো। অসীম

আকাশের দাক নক্ষত্রগুলো আলমল

কবছিন, চ' দেব আলোয় পাহাডেব

বুকে বর্ণাটি আগেব মতই

বয়ে যাচ্ছিল ন'মনি

ঝির ঝির কবে

স্বন্দব ভাবে ]

অপরিচিত। শিশুটি ঘুমাচ্ছে এখনও আগেব মতই !

[ নিন্দা চলে গেলেন ] \*

## বেকার সমস্যা

### শ্রী আশুতোষ সান্যাল

উদ্ভূত

কড়া নাড়ি শব্দ শুনে নন্দামণি দরজা কাছ দিয়ে  
দেখল—বাস্তব ওপব একখানা মোটর গাড়ী দাঁড়িয়ে,  
দুজন লোক অজামিলকে সঙ্গে এক চ'ন্দে লা কবে নিয়ে  
আসছে।

স্বামীব তাদৃশ অবস্থা দেখে নেস্ত গা একেবারে  
অস্বস্থি ধাবল'ক'বে দরজা কাছট দপনা একেবারে খুলে  
ফেল, চোকাঠের বাহিরে একে দাঁড়ায় গৌরবগে বলে  
উঠল—“এই দিন দুপবেও শান্ত হ'ল। হ'য়।—লজ্জা ব'লে  
কি একটা পদার্থও তোমাব নেহ—

অজামিল মাথাটা একটু উচু ক'বে কি বলতে গেল, কিন্তু  
—পরমুহূর্তে তার মাথাটা আবার নেতিয়ে পড়ল।

যারা তাকে ধবা-ধরি কবে আনছিল তাদের একজন  
বলল—“কিছু ভয় নেই মা—বিশেষ আঘাত লাগেনি—  
সামান্যই—”

“উঃ—মাঃ—বাবাবে”—অজামিল গোঁড়াতে লাগল।  
নিস্তার আঘাতের কথা শুনে উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল—“ব্যাপার  
কি ?—কি হয়েছে ?”

“বিশেষ কিছুই নয়—মোটরের একটু ধাক্কা লেগে  
বাবু—” লোকটার মুগের কথা শেষ হ'বাব আগেই নিস্তার  
চীৎকার করে উঠল—“হ্যাঁ—মোটর চাপা—ওরে বাবা—কি  
সর্বনাশ হ'লো গো—ওগো আমি কোথায় যাব গো—”

চীৎকার শুনে বাড়ীর জগন্নাথ বেরিয়ে এসে বলল—“কি  
—কি—কি হয়েছে বোদি—একি অজাদার এ অবস্থা কেন  
—যুব মদ খেয়েছে বুঝি—?”

“ওগো না গো না—মদ খাওয়া যে ছিল ভাল—এষে একেবারে সাফাং যম রে বাবা—”

সন্দের লোকটি বলল—“আপনি অধীর হবেন না, আঘাত সামান্যই লেগেছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ডাক্তার দেখেছেন পিঠে একটু ধাক্কা লেগেছে—তু এক দিনেই সেরে যাবে। উনি কিছুতেই হাসপাতালে থাকতে রাজী হলেন না, তাই বাবু নিজের গাড়ী করে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন।—হুদিন হাসপাতালে থাকলেই আরাম হয়ে বাড়ী ফিরতে পারতেন, কিন্তু কিছুতেই শুনলেন না, বললেন আমি মরি যদি তবে বাড়ীতে আমার জীব কোলে মাথা রেখেই মরব—তাই—”

নিস্তার এবার গলা ছেড়ে কঁদে উঠল—“ওগো এমনি ভালবাসাই আমাকে বাসে গো—”

অজামিল কাতরকণ্ঠে বলে উঠল—“না—না—হাসপাতাল নয়—পা কাটবে—পিঠ কাটবে—মরে যাব—মরে যাব—আমি বাড়ী যাব আমি নিস্তারের কাছে যাব—”

“এই যে গো আমি তোমার পাশেই রয়েছি—তুমি কথা বোলনা গো—”

ধরাধরি ক’রে অজামিলকে তার শয্যায় শুইয়ে দিয়ে লোকটি বলল—“কোন চিন্তা করবেন না আপনারা,—বাবু ডাক্তার খরচ যা লাগে সবই দেবেন। তা ছাড়া—যে কদিন ওঁর কাজকর্ম কামাই হয়—তাও পুষিয়ে দেবেন। বাবু তাঁর নিজের বড় ডাক্তারকেও পাঠিয়ে দেবেন—। খুব ভাল লোক—বড়লোক—আপনারা একটুও ব্যস্ত হবেন না—কালকের মধ্যেই উনি আরাম হয়ে উঠতে পারবেন।”

লোকটি যাবার সময় দশটা টাকা নিস্তারের হাতে দিয়ে নমস্কার করে বলে গেল—“কাল বাবু হয়ত’ নিজেই ডাক্তার সঙ্গে করে আসবেন। আপনারা একটুও ভাববেন না।”

লোকটি চলে গেলে নিস্তার কল্পিত কণ্ঠে বলল—“হীগো উঠে বসতেও পারছ না?”

অজামিল বিকৃত কণ্ঠে বলল—“উঃ নিস্তার আর মরার উপর খাড়ার ঘা দিও না—তার চেয়ে ঐ জগন্নাথকে দিয়ে মোড়ের বিধু ডাক্তারকে বরং ডেকে পাঠাও—”

“ঐ ছোড়া ডাক্তার—”

“আঃ যা বলছি, নিস্তার তাই কর,—আমাকে আর জামিওনা—শুনছো?”

“কিছু—”

“আবার বলে কিছু—বলি উঠবো?—জান রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না—উঠবো নাকি?” বলতে বলতে অজামিল উচু হয়ে উঠে দাঁত মুখ খিচিয়ে বলল—“যাও বলছি—যা বলছি তাই কর—”

“এই না বললে তোমার পিঠের শিরদাড়া ভেঙে গিয়েছে—”

“বলি ভাঙলেই কি বাঁচতে”—বলতে বলতে অজামিল পুনরায় বিছানার উপর ধপাস ক’রে শুয়ে পড়ে কাতরাতে লাগল।

নিস্তার আর বাক্যব্যয় না করে ডাক্তার ডাকাবার বন্দোবস্ত করতে জগন্নাথের খোজে গেল।

### পঞ্চ

দশ্য অজামিল মৃত্যুকালে নারায়ণের নামকরে নরকের রাজাকে ফাঁকি দিয়েছিল, আর অজামিল চক্রবর্তী দুনিয়ার হাটে ফাঁকি দিয়ে বেচাকেনা ক’রে—দিন কাটিয়ে দেবার ফিকিরে ঘুরত। বাল্যকাল হ’তে সে এই নীতি অবলম্বন করেই চল্লিশ বছর কাটিয়ে দিয়েছে। ফাঁকির কারবারে সে যে একজন পাকালোক, তা যে তার কাছে ঠকত সে মুক্ত কণ্ঠেই স্বীকার করে যেত। এ হেন অজামিল—যে মোটরের ধাক্কা খেয়ে—নীরবে হজম করবে, একথা একেবারেই—পৃথিবীর অন্ততম আশ্চর্য্য বস্তুর মতন!

জগন্নাথ মোড়ের বিধু ডাক্তারকে ডেকে আনল। ডাক্তার অজামিলকে দেখে ঔষধের ব্যবস্থা পত্র লিখে দিয়ে চলে গেলে জগন্নাথ অজামিলের কাতরানি আর গোতানী দেখে জিজ্ঞাসা করল—“হী দাদা—আঘাতটা কি বড় লেগেছে—”

“নাঃ—সখ করে বিছানায় পড়ে তামাসা করছি! যাও—যাও—তোমার আর আদিখ্যাতা করতে হবে না—আপন চরকায় তেল দাওগে—”

অপ্রস্তুত জগন্নাথ—আমতা আমতা করে বলল—“না

দাদা তাই বলছিলেন—কোথায় ব্যাথাটা বেশী লেগেছে তাই জিজ্ঞাসা করছিলেন—”

অজামিল চোক বুঁজে বলল—“সর্ব্বাঙ্গে! আচ্ছা যাও আমাকে একটু ঘুমুতে দাও—”

জগন্নাথ চলে গেল। নিস্তার এসে জিজ্ঞাসা করল “কি খানে?”

“তোমার মুণ্ড—মামুষ খায় কি?”

“আমার মুণ্ড ত আজ বিশ বছর ধরেই খাচ্ছ’—ডাক্তার বলে গেল—শুধু দুধ সাবু—তাই বলতে এলাম—”

“দুধ সাবু তোমার ঐ ফচকে ডাক্তারকে পেতে বলগে, পাঁচ সিকের ডাক্তার—ও জানেই বা কি আর বোঝেই বা কি? হাসপাতালের ডাক্তার বলল—মাংস কুটী খেতে আর ঐ হেতুতে বেটা বলে কিনা—দুধ সাবু—আমি কচিথোকা—দুহু খাব—”

“তা মামুষের অস্থখ কবলে—”

“অস্থখ আবাব কি? পিঠের ভেঙ্গেছে শিরদাড়া তার পেটের অপবাধ কি?”

“আচ্ছা তবে তাই খেও। তুমিই ওকে ডাকতে বললে আবাব তুমিই বলছ—পাঁচসিকের ডাক্তার। যা ভাল বোঝ কর”—বলে নিস্তার মুখ খানাকে দ্বিগুন গম্ভীর কবে চলে গেল।

### নেত্র

পরদিন একজন ডাক্তারকে নিয়ে পূর্ণ দিনের সেই মোটবেব অধিকারীর লোকটি বেলা দশটার সময় এসে উপস্থিত হল। ঔষধের খালি ও ভর্তি শিশি, সাবুর বাটী, চাষের কাপ, ঔষধ খাওয়ার গেলাস, থারমোমিটার প্রভৃতি দিয়ে রোগীর ঘবেব আবহাওয়া ঠিক তৈরী করাই ছিল। ডাক্তার এসে প্রায় আধঘণ্টা পরীক্ষা করে জিজ্ঞাসা করলেন—“খুব বেদনা আছে কি?”

অজামিল কাতব কণ্ঠে বলল—

“না—তবে উঠে দাঁড়াতে পারছি না, আর মাঝে মাঝে এমন চিড়িক মারছে যে—উঃ—আঃ—বাবারে—”

ডাক্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রোগীর মুখের পানে চেয়ে বললেন

“ভয় নেই কিছু; দু একদিনের মধ্যেই ভাল হয়ে যাবেন। আমি একটা মালিশ লিখে দিয়ে যাচ্ছি—সেইটে মালিশ করলেই সব সেরে যাবে।”

দরজার আড়াল থেকে চাপা গলায় নিস্তার বলল—  
“বড় ভীত হয়ে পড়েছেন উনি, আজ সকালে উঠতে গিয়েছিলেন কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়ান দূরের কথা—ভাল কবে খেতেই পাবেন না। আমরা গরীব লোক বাব—ওর বাড়ীতে বসে থাকলে কি আমাদের চলবে—?”

“না—না—ভীত হবাব কিছু নেই—মুখ চোখ বেশ প্রফুল্ল আছে—”

ডাক্তারের মুখেব কথা কেড়ে নিয়ে কণ্ঠকণ্ঠে অজামিল বলল—“আজ্ঞে—আমার আঘাতটা লেগেছে পিঠে—মুখে নয়—”

ডাক্তারের মুখে হাসি ফুটে বেরুল, তিনি হাসতে হাসতে বললেন—“হাঁ—হাঁ—ও পিঠের ব্যথা পেটে গেলেই সেরে যাবে। কিছু ভয় নেই—”

অজামিল কাতর স্বরে বলল—“আজ্ঞে সেই কথাই বলছিলাম। অক্ষয় হয়ে পড়ে থাকলে আমাদের ক’লাব পেট চলে ডাক্তারবাবু—?” অপর লোকটি বলে ওঠে—  
“না—না বাবু—সে বাবস্তাও করেছেন”, বলতে বলতে সে পকেট থেকে একতাড়া নোট বের কবে বলল—“এতে দুশো টাকা আছে—এই টাকা নিয়ে এই কাগজটায় একটা মত করুন যে আপনার আর কোন দাবী দাওয়া নেই—”

অজামিল যেন একেবারে গাছ থেকে পড়ল। অবাক হয়ে বিস্মারিত চক্ষে লোকটার মুখের দিকে চেয়ে বলল—  
“টাকাই বা কেন আর—সই বা কিসের। আপনারা যখন বলছেন আঘাতটা কিছুই নয়—সামান্যই—হুদিনেই সেরে যাবে, তখন—এই দু চার দিনের মধ্যে আমার মত এগুটা লোকের বসে থাকার দাম—দুশো টাকাই বা কি করে হবে। কিছু না বাবু—গরীব বটে, তাই বলে লোককে ঠগিয়ে নেওয়া আমাদের ব্যবসা নয়—আপনারা আসুন, নমস্কার—গরীবের পিঠের শিরদাড়া—ওর আর দামই বা কি—দু চার দিন—না হয় দুমাস!—দিন আমাদের দুঃখে কণ্ঠে কেটেই যাবে।—আপনার বাবু চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাকুন,

খনদৌলতে তিনি রাজা হন, দশখানা মোটরগাড়ী হোক। আমাদের টাকার লোভ দেখাবেন না বাবু—আমরা গরীব বটে কিন্তু—বলতে বলতে অজামিলের কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল, তার দুই চক্ষু বয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সে গায়ের চাদরখানা দিয়ে চোখ মুছে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল—“আমুন আপনার!—নমস্কার—”

ডাক্তার বাবু এবং ডাক্তারলোকটি তাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু অজামিল কোন কথাই শুনল না। নিরুপায় হয়ে তাঁরা প্রস্থান করলেন।

তাঁরা চলে গেলে অজামিল নিজের মনে গর্জন করতে লাগল, “ভারী আমার দাতা—দুশো টাকা নিয়ে সকল দাবী ছেড়ে দাও—!”

নিস্তার বলল—“কিন্তু দু দুশো টাকা এই দুঃসময়ে—”

“দু দুশো টাকা—! দেখ নিস্তার মুখ বুঁজে বসে থাক—সব কথায় কথা বলতে এসনা বলছি—দুশো টাকার জন্তে আমি আমার পিঠের শিরদাড়া ভাঙতে যাইনি। অজামিল শর্মার একটা কোড়ে আজুলের দাম দুশো টাকার ঢের বেশী। একটি হাজার টাকা আদায় না করে অজামিল শর্মা শয্যাভ্যাগ করছেন না—বুঝলে?”

“এক হাজার?”

“নয়ত’ কি!—সেদিন খবরের কাগজে পড়ছিলাম একটা লোকের একখানা পা সামান্য জখম হয়েছিল বলে তাকে একটি হাজার টাকা আদালতে দাঁড়িয়ে শুনে দিতে হয়েছিল,—আর আমার হচ্ছে—শিরদাড়া!—হয়ত বা সারা জীবনই বিছানায় শুয়ে কাটাতে হবে!”

“তুমি কি সারা জীবন বিছানায় শুয়ে কাটাবে না কি?”

“দাঁড়াও না—টাকাটা আগে হাতে আনুক তারপর সে হিসেব করব—তখন বলব কতদিন শুয়ে থাকব। এত ঘন ঘন আসবার মানে কি?—দর কসছে বইত নয়। পুলিশে গাড়ীর নম্বর নিয়েছে—গরীব পেয়ে ভেবেছে—ঠকাবে—হঁ—”

বোদ

পর পর চারদিন কেটে গেল—আর কেউ কোন প্রস্তাব

নিয়ে এল না। অজামিল একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল, মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও—মনে মনে সে ভাবছিল—দুশো টাকা ছেড়ে দেওয়া উচিত হয় নি—একটু মোচড় দিলে আরও দু একশো টাকা হয়ত বাড়ত! বাইরে কিন্তু সে একটুও দমল’ না, বরং নিস্তারকে রোজই বলত—রফা করতে তাদের যত দেরী হবে, তার দাবীও তত বেড়ে চলবে চাই কি শেষ পর্যন্ত পাঁচ হাজারেও উঠতে পারে! সবুজ মেওয়া ফলে।

পাঁচ দিনের দিন সন্ধ্যাবেলা নিস্তার রোগীর ঘরে ঢুকে দেখল—অজামিল একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গায়ে অলষ্টার, মাথার ওপর দিয়ে আলোয়ান খানা জড়িয়ে মুখের আধখানা ঢাকা! নিস্তার অবাক! তার মুখ দিয়ে কোনকথা বের হবার আগেই অজামিল বলল—“দুটো টাকা দাও দিকি—খালধারটার একটু বেড়িয়ে আসি, তা ছাড়া—কদিন এক ফোঁটাও পেটে পড়েনি—নাড়ী ভুঁড়ি শুকিয়ে একেবারে দড়ি হয়ে গিয়েছে—”

নিস্তার বাধা দেবার অনেক চেষ্টা করল কিন্তু সব ব্যর্থ! অজামিল তার ভাষা শিরদাড়াকে সোজা করে’ অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

নিস্তার ঘরের কাজকর্ম সেরে—উত্তনের ধারে বসে আঙুন পোহাছিল আর ভাবছিল—মিনেবে শুলো কেন কি?—মদের নেশা মাথায় চাপলে—ব্যারামের কথা পর্যন্ত তাদের মনে থাকে না—আশ্চর্য্য! একলাটি বসে নানক-চিন্তার মধ্যে তার একটু তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ বাইরের কড়া নাড়ার শব্দে চমকে উঠে সে অজামিল কিরে এসেছে মনে করে তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলতেই দেখল—অজামিল নয়, দুজন অপরিচিত ডাক্তারলোক! সে তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে দরজার পাশে সরে দাঁড়াতেই একজন বলল—“আমরা অজামিল বাবুকে একবার দেখতে এসেছি মা—আমার সঙ্গে ইনি হচ্ছেন মেডিকেল কলেজের বড় ডাক্তার।” সর্বনাশ! নিস্তার চোখে আঁধার দেখল! কি বলবে কিছুই স্থির করতে না পেরে অবশেষে বলল—“তিনি এই খানিকক্ষণ হল একটু ঘুমিয়েছেন, সারাদিন পিঠের ব্যাথায়—”



“তা হোক আমরা তাঁকে জাগাবো না—একবার দেখেই চলে যাব—”

“এখন—এখন ত’ কিছুতেই দেখা হতে পারে না—তার চেয়ে আপনারা বরং কাল সকালে আসবেন—”

“এখন কি তিনি বাড়ী নেই?”

নিস্তার তাড়াতাড়ি বলে উঠল—“না—না—বাড়ী আছেন বৈ কি? তাঁর কি উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা আছে—সারা দিন বিছানায় পড়ে ছটকট করছেন—”

“বেশ আমরা একবার উঁকি মেরে দেখেই চলে যাব—তাতে বোধ হয় আপনার আপত্তি নেই—”

“আচ্ছা আপনারা একটু অপেক্ষা করুন—দেখি তিনি জেগে আছেন কি ঘুমুচ্ছেন—”

উত্তরের অপেক্ষা না করে নিস্তার দ্রুতপদে বাড়ীর পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে একেবারে পাশের বাড়ীতে জগন্নাথের ঘরে গিয়ে হাজির হল। জগন্নাথ হারিকেন আলিয়ে কি একখানা বই পড়ছিল—নিস্তারকে দেখে সে বলে উঠল—“একি বৌদি—তুমি—দাদা কেমন, ভাল আছে ত?”

“সবই ভাল ভাই, তবে বড় বিপদ—তুমি একবার শিগ্গির এস—”

“ব্যাপার কি?”

“চল যেতে যেতে বলছি”—বলে নিস্তার একরকম জোর করেই জগন্নাথের হাত ধরে টেনে নিয়ে এল!

### বাঁন

“শিগ্গির শিগ্গির তোমার দাদা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়’—মনে থাকে যেন তুমি খুব ঘুমুচ্ছ—নাও—নাও আর দেরী কোর না—”

জগন্নাথ অবাক হয়ে নিস্তারের দুগপানে চেয়ে বলল—“কিন্তু—যদি চিনতে পারে যে আমি দাদা নই—”

“না—না সে ভয় নেই এরা নতুন লোক আজই প্রথম এসেছে—আগে শুয়ে পড় ভাই—ঘুমোও—কোন ভয় নেই, নাও—নাও ওরা আবার কড়া নাড়ছে—মনে থাকে যেন তোমার শিরদাঁড়া ভাঙা—”

জগন্নাথকে একরকম জোর করে বিছানার উপর শুইয়ে

দিয়ে বাইরে গিয়ে আগন্তুকদের বলল—“তিনি একেবারে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন, কদিনের মধ্যে আজই একটু চোখের পাতা বুজেছেন। যদি দেখেই চলে যান তবে আহ্ন—দয়া করে গোল ক’রে ওঁর ঘুম ভাঙাবেন না—”

“না—না—আমরা ওঁকে বিরক্ত করব না—শুধু একবার দেখেই চলে যাব—”

নিস্তারের সঙ্গে উভয় আগন্তুক পা টিপে টিপে এসে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখল—অজামিল শব্দা বিছানার উপর নিম্পন্দ হয়ে পড়ে আছে। ডাক্তারবাবু বললেন—“আচ্ছা আমরা এখন যাই—অল্প সময় যখন উনি জেগে থাকবেন তখন আসব—এসে সব ব্যবস্থা করে যাব। ইনি ভবিষ্যৎ বাবুর ম্যানেজার—আচ্ছা আসি—নমস্কার—”

উভয়ে মোটরে ক’রে চলে গেল। নিস্তার ঘরে এসে জগন্নাথকে বলল—“ওদের চাউনি ভাল নয় ঠাকুর পো—তুমি শুয়েই থাক—কি জানি যদি চালাকী ক’রে কাছে লুকিয়ে থেকে আবার হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়!”

“বেশ—তাহলে তুমি আমার ঘরটায় চাবি দিয়ে এস।”

জগন্নাথের ঘরে চাবি দিয়ে সব বন্দোবস্ত ক’রে নিস্তার ফিরে এসে তার সঙ্গে গল্প করতে লাগল।

রাত দশটার সময় আবার কড়া নাড়ার শব্দ—নিস্তার তাড়াতাড়ি জগন্নাথকে শুইয়ে দিয়ে বাইরে গেল। এবার আর ডাক্তার নয়—রোগী স্বয়ং,—বেশ তৈরী অবস্থায় এসে উপস্থিত! অজামিল জড়িত স্বরে বলল—“খবর ভাল ত? ব্যাপার কি—অগন চোরের মতন চাইছ কেন?”

নিস্তার তাকে বাড়ীর ভেতর ঢুকিয়ে দরজায় খিল এঁটে দিয়ে ম্যানেজার ও ডাক্তারের আসার কথা বলল।

নিস্তারের কাছে সব শুনে, অজামিল একেবারে জ্বলে উঠল। সমস্ত ঝালটা গিয়ে পড়ল বেচারী জগন্নাথের উপর। ঘরের ভেতর ঢুকেই অজামিল চীৎকার করে উঠল—“ওঠ্ আমার বিছানা থেকে—এত বড় আন্দোল—আমার বিছানায়—”

“কি হ’ল দাদা—তোমারই ভালর জন্তে—”

“থাক—থাক—আর ভালর কাজ নেই! খাসা চাল চলেছ বাবা—একটা পাইট মাত্র খেতে যেটুকু সময়—এরই

মধ্যে পাড়ার লোক এসে একেবারে শয্যা দখল! ওঠ, বলছি শীগ্গির—”

জগন্নাথ বিছানার উপর উঠে বসে বলল—“পিঠের ব্যথা কেমন আছে দাদা?”

“নিপাত যাক্ তোর পিঠের ব্যথা, আগে উঠে বাইরে যা—তারপর অন্য কথা—। আধ ঘণ্টার ভেতর শয্যা অধিকার—আ—”

জগন্নাথ বেগতিক দেখে ধীরে ধীরে প্রস্থানোত্ত হতেই নিস্তার তার হাত চেপে ধরে বলল—“না—না—তোমার কিছুতেই যাওয়া হতে পারে না ঠাকুরপো! ওগো শুনছো—সেই ম্যানেজারবাবু আর বড় ডাক্তারবাবু আবার যে আসবে ব’লে গিয়েছে—”

“আসুক না—একবার কেন—হাজার বার আসুক—অজামিল শর্মা বাকুর একচালায় বাস করে না—”

“কিন্তু তারা ঠাকুরপোকেই তুমি বলে দেখে গিয়েছে—তার খোজ রাখ কি?”

“কি?” অজামিল গর্জন ক’রে উঠল—“কি? আমি জগা?”

“বলি দেখতে পাচ্ছ না দাদা—তোমার পিঠের ব্যথা নিয়ে আমি যে এখন ভুগছি—”

“উহ তা হতেই পারে না—জগা কিছুতেই আমি হতে পারে না—ঐ ক্যাডাভারাস্ চেহারা নিয়ে জগা হবে অজামিল শর্মা—কতি নেই! জগন্নাথ কিছুতেই অজামিল হতে পারে না। বেটা জগন্নাথ—মুলো—থ্যাবড়া নাকি—হু পাশে ছুই কলাগাছ মাঝখানে—আরে ধৎ—নিস্তারের পছন্দ বটে—”

“মরণ আর কি—! ঠাকুরপো ভালমাসু তাই তোমার উপকার করতে এসেছে নইলে—মরুগ গে যাক্—যা ভাল রোখ কর—ওর মন ভাল তাই এখন তোমার গালাগাল হজম করছে—নইলে”—বলে নিস্তার অন্যদিকে মুখ ফেরাল। ‘অজামিল উত্তেজিত ভাবে পদচারণ করতে লাগল।

জগন্নাথ বলল—“আমাদের বাড়ীতে বরং কালকে বলে এস রৌমি যে—যে কদিন দাদার অস্থখ না সারবে—আমি

এখানেই থাকব। ভাগ্গিস্ আগি নিকেজো বাড়ীতে বসে আছি তাই—নইলে কি—”

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অজামিল গর্জন করে উঠল—“নইলে কি?—আগি মরে যেতাম?”

নিস্তার এবার স্বর সপ্তমে চড়িয়ে বলল...“মরতে না, তবে ধরা পড়তে—সব ছোক্তরী ধরা পড়তো—মোটরের ধাক্কা বিছানায় শুয়েছিলে, পুলিশের ধাক্কা জেলখানায় যেতে। কতগুলো লোক কতবার দেখে গেছে তার হিসেব রাখ? কে কখন আসবে তার ঠিক কি! এরা যদি আসে ত’ ঠাকুরপোকেই শুতে হবে বিছানায়—নইলে দেখে গেল জগন্নাথকে আর ফিরে এসে দেখবে—বলরাম! খাসা বুদ্ধি! মাতালের ঘটে আর কত বুদ্ধি হবে—। মরণে যাও—যা ইচ্ছা করগে। আগার কি—আগি দাসী বইত নয়”—বলতে বলতে নিস্তারের চোখে জল গড়িয়ে পড়ল। আঁচল দিয়ে চোখ ঢেকে সে ফোপাতে লাগল।

জগন্নাথ বলল—“দাদা তুমি বুঝ না, উপস্থিত দুজন অজামিল তৈরী ক’রে রাখতেই হবে,—যারা তোমাকে দেখে গিয়েছে তারা যদি আসে তা’হলে তোমাকেই শিরদাড়া ভেঙ্গে শুতে হবে—আর যারা আমাকে দেখে গিয়েছে তারা যদি আসে তবে আমাকেই রোগী সাজতে হবে—উপায় কি?”

নিস্তার বলল—“আর দাঁড়িয়ে কাজ কি—জামা কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়’—নইলে বেশীক্ষণ দাঁড়ালে আবার যদি পিঠে ব্যথাটা চাড়া দিয়ে ওঠে—”

“আচ্ছা—আচ্ছা—তুমি যাও শোওগে”—বলে নিস্তারকে শুতে পাঠিয়ে দিয়ে অজামিল অলষ্টারের পকেট থেকে একটা পাইট বের করে বলল—“খাবি একটু—জগা—”

“কি—মদ?”

“না—লেবেনচুস্—শ্রাকা ব্যাটা—মদের বোতলে থাকবে সীতেভোগ—”

“না দাদা ও জিনিষ আমার হজম হয় না—”

“তবে যা”—বলে বোতলে মুখ লাগিয়েই অজামিল ছটোক্ খেলে, আবার বোতলটা পকেটে রেখে জামা কাপড় ছেড়ে চামর মুড়ি দিয়ে জগন্নাথের পাশে শুয়ে পড়ল।

## শত্ৰু

পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউ এল না। সন্ধ্যার পর জগন্নাথ বলল—“দাদা—হয়ত তারা আমার হুঁটা খানেক নাও আসতে পারে। তোমার পক্ষে অবশ্য কোন ভাবনা নেই—যাহোক কিছু পাবে, কিন্তু আমি কি দাদা শুধু শুধুই এই রোগ যন্ত্রণা ভোগ করব?”

“সে তুই আমার উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক জগা,—আমি যদি কুড়ি টাকা পাই তোর দশ—”

“আর যদি বেশী পাও?”

“সে তখন দেখা যাবে—তোকে ঠকাব না—”

“বেশ। আমার সঙ্গে যদি ভাল ব্যবহার কর, আমিও দাদা অকৃতজ্ঞ নই—ছমাস ঘরে বসে আছি—এক পয়সাও রোজগার নেই! বাড়ীওয়ালার চারমাসের ঘরভাড়া বাকি, তাই—নইলে শুয়ে থেকে তোমার একটু উপকার করব—এর অণ্ডে আর ভাগাভাগি কি?”

অজমিল তাকে আশ্বাস দিয়ে পুনরায় বলল—“কুছ পরোয়া নেই, আমি যতক্ষণ আছি তোর কোন ভাবনা নেই—আমার উপর ছেড়ে দিয়ে তুই নিশ্চিন্ত থাক—”

রফা হল। দুজনে নিশ্চিন্ত মনে গিছানায় শুয়ে থাকে! অজমিল গান গায়, জগন্নাথ তক্তাপোষ বাজিয়ে তাল দেয়!

এক—দুই—তিন—চার দিনের দিন সন্ধ্যার সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল। নিস্তার সদরে গিয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে দেখে, দৌড়ে ভেতরে এসে বলল—“ঠাকুর পো তুমি—তুমি—তোমার লোন্ডেরাই এসেছে”—বলেই সে বাইরে চলে গেল। জগন্নাথ চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। অজমিল পুনঃ পুনঃ তাকে পিঠের বেদনা সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়ে, প শেষ ঘরে গিয়ে আত্মগোপন করল।

ম্যানেজার বাবু ডাক্তার বাবুকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। নিস্তার দরজার পাশে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ডাক্তার বাবু রোগী দেখে বললেন—“এই যে বেশ সেরে উঠেছেন দেখছি—”

ম্যানেজার বাবুও বললেন—“হ্যাঁ সে দিনের চেয়ে ভালই দেখছি—”

নিস্তার দরজার আড়াল থেকে নিম্নস্বরে বলল—“উঠতে আর কৈ পারছেন—পিঠের ব্যথাটা কিছুতেই ত কমছে না!”

ডাক্তার বললেন “দেখি—”

জগন্নাথ অতিকষ্টে পাশ ফিরল, ডাক্তার পরীক্ষা করে মুহূ হাসোর সঙ্গে বললেন—“কতদিন ইটা হয় নি—”

জগন্নাথ বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলল—“আজ্ঞে সেই খাঁকা লাগার দিন থেকে আর উঠে দাঁড়াতে পারিনি।”

“হঁ—আচ্ছা একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা কর দিকি—”

“দাঁড়াব কি ডাক্তার সাহেব—উঠে বসতেই পারি না—শুয়ে শুয়েই—পায়খানা—”

“হাঁ হাঁ উঠে বসতে পারনা তা জানি—সে কি আর আমি দুজনে পারছি না। একবার চেষ্টা কর দিকি ছোট ছেলেরা যেমন করে।—আমি দব ব্যথা আরাম করে দিচ্ছি—এখনি তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেব—”

ডাক্তার সাহেব ম্যানেজারের কানে কানে কি বলতেই তিনি পকেট থেকে একতাত্তা নোট বের করে ডাক্তার সাহেবের হাতে দিলেন। ডাক্তার সাহেব বললেন—“এতে আড়াইশো আছে—উঠে বসে শুনতে পারবে এগুলো—গোন দিকি!”

জগন্নাথের চোখ দুটো উজ্জল হয়ে উঠল। ডাক্তার সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন—“আর যদি উঠে এসে আমার হাত থেকে নিতে পার তা হলে সবগুলো তোমার নাও—দেখি—কেমন পার নিতে—।”

“সত্যি সবগুলো আমার?”—আনন্দে জগন্নাথের গলা দিয়ে কথাগুলো সব একসঙ্গে বেগে এসে, সে একলাফে বিছানা থেকে নেচে পড়ে পপ করে ডাক্তার বাবুর হাত থেকে নোটের তাত্তা নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল। নিস্তার লজ্জা সরম ভুলে হাঁ হাঁ করে ঘরের ভেতর ঢুকে বলে উঠল—“তোমার পিঠ—তোমার পিঠের ব্যথা—শুয়ে পড়—শুয়ে পড়—”

“আমার সব ব্যথা গিয়েছে—আর একটুও ব্যথা নেই—ডাক্তারবাবুর মন্ত্রে সব ব্যথা দেশ ছাড়া হয়ে গিয়েছে।”

ডাক্তারবাবু বললেন—“ভয় নেই মা ঠুঁর শিরদাঁড়া আবার সোজা হয়ে গিয়েছে আর ভয় নেই—”

ম্যানেজার বাবু একখানা কাগজ এবং একটা ফাউনটেন-  
পেন বের করে বললেন—“একটা সহি করে দিন—তা হলে।”  
জগন্নাথ একটানে শ্রীমজামিল চক্রবর্তী সহি করে বলল—  
“চলুন আপনাদের বাড়ীতে গৌছে দিয়ে আসি—শিরদাড়াটার  
পরীক্ষাটাও হয়ে যাবে—”

ডাক্তার বাবু সহাস্য বদনে বললেন—“এস এস—যদি  
কোন দোষ থাকে তাও সেয়ে দিয়ে যেতে পারব—”  
তিনজনে অগ্রসর হলেন, নিস্তার কি করবে ভেবে না

পেয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অজামিল পাশের  
ঘরের ভেতর, পিঞ্জরাবদ্ধ বাঘের মত ছটফট করছিল।  
জগন্নাথ ঘরের দরজার বাইরে একখানা পা দিয়ে নোটের  
তাড়া থেকে একখানা দশটাকার নোট নিয়ে অজামিলের  
দরজার দিকে উড়িয়ে দিয়ে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে সঙ্গে বাইরে  
চলে গেল। অজামিল ঘরের ভেতর থেকে দৌড়ে বাইরে  
এসে দেখল—মোটর চলে গিয়েছে—সেই সঙ্গে জগন্নাথও  
বোধ হয় বেকার সমস্যার সমাধান করতে হারিয়ে গিয়েছে।

—•—

## “তিমির দিগ ভরি যোর আশিনী অথির বিজুলিক পাতিয়া”

—বিজ্ঞাপতি

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য বি, এ  
গগন মেঘে মেঘে নিবিড় কালো,  
হেরিয়া আজি বড় লাগিল ভালো।  
তৃষিত মন মোর ছুটিয়া চলে,  
চাতক পাখী সম জলদ-তলে।  
প্রকৃতি এলায়েছে চিকুর রাশি,  
আননে চমকিছে মধুর হাসি।  
অসীম জলধি ঐ গগনে আঁকা,  
মুকুতা মণি শত অতলে ঢাকা।  
আজিকে মন মোর থির না মানে,  
নয়নে যেন কেবা নয়ন হানে।  
সজল চাহনিটি শীতল লাগে,  
মিলন-মুখ-অশা হৃদয়ে জাগে।  
জমাট মেঘরাশি নিবিড় কালো,  
এলো কি ‘কালো’ হেথা বাসিতে ভালো !

\*স্বাক্ষর\*



শ্রীমণীলকুমার ধর

হাসিমুখে পাশের লোকটির দিকে 'কিরিয়া মমতা বলিল—  
if you don't mind, Mr. Senyal, বাজ নশ যিনিট...

তাহার পর মিষ্টর সানিয়ালের হাতের উপর হাত রাখিয়া আর একবার মুখ হাসিল।

রিষ্ট ওয়াচের দিকে একবার তাকাইয়া মিষ্টর সানিয়াল উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আর একবার ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিলেন—It's eighteen to nine, that means up to eight to nine, alright...

মিষ্টর সানিয়াল পিছন ফিরিতেই মমতা ও নরেন দুইজনই একবার পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া তখনই দৃষ্টি আনত করিয়া অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল—এবং একটি কথাও না কহিয়া দু'মিনিট কাটিয়া গেল। হঠাৎ সময় সম্বন্ধে সচেতন হইয়া নরেন মমতার দিকে তাকাইয়া বলিল—এরি মধ্যে বেশ জমিয়ে নিয়েছ ত!

মুগ তুলিয়া মমতা নীরবে নরেনের মুখের দিকে কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকাইয়া রহিল, তাহার পর বলিল—একাত্তিতে এসেই দেখলাম ইনি যেন এতদিন আমার জন্তেই অপেক্ষা করে আছেন, আই সি-এস; আজকের বাজারে অনেকের চেয়ে দামও বেশী—তাই না বলার কারণ পাইনি—

—Congratulations, মমতা দেবী!

—ধন্যবাদ, আর কোন কথা আছে কি?

কথা আর কি—তবে তোমাকে বত দেখছি ততই মনে হচ্ছে—‘ই ত’ মাত্র আটদিন, এরি মধ্যে ভালবাসার অত পাহাড় কি কোরে ডিঙিয়ে এলে!

বিরক্তির স্বরে মমতা বলিল—দেখুন, এসব আলোচনা করবার ত সময় আমার নেই, তা ছাড়া—

মমতার কথা শেষ হইবার পূর্বেই নরেন বলিল—কিন্তু তুমি ত জানতেই, আমি কাগজের রিপোর্টার নই, আমার নাম নরেন, যার কাছে টেণে, হাসপাতালে ভালবাসা জানিয়েছিলে, যাকে হারাবার ভয়ে একদিন তোমার চোখে জল ধোরত না—

অবজ্ঞাতরে নরেনের মুখের উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া মমতা বলিল—ভিখারীকে ফিরিয়ে না দিয়ে আশ্বাস দেওয়ায় বোকামী হ'য়েছে, কিন্তু আর নয়, আপনি এবার যেতে পারেন—

মমতার ঔৎসাহ্য দেখিয়া নরেন তরক হইয়া গেল!

এতখানি রুচতার কথা সে ভবিতোও পারে নাই। মমতার মুখের দিকে তাকাইয়া নরেন ভাবিল, এই রুচভাষিনী মেয়েটিই তাহাকে প্রেমের প্রলোভন দেখাইয়া বিশ্বাসঘাতক করিয়াছে এরই জন্তে সে সকল সঙ্কোচ সকল লজ্জার কথা ভুলিয়া এখানে ছুটিয়া আসিয়াছে! মাত্র আটদিন পূর্বে যে মেয়েটি কল্প মিনতিভরে তাহাকে প্রেম নিবেদন করিয়াছে—আজ সেই তাহার সামনে দাঁড়াইয়া নিজেকে অন্তের প্রণয়িনী বলিয়া প্রচার করিতেছে! চমৎকার...

এই ত প্রেম! নরেন তোমার ছেলেবেলাকার সাথী প্রথম যৌবনের প্রিয়াদের মনে পড়ে? নির্মলা, শোভনা, সাধন—চঞ্চলা হরিনীর মত নির্মলা, রহস্যময়ী শোভনা আর একান্ত সাধারণ সাধনা...

নরেন কে নীরব দেখিয়া মমতা বলিল—আপনি যদি আশা কোরে এসে থাকেন সেদিন আপনার হঠাৎ চলে যাওয়ার যে কোন একটা কৈফিয়ৎ দিলেই আবার আমি আপনার পায় ধরে প্রেম জানাব, তাহ'লে মন্তবড়ো ভুল হয়েছে! আপনার কৈফিয়ৎ শোনার জন্তে আমি এতটুকুও ব্যাকুল নই...

অত্যন্ত ধীরে ধীরে নরেন বলিল—কৈফিয়ৎ দিতে এসেছিলাম একথা মিথ্যা নয় মমতা, কিন্তু তুমি আমার একটা মন্তবড় ভুল শুধরে দিলে। নারীকে বিশ্বাস করা উচিত নয় একথা জেনেও কেন যে এতবড় ভুল কোরলাম—তোমার এখানে এসে সেই কথাটাই কেবল আমি ভাবছি! আজ্ঞা, উঠি—

কিন্তু উঠি বলিয়াও নরেন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে পারিল না। বহুদূরে সরিয়া গেলেও একান্ত আপনার জনের প্রতি প্রচুর মমতার মত সেও যেন কি এক অজানা বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে। সে কাছে নাই শুধু একথা বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া যায় না। মমতা ঠিক তেমনি ভাবে বসিয়া আছে। তাহাদের দুজনের মাঝে যে বায়ু স্থনিবিড় স্বরূপ—তাহাকে ভাষা দিয়া প্রকাশ করা যায় না।

দুইজনে যখন এমনি গুরুভাবে বসিয়া আছে সেই সময়ে

তাহাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন মিঃ সানিয়্যাল। মমতা হঠাৎ অত্যন্ত সম্ভ্রান্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মিঃ সানিয়্যালের একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—তোমাকে রোজ বলি রাত্তির বেলা মোটর কোরে বেড়াতে নিয়ে যেতে কিন্তু রোজই তুমি একটা না একটা ছুতো করো। আজ আর কিন্তু কোন ওজড়-আপত্তি শুনছি নে, চলো—মমতা একরকম জোর করিয়াই মিঃ সানিয়্যালকে ঘরের বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল।

এখানে আসিবার পূর্বে মমতাকে রুঢ় ও অহঙ্কারী ভাবিতে নরেনের হয়ত বাধিত কিন্তু এখন মমতার কোন ব্যবহারই তাহার নিকট অপ্রত্যাশিত নয়। মমতা যদি মিঃ সানিয়্যালকে পাইয়া স্থগী হইয়া থাকে, ভাল, কিন্তু ঘরের বাহিরে পা বাড়াইয়া নরেনের দিকে মুখ ফিরাইয়া ঐ জুর হাসিটুকুরও ত কোন মানেই হয় না! সেদিনকার চিরকালের জুড়ে চলিয়া যাওয়ার অজুহাতে মমতাকে আরো একটু ভাল করিয়া জানিবার লোভে নরেনের ক্ষতি হয়ত কিছু হইয়াছে কিন্তু সে এই ক্ষণভঙ্গুর প্রেম লইয়া কতদিনই বা মমতার সঙ্গে একঘরে বাস করিতে পারিত!

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নরেন এই কথাই ভাবিল। মমতাকে লইয়া মিঃ সানিয়্যালের মোটর যে গেট পার হইয়া চলিয়া গেল সে শব্দও নরেনের কাণে আচ্ছন্ন, মিনিট খানেকের জুড়ে একবার ঘরের চারিপাশে তাকাইয়া দেখিয়া নরেন বাহির হইয়া পড়িল।

নরেন সেই বিকালে বাহির হইয়া গেছে, রাত্রি একটা বাজে এখনও ফেরে নাই। প্রকাশ সন্ধ্যার সময় বাহিরে একটু বেড়াইয়া এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া একা একা কোন কাজ না থাকায় অনেক দিন পরে কাগজ কলম লইয়া কবিতা লিখিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু এগন পর্যন্ত একটি কবিতাও লিখিতে পারে নাই। ঘরের চারিদিকে এক লাইন দুলাইন কবিতা লেখা টুকরা কাগজের ছড়াছড়ি।

বাম হাতে একখানা কাগজ এবং দাঁত দিয়া কলম কামড়াইয়া ধরিয়া প্রকাশ আপন মনে কি যেন ভাবিতেছিল এমন সময় পিষিয়া ঘুম চোখে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন—তখ ত পেরকাশ, নীচেয় কে যেন ডাকছে—

নরেন আসিয়াছে মনে করিয়া প্রকাশ নীচে নামিয়া দরজা খুলিতেই একটি হিন্দুস্থানী লোক সেলাম করিয়া আগাইয়া আসিয়া তাহার হাতে একখানা চিঠি দিয়া বলিল—দিদিমাণ দিয়া—

প্রকাশ একবার ভাবিল চিঠিখানা না পড়িয়াই ফেরৎ দেয় কিংবা জিজ্ঞাসা করে কাহার নিকট হইতে সে এই চিঠি লইয়া আসিয়াছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোকটিকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সে চিঠিখানা পড়িবার জুড়ে বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া আনো জালিল। খামের উপরকার হাতের লেখা একেবারে অপরিচিত না হইলেও—বরণা যে লেখে নাই সে তাহা বুঝিল, তা ছাড়া চিঠিখানা নরেনের নামে। অপরের বন্ধ চিঠি খুলিয়া পড়িবারও কোতুল প্রকাশের নিকট হইতে আমরা হয়ত আশা করি না—সে বয়সও তাহার অনেকদিন আগে চলিয়া গেছে, তবুও কালকাতায় আসিয়া পৌছাতেই নরেনকে চিঠি লিখিতে পারে এমন একটি মেয়ের কথাও সে ভাবিতে পারিল না। অস্তুতঃ নরেন তাহাকে এমন কোন কথা বলে নাই। তা ছাড়া ঠিক এমনি দরজার হাতের লেখা সে যেন কবে কোথায় দেখিয়াছে—অথচ মনে করিতে পারিতেছে না—এই দু'য়ের ধন্দে পড়িয়া সে চিঠিখানা খুলিয়া ফেলিল।

চিঠিখানা মমতা লিখিয়াছে—

রাত্রি ১১০টা

তুমি কি অস্তুতঃ আদ ঘণ্টার জুড়েও আর একবার আসতে পার না!

—মমতা

মামার বাড়ী থেকে ঠিকানা যোগাড় করে এই চিঠি লিখছি।

ছোট চিঠি,

এই দুইটি মাত্র লাইন কিন্তু প্রকাশ তিনবার পড়িল। মমতা, মমতা এতদিন পরে নরেনকে চিঠি লিখিয়াছে, চিঠি

লিখিয়াছে এই নিশীথ রাতে তাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্তে। একটু মৃদু হাসিয়া চিঠিখানা খামে বন্ধ করিয়া প্রকাশ পকেটে পুরিল। বাহিরে আসিয়া দেখিল হিন্দুস্থানী চাকরটা শীত কোন রকমে কুকড়ি শুকড়ি মারিয়া দরজার পাশে বসিয়া আছে। প্রকাশকে দেখিয়াই অভ্যাসমত তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রকাশ বলিল—বাবু আভিতাক নেহি লোটা, আনেসে হাম্ চিঠি দে দেঙ্গে—

মমতাদের চাকর আর একবার সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

দরজার কপাট ধরিয়া প্রকাশ সেখানে কিছুক্ষণ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া তাহার পর পুনরায় নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তিন লাইন লেখা একটা কবিতা লইয়া বসিল। কবিতাটি শেষ করিতেই হইবে। এতক্ষণ চেষ্টার পর প্রকাশ হয়ত এই কবিতাটি সম্পূর্ণ করিতে পারিত কিন্তু মমতার ছোট চিঠিখানা তাহার সকল ভাব ও চন্দকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কবিতা রাখিয়া প্রকাশ পকেট হইতে চিঠিখানা বাহির করিয়া আবার পড়িতে লাগিল। মমতা চিঠি লিখিয়াছে, এতদিন পরে মমতা চিঠি লিখিয়াছে নরেনকে! চিঠিখানা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া কি এক আক্রোশে প্রকাশ খামখানা কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িল। তাহার পর চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া আর একবার পড়িল।

এখন কেহ প্রকাশের ঘরে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাইত প্রকাশের সারা মুখের উপর নিষ্ঠুরতার স্পষ্ট ছাপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার দুটি চোখের দৃষ্টি হইয়াছে অসম্ভব উজ্জল। চিঠিখানাও বার কয়েক এপিঠ ওপিঠ উন্টাইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং টুকরা কাগজ গুলো ঘুঠোর ভিতর চাপিয়া ধরিয়া সারাঘরে পায়চারী করিতে লাগিল। প্রকাশ যে একটু পূর্বে কবিতা লিখিতেছিল এবং তিন লাইন লিখিয়াছেও এ যেন বিশ্বাস করা যায় না! বৈশাখী সন্ধ্যায় পথের পাশের ঘুমন্ত সোপান সাপটির মাথায় হঠাৎ কে যেন পদাঘাত করিয়াছে! প্রকাশ যখন এমন অশান্তভাবে সারাঘরে পায়চারী করিতেছে নীচের সদর দরজায় কে যেন আবার করাঘাত করিল। প্রকাশ একবার থমকাইয়া দাঁড়াইয়া সে করাঘাত শুনিয়া—

কিন্তু নীচের দরজা খুলিয়া দিতে না গিয়া সে পুনরায় আপন মনে পায়চারী করিতে লাগিল। কাহার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর যেন শোনা গেল। নরেন ফিরিয়া আসিয়াছে হয়ত কিংবা মমতাদের চাকরটা হয়ত আর একখানা চিঠি লইয়া আসিয়াছে, কিন্তু প্রকাশ যেন শুনিতেনই পায় নাই এমনভাবে ঘরময় পায়চারী করিতে লাগিল।

পিষিয়া পুনরায় ঘুম চোখে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন—নরেন যে সেই থেকে ডাকাডাকি কোরছে, শুনতে পাচ্ছি নেন, পেরকাশ?

অত্যন্ত রুক্ষস্বরে প্রকাশ বলিল—তার জন্তে আমাকে বারবার বিরক্ত কোরতে না এসে, চাকর ব্যাটারদের ডেকে দিলেই ত' হয়। ওরা এত বড়ো নবাব পুত্র কবে থেকে হোল?

তাহার পর সে পুনরায় আপন মনে পায়চারী করিতে লাগিল।

পিষিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজেই দরজা খুলিয়া দিতে নীচে নামিয়া গেলেন।

প্রকাশের ঘুঠোর ভিতর মমতার চিঠির টুকরো কাগজ-গুলো তখনও রহিয়াছে—সিঁড়ীতে পিষিয়া ও নরেনের কথার আওয়াজ পাওয়া যাইতেছে কিন্তু প্রকাশের সে দিকে খেয়াল নাই—

তাহার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিয়াছে একখানি শাস্ত্র নীড়ের ছবি! মমতা ও নরেনকে লইয়া ছোট একটি সংসার। সংসারটি ছোট কিন্তু তাহার কোন জায়গায় এতটুকু ক্রটি ও এতটুকু অভাব নাই। নরেন ভুলিয়া গেছে তাহার সমস্ত অতীত পৃথিবীর গীমা ঐ অঙ্গন পধ্যস্ত, তাহার বাহিরের কোন খবরই সে রাখে না,—তবুও ওর চোখে, মুখে পরিতৃপ্তির কি এক অপরিমিত আভাষ! স্মার্ট মমতাকে আজ আর চেনা যায় না, শাস্ত্র, ধীর। কারণ-অকারণে ওর সেই চটল হাসি আর নাই, ও আজ আন্তে আন্তে কথা কয়। মমতার হাসিতে সে ধার নাই বটে, কিন্তু আরো মধুর হইয়াছে। ওর প্রতিপদ-পাতে যেন একটি ছন্দ আছে, ও আজ কল্যানী বধু!

প্রকাশ দেখিল—নরেন বুঝি কোথায় গিয়াছিল, হাতে



বগলে একগাদা কাগজ পত্র, ছবি। দরজার কড়া নাড়িতেই মমতা বাস্তবাবে দোতলা হইতে নীচে নামিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। তাহার পর নরেনের হাত হইতে অর্ধেক কাগজ পত্র লইয়া, নরেনের মুখের দিকে তাকাইয়া মূহু একটু হাসিতে হাসিতে দুইজনে তাহাদের শোবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। নরেন বাকী কাগজ গুলো পাশের একটা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া মমতার একখানা হাত ধরিয়া নিজের চেয়ারের একপাশে বসাইল। খানিক পরে দেখা গেল ইতিমধ্যেই নরেনের বুকের উপর মমতা মাথা এলাইয়া দিয়াছে আর নরেন মমতার মাথায় কপালে চুলে হাত বুলাইতেছে। এমনভাবে কিছুক্ষণ কাটিবার পর কাজের ছুতায় মমতা একবার আড় চোখে নরেনের মুখের দিকে তাকাইতেই—নরেন আশ্চর্য আশ্চর্য মমতার মুখখানা নিজের মুখের সামনে তুলিয়া ধরিল, তাহার পর দুই জনেরই ঠোঁটের কিনারে ফুটিয়া উঠিল দুটো হাসির একটি ক্ষণ রেখা, তাহার পর.....

প্রকাশের পদক্ষেপ ক্রমেই দ্রুততর হইতেছে এবং আপনাকে সে এই স্বপ্নের মাঝে এমনভাবে হারাইয়া ফেলিয়াছে যে, নরেন প্রায় তিন মিনিট আসিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছে এ তাহার পেয়ালই হয় নাই।

ইহাৎ নরেনের সহিত মূগোমুগি হইতেই প্রকাশ অত্যন্ত অপ্রস্তুত ভাবে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মমতার চিঠির টুকরোগুলো তখনও তাহার মুঠার ভিতর।

নরেনের মুখের দিকে তাকাইয়া প্রকাশ চম্কাইয়া উঠিল, মনে হইল নরেনের বুঝি কি এক কঠিন অগ্রথ করিয়াছে। এমনি মলিন ওর মুখ, এমনি পাণ্ডুর ওর চোখের দৃষ্টি! প্রকাশ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বে ম্লান হাসিয়া নরেন জিজ্ঞাসা করিল—কবিতার মিল খুঁজে পাচ্ছ না বুঝি?

এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়া প্রকাশ শুধু একবার ঘরের চারিপাশে তাকাইল এবং তাহার দৃষ্টিকে অমূল্য করিয়া নরেন বিষয়ের হারে বলিয়া উঠিল—কোরেছ' কি হে!

এবং প্রকাশ কোন জবাব দিবার পূর্বেই আগাইয়া

গিয়া টেবিলের উপর হইতে তিন লাইন লেখা কবিতাটি তুলিয়া লইয়া নরেন পড়িতে লাগিল—

আমার পৃথিবী মোরে করিয়াছে হীন প্রতারণা,—  
মহাশূন্যে তাই ঝড় ; তাই তীক্ষ্ণ বিদ্রোহের কণা  
দংশন মাগিছে শুধু—

কবিতার তিনটি লাইন পরপর চারবার আবৃত্তি করিয়া নরেন বলিল—সত্যি, এ কবিতার মিল খুঁজে বার করা সহজ নয়। টেবিলের উপর কবিতার কাগজখানি রাখিয়া দিয়া নরেন নীচু হইয়া সারা ঘরময় ছড়ানো টুকরা কাগজ কুড়াইতে লাগিল। প্রকাশের মুঠোর ভিতর তখনও মমতার চিঠির টুকরোগুলো রাহিয়াছে—ফিকে নীলরঙের খামের টুকরোগুলো ঠিক তাহার বাসবার চেয়ারটির পাশে ছড়ানো।

নরেন ঘরের মেঝে হইতে প্রত্যেকটি টুকরা কুড়াইয়া কবিতার অর্ধ সমাপ্ত একটি লাইন, কোনটিতে বা মাত্র চারটি কথা কোনটিতে বা দুটি লাইন আছে—সব এক একবার করিয়া আবৃত্তি করিয়া পুনরাবৃত্তি করিয়া দিতে লাগিল। এবং প্রতি টুকরাটি পড়া শেষ হইলে সারা ঘরময় একবার পায়চারি করিয়া প্রকাশের সামনে আসিয়া বলিল—তোমার মনে আবার ঝড় উঠেছে, তাই—কিস্তই...

প্রকাশ ইতিমধ্যে চিঠির টুকরোগুলো পকেটের মধ্যে পুরিয়া ফেলিয়াছে। বলিল—এতগুলো কাগজ হাতড়ে তুমি কি এই একটা 'কিস্তই' পেলে?

কিছুক্ষণ নরেন কোন কথা কহিল না। তাহার পর বলিল—অমিও আজ সন্ধ্যা থেকে একখানা ছবি আঁকবার কথাই ভাবছি। সেও ঝড়ের ছবি।—মধ্যাহ্নের তৃণহীন প্রান্তরের উপরকার ঝড়ের ছবি, একটি গাছ পর্যন্ত নেই—কেবল বহুদূরে দেখা যায় শীর্ণা একটা নদী.....

নরেনের উদাস ও তন্ময় দৃষ্টির দিকে তাকাইয়া প্রকাশ তাহার জামার উপর দিয়া পকেটের চিঠির টুকরো গুলো একবার অনুভব করিল।

## সাত

বরুণা কলিকাতায় পৌছাইয়া দেখিল সাংবাদিক মহলে তাহাকে লইয়া মহা তুলুতুল পড়িয়া গেছে। প্রতি কাগজে তাহার ছবি তাহার বক্তৃতার অংশ উদ্ধৃত। এবং তাহার কলিকাতায় পৌছানো সংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র সেই যে সকাল নয়টা হইতে লোকজনের আনাগোনা শুরু হইয়াছে রাত্রি নয়টা পর্যন্তও তাহাদের ভীড় কমিল না। অবশেষে বরুণাকে বাধ্য হইয়াই নিজের শরীরের দোহাই দিয়া অনেককে হতাশ করিতে হইল।

কিন্তু একটি বিষয় বরুণা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছে— এতগুলো কাগজের কোন জায়গায়ই প্রকাশকে লইয়া চাঞ্চল্য নাই এবং নানা রকমের এতগুলো অনুসন্ধিৎসাদের মধ্যে কেহই একবার তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিল না। অথচ বরুণার বক্তৃতার তুলনায় প্রকাশের বক্তৃতা যে অনেক ভাল হইয়াছিল, এবং তাহার মধ্যে অনেক ভাবিবার এবং আনিবার মত কথা ছিল, এ, বরুণাও অস্বীকার করে না। কিন্তু বরুণা এর জন্তে এতটুকু দুঃখিত হইল না, উপরন্তু— ঝড়ের ঢেউ যে আবার তাহার কূলে ফিরিয়া আসিয়াছে এই ভাবিয়া আত্মতৃপ্তি ও আত্মগর্ভ অনুভব করিল। বরুণা আরও একটি কথা ভাবিল—এই ঝড়ের মাঝে যে কোন একজন অবিবাহিত দেশমাত্র নেতাকে বিবাহ করিয়া নিজের ভবিষ্যতকে কাম্যে করিয়া লইবে। এবং এ বিশ্বাস তাহার হইয়াছে যে, গৃহিণী হইবার মনোভাব প্রকাশ করিলে পাণিপ্রার্থীর অভাব হইবে না। সমাজ বিষয়ে পুরুষের একতরফা বিধিবিধানের প্রতিবাদ করিবার জন্তে এবং

ভবিষ্যতে পুরুষ ঘাতে নারীর প্রতি সমাজ ও ধর্মের দোহাই দিয়া কোন অজ্ঞায় বিচার ও অত্যাচার করিতে না পারে তাহার একটা ব্যবস্থা করিবার দুঃসাহসে যে, সে আশ্রমের বাহিরে পালাইয়া আসিয়াছে, একথা আজ তাহার মনেই পড়িল না। মনে না পড়িবারই কথা। বরুণা অন্ততঃ এইটুকু বুঝিয়াছে—পুরুষের নানা অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার মত দুঃসাহস দূরে থাক, এ কথা ভাবিতেও এদেশের শতকরা নিরনব্বইটি মেয়ে জিত্ কামড়াইয়া ফেলে। এদেশের কয়টি মেয়ে লেখাপড়া শিখিয়া একেবারে স্বাধীনভাবে এবং ভালভাবে একার জীবন যাপন করিবার কথা ভাবিতে পারে। একথা ভাবিতেও ওরা ভয় পায়—পাপ মনে করে। ছেলেবেলার শিবপূজার মোহ ওদের মজাগত! কিন্তু এ কথা থাক, ভবিষ্যতে কোনদিন এদেশের নারী যদি পুরুষদের সামনে তাহার এই দাবীর কথা ভয়ে ভয়ে নয়, কেবল কথায় নয়, উদাহরণ দিয়া উপস্থিত করিতে পারে, সেদিনকার ইতিহাসের প্রথম পাতায় যাহার নাম লেখা হইবে, সে এই বরুণা। বরুণা অন্ততঃ এইটুকু বুঝিয়াছে এবং এই জন্তেই ও যদি আজ কোন ‘শাসে-জলে’ দেশনেতাকে বিবাহ করে, ওর বিরুদ্ধে কোন কথাই উঠিবে না। বরং আরও ধন্য ধন্য পড়িবে।

এখন একবারের জন্তেও ওর অমরেশকে মনে পড়িল না, মনে পড়িল না প্রকাশ ও নরেনকে। কেবল ভুলিয়া যাওয়া স্মৃতির মত খুব অস্পষ্ট একখানা মুখের ছবি—তাহার মনে পড়িল—সে মুখ অবনীর। সমস্ত মুখখানা স্পষ্ট মনে পড়ে না।

—ক্রমশঃ



## চাষার ছেলে

শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়

চৈত্র সন্ধ্যার ধূসর ছায়া তখনও পৃথিবীর বুকে তত গাঢ় হইয়া উঠে নাই। নক্ষর তাহার মৈনন্দিন মজুর-জীবনের কৰ্ম শেষে যেমন করিয়া ঘরে ঘরে আজিও ঠিক তেমনই তাহার দা' খানি বাম বগলে গুঁজিয়া ডান হাতে বলদ দুটির দড়ি ধরিয়া তাহাদের পিছু পিছু খেদাইয়া আনিতেছিল।

আঙিনায় পা দিতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সন্ধ্যার আঁধারে শূন্য বাড়ীখানি যেন একটা ছাড়া-বাড়ীর মতই খাঁ খাঁ করিতেছে। কোথায়ও কাহাকে দেখিতে পাইল না, শুধু অদূরে তাহার দুই বৎসরের শিশুপুত্র ঝিলু মনের আনন্দে খেলিয়া বেড়াইতেছে। সাঁঝের কাজগুলো তখনও সবই পড়িয়া আছে। সেই সন্ধ্যা বিশৃঙ্খলার মাঝে যাহা কিছুতে তাহার চোখ পড়িল সকলই যেন তাহাকে তিরস্কার করিয়া উঠিল। গোয়ালে ঢুকিয়া খুঁটিতে গরুর দড়ি হু'গাছা বাধিতে বাধিতে দেখিল গামলায় একটা ফোঁটাও জল নাই। গরু দুটি চির অভ্যাস মতই জিড় লম্বা করিয়া সেই তৃণজলহীন শূন্য আধারটা আরবার চাটিয়া লইয়া মুখ তুলিয়া সঙ্কল্প দৃষ্টিতে নক্ষরের যুগের প্রতি চাহিয়া রহিল। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া দাওয়ার এক কোণ সংলগ্ন জল পিঁড়ির উপর মেটে কলসীতে হাত দিতে সেও যেন তাহাকে বিক্রম করিয়াই ঠন ঠন শব্দে নিজের শূন্যতা জ্ঞাপন করিল। নক্ষর মনে মনে জলিয়া উঠিল। কল্প কণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল, সখি! সখি! কিন্তু স্ত্রী সগিনার কোন উত্তর না পাইয়া নিরুপায় ক্রুদ্ধ কণ্ঠে আপন মনেই বিড় বিড় করিয়া বলিতে লাগিল, এই সাঁঝের বেলায় আবার কোথায় গিয়ে মো'ল। দাওয়ার উঠিয়া খোলা দরজার প্রতি নজর পড়িতেই সন্ধ্যার অশ্লষ্ট আলোকে ঘরের ভিতর উকি মারিয়া দেখিল অদূরে যেকের কোণে কিছু মূড়ি দিয়া জড়-সড় অবস্থায় শায়িত

মানুষের মত কি একটা পদার্থ দেখা যাইতেছে। ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার উপর হাত বুলাইয়া বুঝিল সখিনাই এই অবস্থায় পড়িয়া আছে। অন্ধকারে কপালে হাত ঠেকিতেই দেখিল যেন জলন্ত আগুনের হাল্কা ছুটিয়া বাহির হইতেছে। যুগের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মূহু কণ্ঠে ডাকিল, সখি! সখি! কোন সাড়াই পাইল না। আতঙ্কে তাহার বুকের ভিতর দ্রুত আঘাত করিতে লাগিল। পা কাঁপিতে লাগিল, সহসা উঠিয়া দাঁড়াইতে তাহার মাথার মধ্যে ঘুরিয়া আসিল। একটু সামলাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি সে অন্ধকারে চাতড়াইয়া স্বপ্নের মাচার কোণ হইতে একটা দেশলাইয়ের বাজ বাহির করিল। ক্ষিপ্র হস্তে আলোটা জালিয়া সখিনার শিয়রে আসিয়া বসিল। দেখিল প্রবল জ্বরে একেবারেই তাহার চেতনা লুপ্ত হইয়াছে। নক্ষর শুক হইয়া কিছুকণ তাহার যুগের প্রতি চাহিয়া বসিয়া রহিল; কি করিবে কিছুই যেন ঠাণ্ড করিয়া উঠিতে পারিল না। হঠাৎ কি ভাবিয়া উঠিয়া গেল। এবং জলের কলস হইতে এক বাটি ঠাণ্ডা জল আনিয়া তাহার মাথায় ঢালিতে লাগিল। অল্পকণ মধ্যেই সখিনা তাহার তন্দ্রাবিষ্ট বিহ্বল রক্ত চন্দ্র দুটা ঈষৎ উল্লসিত করিয়া অশ্রুট জড়িত কণ্ঠে কি যেন বলিয়া আবার পাশ করিয়া শুইল।

ঝিলু ইতিমধ্যেই ডাতের জন্ত দাওয়ার বসিয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছে। নক্ষর উঠিয়া আসিয়া পল গাছা হইতে দুই মুঠা শুক পল টানিয়া লইল; এবং গরু দুটির যুগের নিকট কেলিয়া দিয়াই ছেলেকে কোলে তুলিয়া রান্না ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। বাসি ভাত ও তরকারী যাহা হাড়ীতে অবশিষ্ট ছিল ছেলেকে খাওয়াইয়া আনিয়া যুগ পড়াইয়া রাখিল। নিজের দাওয়া দাওয়ার কথা আজ

আর তাহার মনেই হইল না। ক্লান্তি, অবসাদ ও একটা প্রকট দুশ্চিন্তায় তাহার মাথার মধ্যে যেন শুধু ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল।

সারা রাত্রি নফরের চোখে ঘুম নাই। পীড়িতা জীর শিয়রে বসিয়াই কাটিয়াছে। চৈত্রে প্রথর রোত্রে মাঝে সারা দিনব্যাপী হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম; তারপর অনাহার অনিদ্রায় সে একেবারে মুশড়াইয়া পড়িয়াছে। সকালে তাহার অবসন্ন পা ছ'খানা আর যেন তাহার ক্লান্ত দেহটিকে টানিয়া তুলিতেই পারে না। তবুও উঠিতে হইল। প্রতিবেশীদের একগৃহ হইতে একটা কাঁচের শিশি চাহিয়া সে গ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয়ের দিকেই চলিল।

( ২ )

এই হ্যাট-কোট-পর্য্য চশমা-আঁটা সরকারী ডাক্তার বাবুটিকে দেখিলে যতই গভীর প্রকৃতির লোক বলিয়া মনে হউক না কেন; তাঁহার কোট প্যাণ্টের ভিতর এমন একখানি কোমল হৃদয় লুকান ছিল, যা' যত সব অনাথ আতুরদের সাদরে আমন্ত্রণ করিবার জন্ত সর্বদা উন্মুখ থাকিত। নফরের মুখে তাহার জীর রোগের সমস্ত বিবরণ শুনিয়া তিনি চিন্তিত মুখে বলিলেন, ব্যারামটা নেহাৎ সহজ বলে মনে হোচ্ছে না। না দেখে শুনে কি ওষুধই বা দেব। আচ্ছা, রোগীকে তুই একবার দেখাতে পারিস নে? আশার আলোকে নফরের মুখখানা সহসা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল! ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, ডাক্তার বাবু, তোমারাই ত গরীবের মা বাপ। একবার যদি দয়া ক'রে দেখে আসেন তবে গরীবের প্রাণ রক্ষে হয়। তাহার অসীম ব্যাকুলতা ও মিনতিভরা কণ্ঠস্বর ডাক্তারের যুবক হৃদয়ে গভীর আঘাত করিল। বলিল, এই ওষুধটা এখন নিয়ে যা। আমি সময় মত একবার দেখে আসুব এখন।

ডাক্তার বাবু সেই ষ্প্রহর বেলায়ই নফরের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রোগীকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া উত্তর মুখে বলিলেন, যা ভেবেছিলাম তাই ঘটেছে। ছুটো পাশই এক সঙ্গে ধরেছে। ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা বলিয়া দিয়া তিনি উঠিতেই নফর কাতরকণ্ঠে বলিতে

লাগিল, ডাক্তার বাবু, দুখে কষ্টে জীবনে অনেক পড়েছি; কিন্তু এমন দুর্করছোর আর কখন দেখিনি। আমাদের চাষা লোকের আর বাঁচন নেই। ক্ষেতের একটা ফসল যে হাটে তুলে বিক্রি করব; তারও জো' নেই। চার আনার জিনিষটে চার পয়সায় বেচতে হবে—তারই বা খন্দের কোথায়? আবার এত যে সস্তা গুণ্ডা; তাও ত আমরা ছ'বেলা ছ'মুঠো পেট ভরে খেতে পর্য্যন্ত পাইনে। ঐ ঘরখানার পানে চেয়ে দেখ, বিষ্টি বাদলা যদি হঠাৎ আসে রোগীটিকে নিয়ে কোথায় দাঁড়াব তার ঠাই নেই। এখন জীবনটা যাতে রক্ষে হয় তাই করে দাও। প্রাণে যদি বাঁচি তোমার ঋণ রাখব না। ডাক্তার বাবু হাসি মুখেই উত্তর দিলেন, আমার ঋন টিন্ তোর দিতে হবে না। ওষুধ—ডাক্তারখানা থেকে রোজ ওষুধ নিয়ে আসবি। শুধু দেখবি যেন পথ্যাপথ্য আর সেবা শুশ্রূষার কোন ক্রটি' না হয়। আমি সময়মত মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব। মনের কৃতজ্ঞতা নফরের চোখে মুখে উছলিয়া উঠিল। সে মাথা নাড়িয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিল।

( ৩ )

আজ দুই দিন নফর আর জন খাটিতে বাহির হইতে পারে নাই। তাহার সবল দেহের স্বকঠোর পরিশ্রমের দৈনিক মূল্য যাহা একদিন বার আনা ছিল; আজ তাহা বার পয়সায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। তাহাও জোঠান দায়। এই অর্থক্লান্ততার দিনে কয়জনেই বা রোজ রোজ মজুর খাটাইবে। আবার একদিন কাজ জুটাইতে না পারিলেই আর পেট চলিবে না। সগোষ্ঠী উপোস করিতে হইবে। যে কটা ধান এবার ক্ষেতে পাইয়াছিল তাহাত স্নদের বাবদ মহাজনের গোলায় তুলিয়া দিয়াছে। ভাগের ভাগ অল্প যে পাট টুকু হইয়াছিল তাহা ত এবৎসর বিক্রয়ই হইল না। এই দুইদিন ধার কর্ত্ত করিয়াই জীর পথ্য চালাইয়াছে; কিন্তু রোজ রোজ কেই বা তাহাকে বিশ্বাস করিয়া ধার দিবে? সকালে বিছানা হইতে উঠিয়াই নফর তাহার প্রতিবেশিনী এক আত্মীয়া ফুকীকে ডাকিয়া, তাঁহার উপরেই পীড়িতা জীর ভার অর্পণ করিয়া সে কর্ম্মের সন্ধানে চলিয়া গেল।



প্রভাত কখন মধ্যাহ্নে পরিণত হইয়াছে। ভোরের শিথল বাতাসে কে যেন সহসা আগুন ঢালিয়া দিয়াছে। রুদ্ধ বিবর্ণ আকাশের বুক চিরিয়া অজস্র ধারায় যে আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে তাহা যেন সারা বিশ্বকে দগ্ধ না করিয়া আর ক্ষান্ত হইবে না। বাহিরের সেই প্রচণ্ড অগ্নি-লীলার প্রতি চাহিলে চোখে ধাঁধা লাগে—যেন অন্ধকার দেখিতে হয়।

এই প্রচণ্ড রৌদ্র মাথায় লইয়াই নফর সারা দুপুর ঘুরিয়াছে; কিন্তু তার কোন ফল হয় নাই। হতাশ হৃদয়ে বাড়ী ফিরিয়া চিন্তিতমুখে দাওয়ায় বসিয়া এক ছিলিম তামাক টানিয়া শান্তির অনেকখানি লাঘব করিতেছে; এমন সময় সন্মুখের রাস্তা হইতে জমিদারী কাছারীর হিন্দুস্থানী পেয়াদা সহসা যমদূতের মতই আবির্ভূত হইয়া উচ্চ কণ্ঠে ইঁাকিল, নফর! বাড়ী আছিস? নায়েব বাবু জলদি ডেকেছে। নফরের প্রাণ উড়িল। মনে পড়িল কাছারীতে খাজনা দেওয়ার দিন ত আজই। সেদিন অনেক লাঞ্ছনা ও শাস্তি ভোগের পর; নায়েব মহাশয় তাহাকে দুই দিনের সময় দিয়াছিলেন। আজ আবার সেখানে গিয়া কি বলিয়া দাঁড়াইবে; এবং তাহাতে কি ফল হইবে না হইবে ততদূর চিন্তা করিবার শক্তি তখন আর তাহার ছিল না। নিঃশব্দে দাওয়া হইতে নামিয়া নিতান্ত অভিভূতের মতই সে পেয়াদার অনুসরণ করিয়া চলিল।

নফরকে দেখিয়াই নায়েব মহাশয় আগুনের মত জলিয়া উঠিয়া কর্কশ স্বরে বলিলেন, ব্যাটারা সব নগাব পুস্তুর হয়েছেন। বারবার লোক পাঠিয়ে সাধা সাধনা করে তবে আনতে হবে। টাকা কড়ি সব এনেছি নফর! পুরো দুটো সনের খাজনা বাকী। হাল বকেয়া সমস্ত টাকা এখন বুঝে দিয়ে যাবি।

নিতান্ত নিরুপায়ের মতই নফর সেই কাছারী ঘরের দরজার সন্মুখেই ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। বার দুই ঢোক গিলিয়া লইয়া ভীত জড়িতকণ্ঠে বলিল, বড্ড লাচারে পড়ে গেছি বড়বাবু। মূনিব মা বাপ, তাই তাঁর কাছে ছাড়া আর কোথায় জানাবো। আপনাদের দয়াতেই ত ভিটে...

নফরের মুখের কথা শেষ হইতে পারিল না। নায়েব মহাশয় কণ্ঠ দ্বিগুণ তিক্ত করিয়া বিকৃত মুখে ধমকাইয়া উঠিলেন, রাগ ব্যাটা, এখন তোর ও সব জ্বাকামি রেখে দে। ও সব ঘ্যান্ ঘ্যানানি অনেকই শুন্ছি। ব্যাটারা পাকা বদমাইস। সব যেন জোট বেঁধেই একটা বড়বুজ করছে। জমিদারের ও সব মাগার বাড়ীর আদ্যার শুনে ব'লে থাকলে চলবে না। জমিদার আগে বাঁচুক—তাঁর জমিদারী রক্ষে হোক ত পরে তোদের কথা শুন্ব।

এই তিরস্কার যেন নফরের কাণেই পৌঁছিল না। সে পূর্নানুবৃত্তি করিয়াই বলিতে লাগিল, ভেবেছিলাম পাট যেটুকু পেয়েছি বেচে কিনে মালিকের খাজনা কড়ি শুধরে দেব। কিন্তু এমনি ভাগি যে পাটগুলো এবার বিক্রিই হেল না। তা বাবু দয়া করে আর দুটো দিনের সময় দিতে হবে।

নায়েব মহাশয় মুখে এক প্রকার নিশী শব্দ করিয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিয়া উঠিলেন, মালিক আমার! রাত পোহালে তিরিশে চস্তির, আজকেও ওনাকে সময় দাও। শুনে হেসে বাঁচিলে। এ রাম সিং ইক্কো ধুপ্ মে পাড়া করকে রাখো।

রাম সিং নফরের ঘাড়ে দাক্ষা দিতে দিতে বলিল, উঠ শালা। চল।

নফর ধুলার মাঝেই সেখানে আড় হইয়া শুইয়া পড়িল। কাতর কণ্ঠে বলিল, দোহাই বড়বাবু! গরীবকে রক্ষে কর। কাল সন্ধ্যার মধ্যেই টাকা এনে দিয়ে যাব।

নায়েব মহাশয়ের মুখের কঠোরতা বিন্দুমাত্রও কমিল না। তেমনি তীক্ষ্ণস্বরেই বলিলেন, বজ্জাং ব্যাটারা সব। তোরা ত রাম রাজায়েই বাস করছিস। কোন্ জমিদার এত বকেয়া ফেলে রাখে? তারপর কর্তা এবার সূদের টাকাত সব মকুব করে নেওয়ার হুকুম দিয়েছেন। কাল সন্ধ্যার মধ্যেই টাকা চাই, নইলে ভিটে মাটি সব উচ্ছন্ন যাবে; তা বলে দিচ্ছি।

( ৪ )

বাড়ী ফিরিয়া নফর দেখিল ঝিলু দাওয়ার একপাশে ধুলার উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, সেই প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা ফুর্কিই তাকে দয়া করিয়া বাড়ী হইতে

এক মুঠা খাওয়াইয়া আনিয়াছে। নফর যেন হাঁক ছাড়িয়া বাঁচিল। তাড়াতাড়ি জ্ঞান করিয়া আসিয়া ছেলেকে কাছে টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। বাহিরের প্রকৃতির মতই আজ তাহার ভিতরটাও শুধু ধুঁ ধুঁ করিয়া পুড়িতে ছিল। ফুঁকী জিজ্ঞাসা করিল, নফর ভাত না খেয়েই শুয়ে পড়লি যে? চাল ভাল কোথায় আছে দ্যাখায়ে দেনা, আমি না হয় একটা মুঠা ফুটিয়ে দিইয়ে বাই।

না—ফুটিয়ে আমিই নিতে পারতাম, তবে শরীর বড় অস্থখ করেছে, এখন আর কিছু খাব না।

নফর শুইয়া পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। ভাতার বাবু দেখে বলে গেছেন রোগী ক্রমশঃই দুর্বল হইয়া পড়িতেছে—ভাল বলকারক পথ্যের প্রয়োজন। কিন্তু কি দিয়া সে পথ্য কিনিবে? আজ যে এমন একটা পয়সাও নাই যা দিয়া সে এক পয়সার বালি আনিয়া পিড়ীতা স্ত্রীর মুখে তুলিয়া দিবে। সে আর ভাবিতে পারিল না। ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথার রক্ত যেন শুকাইয়া গিয়াছে।

বেলা একটু হেলিয়া আসিতেই নফর গরু দুটিকে মাঠ হইতে বাড়ী আনিল। জল খাওয়াইয়া তাদের গলায় ও পিঠের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, দু'বছর পূর্বে অনেক কষ্টে একটা মুঠা টাকা খরচ করে আমি তোদের কিনে এনেছিলাম; আর এই দুই বছর ধরিয়া তোরাও বুকের রক্ত দিয়ে আমাদের প্রতিপালন করেছিস; কিন্তু আজ দেনার দায়ে তোদের আর রক্ষে করতে পারলাম না। বলিতে বলিতে নফরের চোখ দিয়া জল আসিল। কিছুকণ পরে ঘাড় হুঁগাছা হাতে ধরিয়া হাটের দিকে লইয়া চলিল। আজ সেই তার শেষ সঞ্চন ও চাষীজীবনের একমাত্র সম্পদ গরুদুটিকে মাত্র চৌদ্দ টাকায় ঘুচাইয়া আসিল।

সকালে উঠিয়া নফর নিজেই কাছারীতে গিয়া উপস্থিত হইল। টাকা চৌদ্দটা নায়েব মহাশয়ের পায়ের গোড়ায় রাখিয়াই তাঁহার পা দু'খানা দু'হাতে জড়াইয়া ধরিয়া কঁক কঁক বলিল, বাবু চাষার ছেলের দিন চালানর এক মাস্তুর সম্বোল সেই হালের গরু দুটা বেচেই এই নিয়ে এয়েছি।

এই নিয়েই এবার রেহাই দিতে হবে। আর খুন করলেও একটা আখলা দেবার ঘো নেই।

নায়েব মহাশয় তাঁহার স্বকঠোর দণ্ড নীতির প্রভাবেই যে আজিকার মত দুর্বলসরেও নফরের মত নিঃশ্র প্রজার নিকট হইতে এনগুলি টাকা এক সময়ে আদায় করিতে সক্ষম হইলেন, ইহা ভাবিতেও তিনি মনে মনে নিজের দক্ষতার প্রশংসা না করিয়া পারিলেন না। মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, নে নে পা ছাড়। এ কোথাকার আপদ!

পা ছাড়িয়া বার বার সেলাম করিয়া নফর বাহির হইয়া আসিল। পথের উপর দাঁড়াইয়া সে ঐ খোলা মাঠটার দিকে উদাস নজর তাকাইয়া রহিল। ক্ষুদ্র শিশু হ'ঠাৎ স্নেহের স্পর্শ পাইলে যেমন করিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠে, নফরের তাপিত ললাটে ভোরের সজল স্নিগ্ধ শীতল হাওয়া লাগিতেই তাহারও চোখ দুটা জলে ভরিয়া আসিল। মনে মনে বলিল, খোদা আজ এমনি জুলুম করেই যারা আমার পিড়ীতা স্ত্রী ও কুদিত শিশুর মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে, তাদের কসুর তুমি মাপ করো না! সেদিন আর সে কাজে বাইতে পারিল না।

বৈশালের দিকে রুগ্মা স্ত্রীর পার্শ্বে বসিয়া বাতাস করিতেছে, এমন সময় বাহির হইতে শোনা গেল,—নফর মোঁড়ল! নফর বাহিরে আসিয়া দেখিল কাবুলি রহমৎ খাঁ সপরিবারে উপস্থিত। সহস্রা বসন্তকে স্তম্ভে দেখিলেও নফরের মুখখানা এমন বিবর্ণ হইত না; যেমন হইল এই চার হাত লম্বা ডিলে-জামা-পরা লোকটিকে দেখিয়া। গত বৎসর শীতের সময় তাহার নিকট হইতে ছয় টাকা মূল্যের দুইটা গায়ের চাদর ধারে কিনিয়াছিল। ইতিমধ্যেই বহু দিন কাবুলি টাকার জন্য আনিয়া গিয়াছে; শুধু ওয়াদা করিয়াই তাহাকে ফিরাইয়াছে। আজ যাবার কি বলিয়া তাহাকে বিদায় দিবে? লক্ষ্য করিলে সে যেন একেবারে মরিয়া গেল। নামিয়া আসিয়া কাবুলির হাত দু'খানি ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিল, তাই আজিও টাকার যোগাড় করে উঠতে পারিনি। আর দুটো দিন পরে এস-নিশ্চয়ই দিবে

দেব। কুংসিং ভাষায় অনেক গালিগালাজ পাড়িয়া কাবুলি সেদিনের গতও চলিয়া গেল।

নির্দিষ্ট দিনে কাবুলি আবার আসিয়া উপস্থিত হইল। বিস্তর ডাকা হাঁকি করিয়াও কাহার সাফাং পাইল না। নফর ঘরের ভিতরেই লুকাইয়াছিল; কিন্তু সেদিন সে আর কোন সাড়া দিল না। সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া কাবুলি নফরের চৌদ্দ পুরুষকে জাহ্নমের পাঠাইয়া উঠিয়া গেল।

( ৩ )

আজ তিন দিন স্ত্রীর রোগ দ্রিগুণ বাড়িয়াছে। একদিন যে কি ভাবে কাটিয়াছে সে একমাত্র নফরই জানিতেছে।

সেই সন্ধ্যা হইতেই বিন্ আঙ্গ কার জুড়িয়াছে। নফর তাহাকে কিছুতেই শাস্ত করিতে পারিতেছে না। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ছেলে যখন কিছুতেই ঘুমাইল না; ক্রোধে বিরক্তিতে নফর একেবারে আত্মহারা হইয়া উঠিল। ঠাস করিয়া তার গালে একটা প্রচণ্ড চড় কসাইয়া দিয়া তিক্তকণ্ঠে ধমকাইয়া বলিল, পোড়া ছেলের চোখে আজ যুগও নেই। আপন মরেও না। কের কাদবি ত গলা টিপে একেবারে মেরে ফেলব। শিশু আদর্শে মা মা করিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাদিতে লাগিল। সখিনা তাহার কণি চক্ষু দুটা মেলিয়া একবার চাহিল। অস্পষ্ট আলোকে নফর দেখিল, ছ' ফোঁটা অশ্রু তাহার শুষ্ক চোখের কোণ বহিয়া কাণের

গোড় পর্যন্ত গড়াইয়া আসিল। নফরেরও চোখ দুটা ফাটিয়া জল আসিল। পরক্ষণেই মনে মনে বুঝিল, এই নিরপরাধ ক্ষুদ্র শিশুটি ত আজ অশ্রুয় জিন্দু ধরিয়া কাদিতেছে না। পেট জ্বলিলে ঘুম আসিবে কেন? দুপুর বেলায় পাড়ার কে বুঝি দয়া করিয়া এক মুঠা তাহাকে দিয়াছিল। সারাদিন রোদে ধুলা মাটির মধ্যে থেলিয়া বেড়াইয়াছে; এখন দারুণ ক্ষুধা পেটে লইয়া ঘুমাইবে কেন? দুঃখে আত্ম-প্রাণিতে তাহার বুকের মধ্যে পুড়িয়া যাইতে লাগিল।

গভীর রাত্রি। সারা বিশ্ব সুপ্তির কোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে। পীড়িতা স্ত্রীর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া নফর একাকী। অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখে রক্তহীন সাদা মুখ থানার উপর মৃত্যুর ছায়া যেন নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে—নিঃসাড় নিম্পন্দ

দেহখানা একেবারে বিছানার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। প্রদীপের কণি আলোক রশ্মিটি মৃদু মৃদু শীর্ণ মুখখানার উপর পড়িয়া কাপিতে থাকে; নফর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। ঘর-জোড়া সেই ভয়াবহ নিশ্চলতা ভেদ করিয়া ক্ষুদ্র শিশু বার বার কাদিয়া উঠে, সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া যায় তাহাকে শাস্ত করিতে। আবার ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীর শিয়রে বসে। মনে মনে ভাবে একে তিলে তিলে মরণের দিকে ঠেলিয়া দেওয়ার জন্য দায়ী কে? বাখায় কোন্‌ ভেদে নুখানা তার ভাদ্রিয়া চুরমার হইয়া যায়। দুই হাঁটুর মাঝে মাঝে গুঁজিয়া কত কি ভাবে—ভাবিতে ভাবিতে তাবনার খেই হারাইয়া ফেলিয়া মনে মনে বলে, উঃ! খোদা! আর ত পারিনে। দুদিনের এ বিষম রাত্রি যেন আর শেষ হইয়াও হয় না!

আজ ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসটুকুও নফরের কাছে একেবারে বিষাদ ঠেকিতেছে। মৃদু স্ত্রীকে একরূপ অবস্থায় একাকী ফেলিয়া রাখিয়া বাহির হইতেও তাহার কোন মতেই প্রাণ সরিতেছে না। কিন্তু ক'টি শিশু যে কুদার জালায় চোখের স্রুখে অগ্নি ভাবে শুকাইয়া মরিবে তাহাও আর সহ্য করিতে পারে না, তাই সেদিন ফুঁফুঁকে উপলক্ষ্য মাত্র রাখিয়া বস্ত্রতঃ ভগবানের উপরেই সেই আসন্ন মৃত্যু-পথ-যাত্রীর ভার অর্পণ করিয়া সে কাখোর সন্ধানে বাহির হইয়া গেল।

( ৬ )

সারাদিন রোদ ও কন্ঠের সহিত যুদ্ধ করিয়া সন্ধ্যা বেলায় নফর তিন আনার পয়সা টাকাকে গুঁজিয়া ঘরে ফিরিল। কাবুলি রহস্যময়ী সেই দুপুর হইতেই উঠানে হানা দিয়া আছে। নফরকে আসিতে দেখিয়াই সে ছুটিয়া গিয়া নফরের হাত ধরিয়া প্রচণ্ড বেগে আকর্ষণ করিতে লাগিল। বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, শালা বেইমান্ একুনি টাকা ফেল্। মুহূর্তে নফর আত্মবিস্মৃত হইল। সজোরে হাত ছিনাইয়া লইয়া উদ্ধতকণ্ঠে বলিল, সে টাকা এখন দিতে পারিবে না। আর অবিলম্বে কাবুলি যদি তার বাড়ী ছাড়িয়া না যায় তবে ঝাঁটা পিটিয়া বাহির করিবে। ক্রোধে

কাবুলি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। বিপুল বিক্রমে নফরের টুটি টানিয়া লইল; এবং সেই সন্ধ্যার আঁধারে গা ঢাকিয়া  
চাপিয়া ধরিয়া সেই ধুলার মাঝেই তাহাকে প্রচণ্ড একটা বাড়ীর পিছনে ঐ ঘোষেদের আম বাগিচার ভিতর প্রবেশ  
ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। চোখের পলক মাত্র পড়িল না। করিল।

ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া নফর হিংস্র পশুর মতই  
কাবুলির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া হস্তস্থিত দা' খানি সজোরে  
তাহার কাঁধের উপর বসাইয়া দিল। আর্ন্তকণ্ঠে একবার  
চীৎকার করিয়া উঠিতেই কাবুলির বিপুল দেহ ভুলুষ্ঠিত  
হইল। রক্তের বগ্না ছুটিল। নফর আর তাহার দিকে  
ফিরিয়া চাহিতেও সাহস করিল না। কিন্তুপদে দাওয়ায়  
উঠিতেই আবার তেমনিই নামিয়া আসিল। গোয়ালের  
বেড়ার গায়ে ঝুলান এক গাছা মোটা গরুর দড়ি

\* \* \*  
সন্ধ্যার আঁধার ক্রমে ঘন হইয়া উঠিল। পুলিশ ও  
পাড়ার লোকে শীঘ্রই বাড়ী ভরিয়া গেল। সকলে পরীক্ষা  
করিয়া দেখিল আঘাত অত্যন্ত গুরুতর হইলেও কাবুলি  
প্রাণে মরে নাই! ক্ষত স্থান হইতে অত্যধিক রক্তপাত  
হওয়ায় তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইয়াছে। স্থানীয় লোকের  
সাহায্যে তাহাকে সরকারী ডাক্তার খানায় পাঠাইয়া; পুলিশ  
সেই রাতেই নফরকে খুঁজিতে বাহির হইল... ..।

## ভূপর্যটক

শ্রীমতাদেবী

হে চঞ্চল, ক্ষণিকের সখা, অশান্ত পথিক,  
পায়ে তব নিত্য টুটে, ধরণীর স্নেহের শৃঙ্খল !  
চপলার ক্ষণপ্রভা আলোয়ার আলো সে অলীক,  
মুগ্ধ হ'য়ে তোমাতে ফুটিল, ওগো নিঃস্বল !  
পরিয়াছ নিত্য তব আঁখিতে অঙ্কন,  
নবরাগে হেরিয়াছ মোহিনী সে ধরিজীর গায়া,  
পুরাতনে নাহি তব রতি, তুমি অবহন ।  
বিশ্বে যত অপূর্ণ তিয়াস তুমি তার কায়া !  
বাণী তব বিশ্বের বারতা, কণ্ঠে বাজে অসীমের সুর  
চরণের প্রতিক্ষেপ বেগে ধায় নিত্য কত নবতীর্থ দূর ।  
তারুণ্যের হে প্রতীক, হে পাশ্ব প্রবীণ,  
অর্ঘ্য নাও মিলন বেলায়,  
কালি যদি ভুলে থাকো, থেকো কালি, আজি শুধু  
মধুর মিলন, কালিকে বিদায় ।





# শক্তিয়োগী পীলমুডস্কী

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্তী

বর্তমান যুগে স্বাধীন পোলাণ্ডের জন্মদাতা জোসেফ পীলমুডস্কী যখন জন্মগ্রহণ করেন, রুশ-অধিকৃত পোলাণ্ডের রাজনৈতিক আকাশ তখন ভয়ানক ঘনঘটাচ্ছন্ন ছিল। ১৮৬৩ সালে পোলাণ্ডকে স্বাধীন করিবার জন্য গুপ্ত বিপ্লবীরা বিপ্লব করিতে যাইয়া যখন নিষাতিত, নির্কাসিত ও পলাতক হইল এবং গৃহস্থগণ উপরের দিকে তাকাইয়া বুকভরা বেদনায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছিল, রুশিয়ার সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মতো কোনো ব্যক্তি কি কোনো শক্তি তখন পোলাণ্ডে ছিল না। এই রকম যখন দেশের অবস্থা সেই ভূমিতে ১৮৬৭ সালে পীলমুডস্কী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মগ্রহণের কালে পোলাণ্ডের আকাশে মাটিতে, গগনে পবনে হয়ত কোনো মূর্তন ভাব প্রকাশ পায় নাই; হয়ত কোনো আনন্দও কেহ প্রকাশ করে নাই; কিন্তু পোলাণ্ডের জয়লক্ষ্মী-ভাগ্যলক্ষ্মী রাজলক্ষ্মী সেদিন তাঁহার এই শক্তিমান পুত্রকে পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চয়ই অলক্ষ্যে হাসিয়াছিলেন। মনে হয়, স্বাধীনতার জন্য পাগল পোলজাতিকে গৌরবমণ্ডিত করিবার জন্যই তিনি পীলমুডস্কীকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন।

— ১৭৯৫ সালে তৃতীয় এবং শেষবারে রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া এবং জার্মানি এই তিন পরাক্রান্ত দেশ যার যার সুবিধা মতো পোলাণ্ডকে নিজেদের ভিতর ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইলেন। একদিনে একমুহুর্তে একদেশ তিনভাগ হইয়া গেল; একজাতি তিনজাতি হইয়া; একভাষা, এক আদর্শ, এক কল্যাণ তিনভাগ হইল, হয়ত পোলাণ্ড জন্মের মতো একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল! পোলাণ্ডের গৌরব,—তার সাহিত্য, স্বদেশপ্রেম তার ক্ষাণ্ডবল মুহুর্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া গেল; তার কবি-চারণ, তার বীরেন্দ্রগণ জন্মের মতো ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। পরাক্রান্ত শক্তিবৃন্দের বিরুদ্ধে বাটোয়ারা মোকদ্দমা করিবার

জন্য কোনো আদালত দুর্কলের সে দিন জানা ছিল না। সেই জন্মেই শক্তিমানেরা শক্তির বাহাদুরী দেখাইয়া যার যার ঘরে ফিরিলেন,—পোলাণ্ড দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অশ্রু ফেলিল।

অতঃপর জার্মানি ফন্দী আঁটিল, তার অংশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া, পোলাণ্ডকে জার্মান ভাব-ভাষায়, পোষাকে পরিচ্ছদে, আদবে-কায়দায়, হাসিতে কাশিতে একেবারে জার্মান করিয়া লইয়া বৃহত্তর জার্মানি গড়িয়া তুলিলে। অষ্ট্রিয়া, পোলাণ্ডের জাতীয় সঙ্গীতে, জাতীয় সাহিত্যে, জাতীয় সভ্যতার প্রচারে, তার মাথার উপর আকাশ ভাঙিয়া পড়িবার, কি পায়ে তলায় মাটি ফাটিয়া যাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই দেখিয়াই তার এলাকার তিন বড় বড় সহরে—ক্রাকো, গ্যালিশিয়া এবং লেম্বার্গে—পোল-সভ্যতার প্রচার করিবার গোলা অমুমতি দিল। আর রুশিয়া! সে চালাইল তার এলাকায় অত্যাচারের পর অত্যাচার। কি জাতীয় স্বাধীনতা, কি ধর্মের স্বাধীনতা, কি শিক্ষা সব দিক দিয়াই সে দস্যুর হাতে মানুষের যাহা কিছু সম্পদ সবই একেবারে কাড়িয়া লইল। রুশীয় পোলাণ্ডে মরণভয় আর চরম অত্যাচার উলঙ্গ হইয়া প্রতি মুহুর্তে লোকের দুয়ারে দুয়ারে ফিরিতে লাগিল। সিপাহী-শাস্ত্রীকে পোলদের উপর অত্যাচার করিবার জন্য বেপরোয়া ক্ষমতা দেওয়া হইল। আইন এবং শৃঙ্খলা বলিয়া কোনো বস্তু আর রহিল না; লোকেরা লঘুপাপে গুরুদণ্ড ভোগ করিতে লাগিল। জন্মভূমির জন্য কোনোরকম দরদ-দেখানোর অর্থ হইল দীর্ঘকালের জন্য 'শ্রীঘর' বাস আর সাইবিরিয়ায় নির্কাসন। জাতীয় নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ হইল। পোল-সাহিত্যের গ্রন্থকারের জন্য ব্যবস্থা হইল জেলখানা; পোল-ইতিহাসের মালিককে দেখাইয়া দেওয়া হইল সাইবিরিয়ার পথ। ইহাই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য-ইয়োরোপের এক উজ্জল সূন্দর চিত্র।

তারপর ?—মামুষ মরণভয় ভুলিয়া গেল। যুবকেরা যুতাকে ছানিয়া অমৃতের স্বাদ বুঝিবার জন্ত রুশীয় পোলাণ্ডে সাগর মন্থনের উদ্যোগ করিতে লাগিল। অশান্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্য বিদ্রোহের ভাব ছড়াইয়া পড়িতেই কর্তৃপক্ষ চোথ রাঙাইলেন, নানা রকম ভয় দেখাইতে শুরু করিলেন। জন কতক আপাততঃ ভালো ছেলের মতো ঘরমুখো হইল, আর যাহারা চিরদিনই বেমকা রকমের তাহার সাক্ষর শাসনের হাত এড়াইয়া গোপনে গুপ্ত সাগতির প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিয়া গেল। তার চেয়েও ভয়ঙ্কর হইল পোল-জননীদেব দান ! তাহার ঘরে থাকিয়া সন্তানদের অন্তরে স্বদেশ প্রেম আগাইতে লাগিলেন ; রূপকথার পরিবর্তে রূশ-অত্যাচারের কথা শুনাইতে লাগিলেন ; শিখাইতে লাগিলেন, পোলাণ্ডের স্বাধীনতার জন্ত যুদ্ধ করিয়া মরার চেয়ে গোরবের এবং পুণ্যের কাজ আর নাই।

পোলাণ্ডের স্বাধীনতা ছিল কি স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে,—ইহার যে কোনোটির সম্বন্ধে বেদনা কি আনন্দ প্রকাশ নিষিদ্ধ বলিয়া আইন জারী হইল। রুশিয়ার গুপ্তচরে গুপ্তচরে পোলাণ্ড ছাইয়া ফেলিল। ইহার প্রকাশে অপ্রকাশে, অন্ধকারে আলোতে, উঠানে বাড়ীর আনাচে-কানাচে, সদর রাস্তার উপরে, অগ্নিতে গলিতে দিবারাত্র চকিৎস ঘণ্টা কান পাতিয়া রহিল, কেহ “স্বাধীনতা” শব্দ উচ্চারণ করে কিনা, শুনিবার জন্ত। রুশীয় পোলাণ্ডে সেদিন নিতান্ত ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও গুপ্তচরদলকে ফাঁকি দিবার জন্ত দেশের সম্বন্ধে হেয়ালীতে কথা বলিতে এবং কাজে সামান্য দিয়া চলিতে বেশ ওস্তাদ হইয়া পড়িয়াছিল। দেশের স্বাধীনতার জন্ত, বিশেষভাবে রুশিয়ার অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে সকল প্রকার ষড়যন্ত্রে ইহার কায়মনে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

পোল-বেদনার যৌবনমুগ্ধ রুশিয়ার বিরুদ্ধে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল ১৮৩০ সালে। এই বিপ্লবে পোলাণ্ড স্বাধীন হইয়া গেল না বটে, তবে রুশিয়া এবং জগৎ একই সময়ে বুঝিল পোলাণ্ড মরে নাই ; এক পোলাণ্ড তিন ভাগে বিভক্ত হইলেও তাহার রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক ভাবেই প্রবাহিত হইতেছে ; এক দেশে তিন তিন রকমের পাস পোর্টের

ব্যবহার থাকিলেও পূর্বের এক পোল-আত্মা এখনো ঠিক তেমনই আছে। পোল-শিশুরা বাল্যশিক্ষা লাভ করিতেছিল এই বিপ্লব গ্রন্থের ভিতর দিয়া !

দেশের শিশুরা যখন নানা রকম খেলাধুলায় সময় কাটাইত, পীলুড্‌স্কী তখন পোল-ইতিহাসের গৌরব, “স্বাধীনতা” “লড়াই” ইত্যাদি বিষয় শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন। যে সব খেলা তিনি ভাই বোনদের সহিত খেলিতেন, তাহাই পরিণত হইয়া দেখা দিয়াছিল তাঁহার পরিণত বয়সে পোল-স্বাধীনতার ষড়যন্ত্রের ভিতর। তিনি খেলা-ধুলায় যখন ক্রান্ত হইয়া পড়িতেন, তখন বই লইয়া পড়িতে বসিতেন। যুদ্ধের গল্প, গ্রীক এবং রোমানবীরদের বীরত্ব কাহিনী, এবং নেপোলিয়ন সম্বন্ধে নানারকম সাহিত্যই ছিল তাঁহার মনের প্রধান খোরাক। যে সকল পোল-সৈন্য নেপোলিয়নকে স্পেন-জয়ে সাহায্য করিয়াছিল ; সারাগোসা এবং সোমোসীরার চারিদিকে যুদ্ধের আগুন জ্বলাইয়াছিল ; যে বীরত্ব ওস্তারলিংস-এ লড়িয়াছিল, মোস্কাউকে পুড়াইয়া ছারখার করিয়াছিল, পীলুড্‌স্কী সেই সব বার বার পড়িতেন। পোলাণ্ডের যে সকল সন্তান নেপোলিয়নের মার্শালরূপে ফ্রান্সের গৌরব বাড়াইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের নাম শ্রবণ করিয়া তিনি আনন্দিত হইতেন। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের হইলেও পীলুড্‌স্কী তাঁহাকে পোলাণ্ডের জাতীয় জীবনের আধ্যাত্মিক শক্তি জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতেন। স্বদেশ-প্রেমিক পীলুড্‌স্কীর নিকট নেপোলিয়নই ছিলেন একমাত্র আদর্শ পুরুষ।

১৮৭৪ সালে এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডের ফলে পীলুড্‌স্কী-পরিবারের সমুদয় সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। ঋণগ্রস্ত, দারিদ্র্যপীড়িত পীলুড্‌স্কী-পরিবার পথের ফকীর হইয়া ভিলনায় চলিয়া গেলেন।

এখানে আসিবার পর জোসেফ্ এবং তাঁহার দাদা ব্রোনিম্বল এক রুশ পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি হইলেন। জন্মভূমিকে তিনি সব চেয়ে বেশি ভালোবাসিতেন। রুশ পণ্ডিতের পাঠশালায় তাঁহার সেই ভালবাসাকে অবমানিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত মর্মান্বিত হইলেন। পোলাণ্ডের জন্তই যিনি জন্মিয়াছেন পোলাণ্ডের জন্তই যিনি মরিতে আসিয়াছেন,

পোলাণ্ডের স্বাধীনতা যাহার লক্ষ্য, পোলাণ্ডের গৌরবে  
যাহার পৌরব—পোলাণ্ডের অনন্ত আকাশ তাঁহার গৃহছাদ,  
পোলাণ্ডের বিরাট বক্ষ তাঁহারই উপযুক্ত শয্যা। সেইজন্যই  
অষ্টটন ঘটন পটীয়াসী পোলাণ্ডের ভাগ্য বিধাত্রী পীলস্‌ড্‌স্‌কীর  
অন্তরে দেশের দুঃখদারিদ্র্য অপমানের আগুন জ্বালাইয়া  
দিবার নিমিত্তই তাঁহার ঘর বাড়ী বিহীনসম্পত্তি পুড়াইয়া দিয়া  
তাঁহাকে ভিলনায় টানিয়া আনিয়াছিলেন।

এই সকল কৃষ-পাঠশালায় অধা জানোয়ার অধা মানুষ  
পণ্ডিতগুণা, যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যালয়ের পর পোলাণ্ডের  
শিশুদিগকে নিজেদের বাপ-ঠাকুরদাদার নাম, ধর্মকর্ম, স্বদেশী  
গান-কবিতা এক কথায় যাহা কিছু পোলিশ তাহা ভুলাইয়া  
দিবার মতো শিক্ষা ক্রমের গুরুত্বনিং বিদ্যালয়ে লাভ  
করিবার পর, পাঠশালায় পাঠশালায় রপ্তানি হইত।  
পাঠশালায় তো বটেই রাস্তাঘাটেও স্বদেশী পোষাক পরিচ্ছদ  
পরিধান নিষিদ্ধ বলিয়া আইন জারী হইল। পাঠশালায়  
পাঠশালায় পোলভাষার জবাই চলিল। শিশুমনে তথা-  
কথিত ধর্মের বটবৃক্ষ রাতারাতি গড়াইয়া দিবার জ্ঞাত ছাত্রদের  
হাতে হাতে কৃষভাষায় ছাপানো স্তবের বই দেওয়া হইল।  
রাস্তা, ক্ষেয়ার, বাগ-বাগিচা, দীঘি-সরোবর ইত্যাদির  
কপালে কৃষনাম স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া হইল ; পোল  
জাতি “নিজ বাসভূমে পরদাসী হইল”। কৃষ-অদিকৃত  
পোলাণ্ডের ইতিহাস হইল পোলদিগের জাতীয় ইতিহাস।  
অতি সাবধানতার সহিত মাপিয়া জুগিয়া শিক্ষা বিভাগ এমন  
ইতিহাস রচনা করিলেন যাহাতে ক্রমের গৌরব এবং  
পোলাণ্ডের অধ্যয়ন নিখ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার আর  
উপায় রহিল না। কাণ্ড জ্ঞান বজ্জিত শিক্ষকরা সেই সকল  
কথা ছাত্রদিগকে আকর্ষ পুরাইয়া দিতেছিলেন।

শিক্ষকের এই রকম শিক্ষার ফলে ছাত্রদের ভিতরে  
বিদ্বেষভাব নাশা তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল। যদি শিক্ষক  
এবং শুল কৰ্জপক্ষ দেখিতেন কোনো ছাত্রের তাহাদের  
শিক্ষায় আস্তা নাই তাহা হইলে তাহাকে শুল হইতে  
বিনায় করিয়া দিতেন।

কৃষ্ণ কণ্ঠস্বয়ং নিরঞ্জনঃ শাস্ত্রার্থটাকে দামী পোষাক-

পরিচ্ছদের সাহায্যে আরো জাঁকালো করিয়া ভুলিবার চেষ্টায় ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কথায় কথায় শৃঙ্খলা বিধানটা যে খুব বড় জিনিষ এ সবও অনাবশ্যক আওড়াইতে ছাড়িতেন না। পরাধীন পোলদের মনের উপর নানা দিক দিয়া প্রবল পরাক্রান্ত রুশ শক্তির ছাপ মারিয়া দিবার পক্ষে এগুলি খুব বড় উপায় বলিয়া কর্তৃপক্ষ এই সব উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহাদের জ্ঞান এসব করা হইত সেই ছাত্রদল এসবে মোটেই ভোলে নাই। তাহাদের বিরক্তি বাড়িয়া চলিয়াছিল।

মুখের অশেষ দোষ । এই সকল শিক্ষকরা রাতারাতি পোলাঙকে হজম করিয়া ফেলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন । যে আগুন স্বাভাবিকভাবে জলিতেছিল তাঁহারা সেই আগুনকে আরো উষ্ণাইয়া দিলেন । যে সকল স্বদেশ-প্রেমিকের ছবি জননীরা শ্রদ্ধা করিতেন ; যাহাদের কথা বলিতে বলিতে জননীরা অশ্রু ফেলিতেন ; নষ্টপ্রায় ছবিগুলিও যাহারা অতি যত্নে গর্দের বস্ত্র বলিয়া রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন ; যাহাদের আদর্শে জননীরা নিজ সম্মান-দিগকে গড়িয়া তুলিতেছিলেন, সেই সকল পুণ্যলোক বীরদিগকে শিক্ষকগণ শঠ, বদমায়েস, বিশ্বাসঘাতক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন । ইহারা যে সকল কাজ করিয়া দেশ বিদেশে বরণীয় হইয়াছেন, শিক্ষকরা সেই সকল কাজ কন্মের অকথ্য নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন । যে ক্রিশিয়ার বিরুদ্ধে তাঁহারা বিপ্লব ঘটাইয়া কীৰ্ত্তিমান হইয়াছিলেন, ভাবী যুবকরা আর যাহাতে তাঁহাদের পথে না যায় ভালো ছেলে হয়, লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হয়, সে সম্বন্ধে অপত্যজ্ঞানে চিরহিতাকাম্বী পিতার মতো সময় পাইলেই শিক্ষকরা উপদেশ দিতেন ।

শিশুরা স্কুলে বাহা শুনিতে বাড়াতে আসিয়া জননীদের নিকট তাহা বলিত । জননীরা ইহাতে ভয়ানক ভয় পাঠিতেন । কারণ এই সকল শিশুরা যদি দীর্ঘকাল ক্রশ-শিক্ষার আওতায় থাকে তাহা হইলে পোলাণ্ডের আধীন প্রভাত দেখিবার আর কোনো ভরসা থাকিবে না । জননীরা প্রত্যহ রাত্রিতে একবার ঐ সকল ছবি বাহির করিয়া সম্মানদিগকে দেখাইতেন ; সময় এবং সুযোগ পাঠিলেই স্বদেশী কবিতা ও গান শুনাইতেন । শিক্ষকদের এই বকম চাপাচাপির ভিতর পড়িয়াও একমাত্র জননীদের জন্যই পোল শিশুরা নিজ-দিগকে হারাইয়া ফেলিতে পারে নাই ।

# ‘গতি মোর পূর্ণতার পানে’

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রতিদিন যাত্রাপথে সহস্র বিচ্যুতি,  
ক্রটি ভেদ করি’  
চলিয়াছি পূর্ণ হ’তে পূর্ণতারি পানে  
একলক্ষ্য স্মরি’ ।

নির্ভীক নিষ্ঠুর আমি পশ্চাতে ফিরিনা,  
ক্ষোভে নাহি পুড়ি ;  
ঝড়-ঝঞ্ঝা গিছনে সম্মুখে — আমি হেরি  
পূর্ণের মাধুরী ।

চলিয়াছি যুগ হ’তে কত যুগান্তর  
আমি গৃহহারা  
উর্দ্ধে মোর আকাশ বেড়িয়া, ধরিত্রী সে  
পার্শ্বে চক্রাকারা ।

যত দোষ, গুণ যাহা পারাইয়া ক্রমে  
চলিয়াছি বেগে,  
কত কী আঘাত ক’রে ফিরে যায় পুনঃ  
মোর অঙ্গে লেগে ।

নূতন উজ্জমে চলি দ্বিধা-সন্দ’হীন  
অমর অক্ষয় ;  
যা-ই করি যাহা ইচ্ছা তবু কণ্ঠ গাহে  
পূর্ণতারি জয় ।

যদি ভুল ঘিরে ফেলে স্বকঠিন জালে,  
যদি লাগে ভয়,  
উচ্চ-কণ্ঠে কহিব নির্ভয়ে, ‘চিরন্তন  
এই নয় নয় ।’

চিন্তা যাহা চাহে একমনে সেই সত্য  
সেই সত্য হ’বে,  
কণেকের ভ্রম-পরমাদ, সে-কি মোরে  
জয় ক’রে ল’বে ?

প’ড়ে যাই, ঝ’রে যাই যা’ হই—ইহারা  
পূর্ণতারি হাতে  
সমর্পিয়া দিবে মোরে নিশ্চয় সে এক  
অজানা প্রভাতে ।

আমি যেন রক্ত-শিশু দাঁড়াইয়া আছি  
ধ্যান-মৌন সম,  
ক্রক্ষেপ নাহিক কিসে সম্মুখে পশ্চাতে  
যাহা আছে মম ।

কাল-বৈশাখীর লীলা ভৈরব তাণ্ডবে  
ভেসে দেবে শাখা,  
টুটিবে না, পড়িবে না উচ্চশিরে মোর  
দাঁড়াইয়া-থাকা ।

বর্ষার বষণ-ধারে স্নান করি’ হ’ব  
ধৌত পূত-প্রাণ ;  
যাহা চাই তা’রি ধ্যান, তা’রি একমনে  
করিব সন্ধান ।

দুর্জয় শীতের কোপে কাস্তিভ্রষ্ট আমি,  
শুক মৃত-প্রায়  
সশঙ্কিত, ভয়চিন্ত, বিকোভিত নহি  
তথাপি তাহায় !

সত্য জানি নিশ্চয় সে-বসন্ত আমার  
দৈন্য দেবে মুছি’  
পরিপূর্ণ নবপত্রে সুসজ্জিত পুনঃ  
সুপবিত্র শুচি ।

ঝ’রে যা’ব ক্ষণে ক্ষণে এমনি প্রত্যহ  
পূর্ণ হ’ব তবু,  
গতি মোর পূর্ণতার পানে, জানি—জানি  
অন্যে নহে কভু ।



# নারীসাহিত্যের মর্যাদা

শ্রীকালিদাস রায়

আমাদের দেশে নারীজাতির সকল চেষ্টাকেই সাধারণ সার্বজনীন আদর্শে বিচার করা হয় না—নারীর জ্ঞান হ্রস্বতর স্বতন্ত্র আদর্শের মাপ কাঠিতে ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে। সাহিত্যে নারীর দান সামান্য নয়—অথচ সে দানের কথা স্বীকার করিবার সময় পুরুষের দানের সহিত তাহাকে একশ্রেণীতে গণ্য করিয়া বিচার করা হয় না—নারীজাতির শক্তিকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টতর মনে করিয়া প্রশংসাজালে লেখিকাদিগকে উৎসাহিত ও আশস্ত করা হয়। এই প্রকার বিচারে যে একটা কৃপার ভাব মিশ্রিত আছে তাহাতে লেখিকাদের মর্যাদাহানি হয়। এইরূপ কথাই ইদানীং একটি স্থলেখিকা একটি প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন। লেখিকা এই প্রসঙ্গে যে যুক্তি দিয়াছেন তাহা অসঙ্গত নয়।

আমার মনে হয়, যদি নারীপুরুষনির্কিশেষে অপকৃপাত-সাহিত্য-বিচার হয় তাহাতেও মহিলাসাহিত্যের মর্যাদা বিশেষ কিছু বাড়বে না—তাহাতে নারীজাতির প্রতিই অধিকতর শ্রদ্ধাই সূচিত হইবে। এদেশে আবহমান কাল হইতে পুরুষজাতিই সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। পুরাণ ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়—ভারতবর্ষে কোন ক্রমে নারীও কিছু কিছু সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন—কিন্তু তাহা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। পুরুষই সাহিত্যকে জীবনের ব্রহ্মরূপ গ্রহণ করিয়া রসজগতে বিরাট সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইদানীং জাশিকার বহুল প্রচারে নারীজাতির মধ্যে সাহিত্যচেষ্টা উল্লেখযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই যে মহিলা রচিত সাহিত্য ইহার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য কোথা?

অধিকাংশ মহিলাসাহিত্য পুরুষ রচিত সাহিত্যেরই অনুকরণ মাত্র নয় কি? মহিলাদের রচিত সাহিত্য যতই উচ্চশ্রেণীর হউক—পুরুষ রচিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্তি তাহার প্রকৃত মর্যাদা কোথা? এখানে কথা হইতে পারে—

সাহিত্যের আদর্শ বিশ্বজনীন—তাহা পুরুষের নিজস্ব হইতে পারে না। নারী পুরুষসাহিত্যের অনুকরণ করে নাই—পুরুষের মত সেও সাহিত্যের বিশ্বজনীন আদর্শেরই অনুসরণ করে। ইহার উত্তরে এই বলিতে চাই—সাহিত্যের আদর্শ কাহারও নিজস্ব নয় সত্য—কিন্তু রসদৃষ্টির একটা স্বাভাবিক তারতম্য আছেই। নারী ও পুরুষের জীবনের বৈচিত্র্যে যে যথেষ্ট বিধিনির্দিষ্ট পার্থক্য আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। জীবনের এই বিধানাদিষ্ট পার্থক্য দৃষ্টির পার্থক্যও সৃষ্টি করিবে ইহা স্বাভাবিক। পুরুষ যে দৃষ্টিতে নারী, পুরুষ, প্রকৃতি, সমাজ ও সংসারকে দেখিয়াছে ঠিক সেই দৃষ্টিতেই নারীরও দেখিবার কথা নয়। প্রত্যাশা করা যায়, নারী তাহার নিজস্ব স্বাভাবিক দৃষ্টিতে জগৎকে দেখিবে এবং সেই দৃষ্টিই তাহার রচিত সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করিবে। পুরুষের দৃষ্টি বৈশিষ্ট্যকেই অনুসরণ করিয়া যে সাহিত্যের সৃষ্টি তাহাকে পুরুষ রচিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া আর কি বলিব? নারী যদি আপনার নিজস্ব স্বতন্ত্র স্বাভাবিক দৃষ্টিতে বিশ্বজগৎকে দেখিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করে তবেই তাহার রচিত সাহিত্যের প্রকৃত মর্যাদা জন্মে। পুরুষের আকৃত উপকরণ লইয়া অথবা পুরুষের মতিগতি বৃত্তি প্রবৃত্তি ও দৃষ্টি ভঙ্গীর অনুসরণ করিয়া রচিত সাহিত্য কিছুতেই পূর্ণ মর্যাদা লাভ করিবে না। পুরুষের মকদ্দিমানার হাত হইতে রেহাই পাইবে না। আমি লেখিকাকে অনুরোধ করি তিনি একটি ভাবলউন—আমাদের দেশের লেখিকারা কতটা নারী চিত্রের নিজস্ব স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ও মতিগতির সহায়তায় সাহিত্য সৃষ্টিতে সাফল্য লাভ করিয়াছেন—একটি প্রবন্ধে তাহাই দেখাইয়া দিন। তাহা হইলে নারী সাহিত্যের প্রকৃত মর্যাদা সূচিত হইবে।

# ন্যায়-দর্শন

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানরত্ন এম, এ

গৌতমের ন্যায়-দর্শন ভারতবর্ষে যুগান্তরের সৃষ্টি করিয়াছিল। ন্যায়কে দর্শন না বলিয়া তর্কশাস্ত্র (logic) বলিলে আরো ভালো হয়। এক সময়ে ন্যায় শাস্ত্রের গভীর আলোচনায় বাঙালী মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং কুশাগ্র নৈয়ায়িক বুদ্ধিতে সমস্ত ভারতবর্ষকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। নদীয়া তখন ছিল ন্যায়ালোচনার মূলকেন্দ্র। ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে এই নদীয়ার পণ্ডিতদিগের নিকট ন্যায় শিক্ষা করিতে শতশত জ্ঞান-পিপাসু ছাত্র বাংলা দেশে ছুটিয়া আসিত।

গৌতমের ন্যায়শাস্ত্র ন্যায় দর্শনের আদিম গ্রন্থ। এই পুস্তককে অবলম্বন করিয়া পরবর্তীকালে অনেক ভাষ্য বর্তিকা এবং টীকা সংকলিত হইয়াছে। ন্যায়ভাষ্য ন্যায়শাস্ত্রের আদিম টীকা। ইহা পক্ষিণ স্বামী (বাৎসায়ন) কর্তৃক লিখিত এবং জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। ন্যায় ভাষ্যের আবার ন্যায় বর্তিকা ভাষ্য নামে একখানি টীকা আছে,—ভাষ্যকারের নাম উত্তমকর আচাধ্য। উত্তমকর আচাধ্যের টীকা দুর্লভ। হওয়ায় ইহারও একখানি ভাষ্য লিখিত হইয়াছিল। ইহার নাম ন্যায়বর্তিকা তাৎপর্য টীকা—লেখক বাচস্পতি মিশ্র। ভাষ্যের ভাষ্য তাহার আবার ভাষ্য এই করিয়া কঠিন ন্যায় শাস্ত্র সহজ এবং প্রাঞ্জল হইয়াছে। উদ্ভট আচাধ্য নামে একজন টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র কর্তৃক লিখিত ভাষ্যের ন্যায় বর্তিকা তাৎপর্য পরিবর্তি নামে একখানি টীকা প্রণয়ন করেন।

এতদ্বিধা কেশবমিত্রের তর্কভাষা, মাধবদেবের তর্কভাষা সারমঞ্জরী, গোবিন্দ ভট্টাচার্যের ন্যায় সংক্ষেপ প্রভৃতি বহুগ্রন্থ ন্যায় দর্শন বিষয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বনাথ পঞ্চানন ভাষ্য-পরিচ্ছেদ নামে ন্যায় বিষয়ে একখানি পুস্তক লেখেন। কালীনাথ তর্কপঞ্চানন বাংলাভাষায় ইহার টীকা লিখিয়াছেন।

মুখ্যতঃ ন্যায় অংশের (logical portion) উপর ভিত্তি করিয়া গনেশ উপাধ্যায় তাহার চিন্তামনি নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ন্যায় দর্শনের ইহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ। নদীয়ার পণ্ডিতগণ ছাত্রদিগকে এই গ্রন্থ হইতেই ন্যায়শাস্ত্রে শিক্ষা প্রদান করিতেন। বিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির মতামত এই পুস্তককেই ভিত্তি করিয়া প্রচারিত হয়। তিনি নিজে এই গ্রন্থের একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

অন্যান্য দার্শনিকগণের মত ঋষিগৌতম ও নিশ্রেয়স কি প্রকারে লাভ করা যায়, তাহার অনুসন্ধান তৎপর হইয়াছেন। এই অনুসন্ধানের ফলে প্রকৃতজ্ঞান (perfect Knowledge) অর্থাৎ সত্যের সম্বন্ধে জ্ঞানকেই (Knowledge of truth) তিনি নিশ্রেয়সের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে হইলে অনেক অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে হয়, বিশেষতঃ আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিলে প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় না। যে এই জ্ঞানলাভ করিতে পারে, সে শোক তাপের অনেক উপরে উঠিয়া যায় এবং পুনর্জন্মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়। সে নিশ্রেয়স এবং মোক্ষলাভ করে।

মানব জীবনে এতদুঃখ তাপ এইজন্ত যে আত্মা জড়দেহের সংস্পর্শে আসে এবং পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। মানসিক প্রবৃত্তির জন্য মানবের পুনর্জন্ম হয় এবং এই প্রবৃত্তি হইতে কর্মের উৎপত্তি হয়। কর্ম হইতে কর্মফলের সৃষ্টি। মানবের স্ব স্ব কর্ম ফল ভোগ করিতে হইবে। পূর্ব জন্মের স্মৃতির কর্মফলে মানব পরজন্মে সুখ এবং দুঃখের কর্মফলে পরজন্মে দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

দোষের দ্বারা প্রবৃত্তির জন্ম। মিথ্যা জ্ঞান বা অজ্ঞানতা দূর করিতে পারিলে দোষ দূর হইবে এবং সংসর্গে প্রবৃত্তিও ধ্বংস হইবে। প্রবৃত্তি ধ্বংস হইলে পুনর্জন্ম এবং সঙ্গে সঙ্গে দুঃখতাপ লুপ্ত হইয়া যাইবে। দুঃখ তাপ দূর করিয়া

আত্মাকে চরম বিশ্রাম স্থলে আনার নামই নিশ্চেষ্ট।  
কি করিয়া আত্মা এবং এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে মানুষের  
মিথ্যাজ্ঞান দূর হইয়া প্রকৃত জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে  
ত্নায়-দর্শনের ইহাই একমাত্র লক্ষ্য।

গৌতম প্রথমেই তিনটি জিনিষের নামোল্লেখ করিয়াছেন।  
উদ্দেশ্য, লক্ষণ, পরীক্ষা—এই তিনটি বিষয়ের সাহায্যে  
মিথ্যাজ্ঞান দূর করিবার চেষ্টা করিতে হয়। কোন বস্তুর  
কি নাম, কি কি লক্ষণ এবং সে বিষয়ে কতদূর কি জ্ঞান  
গিয়াছে বা জ্ঞান যাইতে পারে। এই পথ অবলম্বন করিয়া  
সমস্ত বিষয়ে ন্যায়ের দ্বারা সত্যজ্ঞান লাভ করিতে হয়।

প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে হইলে ষোলটি পদার্থে অভিজ্ঞ  
হইবার প্রয়োজন হয়। প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন,  
দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা,  
হেতুভাস, ছল জাতি এবং নিগূহস্থান এই ষোল প্রকার  
পদার্থে সম্যকরূপে জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ  
হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি প্রধান এবং  
অন্যান্য সমস্তগুলি এই প্রথম দুইটি পদার্থের সাহায্যকারী।

ন্যায়ের উদ্দেশ্য প্রমেয়কে প্রমাণ করা। প্রমেয় কি?  
সর্বশুদ্ধ বারোটি বস্তুকে ন্যায় প্রমাণ করিতে চাহে। এই  
বারোটি বস্তু কি কি! আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়-নিচয় অর্থ,  
বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ এবং অণবর্গ।

ইহাদের বিষয়ে সম্যকরূপে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে  
ইহাদ্বিগকে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়া দিতে হয়। এই প্রমাণ  
চারিপ্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ। দর্শন  
এবং স্পর্শের দ্বারা যে প্রমাণ তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ,  
উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণের নাম উপমান, কাব্য কারণ  
দর্শাইয়া প্রমাণের নাম অনুমান এবং পূর্বমুনি ঋষিদিগের  
জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অথবা পবিত্র বৈদিকবাণীর দ্বারা যে  
প্রমাণ তাহাকে শাস্ত্রিক প্রমাণ কহে।

“আত্ম-শরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধি-মনঃ প্রবৃত্তি-দোষ প্রেত্যভাব  
ফল-দুঃখাপবর্গাস্ত-প্রমেয়ম।”

এই দ্বাদশ বস্তুর প্রথম বস্তু আত্মা। সাংখ্য দর্শনের ত্নায়  
ত্নায়নর্শন বহু আত্মার অস্তিত্ব মানিয়া লয়। গোগের মতে  
আত্মা দুই প্রকার—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। পরমাত্মা এক

—স্বথ দুঃখের অতীত এবং অসীম জ্ঞানের অধিকারী।  
জীবাত্মাও অসীম (Infinito), কারণ যেখানেই জড়দেহের  
অস্তিত্ব সেখানেই জীবাত্মার উপস্থিতি। জীবাত্মার পক্ষে  
কর্মফল স্বপদুঃখ সমস্তই আছে। ইহা চিরস্থায়ী, কারণ  
ইহা অসীম। ভিন্ন ভিন্ন জীবের দেহে জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন রূপ  
ধারণ করে। জীবাত্মা চৌদ্দপ্রকার গুণের অধিকারী,—  
সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, বুদ্ধি, স্মৃতি,  
দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, পাপ, পুণ্য কল্পনা-শক্তি।

আত্মা সর্বানুভাবী, সর্বভোক্তা এবং সর্ব-দ্রষ্টব্য।  
সমাধিযোগে পাপ পুণ্যের অতীত হইলে আত্মার ভিতরে  
সর্ব-ব্যাপকত্ব স্থান পায় এবং সর্বজ্ঞত্বাদি গুণ প্রকটিত হইয়া  
থাকে।

শরীর দ্বিতীয় প্রমেয় বস্তু। কতকগুলি অংশের সমষ্টি  
লইয়া শরীরের সৃষ্টি হইয়াছে। অণু পরমাণু শরীরকে পুষ্ট  
করিয়াছে। আত্মা, জ্ঞান এবং অন্তঃপ্রেরণার (sentiment)  
আশ্রয়স্থল; শরীর কতকগুলি মাংসপেশী এবং ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি।  
ইহার গঠন পার্থিব এবং যে সমস্ত গুণাবলী পৃথিবীর আছে  
সে গুলি ইহাতেও উপলব্ধিত হইবে।

মানব শরীর ব্যতীত গৌতম অন্যান্য শরীরের কথাও  
বলিয়াছেন! ইহারা এই পৃথিবী এবং অগ্ন্যাগ্ন সমস্ত জগত  
ব্যাপিয়া বিস্তারিত রহিয়াছে। উপনিষদের মত গৌতম  
তাহাদের জলময়, আগ্নেয় এবং বায়ু এই তিন প্রকারের  
শরীর বলিয়া উপখ্যাত করিয়াছেন।

তৃতীয় প্রমেয় বস্তু ইন্দ্রিয়-বর্গ। ইন্দ্রিয়-নিচয়ের সাহায্যে  
জ্ঞান লাভ করিতে হয়। ইহারা জ্ঞান লাভের যন্ত্র বিশেষ।  
অণু পরমাণু লইয়া গঠিত ইন্দ্রিয় পাঁচটি—আজ্ঞাণ, আশ্রাদ,  
দর্শন, স্পর্শ এবং শ্রবণ। “জ্ঞাণ-রসন-চক্ষুশ্রু-শ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি  
ভূতভ্যাঃ”। পৃথিব্যাदि পঞ্চভূত হইতে ইহাদের উৎপত্তি  
হয়। সাংখ্যের মতে যেমন এই ইন্দ্রিয় নিচয় অন্তর্কর্কৃষ্ণির  
আকার পরিবর্তিত হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে, ত্নায়ের মতে সেরূপ  
ভাবে ইহারা সৃষ্ট হয় নাই। ত্নায়ের মতে ইহারা জড়  
পদার্থ—পঞ্চভূতের সমষ্টি।

দর্শনেন্দ্রিয় স্বচ্ছ, শ্রবণেন্দ্রিয় বায়ুময়, আশ্রাদেন্দ্রিয় জলময়,  
স্পর্শেন্দ্রিয় বায়ব এবং আজ্ঞাণেন্দ্রিয় পার্থিব। চোখের

মনি দর্শনেন্দ্রিয়ের আশ্রয়স্থল, শ্রবণেন্দ্রিয়ের নিবাস স্থান—কর্ণপটহ, আত্মাণেন্দ্রিয়ের বসতিস্থল—নাসিকা দ্বার অথবা নাসিকার অগ্রভাগ, আত্মাদেন্দ্রিয়ের—জিহ্বার অগ্রভাগ এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের—ত্বক। জ্ঞানেন্দ্রিয়-নিচয়ের দ্বারা গন্ধ, আত্মাদ, বর্ণস্পর্শ এবং শব্দ উপলব্ধি হইয়া থাকে। বৌদ্ধদিগের মতে জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি, সাংখ্যের মতে এগারোটি কিন্তু জ্ঞানদর্শনের মতে জ্ঞানেন্দ্রিয় মাত্র ছয়টি—আত্মাণ, আত্মাদ, দর্শন, স্পর্শ, শ্রবণ এবং মন।

মন সুখ দুঃখ এবং অন্তর্কর্ক ( internal sensation ) অনুভব করিবার যন্ত্র বিশেষ। মন যখন পঞ্চেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসে তখনই কেবল বাহ্যবস্তু বিষয়ে সচেতন হয়। আমাদের এক সময়ে কেবল মাত্র একটি বিষয়ে জ্ঞান লাভ হয়—ইহার দ্বারা মনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। প্রত্যেক আত্মার মাত্র একটি মন আছে। ইহা অসীম—অসীম নহে কিন্তু চিরস্থায়ী (eternal)।

বাহ্য পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হয়, তাহারাই অর্থ। এই অর্থই যোগের চতুর্থ প্রমেয় বস্তু। “গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ শব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণাস্তদর্শাঃ।”

প্রমেয় পঞ্চম বস্তু বুদ্ধি। বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান একই অর্থজ্ঞাপন করে। বুদ্ধির দুইটি রূপ—অনুভব এবং স্বরণ। অনুভব সত্য হইতে পারে এবং মিথ্যাও হইতে পারে। স্বরণও সত্য এবং মিথ্যা দুইই হইতে পারে। জাগরণে সাধারণতঃ সত্যস্বরণ আসে এবং ঘুমে মিথ্যা স্বরণের উপলব্ধি হয়।

ষষ্ঠ প্রমেয় বস্তু—মন। ইহা ইন্দ্রিয়-নিচয়ের অগ্রতম। বাহ্য বস্তু বিষয়ে ইহার কোন চেতনা না থাকিলেও, অন্তর্কর্কিতে ইহা অচেতন থাকে। আত্মা, শরীর প্রভৃতির জ্ঞান মনকেও সপ্রমাণ করিতে হইবে।

“বাক্য, বুদ্ধি এবং দেহ দ্বারা সৃষ্ট গুণ বিষয়কে প্রবৃত্তি বলে। এই স্থলে কিন্তু বুদ্ধি বলিতে মন ধরিয়া লইতে

হইবে, এবং প্রবৃত্তি শব্দের প্রকৃত অর্থ হইবে তজ্জনিত পাপ-পুণ্য। প্রবৃত্তির দ্বারাই জীবের পুনর্জন্ম সংঘটিত হয়। প্রবৃত্তি জ্ঞানদর্শনের সপ্তম প্রমেয় বস্তু। রাগ, দ্বেষ ও মোহ হইতেই প্রবৃত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে ইহা মৌখিক, মানসিক এবং দৈহিক। মৌখিক প্রবৃত্তি বাক্য, মানসিক প্রবৃত্তি চিন্তা প্রভৃতি, এবং দৈহিক প্রবৃত্তি হাব ভাব চলা ফেরার দ্বারা সৃষ্ট হয়।

অষ্টম প্রমেয় বস্তু দোষ। দোষ কি জানিতে হইবে। বাসনা, ইচ্ছা, দ্বেষ, ভুল, প্রভৃতিই দোষ।

প্রত্যভাব প্রমেয় নবম বস্তু। মৃত্যুর পরে জীবাত্মা যে অবস্থায় উপনীত হয় তাহাই প্রত্যভাব। “পুনরুৎপত্তিঃ প্রত্যভাবঃ।” পুনরুৎপত্তিকে প্রত্যভাব বলে। জন্ম ও মরণের এই যে প্রবাহ ইহাকেই প্রত্যভাব বলিয়া জানিতে হইবে। এই প্রত্যভাব সৃষ্টির গোড়া হইতে চলিয়া আসিতেছে।

ফল, জ্ঞানদর্শনের প্রমেয় দশম বস্তু। কর্ম করিলেই ফল উৎপন্ন হইবে। ফলকে পূর্ণভাব বলা হইয়া থাকে। শরীর মন এবং ইন্দ্রিয় নিচয়ের সাহায্যে কর্মের পরিণাম স্বরূপ সুখ দুঃখ উপভোগ করিতে হয়।

জগতের প্রত্যেক জীবই অল্প বিস্তর দুঃখ পায়। দুঃখ জগতে চিরন্তন সত্যরূপে বর্তমান। সাংখ্য যেমন দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে, ন্যায়ও দুঃখকে বরণ করিয়া লইতে বলে নাই। দুঃখ ন্যায়ের প্রমেয় একাদশ বস্তু। এই দুঃখকে দূর করিয়া তবে অপবর্গ লাভ করিতে হয়।

অপবর্গ লাভই ন্যায়দর্শনের চরম উদ্দেশ্য (Summum Bonum)। অপবর্গ লাভ করিতে পারিলে কাহারও আর পুনর্জন্ম হইবে না সুতরাং জীব সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণার হাত হইতে নিস্তার পাইতে পারিবে। ইহাই ন্যায়দর্শনের নিশ্চেষ্ট ইহাই ন্যায়ের মোক্ষ।

—ক্রমণঃ





# সঙ্কলন

## যোগশক্তি

বা

(আমার যোগ সাধনা)

শ্রীবাবীন্দ্রকুমার ঘোষ

মানুষ এক পরম রহস্য পূরী অধিবাসী; কি এক ইন্দ্রজালের কুহক তার জন্ম ও মৃত্যু ঘিরে তাকে অবিরাম ডাক দিচ্ছে, এ অজানার ডাক এড়ান তার সাধ্যাতীত। সে যদি মূল জড় বস্তু হ'তো, তা'হলে পাথরের শালগ্রামটীর মত যেখানে রাখো পরম নিশ্চিত জড়তায় সেইখানে তদবস্থায়ই যুগযুগান্তর ধরে পড়ে থাকতো। সে যদি গাছপালার মত জড়ধর্মী অথচ চেতন হ'তো তা হ'লে তার ঈষৎ পরিশ্রুট স্বভাবজ চেতনা নিয়ে মাটির রস টেনে সূর্যের কিরণ পান করেই তুষ্ট থাকতো। সে যদি নিত্যন্ত অপরিণত মন নিয়ে প্রাণের অন্ধতৃষ্ণা ও আবেগতাড়িত পশু হতো তা'হলেও অজানার হাতছানি তাকে এমন করে ব্যাকুল করতো না, আহার নিদ্রা মৈথুন এই ত্রিবিধ জীবধর্ম পালন ও চরিতার্থ করেই তার সহজে তুষ্ট জীবন সাক্ষ হতে পারতো। মানুষ গোল করেছে বুদ্ধিজীবী হয়ে। মুক এই জড় বস্তু ক্রমে ক্রমে তরলতা থেকে কীটপতঙ্গ পশুর স্তর পেরিয়ে ক্রম পরিশ্রুট চেতনা নিয়ে অনির্কচনীয় জটিলতায় যখন পূর্ণচেতন মানুষ হয়ে উঠলো তখনই তার বুদ্ধি বিষয়ে মুগর হয়ে প্রশ্ন করে উঠলো “একি”।

এই সবিস্ময় প্রশ্নে এবং অনুসন্ধানেই মানুষের ধর্মের সৃষ্টি। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় মিলে জড় এবং চেতনে মেশামেশী এই জগতের স্থলরূপ ও বৈচিত্র্য দেখে দেখে মানুষ যখন এর সঙ্গে পরিচয় সাজ করে আনলো, তখন তার অতৃপ্ত মন প্রাণ ভাবতে বসে গেল, “এই যে লক্ষ কোটি গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র তারা এই পৃথিবী ও তার প্রাণের হরিত বসন্ত প্লাবন, তার বহু-বিচিত্র জীবজগৎ—এ সবার উৎপত্তি কোথায়, কি ধরে এরা টিকে রয়েছে, অন্তিমে

কোথায় যাচ্ছে।” স্থলের জ্ঞান তাকে তৃপ্ত ও তুষ্ট রাখতে পারলো না স্থলের পিছনে ঢুলছে যে সূক্ষ্মের উজ্জল পেলব কল্পলোক তার সন্ধানে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি যাত্রা করলো। ঐ অনির্দিষ্টের খোঁজে যাত্রা না করে তার উপায়ান্তর নেই। অন্নের ক্ষুধা, জলের তৃষ্ণা, মানুষের সঙ্গে লালসার মতই দুর্দমনীয় ও দুর্কার তার এই অচিনের ক্ষুধা, আবাঙ্‌মনসগোচরের টান, নিবিস্তের পরম দুর্গম রহস্যময়ীর প্রেম।

কিন্তু সবার মাঝে এ টান জাগে না, জাগা সম্ভব নয়। মানুষে মানুষে আধার ভেদ আছে, উপাদান ভেদ আছে। মানুষও আছে নানারকম পৃথক পৃথক স্তরের। ছেলেবেলায় প্রথম রঙিন জগতে বিশ্বয়াপ্ত চোক দুটি মেলে মনে হয়েছিল সব মানুষই এক, সবারই দুটি হাত দুটি পা একই রকম নাক মুখ চোক। তারপর বয়েসের সঙ্গে নিকট পরিচয়ে দেখতে পেলাম তারাই আবার সব আলাদা হয়ে দাঁড়ালো, মনের হৃদয়ের ও প্রাণের প্রকৃতিভেদে তাদেরই কতই না বৈচিত্র্য, কতই না শ্রেণী, কতই না প্রকার ভেদ। খুঁটিয়ে তলিয়ে দেখলে শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গও তাদের এক নয়; কারু নাক উঁচু, চোঁট বাদামী ও পাতলা। কারু বা চোক দুটো আয়ত ঢল ঢল, হাতে পায়ে কি এক চারু কমনীয় পদ্মনালের লালিত্য! লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের মাঝে কচিং দুটি মানুষের নাক মুখ চোখের ছন্দ এক, হাত পা শরীরের গঠনভঙ্গী সমজাতীয়। বয়স ও অভিজ্ঞতা যতই বাড়তে লাগলো, মানুষের সঙ্গে পরিচয় যত অন্তরঙ্গ, নিবিড় ও ব্যাপক হয়ে চললো, ততই মানুষে মানুষে ভেদ সূক্ষ্ম হয়ে উঠলো। তার মানে দেখতে দেখতে দেখবার

অন্তর্ভেদী দৃষ্টিই প্রথমে হয়ে উঠলো, জ্ঞান হয়ে দাঁড়ালো  
স্বপ্ন থেকে স্বপ্নতর ।

তারপরে জীবনে এলো গুরুকৃপা—যোগশক্তি। যে  
এক অপূর্ণ ব্যাপার, নিদ্রিতা রাজকন্ঠার অঙ্গে যেন সোনার  
কাঠি রূপার কাঠির পরশ, সহজ মোটা জড়জগৎ থেকে  
হঠাৎ কি যাদুবলে যেন দূরবীক্ষণের দুনিয়ার জাগরণ,  
সেখানে স্থল নিরেট সাদা মাটি জিনিষটির মাঝে জাগিয়ে  
তোলে স্বপ্ন দৃষ্টির কি অনির্লচনীয় বৈচিত্র্য, আগে যেটাকে  
শূণ্য বলে মনে হতো সেই ব্যোম ভরে জেগে উঠলো নব নব  
জীব-সঙ্কল কত না জগৎ । গল্পে শোনা গেছিল সম্যাসীকে  
রাজা জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন—“আপনি লোকালয় ছেড়ে বনে  
থাকেন কেন ?” সম্যাসী বলেছিল—“লোকালয় কোথায় ?  
এও তো পশুসঙ্কল বন !” তারপর একটি সরিষা প্রমাণ  
গুলি খাইয়ে দিতেই বিস্মিত রাজা দেখতে লাগলো, “রাজপথ  
বেয়ে চলেছে মানুষের বিচিত্র সমারোহ কিন্তু তার দু' একজন  
ছাড়া কেউই মানুষ নয়, কারু মুখে শেয়ালের কারু কপালের  
কাছটা বাঘের, নীচের মুখ পাঠার, কারু সর্দাহের আকার  
গরিলার সিপাজির, সর্দাবয়ব পূর্ণ মানুষ যাচ্ছে কচিং দু' একটা  
এই বিচিত্র অর্ধপশু অর্ধমানবের শোভাযাত্রায় মিশে ।  
সাধনা নিয়ে আমার হলো তাই ।

এতকথা বলছি এই কথাটি সুস্পষ্ট করতে, যে, মানুষ  
সব এক নয় । ভাসা ভাসা চোকে দেখতে একরকম  
হলেও তাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন ধাতুতে গড়া । কেউ  
মোটা জড় মাটির, বুদ্ধি তার কাজেই স্থল, সে অনেকগান  
স্বভাবজ্ঞ জ্ঞানে চলে, ক্ষুধা তৃষ্ণার বেগে নিত্যন্তই পশুবৃত্তির  
প্রয়োজন সেটাতেই সে ব্যস্ত । কাজে সে জগতের কারণ  
খোঁজে না, স্বপ্নরূপ বা কাজের ধার ধারে না ; মোটা জগতের  
স্থল প্রয়োজন নিয়েই সে তুষ্ট । আর একজন উজ্জল স্বপ্ন  
তেজে গড়া, প্রাণের তরঙ্গে সে গলিত ধাতুর মত জলে উঠে,  
জীব রাজ্যের জোয়ার ভাঁটায় আনন্দ উজ্জল সত্তা তার  
সঙ্কচিত ও ক্ষীত হয়ে তুলতে থাকে । রূপের, রসের,  
কল্পোলোকের হাত ছানিতে কবিতার ভাবে, সঙ্গীতের  
তানলয়ে, চিত্রের লালিত রেখার ছন্দে স্বতই সাদা দেয় তার  
উচ্চ গ্রামে বীধা গন প্রাণ ।

ঐ যে মুটে তোমার মোট বইছে, ঐ যে করিমবক্স  
তোমার গাড়ী হাঁকায় আর সিধু ময়রা তোমার জন্তে ভেজাল  
ঘিয়ের খাবার করে, ওদের কাছে কি অবনীন্দ্রের রূপজগৎ,  
রবীন্দ্রের ছন্দ ও রসজগৎ, দিলীপের সুরের জগতের দুয়ার  
খোলা আছে ? যে গণিতজ্ঞ সে হয়ত কবিতার রসে বঞ্চিত,  
যে বীণার বাদক তার কাছে আচার্য্য জগদীশের বিজ্ঞান-  
লোকের কোন স্বপ্ন স্পন্দই পৌছায় না । এই জগতের  
জ্ঞান নিয়েই যখন এত পার্থক্য তখন দুর্গম গুহাতীত পরমার্থ  
জগতের সম্বাদ যে হাজার করা দু' একটা মানুষ পাবে তাতে  
বিচিত্রতা কি ? তাই যখন যোগবলের কথা মানুষ শুনে  
হাসে তখন রাগ করে লাভ নেই ।

যারা হাসে তারা রূপার পাত্র, রবীন্দ্রের কাছে কাব্য  
সম্বন্ধে অজ্ঞ পাক্কী বাহক উড়ে বেহারা যেমন রূপার পাত্র ।  
যে বুঝতে পারে না অথচ জানে যে সে বোঝে না—সে তো  
তবু জ্ঞানী, কিন্তু যে নিজেকে বোঝে না বলেই, মনে করে সে  
বস্ত নেই, সে অজ্ঞানের দস্তে অন্ধ । তাকে ভগবান কি বস্ত  
তা বোঝাবার জন্তে আমার সাধন-জীবনের এই রহস্যের  
আরব্যোপন্যাস লিখছি । আমি লিখছি প্রথমতঃ যে জানে  
তারজন্তে, দ্বিতীয়তঃ জিজ্ঞাসুর জন্ত, পারমাণবিক অনুসন্ধিস্থর  
(research scholar এর) জন্ত । যার এবস্ত না খুঁজে উপায়  
নেই—সে যাতে খোঁজার সত্য পথটি পায়, পথে হোঁচট  
না খায়, ভুল না করে সেই জন্তই আগার এ কাহিনী লেখা ।

আজ অবধি যোগসাধনায় বড় বই বের হয়েছে এখানি  
তার মধ্যে হবে একটি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার । আমি যে  
যোগপথের কথা বলবো তা ঠিক শাস্ত্রোক্ত যোগপথ নয়  
কারণ তাতে, শ্লোকের বাহুল্য পাবে না, জটিল দুরূহ পদ্ধতি  
ও তার ব্যাখ্যা পাবে না, একটা রহস্যের আলোচনার  
রূপকের ছড়াছড়ি ও নানা সিষ্টিমিজমের বকুনি পাবে না ।  
সব রকম ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি বিবর্জিত সরল সহজ এই  
বই খানিতে পাবে একজন আনাড়ি মানুষের অন্তররাজ্যের  
খাটি ইতিহাস । ভিতরের একটি অজানা ডাকের হাতছানি  
পেয়ে পথ খুঁজতে বেরিয়ে তার অজ্ঞান বালকের মত  
হাতড়ানো এবং পরে অন্ধকারে হঠাৎ জলজলে মণিমুক্তার  
ভাঙারে প্রবেশ ।

এই যোগ শক্তির সন্ধান পেয়ে সেখানে আমি কিছুই অন্ধ বিশ্বাসে ধরে দিইনি। প্রত্যেকটি রত্ন সেখানকার আমি নিজের ও আরও বহু সহস্রাধিকের অভিজ্ঞতায় এবং বারবার প্রত্যক্ষ দর্শনে বাজিয়ে যাচিয়ে নিয়েছি। আমি বহুযত্নে খুঁজে পেতে দেখেছি কোথায় কোন্ দিকে এ রহস্য রাজ্যের প্রবেশের পথ, কোন্টি তার চোরাগলি, কোন্টি বা কানাগলি—(blind lane leading no where in particular) যেখানে ঢুকলে দেওয়ালে মাথা ঠুকে যাওয়া ছাড়া আর কিছু কপালে জোটে না। ঐ পথের এবং ঐ অনির্দেয় বস্তুর যতটুকু আমি বুঝেছি তাই এই বইয়ে স্থান পাবে, যা বুঝিনি তা সকপটে স্বীকার করবো।

আমি দেখছি এই যোগপথে আছে কত কাঁটা, কত বন্য-জন্তু, কত আলেয়ার প্রতারণা প্রলোভন, কত কুটিল নিশি-ডাঁকের আয়োজন, দেবতার ছদ্মবেশে কত শঠ প্রবঞ্চকের ভিড়। এ সংসারকে লোকে মায়া বলে কিন্তু এই পরা রাজ্যের মায়ায় মত মূনি-মন-ভোলানো মায়া আর কোথায় আছে? আমাদের দেশে কেন যে সাধনা করতে গিয়ে এত মানুষ কপট ভণ্ডে পরিণত হয়, কত পাগল হয়, উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হয়, অনেক ক্ষেত্রে প্রাণে মারা যায় তার হেতু ও সমাধান আমার এই বই খানিতে প্রত্যক্ষের নিকষ পাথরে কষে পাবে। যারা অদম্য কৌতুহলের বশে বা পরের

দেখাদেশি এই পথ খুঁজতে গিয়ে বিপন্ন হয় আমার বইখানি তাদের হবে Warning post বা বিপদসূচক সিগনাল—Danger signal.

ভারতে বায়াম লক্ষ্য মানুষ কেন কৌপীন সম্বল হয়ে ধুরছে, তাদের কজন কি পেয়েছে, কারণ তরী কোন চোরা বালিতে আটকে গেছে, কারা পথের কোন ফাঁকে যাদুকরীর মায়ায় ভুলে সাধু মোহন্থ সেজে বসে পড়েছে, দু'শটাকা পুঁজি করে কারা এ রাজ্যে লাখ টাকার কারবারের জাগ করছে এই পথের চটিতে বসে, এ সবের কিছু কিছু ইঙ্গিত আমার বই খানিতে অনুসন্ধিৎসুরা খুঁজে পাবে। অনেকের বুজকির ব্যবসা এবং সাধুগিরির ফাঁপা বেলুন “যোগ শক্তির” আঘাতে ফেঁসে যাবে বলে হয় তো লেখকের উপর তথাকথিত অনেক মহাপুরুষ এবং অবতাররা চটে যাবেন কিন্তু তার আর উপায়স্তর নেই। ভারতে ধর্মের রাজ্যে ও খাঁটি জিনিসের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও research হওয়া আর একবার দরকার হয়েছে—যত অপশাস্ত্র ও অপধর্মের আবর্জনা ভাগাড়ে টেনে ফেলবার আয়োজন। মানুষের চোককাণ ফুটুক, “মেকি ও খাঁটি চিনে নেবার সামর্থ্য হোক, সত্য পিপাসা ভারতের আবার হোক সরল ঋজু ও অনাবিল।

—(বিজলী—১২ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, ১৫ই আবেণ)

—•—

গত মাসের ইঙ্গিতে প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের ও  
মীরাদেবীর ছবি দুইখানির জন্য আমরা  
চিত্রভবনের শ্রীযুত রতিকান্ত পালিত  
মহাশয়ের নিকট ধন্য।



**বর্তমান—**ইঙ্গিতের পাঠক পাঠিকাদের আমাদের বিজ্ঞয়ার সাদর সম্ভাষণ জানাই। সারাবৎসর ধরিয়। এই বিশেষ তিথিটির প্রতি বাংলার নরনারীর মন উন্মুগ্ন আগহে চাহিয়া থাকে। শিক্ষা ও কর্মব্যাপদেশে যাহারা বৎসরের বারোমাস প্রবাসে থাকেন তাঁহারা কয়টি দিনের জন্ত আপন আপন পল্লীভবনে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সহিত মিলিত হইয়া দীর্ঘ প্রবাসের গ্লানি ভুলিয়া থাকেন। নিরানন্দ যৌন পল্লী কয়েকটি দিনের জন্ত মিলনানন্দে আবার মুগ্ধ হইয়া উঠে। অভাবে আলস্যে অজ্ঞান্য আমাদের পল্লী-জীবন দিন দিন যেরূপ পঙ্কিল হইয়া উঠিতেছে তাহা মনে করিলে বিষন্ন হইতে হয়। সহরের বৃকে ব্যস্ততা ও কণ্ঠেষণার অন্ত নাই। ঐশ্বর্য ও চাকচিক্যের খেলাও সে কতকটা সহরে চলিয়া থাকে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যে পল্লীতে জাতির যথাযথ জীবনের ভিত্তি সেই গানেই প্রাণের স্পন্দন স্তিমিত হইতে স্তিমিততর হইয়া আসিতেছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে স্বরাজ হয়ত মিলিবে, কিন্তু ততদিনে পল্লীগুলিতে বৃষ্টি শ্রমশানের করাল ছায়া পড়িবে। যাহারা সমূলতলা দার্জিলিংয়ের গোহ ত্যাগ করিয়া চির-অবহেলিত গ্রামে অবকাশ যাপন করিতেছেন তাঁহারা বাংলার পল্লী-সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হইবেন আমরা এই আশাই করি।

**ইঙ্গিতের বর্ষানন্ত—**বন্ধু ও বান্ধবীদিগের স্নেহের আশ্রয়ে এবং প্রত্নে ইঙ্গিত তাহার সকল ক্রটি বিচ্যুতি লইয়া দ্বিতীয় বর্ষে প্রবেশ করিল।

মানুষের অন্তরঙ্গে সার্থক সুন্দর হইয়া উঠিবার জন্ত যে একটা চিরন্তন আকুলি ব্যাকুলি চলিয়া আসিতেছে, সাহিত্য প্রচেষ্টা মাত্রই তাহানই একটা আংশিক প্রকাশ।

ইঙ্গিতকে অবলম্বন করিয়া একবৎসর পূর্বে যে সাহিত্য প্রচেষ্টার সূচনা হইয়াছিল, তাহা যতই ক্ষুদ্র ও নগণ্য হউক না কেন, তাহার বিকাশ ও পরিণতির সম্বন্ধে আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার অন্ত নাই। এই বর্জে যাহারা সমিধ যোগাইয়াছেন ও যোগাইতেছেন মামুলী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া আমরা তাঁহাদের দানকে পরী করিতে চাহি না। শুধু বলিতে চাই যে 'ইঙ্গিত' তাঁহাদেরই, তাহাকে ফুটাইয়া ফলাইয়া তুলিবার দায় আমাদেরও যতখানি তাহাদেরও ঠিক ততখানি। তাই বর্ষান্ত্রে আবার নূতন করিয়া তাঁহাদের নিকট ইঙ্গিতের দাবী পৌঁছাইয়া দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম।

**ভেদনাই?**—দেখিতে দেখিতে মন্দিরের দ্বার খুলিল। ভাবিলাম মনের দরজাও বৃষ্টি বা সেই অমুশোভিত খুলিবে, তাই একটু কোতূহল লইয়াই গ্রামে গিয়াছিলাম! কিন্তু এক আধজন সমাজপতির সহিত আলাপ করিয়া বৃষ্টিলাম সংবাদ পত্রের গুস্তে ও জীবনে অনেক পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে এখনও! টাউন হলে ও সভাসমিতিতে যাহা চলিতেছে গৃহের চতুঃসীমানায় ও পূজামণ্ডপে তাহা এখনও অচল! কতদিনে এ অসামঞ্জস্যের সমাধান হইবে তাহা জাতির ভাগ্যবিধাতাই জানেন!

**মহন সুখা—**মহাআর মৃত্যুপণ ব্যাপারে দেশের আপামর সাধারণের অন্তর কত গভীর ভাবেই না আলোড়িত হইয়াছে! এই মহন-সুখা পান করিয়া আজ



উচ্চবর্ণ হিন্দু অসঙ্কোচে তথাকথিত অস্পৃশ্য ভাই এর হাত ধরিয়াছেন। হিন্দু মুসলমানের চিরন্তন কলহ স্বদেশে বিদেশে বহু আলাপ আলোচনায় যাহার মীমাংসা হয় নাই তাহাও বুঝি বা গিটিতে চলিল! কোপীনধারী কৃশকায় একটি মানুষ কারাক্ষকারে বসিয়া জাতির জীবন-থাতে কেমন করিয়া প্রেমের বন্যা বহাইয়া দিলেন ইহা গভীরভাবে উপলব্ধি করিবার কথা। কি গুণে বুদ্ধ খ্রীষ্ট চৈতন্য প্রেমের শাসনে লক্ষ লক্ষ নরনারীর চিত্ত মথিত, আকৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত করিতেন আমরা তাহারই চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়া যন্ত্র হইলাম, তাও আবার এই বস্তুসংস্পর্শ যুগে!

**কবি ও নবী**—রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিলাসী ও স্বপনচারী বলিয়া যাহাদের আক্ষেপের অন্ত নাই, কবির পুণা অভিযানের পর তাঁহারাও কবিকে অভিনন্দন করিয়া বলিতেছেন “এ কী রূপে দিলে দরশন!” আমরা বলি কবির এ রূপ আমাদের অপরিচিত নয়। যখনই জাতির জীবনে এমনি একটা সঙ্কটকাল বা সঙ্কীর্ণ আসিয়াছে তখনই তাঁহার আসন টলিয়াছে।

যারবেদ্যার কারা প্রাচীরের অন্তরালে কবি ও নবীতে সেই অপূর্ণ সাক্ষাৎ ও আলিঙ্গন—জাতির জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। একদিন অতি দুঃখেই কবি তাঁর অপরূপ ছন্দে ‘দুর্ভাগা’ দেশকে ডাকিয়া বঞ্চিত ও উপেক্ষিতের প্রতি নির্মমতার জগ্ন তিরস্কার করিয়াছিলেন। কে জানিত কবি ও নবীর স্বপ্ন এমন করিয়া সফল হইবে!

**শোকসংবাদ**—যশোহরের গৌরবন্ত রায় বাহাদুর যহুনাথ মজুমদারের মৃত্যুতে আমরা মর্মান্তিক ব্যথা

পাইয়াছি। মনীষা, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, দেশাত্মবোধ ও কর্ম-কুশলতায় যহুনাথের চরিত্রে একটি অনন্য সুলভ বিশিষ্টতার ছাপ ছিল। একদিকে জনকতুল্য জ্ঞানের গভীরতা, অপরদিকে অসাধারণ কর্মকুশলতা—এই দুই গুণের একত্র সমাবেশ সংসারে বিরল। যহুনাথের উভয় গুণই ছিল। যশোহরের জেলাবোর্ডে প্রথম বেসরকারী সভাপতি ছিলেন যহুনাথ। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি এই দায়িত্বপূর্ণ কাব্য অপূর্ণ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেন। বাগিতা ও বিচক্ষণতায় যহুনাথের কৃতিত্বের সংবাদ অনেকেই রাখেন। বঙ্গদেশের লুপ্ত নদীগুলির পুনঃ সংস্কারকল্পে তিনি অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু বিধির নিষেধ বিধানে সংস্কার-কাব্য আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বেই আমরা তাঁহাকে হারাইলাম। তিনি ছিলেন বেদজ্ঞ, শোক দুঃখের অতীত, কিন্তু মাটির মানুষ আমরা শোকাকর্ষ মনেই তাঁহাকে আমাদের প্রণতি জানাই।

**আত্মীয় আত্মীয়**—স্বকবি ও সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হুমাযুন কবির ও শ্রীমতী শান্তি দাস পবিত্র পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। আমরা এই নবদম্পতীর দীর্ঘায়ু ও উন্নতি কামনা করি। প্রেমের মহিমা যে জাতিবর্ণের বৈষম্যকে গর্হ করিয়া দিতে পারে, ইহাদের পরিণয়ে সেই সত্যের পরিচয় পাই। শিক্ষা দীক্ষা ও কৃষ্টিগত স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডী কোথায় বাইয়া থামিবে তাহা সকল সময়ে শাস্ত্রকার বা সমাজপতির নির্দেশে নির্ণীত হয় না। এইরূপ মিলনে উভয় সমাজের কল্যাণ হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।



## প্রাপ্তি স্বীকার

**বৈতরণী**—উড়িষ্যা হইতে প্রকাশিত ইংরাজী মাসিক "বৈতরণী"র এক সংখ্যা পাইয়া আমরা আনন্দিত হই। ইহার সম্পাদক কুমার বিজ্ঞান সিংহদেও বি, এ, এম, আর, এ, এস, বি, এল। ঠিকানা—পোঃ চতুর্দার, কটক, উড়িষ্যা। উক্ত মাসিকের ঘোষণা অনুসারে পত্রিকাখানিকে উড়িষ্যার সর্বপ্রথম ইংরাজী মাসিক বলিতে হইবে। তাহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে উহা উড়িষ্যার গৌরব ও সম্পাদকের কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। শুধু উড়িষ্যা বলিব কেন, দিকেদিকে এইরূপ সাহিত্যশুশীলনের প্রেরণা ভারতের নবজন্মের সুপ্রভাতেরই সূচনা করে। তবে একটা ক্রটি আমাদের চোখে পড়িল। পত্রিকাখানির অবস্থা-সম্ভার খুব প্রশংসাই নয়। আমরা নবীন সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করি।

**বিশ্বজনীন**—মাসিক পত্রিকা। তত্ত্বমসি মঠের মুখপত্র। সম্পাদক—বামী নির্মাণানন্দ। প্রাপ্তিস্থান বিশ্বজনীন কার্যালয়। ৩২।১ রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। তৃতীয় বর্ষ চলিতেছে। সডাক বার্ষিক মূল্য ২৭, প্রতি সংখ্যা ৮।

সনাতন আধ্যাত্মের সর্বজনীন প্রচার—হিন্দুধর্মের গভীর তত্ত্বসমূহ, জীবমুক্ত মহাপুরুষগণের জীবনী ও উপদেশাবলী, শাস্ত্র সমূহের গূঢ় ব্যাখ্যা, শাস্ত্র সমন্বয় তথা বিভিন্ন ধর্মের অসাম্প্রদায়িক আলোচনা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্প সমূহ ইহাতে প্রকাশিত হয়। কম্পী ইহার মধ্যে কর্ণের প্রেরণা, জ্ঞানী ইহার মধ্যে জ্ঞানের আদর্শ ও ভক্ত ইহার মধ্যে ভক্তির উৎস লাভ করিবেন। ভাষা সহজবোধ্য ও সরল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের পাঠের যোগ্য। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

**ভক্তিতত্ত্ব**—বামী নির্মাণানন্দ প্রণীত। প্রকাশক ব্রহ্মচারী নির্মল চৈতন্য। প্রাপ্তিস্থান, বিশ্বজনীন কার্যালয়, ৩২।১ রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৮।

অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান কালের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সময় পর্য্যন্ত যে আদর্শ ভক্তিতত্ত্ব আমাদের দেশে আলোচিত হইয়াছে প্রকার সঙ্ক্ষেপে সমগ্র ভক্তিশাস্ত্র সহজ সরল ও সাধারণের বোধগম্য ভাষায় নয়টি অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্রঃ সম্বন্ধে যাহার কিছু জানিতে চান, এ পুস্তকটি পাঠ করিলে তাহার বিশেষ লাভবান হইবেন।

**উত্তরা**—৪৬ নং ভেলুপুরা, বেনারস সিটি হইতে প্রকাশিত। "উত্তরা"র ভাষ্যসংখ্যা পাওয়া গেল। ইহার সম্পাদক—সুপরিচিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন ও হরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। ছাপায় এবং গেটআপে বাংলায় এর সমতুল্য আর একখানি কাগজও নাই। সুদূর বেনারস হইতে প্রকাশিত হইয়াও, কি করিয়া এই পত্রিকাখানি বাঙ্গলা দেশের সর্বত্র সকলের সমাচার ও পরিচয় লাভ করিল, তাহা এই পত্রিকাখানি দেখিলেই বুঝা যাইবে। ইহার প্রত্যেক প্রবন্ধটাই সুচিন্তিত এবং চিন্তাশীল সুখী লেখকের দ্বারা লিখিত। সহযোগীর বহুল প্রচার কামনা করি।

**অর্চনা**—এখানি মাসিক পত্র। সম্পাদক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস। ৩০ বি পার্কভীচরণ ঘোষের লেন, অর্চনা অফিস হইতে প্রকাশিত। দাম বার্ষিক ১।০—নগদ ০।১০ পয়সা। কাগজ খানিতে সাহিত্যিক সৌষ্টবতা অপেক্ষা ব্যবসাদারী অল্প সজ্জাই বেশী পরীক্ষিত হয়—কারণ প্রত্যেক প্রবন্ধের মধ্যেই বিজ্ঞাপনের বাহুল্য দেখা গেল। সর্বাপেক্ষা অধিক পীড়া দেয় ইহার প্রচ্ছদপটের ছবিখানি। ছবিখানিতে অর্চনার কি অর্থ ফুটিয়া উঠিয়াছে শিল্পের সে সূক্ষ্ম বর্ণমায়া আমাদের এ হুল চক্ষু বুঝিতে অক্ষম। পত্রিকাখানি ব্যবসাদারী অনুপ্রেরণার কিয়দংশ পরিত্যাগ করিয়া খাঁটি সাহিত্যের বর্ণেই সমধিক অনুরক্ত হউক ইহাই আমাদের কামনা। প্রক্কেয় সম্পাদক মহাশয় সেদিকে দৃষ্টি ফিরাই তাহা সম্ভব—ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

—হিমাদ্রি বহু।

শ্রীসরোজরঞ্জন মিত্র কর্তৃক ৩০নং হরিতকি বাগান লেন, কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত,  
ও মেহেরপুর, গোপসেনা পোঃ, জেলা অশোহর হইতে প্রকাশিত।











